প্রথম প্রকাশ ঃ মহালয়া, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৯

প্রকাশক ঃ
কল্যাণী প্রকাশনী
১০ , এস. কে, দেব রোড,
কলিকাতা-৭০০০৪৮

মুদ্রাকর ঃ
অসিত মণ্ডল
এ. পি. ওয়ার্কস
১৯/জে গোয়াবাগান লেন,
কলিকাতা—৭০০০

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

পরিশিষ্ট

প্রথম অধ্যায়

● রাজনৈতিক পটভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হতে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের যে মানসিকতা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল, রাজনৈতিক জটিলতার আবর্তে পড়ে সেই স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ ক্রমশ সুগঠিত ও বলিষ্ঠ রূপ ধারণ করে বিশ শতকের রাজনৈতিক পরিবেশকে সমৃদ্ধ করে তোলে। উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য' এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের কাব্য কবিতার মধ্যে এই স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু, প্যারীচরণ সরকার, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিগণের সহযোগিতায় হিন্দু মেলার আয়োজন করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল স্বদেশানুরাগ বর্ধিত করা। এই ভাবে স্বদেশ-প্রেমের এবং জাতীয়তা বোধের পরিমণ্ডল বাড়তে থাকায় ইংরেজ-শাসকগণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁরা স্বদেশ প্রেমের এই বীজকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চান। এই উদ্দেশ্যে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রচলিত মিউনিসিপ্যালিটির স্বায়ত্তশাসন নীতির পরিবর্তনের জন্য ছোট লাট স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি একটি বিল রচনা করেন। ইংরেজদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন এই বিলের বেশ কিছু দিকের পরিবর্তন করেন। নতুন আইনের সাহায্যে পৌর শাসন ব্যবস্থায় কলিকাতার নাগরিক প্রতিনিধির সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়। পৌর শাসন ব্যবস্থায় সরকার মনোনীত প্রতিনিধিদের অধিক ক্ষমতা দেওয়া হয়। এর ফলে স্বায়ত্তশাসন সংস্থা হিসাবে পৌর শাসন ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ নষ্ট হয়। পৌরসংস্থার শাসন ক্ষমতায় ইংরেজ সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দেশের জনগন বুঝতে পারেন যে সরকার দেশ ও জাতির স্বার্থ বিরোধী কাজ করছে। ইংরেজ সরকার দেশের মধ্যে তার ক্ষমতার পরিধিকে আরো ছড়িয়ে দিতে চাইছে। অধিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠার জন্যই ইংরেজ সরকার জনগণের আশা আকাঙ্খা ও ইচ্ছাকে মোটেই আমল দিচ্ছে না। এর প্রতিক্রিয়ায় দেশের মধ্যে গণ-অসন্তোষ বাড়তে থাকে। দেশের জন্য মুঠো মুঠো ভালোবাসা আর বিদেশী ইংরেজদের জন্য একরাশ ঘৃণার আগুন নিয়ে দেশের মানুষ এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শপথ গ্রহণ করেন। দেশের মধ্যে গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়। দেশের নেতারা স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য এবং দেশের মধ্যে তার ব্যবহার বাড়াবার উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে বিভিন্ন উপায়ে জনমত গড়ে তোলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস স্বদেশী শিল্পের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে।

স্বদেশী শিল্পের উৎপাদক ও প্রতিষ্ঠাতাগণ দেশীয় শিল্পের বিকাশের জন্য এর থেকে নতুন প্রেরণা লাভ করেন। এইবাতাবরণে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেশবাসীর নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য ব্যবহারিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এই উদ্দেশ্যে এবং দেশের মধ্যে স্বদেশীভাব সঞ্চারের জন্য তিনি 'ডন ম্যাগাজিনে' ভারতীয় শিক্ষা-সমস্যা ও তার প্রকৃতি সম্বন্ধে এক দীর্ঘ রচনা লেখেন। এই রচনার দ্বারা তিনি জনমানস গঠন করতেও চেয়েছিলেন[১]। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি 'ডন সোসাইটি' স্থাপন করেন। সেদিনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিনয় সরকার, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ মনীষীগণ এই সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। "ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতির রচনাত্মক কর্মে যুবশক্তির উদ্বোধন।[২] এই 'ডন ম্যাগাজিন' ও 'ডন সোসাইটির' মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন একটা সাংগঠনিক রূপ লাভ করে। এই আন্দোলনে দেশের অগণিত মানুষ সামিল হন। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে", "তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে তা বলে ভাবনা করা চলবে না"— রবীন্দ্রনাথের এসকল গান এই আন্দোলনে নতুন শক্তি ও উদ্দীপনার জোয়ার এনে দেয়। বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা "ডন সোসাইটির বক্তৃতাদির সময়ে উপস্থিত থেকে ছাত্রদের সশস্ত্র সংগ্রামে প্রণোদিত করেন, বিবেকানন্দের আদর্শ নিতে বলেন, জাতীয়তার বিষয়ে শিক্ষা দেন, তরুণদের মনে বিদ্রোহের বীজ বপন করতে চেষ্টা করেন"।[৩]

এইভাবে দেশের মধ্যে স্বদেশী চেতনা ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং একই সঙ্গে ইংরেজ সরকার এই স্বদেশী চেতনার গতিরোধ করার জন্য নানাবিধ রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক কৌশল অবলম্বন করেন। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারই এদেশের জাতীয়তাবোধকে সম্প্রসারিত করেছে। ইংরাজী শিক্ষার ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ভবিষ্যতে দেশের শাসনক্ষমতাকে তাঁরা ধরে রাখতে পারবেন না। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বৈরতন্ত্রের উপাসক[৪] বড়লাট লর্ড কার্জন বিশ্ব বিদ্যালয় আইন প্রয়োগের দ্বারা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় দেশের মধ্যে ব্যাপক গণ-অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে ওঠে। দেশের প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ এবং পণ্ডিত ব্যক্তিগণ দেশের মধ্যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন করার গুরুত্ব অনুভব করেন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হবার পর সতীশচন্দ্র মুখার্জী ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তের যুগ্ম নেতৃত্বে সারা দেশের ছাত্ররা এই আন্দোলনকে খুবই গতিশীল করে তোলে। "ভাঙো সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। কায়েম করো স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়।"[৫]—বাগ্মী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই উদাত্ত আহ্বানে শুধুমাত্র ছাত্ররা সাড়া দিলেন না, সেকালের বিদগ্ধ, দূরদর্শী ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণের মধ্যে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিনয় সরকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ,

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীগণও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই শিক্ষা আন্দোলনে যোগ দেন। এই আন্দোলনকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর ইংরেজ সরকার সকল প্রকার রাজনৈতিক সভা, বক্তৃতা, পিকেটিং ইত্যাদি বন্ধের নির্দেশ দিয়ে 'কারলাইন আইন' জারি করেন। সরকারের এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা নভেম্বর শচীন্দ্রনাথ বসু ও রমাকান্ত রায়ের নেতৃত্বে 'এনটি সারকুলার সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় নেতৃবৃন্দ অনুভব করেন যে জাতীয়তার আদর্শে সাহিত্য, বিজ্ঞান, এবং কারীগরী শিক্ষার বিস্তারের জন্য একটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই মার্চ যাদবপুরে "জাতীয় শিক্ষা পরিষদ" প্রতিষ্ঠিত হয়। গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী পাঁচ লক্ষ টাকা, মুক্তাগাছার জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য্য আড়াই লক্ষ টাকা এবং রাজা সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক একলক্ষ টাকা দান করে এই পরিষদের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে সুদৃঢ় করেন। ১৯০৬ সালের ১৪ই আগষ্ট কলকাতার টাউন হলে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ। সেই জনসভায় "জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্তর্গত বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয়।"[৬] এরপর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে সার্কুলার রোডে 'বেঙ্গলঃ টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট', প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে স্বদেশীবোধ, স্বদেশী চেতনা, এবং স্বদেশী ভাবধারার আদর্শ অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষানীতি গঠন করার জন্য অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে প্রাচীন তপোবন শিক্ষা প্রণালীর প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে সঙ্গে করে শহর হতে দূরে বোলপুর শান্তিনিকেতনে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ব্রহ্মবান্ধব মহাশয় কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করে 'সারস্বত আশ্রম' স্থাপন করেন। শ্রমের মর্য্যাদা ও আত্মনির্ভরতার বিষয়ে ছাত্রদের মনে চেতনার উন্মেষ ঘটানই ছিল এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ একটা সমিতি গঠন করেন। কার্য্যকরী শিল্প শিক্ষার জন্য ছাত্রদের বিদেশে প্রেরণের উদ্দেশ্যে এই সমিতি থেকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হ'ত। ব্রজসুন্দর রায়ের নেতৃত্বে রংপুরে একটা 'জাতীয় বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। এইভাবে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রভাবে এবং নতুন ভারত গঠনের প্রেরণায় ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে উনিশটি জাতীয় বিদ্যালয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অনুমোদন লাভ করে।[৭]

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্যার এণ্ডরুজ উড়িষ্যাকে বাংলা হতে পৃথক করার যে প্রস্তাব দেন, তা তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন সমর্থন করেন। ফলে উড়িষ্যা ও বাংলা দুটি পৃথক প্রদেশে পরিণত হয়। এতে দেশবাসীর মনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার ছোটলাট স্যার এন্ডরুজ বাংলা দেশকে ভাগ করে আসামের সঙ্গে পূর্ববঙ্গকে এক করে দেবার পরিকল্পনা

করেন। এর ফলে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে "অন্তত তিন হাজার প্রকাশ্য সভায় জনসাধারণ ইহার প্রতিবাদ করে। বাংলার সর্বত্র এইরূপ সভার অধিবেশন হয়।······এই সকল সভায় ৫০০ হইতে ৫০,০০০ শ্রোতা উপস্থিত থাকিতেন"।[৮] ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলকাতার টাউন হলে বঙ্গবিভাগ রোধের জন্য এক বিরাট সভাও অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে সরকারীভাবে "ঘোষিত হইল যে ভারত সচিব বঙ্গভঙ্গ মঞ্জুর করিয়াছেন"।[৯] জাতীয় ঐক্য ও সংহতি এবং জাতীয় সৌভ্রাতৃত্ব এবং সম্প্রীতিকে বিনাশ করার জন্য সরকারের এই ঘোষনাকে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিধ্বংসকারী বোমার সঙ্গে তুলনা করে দেশবাসীকে এ সম্পর্কে সজাগ করে তোলেন। সভাসমিতিতে হাজার হাজার কণ্ঠ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে লেখনীর মাধ্যমে মত প্রকাশিত হতে থাকে। বৃটিশরাজের এই গর্হিত কাজের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ সোচ্চার হয়ে ওঠেন। বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অশ্বিনীকুমার দত্ত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সকলেই এই আন্দোলনের শরীক হন। লালা লাজপত রায়, মহামান্য তিলক, গোখলে এবং নৌরজী বলিষ্ঠ আত্ম-প্রত্যয়ের দ্বারা এই আন্দোলনকে সমর্থন করেন। টইলরাম গঙ্গারামের ভূমিকাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[১০] একই উদ্দেশ্যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে এক মহতী সভার আয়োজন হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্র, যুবক ও অন্যান্য প্রতিনিধিগন এই সভায় যোগদান করেন। সভা আরম্ভের বহু আগে থেকেই শত সহস্র ছাত্র যুবক কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হন।

বন্দেমাতরম ধ্বনি-সহ ছাত্রেরা কৃষ্ণ পতাকা হাতে করে সারিবদ্ধ ভাবে রমাকান্তের নেতৃত্বে টাউন হলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। জনসমাগমে টাউন হল পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। টাউন হলের দোতালা এবং একতলায় দুটি পৃথক সভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু। বিশাল সমাগমের জন্য টাউন হলের সম্মুখস্থ ময়দানে অম্বিকাচরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে আরও একটি সভার আয়োজন করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্তিত "বন্দেমাতরম" এই সভাতেই স্বদেশী-মন্ত্ররূপে স্বীকৃতি লাভ করে। বাঙালীর সামাজিক, আর্থিক ও নৈতিক উন্নয়নের পরিপন্থী বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এই সভাতেই করা হয় এবং অবিলম্বে 'বঙ্গভঙ্গ' সম্পূর্ণভাবে রদ করার জন্য রাজ্যসচিবকে অনুরোধ করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বঙ্গভঙ্গের এই সন্ধিক্ষণে সরকারের অনমনীয় মনোভাবকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জন্য দেশীয় নেতৃবৃন্দ জাতিকে আহ্বান জানান। বিদেশী দ্রব্য বয়কট আন্দোলনকে সুতীব্র করে তোলার জন্য সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় পত্রিকা মারফৎ সমগ্র জাতিকে বিদেশী পণ্যবর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তুলতে

সচেষ্ট হন।[১১] টাউন হলের এক মহতী সভায় শ্রী নরেন্দ্রনাথ সেন দেশের জনমানসে বিদেশী দ্রব্য বয়কটের মনোভাবটি প্রস্তাবাকারে উপস্থিত করেন। সর্ব-সম্মতিক্রমে সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়। এরপর বিদেশী পণ্য বয়কটের আন্দোলন চতুর্দিকে প্রসার লাভ করতে থাকে। দেশীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারতার জন্য দেশীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে কর্মতৎপরতা দেখা দেয়। ধীরে ধীরে কিছু কিছু দোকান খোলার মাধ্যমে দেশে প্রস্তুত বিভিন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের চেষ্টা করা হয়। জনসাধারণকে স্বদেশী দ্রব্য ক্রয়ে আগ্রহী ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য হ্যাণ্ডবিল ছাড়া হয়। বাংলাদেশের জমির স্বত্বাধিকারীগণ দেশপ্রেমের আহ্বানে অনুষ্ঠিত এক সভায় দেশে সুতা ও তাঁত শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় হন। এই উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহের মহারাজা পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং ওয়াটুরের মহারাজা দশহাজার টাকা চাঁদা বাবদ দিতে প্রতিশ্রুত হন। নানা জাতীয় দ্রব্য উৎপাদনের জন্য দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ন্যাশনাল সোপ ফ্যাকটরী, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, যশোহর চিরুনীর ফ্যাকটরী—প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থকরী ব্যাপারে স্বনির্ভরশীলতার জন্য দ্বারভাঙার মহারাজকে পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য রূপে রেখে বাবু ভুপেন্দ্রনাথ বসু বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাংক খোলার কথা ঘোষণা করেন। ন্যাশনাল বীমা কোম্পানীও স্থাপিত হয়। দেশজাত দ্রব্য যথা যশোহরের চিরুনী, কাঞ্চন নগরের ছুরি-কাঁচি, বরিশালের নিব, কলম ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য দেশবাসীর মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা দেখা দেয়। 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথার' মাধ্যমে রামেন্দ্রসুন্দর স্বদেশবাসীকে আহ্বান করে বললেন "মা লক্ষ্মী কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেব না। ঘরের থাকতে পরের নেব না। শাঁখা থাকতে পরের চুড়ি পড়ব না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করব না। মোটা বসন অঙ্গে নেব"।[১২] ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে ও ৩১শে জুলাই রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশ সমাজ' বক্তৃতার মাধ্যমে বাঙালীজাতিকে তথা ভারতবর্ষকে বিদেশমুখী না হয়ে স্বদেশাভিমুখী হতে উদ্বুদ্ধ করেন। কবি রজনীকান্ত সেনও এই একই উদ্দেশ্যে দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে বল্লেন—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই
দীন দুখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই..."

সাহিত্যে, কাব্যে, সংগীতে জাতীয়তাবোধের প্রবাহ এইভাবে সমগ্র দেশকে প্লাবিত করে। চারুশিল্পের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। কলকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেলের প্রেরণায় শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশ্চাত্ত্য রীতিকে ত্যাগ করে প্রাচ্য রীতিতে অঙ্কণ শুরু করতে থাকেন। উভয়ের প্রচেষ্টায় ভারতীয় চিত্রকলা দেশীয় সংস্কৃতির অলঙ্কারে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মাড়োয়ারী ও মুসলমান সম্প্রদায় এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও বিদেশী দ্রব্য বয়কট আন্দোলনকে সমর্থন করেননি। বস্তুত-পক্ষে মুসলমান সম্প্রদায় এই অন্দোলনের বিরোধিতা করেন।[১৩] ১৯০৫ সালের ১০ই আগস্ট আন্জুমানি খাদেমল ইসলামের উপস্থিতিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের এক সাধারণ সভায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, বয়কট আন্দোলন এবং বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পটভূমিকায় মুসলিম সম্প্রদায়ের সামগ্রিক অবস্থার পর্যালোচনা করা হয়। এই সভায় হিন্দুদের সংস্পর্শে আসার সময় থেকে কিভাবে মুসলিম সম্প্রদায় সর্বদিক থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন সে বিষয়ে সভার সভাপতি মৌলানা জাহেদ হাসান সাহেব সমবেত মুসলিম সম্প্রদায়কে সচেতন করে তোলেন।[১৪] মৌলানা জাহেদ হাসান বলেন বৃটিশ সরকারের শাসন ব্যবস্থা তাঁদের পক্ষে সুখপ্রদ এবং শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য শুধুমাত্র বাংলাদেশ নয় সমগ্র ভারতকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করলেও তা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী নয়। বরঞ্চ ধর্মের বিভিন্নতার ফলে হিন্দু ও মুসলমানের কোন সময়েই মিলিত ভাবে থাকা সম্ভব নয়। এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন থেকে বিরত থাকার জন্য মুসলিম সম্প্রদায়কে আহ্বান করা হয় এবং কার্জনের কাজকে সমর্থন করে ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব নেওয়া হয়।[১৫] তদুপরি হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণকে প্ররোচিত করার জন্য লর্ড কার্জনের কূটনৈতিক তৎপরতা, আলীগড়ের হিন্দুবিদ্বেষী মুসলিম নেতা সৈয়দ আহমেদের দুরভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপ, কায়েমী স্বার্থবাজ ঢাকার নবাব সলিমুল্লার পৃষ্ঠপোষকতা, ১৯০৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের দলীয় কর্মতৎপরতা,[১৬] ইত্যাদির ফলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদবুদ্ধি ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। এর ফলে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা, ময়মনসিংহ ইত্যাদি অঞ্চলে বীভৎস সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। দেশীয় নেতাগণ সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ব রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। সর্বপ্রকার ভেদাভেদ ও সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে দেশের সামগ্রিক স্বার্থে বিদেশী পণ্য দ্রব্য বয়কট আন্দোলনকে সার্থক করে তোলার জন্য তাঁরা দেশবাসীর কাছে আবেদন জানান। এই বয়কট আন্দোলনের তীব্রতায় বৃটিশ সরকার কর্তৃক ভারতবর্ষে বিদেশী পণ্য আমদানীর পরিমাণ ক্রমহ্রাসমুখী হয়ে পড়ে। সুতী কাপড়, বিদেশী জুতা, সিগারেট ইত্যাদি পণ্যের কথা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এইভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন এবং অর্থনৈতিক আন্দোলনের তীব্রতায় দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে।

দেশব্যাপী এই অন্দোলনের গুরুত্বকে অস্বীকার করে নিজেদের কায়েমী স্বার্থকে বজায় রাখার জন্য ইংরেজ সরকার ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন। এই মর্ম বিদারক খড়্গাঘাতে সমগ্র জাতি বাক্‌রুদ্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। জাতির সকল শক্তি একত্রিত হয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইংরেজ সরকারকে চরম আঘাত হানার জনা দেশের জনগণ ক্রিয়াশীল হয়ে

ওঠেন। জাতির এই চেতনাকে উদ্দীপ্ত করার জন্য জাতিকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বল্লেন—

"রাজার শাণিত খড়্গ নিষ্ঠুর আঘাতে
পারেনি করিতে দ্বিধা তোমার স্বদেশ।
শুধু ভাঙ্গিয়াছে তব নিদ্রার আবেশ
দিয়াছে চেতনা।
এই ব্যবচ্ছেদ-খাদ
ভাবিয়া বহিয়া যাক তরঙ্গ বৈভব
বঙ্গ বক্ষঃ ক্ষত বিগলিত মেঘনাদ
রক্তগঙ্গা পুণ্য স্পর্শ যার দিবেপ্রাণ
সহস্র সন্তানে। দিবে বরাভয় দান।"

জাতির ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বকে সুদৃঢ় করে তোলার উদ্দেশ্যে বঙ্গভঙ্গের দিনটিকে রাখী বন্ধনের উৎসব হিসাবে পালন করার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতিকে আহ্বান জানান।[১৭] রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পরামর্শে ঐ দিনটিকে 'অরন্ধন দিবস' রূপেও পালন করা হয়। শোক দিবস হিসাবে ঐ দিনটিতে সকলের নগ্নপদে থাকার ও দোকানপাট বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত করে তুলে সমবেত ভাবে রাখী বন্ধন উৎসব পালনের আয়োজন হয়। "গঙ্গা স্নানান্তে বিডন উদ্যানে ও সেনট্রাল কলেজ প্রাঙ্গণে রাখী উৎসব"[১৮] সম্পন্ন হয়। বিপুল উদ্দীপনায় দেশবাসী এই উৎসবকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেন। এই মহান রাখী বন্ধনের উৎসবকে কেন্দ্রকরে রচিত হ'ল এক মিলন সংগীত—

"বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হইক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক
হে ভগবান।"

এরপর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে সভা সমিতির মাধ্যমে আলোচনা চলতে থাকে। দেশের আপামর মানুষ বিদেশী দ্রব্য বর্জনের মাধ্যমে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ১৯০৫ সালে বেনারস কংগ্রেস অধিবেশনে লালা লাজপত রায় এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।[১৯] এই আন্দোলনের দ্বারা সমগ্র ভারতবাসীর সংগ্রামশীলতা অধিক ভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। যুক্ত-প্রদেশের তেইশটি জেলায়, বম্বে প্রদেশের চৌদ্দটি জেলায়, মধ্যপ্রদেশের পনেরটি শহরে, পাঞ্জাবের কুড়িটি জেলায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ভারতবাসীর আন্দোলন

বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এইভাবে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সমগ্র ভারতে ঐক্যবন্ধ জাতীয় আন্দোলন বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ 'অখণ্ড বঙ্গভবন' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আপার সারকুলার রোডে এই উদ্দেশ্যে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় ইংরেজ সরকারের কায়েমী স্বার্থ প্রণোদিত এই জঘন্য কাজের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকারে দেশের সর্বস্তরে বলিষ্ঠ আন্দোলন করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ইংরেজ সরকারের প্ররোচনাকে উপেক্ষা করে আবদুল রসুল, আব্দুল হালিম গজনভি, মুসুকখান বাহাদুর, মহম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, লিয়াকৎ হোসেন খান প্রমুখ ব্যক্তির নেতৃত্বে কলিকাতার মুসলমান সমাজের এক অংশ এই আন্দোলনে যোগদান করেন। এর ফলে আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথমাবস্থা থেকেই অশ্বিনীকুমার একে জাতীয় আন্দোলনের রূপ দিতে সচেষ্ট হন। তাঁর আহ্বানে চারণকবি মুকুন্দ দাস দেশপ্রেমের গান গেয়ে গেয়ে দেশবাসীর মধ্যে দেশপ্রেম ও সংগ্রামশীলতার বীজ বপন করতে থাকেন।[২০] ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে অশ্বিনী কুমারের প্রচেষ্টায় আবদুল রসুলের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির এক অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। এর বহু পূর্বেই স্বদেশী আন্দোলনের প্রকোপ বরিশালে বৃদ্ধি পেতে থাকায় সরকার বরিশালকে "আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী অঞ্চল" বলে ঘোষণা করেন। সরকারী নির্দেশ অমান্য করে হাজার হাজার স্বেচ্ছা-সেবকগণ এই অধিবেশনকে সার্থক করে তোলার জন্য শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মিছিল করে সভায় যোগ দিতে আসেন। ইংরেজ শাসক শ্রেণীর অমানুষিক অত্যাচারে শেষ পর্য্যন্ত সভার কার্য্য স্থগিত হয়ে যায়। কিন্তু এই অত্যাচারের ফলে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসীর বিক্ষোভ আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে। বিপিনচন্দ্র পাল ১৯০৬ এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার বীজ বপন করার জন্য বাংলাদেশের সর্বত্র বিশেষত যশোহর, খুলনা, শিলচর, বরিশাল, কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে সভাসমিতি স্থাপন ও বক্তৃতা দিতে থাকেন। তিনি বিভিন্ন সভায় দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন—"আমি মনে করি বঙ্গবিভাগ কেবল বাংলার নহে সমগ্র ভারতবর্ষের নবোন্মেষিত জাতীয় জীবনের উপর বিষম কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে।"[২১]

এই পটভূমিকায় জাতীয় মুক্তির জন্য ইংরেজ সরকারের নিকট কেবলমাত্র আবেদন নিবেদনই যে যথেষ্ট নয় এবং এর জন্য সশস্ত্র শক্তি অর্জনের দ্বারা ইংরেজদের বিরো-ধিতা করাও প্রয়োজন—এই বিষয়টি দেশের নেতারা বুঝতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে দেশের মধ্যে গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। ১৯০১—১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে কলিকাতার আপার সারকুলার রোডে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—বিবেকানন্দের এই বাণী জাতীয় মুক্তির মন্ত্র বলে গৃহীত হয়। গুপ্ত সমিতিগুলি

তাদের কার্য্যের মাধ্যমে এই মন্ত্রকে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে।[২২] ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে পুলিনবাবুর সঙ্গে পি. মিত্র ঢাকায় যান। সেখানকার যুবকদের কাছে তিনি লাঠি খেলা, তরোয়াল খেলা, বন্দুক চালনা ইত্যাদি শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা দেশের মুক্তির সংগ্রামে নিজেদেরকে যুক্ত করার জন্য তিনি তাঁদের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানান।[২৩] সতীশচন্দ্র পাকড়াশীর মত বহু বিপ্লবী এতে উদবুদ্ধ হন। কলিকাতার মদন মিত্র লেনে সতীশচন্দ্র বসু ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আরও একটি অনুশীলন সমিতি গঠন করেন। এইভাবে সমগ্র বাংলাদেশে এরকম বহু অনুশীলন সমিতি গড়ে ওঠে। এর মধ্যে বরিশালের 'স্বদেশ বান্ধব সমিতি', ফরিদপুরের 'ব্রতী সমিতি', ময়মনসিংহের 'সুহৃদ সমিতি' খুবই উল্লেখযোগ্য। বহু স্বেচ্ছাসেবকদের জীবন-দানে এসকল সমিতি সুগঠিত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। "এই সব স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে লাঠি, মাথায় হলুদ রং-এর পাগড়ী, গায়ের লাল সার্টে বন্দেমাতরম্ ব্যাজ ও পরিধানের ধুতির একপ্রান্ত কোমরে ঘুরাইয়া বাঁধা থাকিত।"[২৪] সমগ্র দেশে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস অর্জনের এক মহাযজ্ঞ ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে থাকে। দেশের নেতাগণ এই উদ্দেশ্যে দেশী ও বিদেশী বীরদের বীর কাহিনী প্রচার করতে থাকেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা নেতা সখারাম গনেশ দেউস্কর 'শিবাজী উৎসব' উদ্‌যাপন করেন। এই উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজী উৎসব' নামে একটি কবিতা রচনার দ্বারা দেশবাসীর সামনে এক অখণ্ড ভারতের রূপচিত্র তুলে ধরেন। সখারাম দেউস্কর রচিত 'শিবাজীর দীক্ষা' গ্রন্থের ভূমিকায় এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়। শুধুমাত্র 'শিবাজী'র জীবনকে কেন্দ্র করেই নয়, মধ্যযুগের প্রতাপাদিত্য, সীতারাম রায় প্রমুখ বীরগণের জীবনকে কেন্দ্র করেও দেশের মধ্যে বীরানুষ্ঠানের প্রবাহ চলতে থাকে। ১৯০৬ সালে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'Field and Accademy' ক্লাবের মাঠে পুনরায় শিবাজী উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উৎসব উপলক্ষে একটি স্বদেশী মেলারও আয়োজন করা হয়। এই উৎসবের প্রারম্ভে 'ভবানীপুজার' ব্যবস্থা করা হয়। ভবানীপুজা, কালীপুজা ইত্যাদির মাধ্যমে গুপ্ত সমিতির সদস্যগণ অসুররূপী ইংরেজ শক্তির নিধনের জন্য বিশেষ মানসিক ও দৈহিক শক্তি অর্জনের সাধনায় ব্রতী হন।[২৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাগিনেয়ী সরলাদেবী শিশু কিশোর যুবকদের নিয়ে শারদীয়া মহাষ্টমীর দিনে বীরাষ্টমী ব্রত উদ্‌যাপন করতে থাকেন। এ সময় নতুন জাপানের ভাবমূর্তির ধারক 'ওকাকুরা' ঠাকুর বাড়িতে অতিথি হিসাবে আসেন। এখানে তিনি "এশিয়া—এশিয়াবাসীদের জন্য" এই মনোভাব বলিষ্ঠ ভাবে ব্যক্ত করেন। এর ফলে দেশবাসীর সংগ্রামী চেতনা আরও উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। এছাড়া ডন, বেঙ্গলী, হিতবাদী, সঞ্জীবনী, বরিশাল হিতৈষী, যুগান্তর ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার পত্র পত্রিকা নানাবিধ স্বদেশীমূলক রচনার মাধ্যমে দেশের মধ্যে স্বদেশী ভাবধারাকে বিস্তৃত করতে থাকে। সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক, চিত্তরঞ্জন

দাস প্রমুখ ব্যক্তিদের অর্থনৈতিক সহযোগিতায় ১৯০৬ সালের ৬ই আগস্ট 'ভারতবর্ষ ভারতবাসীর জন্য' এই শিরোভূষণসহ "বন্দেমাতরম্" নামে ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। দেশের মুক্তির জন্য দেশবাসীকে সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৯০৭ সালের ২রা সেপ্টেম্বর এই পত্রিকায় 'রণনীতি' নামক এক কবিতা প্রকাশ করা হয়।[২৬] রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে বঙ্গদর্শনের নবপর্য্যায় সূচিত হয়। বিশ শতকের যুগধর্মের ব্যাখ্যার জন্য এই পত্রিকায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থার পর্যালোচনা, সরকারি শোষণ ও অত্যাচার প্রতিরোধের উপায় ইত্যাদি সম্পর্কে নানাবিধ মননশীল ও প্রেরণামূলক রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, সভ্যতার আদর্শ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮), ভারতবর্ষের ইতিহাস, মাভৈঃ, (কার্তিক, ১৩০৯), স্বদেশ (পৌষ, ১৩০৯), বঙ্গবিভাগ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১), রাজকুটুম্ব (বৈশাখ, ১৩১০)' ইত্যাদি রচনা দেশবাসীর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কিত চিন্তাধারাকে বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ করে তোলে। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় কর্তৃক ১৯০৪ সালের মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠিত 'সন্ধ্যা' এবং বিপিনচন্দ্র পালের সম্পাদনায় 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকাদ্বয়ও দেশের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে পরিপুষ্ট করে তোলে।[২৭] এ ছাড়া 'ভারতী', 'প্রবাসী' ইত্যাদি পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলাদেবী, হিরণ্ময়ীদেবী, প্রমথ চৌধুরী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তিগণও দেশের মুক্তির জন্য দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করতে থাকেন। এর দ্বারা গুপ্ত সমিতির সদস্যগণও তাঁদের লক্ষ্য পূরণের জন্য অধিক উৎসাহিত হয়ে ওঠেন এবং দেশবাসীর উপর তাদের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

গুপ্ত সমিতির এই ব্যাপক প্রভাব প্রতিপত্তিতে ভীত সন্ত্রস্ত ইংরেজ সরকার ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলের গুপ্ত-সমিতিগুলিকে বেআইনী বলে ঘোষণা করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই জুন তারিখে ইংরেজ সরকার একদিনের অধিবেশনে বিস্ফোরক আইন এবং সংবাদপত্র আইন ব্যবস্থা পরিষদে পাশ করিয়ে নেয়। এর মাধ্যমে ইংরেজ সরকার দেশীয় সংবাদপত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য সশস্ত্র কার্য্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করতে বিশেষ উদ্যোগী হন। ১৯১০ সালে প্রেস আইন চালু করা হয়।এই আইনের মাধ্যমে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সংবাদ-পত্র মালিকদের কিছু প্রকাশ করা আইনত দণ্ডণীয় অপরাধ বলে ঘোষণাকরা হয় এবং এর দ্বারা পুনরপরাধে প্রেস মালিকের আর্থিক জরিমানা ছাড়াও প্রেস বাজেয়াপ্ত করার অধিকার ইংরেজ সরকারলাভ করেন। এই আইনের প্রয়োগ দ্বারা ইংরেজ সরকার মাদ্রাজের 'ইণ্ডিয়া' ও 'স্বরাজ্য', মধ্যপ্রদেশের 'হরিকিশোর' পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'বন্দেমাতরম', 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করা হয়। এইভাবে এই আইনের সাহায্যে ১৯১০ থেকে ১৯১৯ এর মধ্যে সরকার ৩৫০টি মুদ্রাযন্ত্র, ৩০০টি সংবাদপত্র এবং ৫০০টি বই বাজেয়াপ্ত করেন।

বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ ব্যক্তিগণের নেতৃত্বে গুপ্তসমিতিগুলি সশস্ত্র লড়াই-এর মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা আনার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের পথ গ্রহণ করে। এই বিপ্লবীরা সরকারি তহবিল লুঠ ও ধনীর গৃহে ডাকাতির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করতে থাকেন। সংগৃহীত অর্থ সমিতির সাংগঠনিক কাজে ব্যয় করা হয়। সমিতির সদস্যরা নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা মত অত্যাচারী ইংরেজ ও তাদের দেশীয় প্রতিনিধিদের হত্যা করে ইংরেজ সরকারের সুদৃঢ় রাজ-শক্তির উপর আঘাত হানতে থাকেন। বিপ্লবী ক্ষুদিরামের ফাঁসী, প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা, বারীন ঘোষের দ্বীপান্তর ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে দেশের মধ্যে বিপ্লব-বাদী কার্য্যকলাপ ক্রমশ উত্তুঙ্গ হয়ে ওঠে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিপ্লবীদের এ হেন কর্মপ্রচেষ্টা আরও সুসংবদ্ধ হয়ে উঠতে থাকায় ইংরেজ সরকার বিপ্লবীদের কর্ম-প্রচেষ্টাকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ 'ভারত রক্ষা আইন' (Defence of India Act) চালু করেন। কিন্তু এর দ্বারাও বিপ্লবীদের কার্য্যকলাপ এবং বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দেশবাসীর আন্দোলনকে প্রতিহত করা ইংরেজ সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। এর ফলে বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে ইংরেজ সরকার নতুন করে চিন্তা করতে বাধ্য হন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর রাজা পঞ্চম জর্জের আগমন উপলক্ষে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক দরবারে ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গ রোধের কথা ঘোষণা করেন। জাতির এতদিনের কর্মপ্রচেষ্টা সার্থক রূপ লাভ করে।

ইতিমধ্যে ভারতের রাজনৈতিক আকাশের পটও পরিবর্তিত হয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও তারপ্রয়োগ-গত পদ্ধতি বিষয়ে ভারতীয় নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। এর ফলে নেতাগণ দুটি পৃথক শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ফিরোজশাহ মেটা, গোপালকৃষ্ণ গোখলে এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রাচীন বা নরমপন্থী এবং বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে নূতনপন্থী বা চরমপন্থী—এই দুটি রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। উভয় দলের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের গতিরেখাকে অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। নরম-পন্থীদের উদ্দেশ্য হ'ল বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের মত স্বায়ত্ত শাসন অর্জন করা। চরমপন্থীদের লক্ষ্য ইংরেজদের সর্ববিধ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতা অর্জন।[২৮] বিশ্ব রাজনীতিতে ইংলন্ডের নির্বাচনে লিবারেল পার্টির জয় নরমপন্থীদের উৎসাহিত করে। অপরদিকে জাপানের কাছে রাশিয়ার বিপর্যয়ের ঘটনায় ভারতবর্ষের চরমপন্থীদের মনোবল সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। ১৯১৪ সালের ৪ঠা আগষ্টপ্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের নরমপন্থী দল এই যুদ্ধের সময় সর্বপ্রকারে ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করার প্রস্তাব

গ্রহণ করে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ও দেশীয় রাজন্যবর্গের সহযোগিতায় ইংরেজদের জন্য নতুন করে করে সৈন্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।[২৯] ইংলণ্ডের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে জার্মানের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডবাসীর সংগ্রামী চেতনাকে উদ্দীপ্ত করার জন্য ইংলণ্ডবাসীর উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। এই ভাষণ ভারতবাসীকেও তাঁদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করার প্রেরণা দান করে। হিন্দু ও মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ হন। ১৯১৫ ও ১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশন একই স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯১৭ সালের ২০শে আগস্ট ভারত সচিব মণ্টেগু ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন দান করার প্রতিশ্রুতি দেন। ইতিমধ্যে ১৯১৯ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে সংঘটিত কয়েকটি ঘটনা দেশের রাজনৈতিক অবস্থার উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। 'রাউলাট আইন' সম্পর্কীয় আন্দোলন দেশবাসীর আত্মমর্যাদাবোধকে উদ্দীপ্ত করে। ১৯১৯ সালে ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে জেনারেল ডায়ারের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পটভূমিকায় ইংরেজ সরকারের অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে দেশবাসী সোচ্চার হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাইট উপাধি ত্যাগ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসীর ঘৃণা ও ধিক্কারকে আরও ঘনীভূত করে তোলে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক সাম্রাজ্যের এক বৃহদাংশ বৃটিশের অন্তর্ভুক্ত হয়। মুসলিম সমাজ একে ইসলাম ধর্মের উপর ইংরেজ শক্তির চূড়ান্ত আঘাত বলে মনে করে। বিপন্ন ইসলামকে রক্ষার জন্য খিলাফৎ কনফারেন্সে ইংরেজ শক্তির প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়। গান্ধীজীর ডাকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে খিলাফৎ আন্দোলন শুরু হয়। ইংরেজদের নানাবিধ অত্যাচারে দেশবাসীর বিক্ষোভকে সুষ্ঠুরূপ দেবার জন্য ৩০শে ডিসেম্বর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরের সাধারণ অধিবেশনে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, মৌলানা আক্রাম খাঁ প্রমুখ ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আপামর ভারতবাসীর সহযোগিতায় ১৯২১ সাল থেকে এই আন্দোলন ক্রমশ দুর্বার হয়ে উঠতে থাকে এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রাম এর ফলে নতুন শক্তি লাভ করে।

● অর্থনৈতিক পটভূমিকা

দেশের অর্থনীতি দেশের জনমানসের চিন্তা-চেতনা ও ভাবধারাকে গভীর ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। এই অর্থনীতিকে ভিত্তি করেই দেশের কৃষি ও শ্রম ব্যবস্থার বিন্যাস গড়ে ওঠে। ইংরেজদের কায়েমী স্বার্থ-সিদ্ধির প্রচেষ্টার ফলে ভারতীয় অর্থনীতি ক্রমশ বিপন্ন হয়ে পড়ে। ইংরেজ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিজের দেশের শিল্পের সমৃদ্ধির জন্য ভারতবর্ষকে কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার

করা। ভারতবর্ষকে নিজেদের যন্ত্রশিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের বৃহৎ বাজার হিসাবে ব্যবহার করাও ইংরেজদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। এর ফলে উনিশ শতকের মধ্য ভাগ থেকেই কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানী ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।[৩০] তদুপরি এদেশের কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পকে ধ্বংস করার জন্য ইংরেজ সরকার এদেশের সমস্ত প্রকার শিল্পজাত দ্রব্যের উপর অযৌক্তিকভাবে কর বৃদ্ধি করতে থাকে। এর ফলে একদিকে অবাধ বাণিজ্য নীতিতে ইংরেজদের আর্থিক স্বার্থ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং অপরদিকে এদেশের শিল্পের অবস্থা সংকট জনক হয়ে ওঠে।[৩১] প্রচলিত নতুন কর ছাড়াও ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সুতীবস্ত্রের উপর শতকরা পাঁচভাগ কর আরোপ করা হয়। বৃটেন থেকে আমদানীকৃত দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সমর্থ ভারতীয় পণ্যের উপর আরও শতকরা পাঁচভাগ কর চাপানো হয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সুতিবস্ত্রের কাঁচামালের ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করা হলেও আমদানীকৃত সুতীজাত দ্রব্যের উপর সাড়ে তিনভাগ আবগারী শুল্ক বসানো হয়। এইভাবে অতিরিক্ত করের চাপে ভারত কেবল কাঁচামাল এবং খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানী কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং ভারতের মধ্যে প্রস্তুত শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানী বন্ধ হয়ে যায়। ইংরেজ সরকার কর বাবদ বিভিন্ন খাত থেকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ লাভ করতে থাকেন তা ভারতীয় জনগণের স্বার্থে এবং এদেশের কল্যাণে ব্যবহার না করায় দেশের লগ্নীকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা আরও দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। এছাড়া ভারতবর্ষে বৃটিশ মূলধনের সুদ, ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রজনিত ব্যয়—ইত্যাদি বাবদ হোম চার্জের (Home charge) নাম দিয়ে ইংরেজ সরকার এক বিপুল পরিমাণ অর্থ এদেশ থেকে সংগ্রহ করে নিজের দেশে পাঠাতে থাকেন। ভারতবর্ষের ঋণের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান কালে ১৮৫৮ সালে ভারতবর্ষের ঋণের পরিমাণ ছিল সত্তর লক্ষ টাকা। রাণী এলিজাবেথের শাসনের আঠারো বৎসরের মধ্যে তার পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। যুদ্ধের সময় প্রাথমিক খরচার ভার বহনের জন্য নগদ দশকোটি পাউণ্ড বৃটিশকে দান হিসাবে দেওয়া হয়। এর ফলে ভারতের জাতীয় ঋণের পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়াও যুদ্ধের অন্যান্য খরচা বাবাদ প্রায় ১০ কোটি পাউণ্ড রাজস্ব হিসাবে ভারতকে দিতে হয়। এরফলে ভারতের মুদ্রামূল্য ক্রমহ্রাসমান হয়ে পড়ে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

দেশের এরূপ অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের কৃষি ব্যবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হয়ে ওঠে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা পূর্বের জমিদারী প্রথার রদের পরিবর্তে ইংরেজ সরকার নিজেদের স্বার্থের পরিপোষক নতুন একশ্রেণীর জমিদারী ব্যবস্থার সৃষ্টি করেন। বকেয়া রাজস্ব ও ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত জমিদারগণ স্বেচ্ছায় অথবা বাধ্য হয়ে তাদের জমিদারী বিক্রয় করতে থাকেন। সে সময় সমাজের ধনীব্যক্তিগণ, মহাজনগণ, এবং ব্যবসায়ীগণ সেই জমিদারী স্বত্ব ইংরেজ সরকারের থেকে ক্রয় করে নেয়। এইভাবে সমাজের মধ্যে

নতুন একধরণের পুঁজিবাদের প্রসার ঘটে।[৩২] ফড়িয়া ও অন্যান্য ধনী ব্যক্তিগণ শহরের জমির ক্রয় বিক্রয়ে অর্থলগ্নী করে তার দ্বারা ভূমিস্বত্বের অধিকার লাভ করতে থাকে। জমির মূল্য স্বরূপ রাজস্ব বাবদ দেয় নির্ধারিত ফসলের পরিবর্তে মুদ্রার ভিত্তিতে জমির রাজস্ব দেওয়ার রীতির প্রচলন হয়। ভূসম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা আরোপ এবং মালিক হিসাবে ব্যক্তিগত ভাবে রাজস্ব দেওয়ার রীতি গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবস্থার এক আমূল পরিবর্তন সাধন করে। পূর্বে সমস্ত জমিজমার উপর প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এর উপর গ্রাম সমাজের পুরো নিয়ন্ত্রণ ছিল। কৃষকরা শুধুমাত্র জমি চাষ করার অধিকার ভোগ করত। কিন্তু কৃষিভূমি বিক্রয় বা দান করা বা বন্ধক রাখার কোন অধিকার তাদের ছিল না। গ্রাম সমাজের পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তের দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত হ'ত। কিন্তু মুদ্রার ভিত্তিতে গঠিত বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কৃষকেরা জমি বিক্রয়, বন্ধক রাখা, দান করা ইত্যাদির অধিকার লাভ করে। এর ফলে ক্রমবর্ধমান রাজস্বের ভারে অভাবের তাড়নায় কৃষকেরা তাদের জমির মালিকানা স্বত্ব বিক্রয় করতে থাকে। জমির মালিকানা হারিয়ে কৃষকরা রাষ্ট্রের রায়তশ্রেণীতে পরিণত হয়। দেশের কুটিরশিল্প ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় এই শিল্পের শ্রমিকরাও কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এভাবে কৃষিকার্য্যের উপর বেকার জনসংখ্যার চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে কৃষিভূমি ক্রমশ ক্ষুদ্রাকৃতি হতে থাকায় কৃষি জমিতে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হতে থাকে। উপরন্তু জমির মালিকদের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ পরিশোধ করতেই কৃষকদের আয়ের বেশীর ভাগ অংশ ব্যয় হতে থাকায় তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। এরূপ অবস্থায় কৃষকদের কল্যাণের জন্য সরকার কোনরূপ গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ না করায় কৃষকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ক্রমশই বাড়তে থাকে। কৃষকরা তাদের বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ক্রয় করার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেন। অর্থ সংগ্রহের আশায় তারা নিজেদের জমি ছাড়াও ঘরের সঞ্চিত মূল্যবান রৌপ্য গহনা-বিক্রয় করতে থাকে।

সরকারের অর্থনীতি ও শিল্পনীতির জন্য সারা দেশে কৃষকের অসন্তোষের পাশাপাশি শ্রমিক অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। বিদেশী পণ্যের সঙ্গে স্বদেশী শিল্পজাত দ্রব্য প্রতিযোগিতায় পেরে না ওঠায় স্বদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন খরচ তোলাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। শ্রমিকেরা নিজেদের জীবিকা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।[৩৩] এইভাবে ইংরেজ সরকার নিজেদের স্বার্থে সামগ্রিক ভাবেই দেশের শিল্পশ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে বিপর্য্যস্ত করে তোলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের দরুণ বাজার খারাপ হওয়ার ফলে এদেশের শিল্পাঞ্চলে বেকারির সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকদের মধ্যে কাজের বণ্টন ব্যবস্থা, মজুরীর হার ইত্যাদির ক্ষেত্রে মালিক পক্ষের বৈষম্য ও অনুদারতা শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের অসন্তোষকে তীব্রতর করে তোলে। রেল শ্রমিকদের ধর্মঘট,

প্রেস শ্রমিকদের ধর্মঘট—ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রমিক আন্দোলন ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকে। দেশের জাতীয় আন্দোলনের দ্বারাও শ্রমিক আন্দোলন প্রভাবিত হয়। ১৯০৮ সালে মহামান্য তিলকের কারারুদ্ধের প্রতিবাদে শ্রমিকদের ছয়দিন ধরে এক নাগাড়ে ধর্মঘটের ঘটনাটি শ্রমিক জাগরণের ইতিহাসে এক ঐতিহ্যময় অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। শ্রমিক ও মালিক পক্ষের বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে সরকারি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বোম্বাই-এ সামাজসেবীদের প্রচেষ্টায় ১৯১০ সালে Workers Welfare Association—গঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে এবং ১৯১৭ সালে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ফলে এদেশের শ্রমিকরা সমস্ত প্রকার শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করার প্রেরণা লাভ করেন। বিশ শতকের সূচনা থেকেই শ্রমিক আন্দোলন ক্রমশ সংহত হয়ে ওঠে। ১৯২০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের শ্রমিক আন্দোলনের এই সংহত ও বলিষ্ঠ রূপ প্রকাশিত হয়।

● সামাজিক পটভূমিকা

দেশের মধ্যেকার এই ক্ষয়িষ্ণু অর্থনীতির ফলে দেশের সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বর্ণ ও জাতির ভিত্তিতে গঠিত সনাতন সমাজ বিত্তধারী সমাজে রূপান্তরিত হয়। অর্থের কৌলিন্যই ব্যক্তির সামাজিক স্তরে তার শ্রেষ্ঠত্বের নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে।[৩৪] কুটিরশিল্পের ধ্বংসোন্মুখতার জন্য শুধুমাত্র কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে অর্থোপার্জনের আশায় শ্রমিক, কৃষক, মজুর ও অন্যান্য শ্রেণীর মানুষেরা নগরাভিমুখী হতে থাকে। শহরাঞ্চলের শিল্পজাত দ্রব্য গ্রামের শিল্পজাত পণ্যের অভাব পূরণ করতে থাকে এবং ভূমি ও শাসন সংক্রান্ত মালিক ও কর্মচারীরা যথা জোতদার, মজুতদার, দারোগা-পুলিশের দল গ্রামের মধ্যে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ ও শক্তি-কে বিস্তৃত করতে থাকে। আগেকার গ্রাম্য সমাজের শান্ত সমাহিত ভাব এর ফলে বিনষ্ট হয় এবং গ্রামের লোকেদের কাছে শহরকেন্দ্রিক জীবন-যাত্রার মোহ বাড়তে থাকায় গ্রামকেন্দ্রিক হিন্দু সমাজ নগরকেন্দ্রিক ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। ইংরেজ সরকারের অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্যে লাভের আশা না থাকায় এবং স্বদেশীয় মূলধনের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায় এদেশীয় বাণিজ্য বিমুখ ধনবান ব্যক্তিগণ সুদখোর মহাজনী বৃত্তি গ্রহণ করে এবং এই মহাজনি ব্যবসার দ্বারা তারা শহর ও গ্রামের অর্থনৈতিক ও পারিবারিক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ভূমি সম্পত্তির ক্রমবিভাজন যৌথ পরিবারের আর্থিক বনিয়াদকে দুর্বল করে তোলে। মধ্যবিত্ত মানুষের জীবিকার অন্যতম পন্থা চাকরি ও ভূমিসম্পত্তির পরিমাণ জনসংখ্যার তুলনায় ক্রমশ অপ্রতুল হওয়াতে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়। এরফলে একান্নবর্তী পরিবারে একজন ব্যক্তির আয়ের উপরে দশজনের নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে। এর ফলে মধ্যবিত্ত সমাজের যৌথ

পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান বিপন্ন হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে মানুষের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের স্পৃহাও ক্রমশ বাড়তে থাকে। একত্রিত হয়ে যৌথ পরিবারে থাকার মানবিক মূল্যবোধ নষ্ট হতে থাকে। এরফলে যৌথ পরিবার ভেঙে ভেঙে ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিবার প্রথার সৃষ্টি হতে থাকে।[৩৫] বিত্তভিত্তিক সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যবর্তী মধ্যস্বত্বভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরাজী শিক্ষালব্ধগুণে সরকারী চাকুরি, জমিদারদের অধীনস্থ কর্মচারী কিংবা ছোটখাট ব্যবসার দ্বারা নিজেদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে থাকে। সমাজে নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে স্বদেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি বিজাতীয় অশ্রদ্ধা, উদাসীনতা প্রকট হয়ে ওঠে। তাদের পারিবারিক জীবনের সমস্তক্ষেত্রে ইংরাজী সভ্যতার অন্ধ অনুকরণের প্রবণতাও লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক মান নিম্নাভিমুখী হয়ে পড়ে। যুবশক্তিকে ধ্বংস করার জন্য তথা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে সরকারের পৃষ্ঠপোষাকতায় শহরে ও গ্রামের মধ্যে দেশী ও বিলাতি মদের দোকানের এবং নিষিদ্ধপল্লীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ সবের আকর্ষণে সমাজস্থ মানুষের চারিত্রিক অবনতি সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে বিষময় করে তোলে। সামাজিক বিবাহ ব্যবস্থা অর্থোপার্জনের মাধ্যমে পরিণত হয়। নারীকে ভোগ সর্বস্ব পণ্য ও অর্থ উপার্জনের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করার জন্য সমাজের মধ্যে একাধিক বিবাহের প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমাজে নারী-জীবনের মানবিক দিকগুলি উপেক্ষিত, অবহেলিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্কের মূল্যবোধ ক্ষুণ্ন হয়ে পড়ে। পারিবারিক জীবনে গৃহবধূর উপর অমানুষিক মানসিক ও শারীরিক অত্যাচারের ঘটনা ঘটতে থাকে। সমাজে বাল্য-বিবাহের বহুল প্রচলন বাল্য-বৈধব্যের সমস্যাকে অগ্নিগর্ভ করে তোলে। সমাজের মধ্যে বাল্যবিধবাদের বিপথগামী হওয়া, ভ্রূণ হত্যা করা, আত্মহত্যা করা এ সকল অনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। 'কন্যাদায়' জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। উপযুক্ত বয়সে কন্যার বিয়ে দিতে না পারলে সংস্কারাচ্ছন্ন ও কায়েমী স্বার্থবাজ সমাজপতিদের বিধিবিধানের চাপে কন্যাপক্ষের সামাজিক মর্যাদা ও অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। বরপক্ষের অর্থনৈতিক দাবি দেওয়ার চাপে পড়ে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের নাভিশ্বাস উঠতে থাকে। এভাবে আর্থিক ও নৈতিক অবক্ষয়ে পঙ্গু সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। সমাজের মধ্যে দৈব এবং ভাগ্যের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে সমাজস্থ মানুষের মধ্যে প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার মত দৃঢ় মানসিকশক্তির অভাবও বড় হয়েওঠে।

● ধর্মীয় পটভূমিকা

বেদ উপনিষদ ষড়দর্শন এবং পুরাণ সমন্বিত মোক্ষলাভেচ্ছু ভারতীয় ধর্মদর্শনের মূলে ছিল বিশ্বের মূলশক্তি এবং সেই শক্তির অংশ রূপে প্রকাশমান বস্তুজগৎ ও

প্রাণীজগতের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেম নিবেদনের আকুতি। কালচক্রের প্রবাহে সনাতন বেদের অনুশাসন শিথিল হয়ে আসে। মোক্ষলাভের পরিবর্তে সমাজে ধর্ম শুধুমাত্র ইহলোকের কামনা-বাসনা এবং সুখ-স্বার্থ লাভের মাধ্যম হয়ে ওঠে। হিন্দুধর্ম স্বার্থান্ধ ধর্মাবলম্বী ও সমাজপতিগণের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকেই হিন্দু সমাজে ও ধর্মে এই স্বার্থান্ধতা খুবই প্রকট হয়ে দেখা দেয়। ধর্মের অন্ধ সংস্কার ও মূঢ় রীতিনীতির অনুশাসনে মানুষের দৈনন্দিন জীবন নিপীড়িত হতে থাকে। রক্ষণশীল ধর্মীয় অনুশাসন নারীজাতির সাধারণ ও সার্বিক বিকাশ লাভের পথ রুদ্ধ করে তাকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর শোষণের যন্ত্রে পিষ্ঠ করতে থাকে। নিছক অন্ধ আনুগত্যযুক্ত ধর্মীয় মানসিকতা ব্যক্তির ও সমাজের বিচারের স্রোতকে আচার বিচারের পঙ্কে আবদ্ধ করে ফেলে। জাতিগত ও বর্ণগত বিদ্বেষ হিন্দুধর্মের ঐক্যসাধনাকে ব্যাহত করে। জনগণের এক বৃহদাংশ উচ্চ-বর্ণের দ্বারা ধিক্কৃত ও লাঞ্ছিত হতে থাকে। বাগদী, বাউরি, ভুঁইমালি, ভুঁইয়া, চামার, মুচি, চাষী, কৈবর্ত্ত ইত্যাদি নিম্নজাতির জীবনের নিরাপত্তা উচ্চবর্ণের সামাজিক শোষণের ফলে বিঘ্নিত হয়।[৩৬] নবজাগরণের ফলে এ সব মানুষেরা ধীরে ধীরে উচ্চশিক্ষিত ও উদারপ্রাণ সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসেন। স্থানীয় শিক্ষায়তনের মাধ্যমে তাঁরা ক্রমশ শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে ওঠেন। হিন্দুধর্মের অন্যায় তিরস্কার লাঞ্ছনা, অপমান ও অবিচার হতে মুক্তির জন্য তাঁরা ভিন্ন পথের অন্বেষণ করতে থাকেন। ইংরেজ সরকার নিজেদের শাসন ব্যবস্থার সুবিধার জন্য হিন্দুধর্মের এই দুর্বলতাকে মূলধন হিসাবে গ্রহণ করেন। হিন্দুধর্মের প্রতি বিক্ষুব্ধ এসব মানুষকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার ব্যাপারে ইংরেজ সরকার যত্নশীল হন। হিন্দুধর্মের এ ধরণের অনুদারতা ও হৃদয়হীনতাকে আরো ব্যাপকভাবে প্রচার করে ইংরেজ সরকার হিন্দুধর্মের প্রতি মানুষের মনে অশ্রদ্ধার ভাবকে জাগিয়ে তোলেন। হিন্দুধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের সংঘাত সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দুদের মধ্যেকার ঐক্যবোধও এর ফলে বিনষ্ট হতে থাকে। এইভাবে ইংরেজ সরকার তাঁদের বিভাজন ও শাসন নীতিকে (Divide and Rule Policy) কার্যকর করে তোলেন। প্রথম দিকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ইংরেজরা হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ঘৃণ্য ধারণার বাহক ও প্রচারক তৎকালীন মিশনারীদের সাহায্য গ্রহণ করেন। মিশনারীগণ স্বল্পদামে খাদ্যদ্রব্য এবং পরিচ্ছদের বন্টন ব্যবস্থা, বিনাব্যয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং আর্থিক সাহায্য দানের মাধ্যমে এদেশের মানুষকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। ভারতবাসীর দারিদ্রের সুযোগই এক্ষেত্রে মিশনারীদের প্রচেষ্টাকে ফলবতী করে তোলে। আলেকজাণ্ডার ডফ প্রমুখ খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের তৎপরতায় বহু বাঙালী হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। ইংরেজ সরকারও ইতিমধ্যে হিন্দুধর্মত্যাগী খ্রীষ্টানদের পৈতৃক সম্পত্তি পাবার অধিকার আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ করেন। এরফলে ধর্মত্যাগীদের মধ্যে

উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। উনবিংশ শতকে কেবল খ্রীষ্টধর্ম নয়, ব্রাহ্মধর্ম ও মুসলিম ধর্মের প্রভাবেও হিন্দুধর্মের ক্ষয় দেখা দিয়েছিল। এইজন্য হিন্দুধর্মের নবমূল্যায়ন দ্বারা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র হিন্দুজাতির মধ্যে ঐক্য সম্প্রীতি রক্ষার মাধ্যমে খ্রীষ্টধর্ম-ব্রাহ্মধর্ম এবং মুসলিম ধর্মের আঘাতে বিপন্ন হিন্দুধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার গুরুত্ব হিন্দুসমাজের মনীষীগণ উপলব্ধি করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সমাজের বিবেচক ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে স্বধর্মত্যাগীদের পুনরায় হিন্দুধর্মে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন। হিন্দুধর্মের অহেতুক গোঁড়ামী ও রক্ষণশীলতার কাঠামোকে শিথিল করে দিয়ে ধর্মীয় রীতি নীতির মধ্যে উদার মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়ে তাকে সকলের গ্রহণযোগ্য করে তোলার দিকেও তাঁরা যত্নবান ছিলেন। হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী কর্তৃক 'হিন্দু-মহিলা বিদ্যালয়' স্থাপন, সনাতন ধর্মের ঐতিহ্য প্রচারের জন্য রাধাকান্ত দেবের ধর্মসভা স্থাপন, মতিলাল শীলের প্রচেষ্টায় কলিকাতার কলুটোলায় একাধিক ধর্মসভা অনুষ্ঠানের আয়োজন ইত্যাদি নানাবিধ প্রচেষ্টা এ সময় বিশেষ ভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। 'বঙ্গদর্শনের' মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র পৌরাণিক ধর্মকেই হিন্দুধর্মের পরিণত রূপ বলে ঘোষণা করেন। তিনি হিন্দুধর্মের পূর্ণাঙ্গ অবতার 'শ্রীকৃষ্ণ' চরিত্রকে যুক্তির দ্বারা নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। খ্রীষ্ট ও ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীরা শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমমূলক আখ্যায়িকাকে বিকৃত করে প্রচার করছিল। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে মানুষের মনকে কলুষিত করা এবং হিন্দুধর্ম থেকে হিন্দুদের বিচ্ছিন্ন করাই এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। "কৃষ্ণ" চরিত্রকে নতুন ভাবে ব্যাখ্য করে বঙ্কিমচন্দ্র এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অপূর্ব অধ্যাত্মদৃষ্টি ও জীবন সাধনার দ্বারা বেদ, পুরাণ ও তন্ত্র—হিন্দু ধর্মসাধনার এই তিন ধারার সমন্বয় সাধন করেন। এই ধর্ম যে কোন ধর্মেরই প্রতিবন্ধক নয় সে সম্পর্কে সকলকে ওয়াকিবহাল করে তোলার জন্য তিনি হিন্দু-ধর্মের ব্যাখ্যা করলেন। প্রেম ও ভক্তির মাধ্যমে সকল ধর্মের ঐক্য সাধনই হিন্দু-ধর্মের অন্যতম লক্ষ্য—এ বিষয়ে তিনি জনমতও গড়ে তোলেন। দেশের মধ্যে এই প্রেম ও ভক্তি সাধনার প্রসার তখন খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল।[৩৭] জাতি-বর্ণ ও ধর্মের ভেদাভেদ জ্ঞান ভুলে শিবজ্ঞানে জীবসেবার মাধ্যমে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশবাসীদের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানান। সুদীর্ঘকালের বিদেশীর অত্যাচারের সামনে হিন্দু সভ্যতা ও ধর্ম যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তার কারণ বিশ্লেষণ করে তিনি স্বদেশবাসীদের উদ্দেশ্য করে বললেন—

> "আমাদের এখনও জগতের সভ্যতার ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে তাই আমরা বেঁচে আছি।"[৩৮]

এসবের ফলে হিন্দুরা স্বধর্মে ক্রমশ আস্থাবান হয়ে ওঠেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও এ সকল রীতি চলতে থাকে। ১৯০৭ সালে থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি অ্যানি বেসান্ট আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রমাণ দাখিল করেন। এ ঘটনাটি হিন্দুদের নিজেদের ধর্ম রক্ষা ও পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে অণুপ্রাণিত করেছিল। আধ্যাত্মিক শক্তির পুনরুজ্জীবনের দ্বারা দেশবাসীর মধ্যে শুভবোধ ও ধর্মবোধকে জাগরুক করে তোলার এক বিশেষ প্রচেষ্টা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। চারদিকের বিভিন্নরকম আঘাত থেকে দেশ ও দেশবাসীকে রক্ষা করতে হলে দেশের কল্যাণ কর্মে প্রাণ উৎসর্গের প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে এই ধর্মভাব জাগরণের মূল্য অপরিসীম।[৩৯] এই জন্যই অতীত ঐতিহ্যের স্মৃতিচারণের দ্বারা জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির পুনর্জাগরণের প্রয়াস ঘনীভূত হয়ে ওঠে।[৪০]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের মানবতাবাদী আন্দোলন মূলত নগর-কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল। দেশের আপামর জনসাধারণের নাড়ীর সঙ্গে এর যোগ না থাকায় নবজাগরণের এই আন্দোলনে জাতির চৈতন্যে সাড়া জাগেনি। তাছাড়া কোন নতুন চিন্তা বা চেতনা কোন জাতির গভীরে সহজে প্রবেশ লাভ করতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন সময়ের ও অনুশীলনের। নবজাগরণের আবহাওয়া সেই সময়েও অনুশীলনের উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠেনি। তাই সমাজের সর্বত্রই এই নবজাগরণের আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। সর্বোপরি মাটি ও বীজের পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্কের মত বাঙালীর জীবন-মৃত্তিকার মূল তার ভাবসাধনার মধ্যেই নিহিত। জীবনের উষালগ্ন থেকেই এই বীজ ক্রীয়াশীল হয়ে ওঠে। যুগে যুগে তন্ত্র-মন্ত্র পুরাণের বেদীতে বসে বাঙালী এই ভাবসাধনার আরাধনায় নিমগ্ন। ঐহিক সুখভোগ অপেক্ষা, পার্থিব কামনা বাসনা অপেক্ষা পরম করুণাময় ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের আকুতি তাঁর কাছে শ্রেয়। জীবন ধর্ম অপেক্ষা জীবমুক্তির সাধনাকেই বাঙালী পরমপুরুষার্থ বলে মনে করেছে। এ সাধনার ক্ষেত্রে পরমারাধ্য দেবতা তাঁর আত্মার আত্মীয়, ঘরের মানুষ, হৃদয় সর্বস্ব, সকল দুঃখ কষ্টের মুক্তিদাতা নর-নারায়ণ। বিশ শতকের প্রথম ভাগের পৌরাণিক নাটকে এই সুরের পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্তেও ধর্মকে আশ্রয় করে এক সময় বহু নাটক রচিত হয়েছিল।

● নাটকের কথাবস্তু, উৎস, পটভূমিকার প্রভাব।

উপরিউক্ত পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের (১৯০০-১৯২০) পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অন্যান্য নাটকের কথাবস্তু, উৎস এবং নাটকের উপর তদানীন্তন পটভূমিকার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

● পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটক।

সাবিত্রী (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। স্টার থিয়েটার—৪-১০-১৯০২)।

শাস্ত্রজ্ঞান, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, যুক্তি নিষ্ঠা এবং পতিব্রতার গুণে যমরাজকে সন্তুষ্ট করে মদ্ররাজ অশ্বপতির কন্যা সাবিত্রী তাঁর মৃত স্বামী সত্যবানের প্রাণ ফিরে পেলেন।

মূল কাহিনী কাশীরামদাসের বনপর্ব থেকে নেওয়া হয়েছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ধ অনুকরণের ফলে হিন্দু সমাজ সনাতন হিন্দু দাম্পত্য-জীবনের আদর্শ থেকে ক্রমেই দূরে সরে আসতে থাকে। পারস্পরিক স্বার্থপরতা ও ভোগসর্বস্ব আত্মকেন্দ্রিকতা পারিবারিক সম্পর্ককে কলুষিত করতে থাকে। এরূপ অবস্থার প্রতিকারের বাসনায় তদানীন্তন সমাজ ও ধর্ম সচেতন ব্যক্তিগণ আর্যভূমি ভারতবর্ষের সনাতন দাম্পত্য জীবনের মূল্যবোধকে দেশবাসীর মধ্যে জাগরূক করার জন্য সচেষ্ট হন। এর মাধ্যমে তাঁরা হিন্দুধর্মের স্বতন্ত্রতাকে ধরে রাখার চেষ্টাও করেন। আলোচ্য নাটকে তার প্রভাব বিদ্যমান :ক

ক—"সনাতন সতী ধর্মেই আর্যাবর্তের প্রতিষ্ঠা। আর্যাবর্তই সতীর আশ্রয় স্থান। আর্যাবর্তই লীলা।" [তৃতীয় অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, সাবিত্রী।]

ধর্মনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য দৈবনির্ভর কূপমণ্ডূক ভারতবাসীর প্রতি বিবেকানন্দ কর্মযোগের আহ্বান জানিয়েছিলেন। নাটকে তার প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়।খ

খ—"কর্মযোগে নিয়তির আক্রমণ প্রতিহত করা যায়। এইজন্যই তো দৈবের সঙ্গে পুরুষাকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।" [তৃতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য, সাবিত্রী]

(ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। স্টার থিয়েটার—৯-৬-১৯০৬)

অর্জুনের সঙ্গে অর্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের যুদ্ধে অর্জুনের মৃত্যু এবং উলুপীর প্রচেষ্টায় প্রাণপ্রদায়ী মণির সাহায্যে অর্জুনের পুনর্জীবন লাভ।

মূলকাহিনী কাশীদাসী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব থেকে নেওয়া হয়েছে।

সে সময় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকৃত প্রভাব থেকে হিন্দুধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থাকে বাঁচানোর যে প্রচেষ্টা ক্রিয়াশীল ছিল এই নাটকে তার প্রভাব বিদ্যমান।

শংকরাচার্য (গিরিশচন্দ্র ঘোষ। মিনার্ভা—১৫-১-১৯১০)

ভ্রষ্টাচারে পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম, বামাচারী শাক্তধর্ম এবং নাস্তিক দর্শনকে খণ্ডন করে শঙ্করাচার্য কর্তৃক ভারতবর্ষে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠার কাহিনীই এই নাটকের কথাবস্তু।

গিরিশচন্দ্রের পূর্বে শঙ্করাচার্যের কাহিনী অবলম্বনে ১২৯৪ সালে হারাণচন্দ্র রক্ষিত 'শঙ্কর বিজয়' এবং ১২৯৫ সালে নগেন্দ্রনাথ বসু 'শঙ্করাচার্য' নাটক রচনা করেন। মাধবাচার্য, আনন্দগিরি, এবং চিদ্বিলাস যতি সংস্কৃত ভাষায় পৃথক পৃথক ভাবে শঙ্করাচার্যের জীবন চরিত রচনা করেন। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় মাধবাচার্য কৃত শঙ্করাচার্য জীবনচরিত অবলম্বনে 'শঙ্করাচার্য চরিত' রচনা করেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'শঙ্করাচার্য' নাট্য রচনার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র শাস্ত্রীর উপরোক্ত পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করেন।

বেহুলা (হরনাথ বসু। স্টার থিয়েটার—১০-১২-১৯১০)

সাধ্বী স্ত্রী বেহুলার সতী মাহাত্ম্যের গুণে বাসর ঘরে সর্পাঘাতে মৃত লক্ষীন্দরের পুনর্জীবন লাভ এবং মনসা বিদ্বেষী শৈব্য চন্দ্রধরের চম্পারাজ্যবাসীদের সঙ্গে মনসার সেবক নাগরাজ্যবাসীদের মিলন।

মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্য থেকে মূল কাহিনী নেওয়া হয়েছে।

হিন্দুধর্ম ও হিন্দুর জীবনাদর্শকে যথাক্রমে নাস্তিক-বাদীদের আঘাত থেকে এবং পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের প্রভাব থেকে মুক্ত করার যে প্রচেষ্টা তদানীন্তন সময়ে গড়ে উঠেছিল তার প্রভাব নাটকের মধ্যেও লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে।ক

ক(১)—"ধর্ম নামে নাস্তিকতা নাহি রবে আর
হবে চৈতন্য উদয়।···

দেখিবে অচিরে
বিদ্যা ও অবিদ্যা শক্তি মহাসংঘর্ষণে
দাবানল জ্বলিবে ভারতে।
সে অনলে নাস্তিকতা হবে ভস্মরাশি···"।

[প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, বেহুলা।]

(২)—"যেখানে আমার স্বামী সেইখানেই আমার ঘর। অগ্নি সাক্ষী করে যার চরণে আমায় সমর্পণ করেছ তিনি ভিন্ন আমার গতি নাই।"

[তৃতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য, বেহুলা।]

স্বামী বিবেকানন্দের নরনারায়ণ সেবার আদর্শের ধারায়ও নাটকটি প্রভাবিত।খ

খ—"···জীবের সেবা ব্যতীত শিবের প্রীতিসাধন অসম্ভব। বিশ্বদেবতাকে লঙ্ঘণ করে বিশ্বাতীত দেবতাকে কেউই ধারণা কর্ত্তে পারে না।"

[চতুর্থ অংক, চতুর্থ দৃশ্য, বেহুলা।]

তপোবল (গিশিচন্দ্র ঘোষ। মিনার্ভা থিয়েটার—১৮-১-১৯১১)

ক্ষত্রিয়রাজ বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যার দ্বারা ক্রমান্বয়ে রাজর্ষিত্ব, মহর্ষিত্ব এবং

পরে ব্রাহ্মণোচিত শম-দম-তিতিক্ষা ও ক্ষমাগুণ অর্জনের দ্বারা ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করেন।

মূল কাহিনী কাশীদাসী মহাভারতের আদিপর্ব থেকে নেওয়া হয়েছে।

জয়দেব (হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। গ্রান্ড ন্যাশানাল—১৪-৯-১৯১২)

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে বৈষ্ণব কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ রচনা এবং ভ্রষ্টাচারী শাক্ত ধর্মাবলম্বীদের দমন করে জয়দেব কর্তৃক দেশের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠাই নাটকের কথাবস্তু।

জাত্যাভিমান, বর্ণবিদ্বেষ, ও ধর্মের নামে নানাবিধ কুসংস্কারকে দূরে সরিয়ে দিয়ে হিন্দুধর্মকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আপামর দেশবাসীর মধ্যে সহজে গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তোলার চেষ্টা সে সময় ক্রিয়াশীল ছিল। তদানীন্তন খ্রীষ্ট, ব্রাহ্ম ও মুসলিম ধর্মের আঘাত থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করাই এর উদ্দেশ্য ছিল। নাটকটি দেশের এই ধর্মীয় পটভূমিকার দ্বারা প্রভাবিত। এই জন্য নাটকটির মাধ্যমে উদার বৈষ্ণব ধর্মের মাহাত্ম্যকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে।[৪১]

বিশ্বামিত্র (হরিশচন্দ্র সান্যাল। কোহিনুর থিয়েটার—২৬-৮-১৯১১)

ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের মত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার জন্য ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র কর্তৃক কঠোর সাধনার দ্বারা ব্রহ্মবল লাভ।

মূল কাহিনী কাশীদাসী মহাভারতের আদিপর্ব থেকে নেওয়া হয়েছে।

দেশের তৎকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব নাটকে বিদ্যমান।

দেশীয় সম্পদের উপর ইংরেজ শাসকবর্গের ক্রমবর্ধমান লোলুপতা এবং দেশবাসীর প্রতি তাঁদের নানাবিধ অত্যাচার যে প্রকৃত রাজধর্মোচিত নয় তার প্রতি নাট্যকার দেশবাসীকে সচেতন করে তুলেছেন।ক

ক—"রাজধর্ম্ম নহে মহারাজ
প্রজার ইষ্টের প্রতি দৃষ্টি লালসার……"

[প্রথম অংক, চতুর্থ দৃশ্য, বিশ্বামিত্র।]

দেশমাতৃকার লাঞ্ছনা দূর করার জন্য তিনি দেশবাসীকে সশস্ত্র যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি সে সময়কার বিপ্লববাদী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।খ

খ—"কে বল আপন মায়ে
দিতে পারে বিসর্জন ?
… …
মহাযুদ্ধে জ্বলুক অনল
দগ্ধ হোক দস্যুর বাহিনী॥"

[প্রথম অংক, চতুর্থ দৃশ্য, বিশ্বামিত্র।]

সতীর মাহাত্ম্য বর্ণনার দ্বারা নাট্যকার পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাব থেকে প্রাচ্যের দাম্পত্য জীবনের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়াসী হয়েছেন।গ

গ—"পতিপদ ধ্যান
পতিপদ সম্বল আমার
পতিপদ নিরাশার আশা।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পতিপদে করেছি অর্পণ ;
পতি পতিত পাবন—নারায়ণ অন্তরে অন্তরে
দূরে বা নিকটে—বিরাজিত অন্তরে অন্তরে
আলোকে আঁধারে সাথী
পতিবিনা গতি কিবা আর"

[দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য, বিশ্বামিত্র।]

স্বদেশীয় কৃষ্টি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাঁচাবার যে মানসিকতা সে সময় ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল এটা তারই দ্বারা প্রভাবিত।

ভীষ্ম (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। মিনার্ভা থিয়েটার—১০-৫-১৯১৩)

ঋষি আপবের কামধেনু চুরির অপরাধে মর্ত্ত্যলোকে অষ্টবসুর ভীষ্ম রূপে জন্ম গ্রহণ এবং বীর্যশুল্কে আনীত কাশীরাজ কন্যা অম্বাকে ব্রহ্মচারী ভীষ্ম বিয়ে না করায় অপমানিত ও প্রতিহিংসাপরায়ণা অম্বার প্রচেষ্টায় কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কৃষ্ণ সমীপে ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মের শরশয্যা ও দেহত্যাগ।

নাটকের মূল কাহিনী কাশীদাসী মহাভারতের আদিপর্ব ও ভীষ্ম পর্ব থেকে নেওয়া হয়েছে।

ব্রহ্মতেজ (হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। গ্র্যান্ড ন্যাশানাল থিয়েটার—১-২-১৯১৪)

ক্ষত্রিয় কার্ত্তবীর্য্য পরশুরামের পিতাকে হত্যা করায় এবং তাঁর মাতাকে লাঞ্ছিত করায় প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পরশুরাম একুশবার ক্ষত্রিয় কুল ধ্বংস করলেন এবং কার্ত্তবীর্য্যকে যুদ্ধে পরাজিত করে তার রক্তে পরশুরাম তাঁর পিতার তর্পণ করে এ বিষয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণ করলেন।

কাহিনীর মূল অংশ কাশীদাসী মহাভারতের শান্তিপর্ব এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের নবম অধ্যায়ের "ঋচীক জমদগ্নী" নামক আখ্যায়িকা থেকে নেওয়া হয়েছে।

নাটকের রাজা কার্ত্তবীর্যের অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে পরশুরামের সশস্ত্র সংগ্রামের ঘটনা বিন্যাসের ক্ষেত্রে নাট্যকার তদানীন্তন অত্যাচারী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লববাদীদের সশস্ত্র সংগ্রামের আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। বিভিন্ন

ধর্মের আঘাত থেকে হিন্দুর সনাতন ধর্মকে রক্ষা করার তদানীন্তন মনোভাবের দ্বারাও নাট্যকার প্রভাবিত।ক

ক—"করিব সংহার সনাতন ধর্মদ্বেষী অভাজনে
বিশ্বে সনাতন ধর্ম করিব স্থাপন
আয় ওমা শক্তিময়ী আমার হৃদয়ে।" [ক্রোড় অংক, ব্রহ্মতেজ।]

পতিব্রতার আদর্শকে তুলে ধরা, পাশ্চাত্যশিক্ষা ও সংস্কৃতির বিরূপ প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে ভারতবর্ষীয় গার্হস্থ জীবনের মৌলিকতাকে অক্ষুন্ন রাখার যুগোচিত মানসিকতার দ্বারাও নাট্যকার প্রভাবিত।খ

খ—"পতি ব্রহ্মা, পতি বিষ্ণু পতি দেব মহেশ্বর
পতি গতি পতি মুক্তি, পতি ধর্ম্ম পরাৎপর ।।"
[পঞ্চম অংক, তৃতীয় দৃশ্য, ব্রহ্মতেজ।]

ক্ষত্রবীর (ভূপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। স্টার থিয়েটার—৫-১২-১৯১৪)

গর্গ ঋষির অভিশাপে চন্দ্রলোক থেকে নির্বাসিত রোহিনীর স্বামী চন্দ্রের অভিমন্যুরূপে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে চক্রব্যূহে সপ্তরথীর আক্রমণে তাঁর মৃত্যুর পর শাপমুক্ত হয়ে রোহিনীর সঙ্গে পুনরায় চন্দ্রের মিলন ও তাঁদের চন্দ্রলোক যাত্রা।

মূল কাহিনীটি কাশীদাসী মহাভারতের দ্রোণ পর্বের 'অভিমন্যু জন্মবৃত্তান্ত' এবং 'অভিমন্যু বধ' আখ্যায়িকার অন্তর্গত। নাট্যরচনায় নাট্যকার নবীনচন্দ্র সেনের 'কুরুক্ষেত্র' মহাকাব্যের সহায়তাও গ্রহণ করেছেন।ক

ক—"ক্ষত্রবীরের মূলভিত্তি কহ্যকবি স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেনের মহাকাব্য—"কুরুক্ষেত্র"— [ভূমিকা। ক্ষত্রবীর]

নাটকে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের মহারণাঙ্গণে অভিমন্যুকে নিজের ক্ষাত্রবীর্যের পরীক্ষা দেবার জন্য রোহিনীর প্রেরণাদান, অশুভশক্তি কুরুপক্ষকে ধ্বংস করার জন্য ভীষ্মের দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি ঘটনার বিন্যাস করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নাট্যকার ভারতের ধর্মযুদ্ধ রূপ স্বাধীনতার যুদ্ধে অশুভ ইংরেজ শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য পরোক্ষ-ভাবে ভারতবাসীকে ক্ষাত্রতেজে ও বীর্যে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন।খ

খ—রোহিনী—"বাজিছে সমরবাদ্য গভীর নিক্কনে
রণাঙ্গনে শুন ভাই ওই।
মত্ত রণপদে সৈনিক নিচয়,—
ছুটিছে তুরঙ্গদল—
তরঙ্গ সকল সিন্ধু বক্ষে ছোটে যথা
রথোপরি শোভা মহারথীবৃন্দ যত,
প্রকাণ্ড কোদণ্ড টঙ্কারিছে মুহুর্মুহুঃ—

রুন্ধকর্ণ ভীম শঙ্খনাদে—
জলদের গরজনে শ্রাবনে যেমতি—
কহ রথী এহেন সময়ে তুমি
কি করিছ উপবনে জায়াসনে মিলি ?"

[তৃতীয় অংক, চতুর্থ দৃশ্য, ক্ষত্রবীর।]

ভীম—"শুন মম এ কঠোর পণ,
যদবধি কুরুগণ না হবে নিধন,
রণে ক্ষান্ত কভু নাহি দিব।
প্রাণভরে করি দুঃশাসন রক্তপান
স্নিগ্ধ হবে প্রাণ
কৌরবে পান্ডবে বাদ তবে অবসান ॥"

[প্রথম অংক, পঞ্চম দৃশ্য, ক্ষত্রবীর।]

এক্ষেত্রে নাট্যকার তৎকালীন অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের কর্মধারা ও চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে ১৮৭৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ইংরাজ সরকার কর্তৃক অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন জারী (An act for thc better control of public dramatic performance) করার ফলে নাট্যকারগণ স্বাধীনতার যুদ্ধে দেশবাসীকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে উদ্দীপ্ত না করে পরোক্ষভাবে উদ্দীপ্ত করার এই কৌশল গ্রহণ করেছিলেন।

উত্তরার সতীধর্মের আদর্শকে তুলে ধরে নাট্যকার সনাতন হিন্দুধর্মের আদর্শ রক্ষার যুগোচিত পরিমন্ডলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।গ

গ—উত্তরা—"পতিগত প্রাণা সতী
নহে সে ক্ষত্রিয় শূদ্র চন্ডাল ব্রাহ্মণ
পতিবিনা নাহি তার অন্য পরিচয়
শূন্যময় ত্রিসংসার পতির বিরহে।
নাহি লাজ লজ্জা মান অভিমান,
পতির কারণে
ছার প্রাণ অনায়াসে পারে বিসর্জিতে।

[তৃতীয় অংক, সপ্তম দৃশ্য, ক্ষত্রবীর।]

ভক্ত কবীর (হরনাথ বসু। মিনার্ভা থিয়েটার—৮-৪-১৯১৬)

গুরু রামানন্দের শিষ্যত্ব অর্জনের পর বৈষ্ণব ধর্ম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তৎকালীন ইসলাম রাজশক্তির প্রবল বিরোধিতার মধ্যেও সারা দেশে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য সাধক 'কবির' নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন।

বিভিন্ন গ্রন্থে কবিরের জীবন সম্বন্ধে প্রকাশিত নানাবিধ ঘটনা অবলম্বনে নাট্যকার নাটকটি রচনা করেছেন।ক

ক—নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ হইতে এই নাটকের আখ্যায়িকা সংকলিত হইয়াছে। (ক) ভক্তমাল, (খ) বীরেশ্বর চক্রবর্তী প্রণীত 'ভারতের ভক্তকবি'। (গ) বিশ্বকোষ নামক প্রসিদ্ধ অভিধান, (ঘ) ক্ষিতিমোহন সেন সম্পাদিত চারিখণ্ডে প্রকাশিত 'কবীর'। [ভূমিকা, ভক্ত কবির]

হিন্দুধর্মের কুসংস্কার এবং আচার-বিচার সর্বস্ব রীতি-নীতি হিন্দুদের মধ্যে অনৈক্যের সূত্রপাত ঘটিয়ে হিন্দুধর্মকে দুর্বল করে তুলেছিল। এ ধরণের সংকীর্ণতা থেকে হিন্দুধর্মকে মুক্ত করে তাকে দৃঢ় করে তোলার জন্য সে সময়কার প্রাজ্ঞ মনীষীদের কর্ম প্রচেষ্টার পটভূমিকার দ্বারা নাটকটি প্রভাবিত।খ

খ—"শিষ্যগণ দেখেছ স্বয়ং রামচন্দ্র যার হাতে সেবা নিয়েছেন সে স্পৃশ্য কি অস্পৃশ্য তাকি আর দেখবার প্রয়োজন আছে? কবীর! আজ থেকে তুমি আমার শিষ্য নও আমি তোমার শিষ্য।"

[চতুর্থ অংক, প্রথম দৃশ্য, ভক্ত কবির।]

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার যে ঐকান্তিকতা দেশের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল নাটকের মধ্যে তারও প্রভাব লক্ষ্যণীয়।গ

গ—"একই সূর্য্য যেমন দিকে দিকে রশ্মিজাল বিস্তার করে, একই উৎস যেমন সহস্র ধারায় বারি উৎক্ষিপ্ত করে, একই ধর্ম তেমনি দেশে দেশে নানামূর্তিতে প্রকাশিত। তোমার দৃষ্টি দূষিত তাই তুমি এককে বহু দেখছ।......ঘন দর্শনে চাতক যেমন ধাবিত হয় হিন্দু বল, মুসলমান বল, বৌদ্ধ বল সবাই তেমনি সেই একের দিকে ছুটেছে।" [পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য, ভক্ত কবির।]

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে দৃঢ় করে তোলার জন্য অত্যাচারী সেকেন্দারকে কবিরের ক্ষমা প্রদর্শন এবং তাকে ভ্রাতৃত্বের মর্য্যাদা দান করার ঘটনাটি নাটকের মধ্যে উপস্থাপিত করা হয়েছে।ঘ

ঘ—"আর আজ থেকে তুমিও আমার ভাই (বাদশাহের হস্ত ধারণ পূর্বক) শিখাও ভাই, সকলকে শিখাও যে রাম সেই রহিম, যে রহিম সেই রাম। সকল জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। হিন্দু মুসলমানের বিরোধ দূর হবে।"

[পঞ্চম অংক, পঞ্চম দৃশ্য, ভক্ত কবির]

রামানুজ—(অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—মিনার্ভা থিয়েটার—১৫-৭-১৯১৬)

অদ্বৈতবাদী মতাবলম্বীদের কর্ণধার অজগর পণ্ডিত, যাদব প্রকাশ প্রমুখ ব্যক্তিত্বকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করে শৈবধর্মী চোলরাজ্যসহ সমগ্র দাক্ষিণাত্যে এবং ইসলাম ধর্মের প্রভাবকে অতিক্রম করে দিল্লীতে রামানুজের প্রচেষ্টায় ও নেতৃত্বে দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠা।

সাম্প্রদায়িক ঐক্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য হিন্দুর সার্বভৌম উদার দৃষ্টির পরিচয় তুলে ধরে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতবাসীর মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য রক্ষার যে প্রয়োজনবোধ দেশের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, নাটকের উপর সেই পটভূমিকার প্রভাব বিদ্যমান। ইসলাম ধর্মী দিল্লীশ্বরের কন্যা লচিমা কর্তৃক বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ, রামানুজের নির্দেশে দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক বিষ্ণুমন্দিরে লচিমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা (৫।৭ দৃশ্য)—ইত্যাদি ঘটনাদ্বয় এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। রামানুজ কর্তৃক কৃষ্ণমন্ত্রে সকল মানুষকে একসূত্রে বেঁধে দেওয়ার ঘটনাটিও এ বিষয়ে স্মরণযোগ্য।ক

ক—রামানুজ—"কোথা কেবা আছ পাপী তাপী পতিত কাঙাল
কোথা ভক্তবৃন্দ মোর
এস সবে
প্রত্যক্ষ করহ আজি কৃষ্ণময় এ জগৎ
সর্বভূতে পুরুষ—প্রকৃতি লীলা
রাধাকৃষ্ণ অপূর্ব মিলন—
অভিন্ন জগৎ ব্রহ্ম নিত্য বিরাজিত।
ওঠ দেখ দিল্লীশ্বর
কন্যাতব কৃষ্ণ পদে চামর দুলায়।
আজি হতে দাক্ষিণাত্যে প্রতি বিষ্ণুমন্দিরে
কন্যার বিগ্রহ তব হইয়া পূজিত
সার্বভৌম হিন্দু ধর্ম করিবে প্রচার।"

[পঞ্চম অংক, সপ্তম দৃশ্য, রামানুজ]

বারাণসী (মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—স্টার থিয়েটার—৪-১১-১৯১৬)

কাশী থেকে নির্বাসিত অন্নহারা মহাদেবের পুনরায় কাশীর অন্নপূর্ণা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা লাভ ও অন্নগ্রহণ।

সে সময়কার ধর্মীয় ও সামাজিক পরিমণ্ডলের প্রভাব নাটকে বর্তমান। নাট্যকার শুদ্ধ ভক্তিভাবের প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশবাসীর চিত্তকে নির্মল করে রাখার চেষ্টা করেছেন। হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবনের শুচিতাকে পাশ্চাত্যের ভোগসর্বস্ব জীবন দর্শন থেকে রক্ষা করে হিন্দুর জীবন-দর্শন ও ধর্মের পরিমণ্ডলের স্বতন্ত্রতাকে রক্ষা করার প্রচেষ্টাও এ নাটকে লক্ষ্যণীয়।

কুরুক্ষেত্র (নারায়ণ বসু—স্টার থিয়েটার—২২-৯-১৯১৭)

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কৌরব ও পান্ডবের যুদ্ধে কৌরব পক্ষের পরাজয় এবং অভিমন্যুসহ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরদের আত্মদানে পাণ্ডবপক্ষের জয়।

কাশীদাসী মহাভারতের বিরাট পর্ব, উদ্যোগ পর্ব, ভীষ্ম পর্ব, দ্রোণ পর্ব, কর্ণ পর্ব, শল্য পর্ব, গদা পর্ব, সৌপ্তিক পর্ব, ঐষিক পর্ব—ইত্যাদি পর্ব থেকে মূল কাহিনী নেওয়া হয়েছে।

নিজেদের অধিকার রক্ষার এবং তার প্রতিষ্ঠার জন্য কৌরবদের বিরুদ্ধে পাণ্ডবগণের আমরণ সশস্ত্র সংগ্রামের কাহিনীটি ভারতবাসীকে নিজেদের সার্বভৌম অধিকারকে রক্ষা করা ও তাকে ধরে রাখার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমৃত্যু সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। এদিক থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পটভূমিকার দ্বারা নাট্যকার প্রভাবিত হয়েছেন। সর্বধর্মের সমন্বয় সাধনই হিন্দুধর্মের মূল লক্ষ্য—নাটকে এই ভাবকে তুলে ধরা হয়েছে।ক

ক—কৃষ্ণ—"নব অবতার হইব আবার
সর্ব ধর্ম্ম সমন্বয়—
শিখাতে মানবে।" [প্রথম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, কুরুক্ষেত্র।]

তৎকালীন বিভিন্ন ধর্মের আঘাত থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষার প্রচেষ্টাও এর মাধ্যমে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে।

ঐন্দ্রিলা (মনোমোহন রায়—মিনার্ভা—৫-১১-১৯০৪)

ঐন্দ্রিলার মনোবাসনা পূরণ করার জন্য বৃত্রাসুর দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী শচীকে বলপূর্বক হরণ করে বন্দী করলে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে অসুররাজ বৃত্রাসুরের পরাজয় ও নিহত হওয়ার ঘটনায় শচীর উদ্ধার লাভ এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে পতি ও পুত্রকে হারাবার ফলে মনের ক্ষোভে ও যন্ত্রনায় বৃত্রাসুর পত্নী ঐন্দ্রিলার মন্দাকিনী নদীতে দেহ বিসর্জন।

মূল কাহিনী কাশীদাসী মহাভারতের গদাপর্বের অন্তর্গত 'বিষ্ণুর নিকট দেবগণের দুঃখ নিবেদন, দধিচীর আত্মদান, বৃত্রাসুর সংহার' ইত্যাদি আখ্যায়িকা থেকে নেওয়া হয়েছে।

স্বর্গরাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অসুরের বিরুদ্ধে স্বর্গবাসীদের সংগ্রামের কাহিনী বিন্যাসের মধ্য দিয়ে নাট্যকার পরোক্ষভাবে ভারতবাসীকে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছেন।ক

ক—"জাগ্রত কি অমরমণ্ডলী—কিম্বা মগ্ন
ঘোর মোহ নিদ্রাবশে? ভাঙ্গিল সুষুপ্তি—
কি হে? তবে কেন নিষ্পন্দ নির্বাক হেন
চিত্রার্পিত পুতুলের প্রায়? দৈত্য ধন
করস্পর্শে আবিল অমরা, সুরবৃন্দ
নিদ্রামগ্ন হেথা!......

নিদ্রা ত্যাজি উঠ বীরগণ, জ্বাল স্বর্গে
অযুত বরষ ব্যাপী সমর অনল,
ঘৃতাহুতি দাও তাহে দনুজ শোণিত।
উঠ উঠ দেববৃন্দ! বজ্র মুষ্ঠি ধর
সবে অক্ষয় কার্ম্মুক। সমর প্রাঙ্গণে
হবে কর্ত্তব্য বিচার।...দেখি ঘোর
রণে কেমনে দনুজপতি পায় প্রাণ।" [প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, ঐন্দ্রিলা]

সুতরাং নাটকে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব বিদ্যমান।

● ঐতিহাসিক নাটক।

শিবাজী (মনোমোহন গোস্বামী—ক্লাসিক—২২-৩-১৯০২)

ভ্রাতা ব্যাঙ্গোজীর বিরোধীতা ও পুত্র শম্ভুজীর বিশ্বাসঘাতকতা সত্বেও হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে শিবাজীর আমরণ যুদ্ধ এবং শিবাজী কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

"ছত্রপতি শিবাজী" শুধু ইতিহাসের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব নয়, আবহমানকালের জীবন সংগ্রামের নিটোল শক্তির প্রতীক। ভারতীয় গণমানসে শিবাজীর এই ভাবমূর্ত্তিই চিরন্তন হয়ে আছে। 'শিবাজী'-র অর্থ স্বাধীনতা। 'শিবাজী'-র অর্থ মুক্তি। 'শিবাজী'-র অর্থ অন্যায় আর শোষণের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই। 'শিবাজী'-র অর্থ সাংগঠনিক শক্তির সমৃদ্ধি। আত্মচেতনা, আত্মপ্রত্যয় আর আত্মবিশ্বাসের ত্রিবেণী সঙ্গম এই 'শিবাজী'।

বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে বিভিন্ন প্রতিকূল শক্তির ঘূর্ণাবর্ত্ত থেকে হিন্দু জাতি ও হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের জন্য এ ধরনের ব্যক্তিত্বের স্মৃতিচারণের প্রয়োজন ছিল। মোঘলের বিরুদ্ধে আমরণ আপোষহীন শিবাজী সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতার পতাকাকে উর্দ্ধে তুলে ধরেছিলেন। অনুশীলন দলের বিপ্লবীরা সশস্ত্র লড়াই এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিল। এই পটভূমিতে শিবাজীর শৌর্য্য, বীর্য্য, রণজয় গাঁথা তাঁদের মনে অফুরন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করবে, জাতীয় আন্দোলনে বানভাসি জোয়ারের সৃষ্টি করবে —এটাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা। এই পটভূমিকার প্রভাবেই "শিবাজী" নাটকটি রচিত ও মঞ্চস্থ হয়েছিল।

রিজিয়া (মনোমোহন রায়—অরোরা—১৭-৫-১৯০৯)

রাজা বীরেন্দ্র সিংহ সুলতানা রিজিয়ার প্রেম প্রত্যাখ্যাণ করায় অপমানিত ও ক্রোধান্ধ রিজিয়ার নির্দেশে ঘাতক কর্তৃক রাজা বীরেন্দ্রকে হত্যা করা এবং রাজা বীরেন্দ্রের মৃত্যুর পর রিজিয়ার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা 'বাইরাম' ও তাতার সেনাপতি

'বক্তিয়ারের' মিলিত আক্রমনের মুখে পরাজিত ও বন্দী রিজিয়ার কারাগারে আত্মহত্যার কাহিনীই এই নাটকের কথাবস্তু।

পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্ধ অনুকরণের ফলে দেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়েছিল। সমাজের বিরাট অংশে মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। পারিবারিক সম্পর্কগুলি কলুষিত হয়ে পড়ছিল। এই বাতাবরনে পারিবারিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে এই নাটকের ইতিবাচক ভূমিকা লক্ষ্যণীয়। রাজা বীরেন্দ্র সুলতানা রিজিয়াকে বোনের মত সম্মান করেছিলেন। তাই রিজিয়ার প্রেম তাঁর কাছে প্রার্থীত নয়। এর মূলে ছিল সাংসারিক জগতের পবিত্র পারিবারিক মূল্যবোধের তাগিদ।ক

ক—বীরেন্দ্র—"……ভ্রাতা যদি বন্ধ
হয় পরিণয় সূত্রে ভগিনীর সনে,
লুপ্ত হবে ধর্মনাম এ বিশ্ব সংসারে
ধর্ম সনে ব্রহ্মাণ্ডের হবে লয়।" [চতুর্থ অংক, ষষ্ঠ দৃশ্য, রিজিয়া।]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পুরুষ শক্তির সঙ্গে নারী শক্তির মেলবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা সে সময়কার শিল্পী, সাহিত্যিক ও মনীষীরা অনুভব করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে চারণ কবি মুকুন্দদাসের "মাতৃপূজা" যাত্রাপালা, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "নন্দকুমার" নাটক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "স্ত্রীর পত্র" নামক ছোটগল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যিকরা এসব সাহিত্য শিল্পের মাধ্যমে যুগের এই প্রয়োজনের প্রতি জাতিকে সচেতন করে তুলেছিলেন। এই পটভূমিকায় নাট্যকার নারীজাগরণের এই কর্মমুখী প্রচেষ্টার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। রাজ্য-শাসনে রিজিয়ার অংশগ্রহণের বিষয়টি দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নারী জাতির সার্বিক অধিকার ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে ভারতীয় নারী-মানসে চেতনার প্রসার ঘটাতে সাহায্য করেছিল।

বঙ্গের প্রতাপাদিত্য (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—স্টার—১৫-৮-১৯০৩)

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোঘল সম্রাট আকবরের সঙ্গে যুদ্ধে যশোরের স্বাধীন ভুঁইয়া প্রতাপাদিত্যের পরাজয়।

১৯০৫ সাল থেকে অদম্য স্বাধীনতার স্পৃহা জাতীর জীবনকে ধীরে ধীরে আগামী দিনের কঠোর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। সে সময় দেশবাসীর মধ্যে দেশের অতীত শৌর্য-বীর্যের স্মৃতিচারণ মূলক কার্যকলাপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। নাটকের বিষয়বস্তুর নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেশের এই রাজনৈতিক পটভূমিকার প্রভাব বর্তমান।ক

ক—'প্রতাপাদিত্য নাটকখানি এক হিসাবে আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস।'
[মন্মথ মোহন বসু। ভূমিকা প্রসঙ্গে। বঙ্গের প্রতাপাদিত্য।]

সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করার বিপ্লববাদী আদর্শের প্রভাবও নাটকের মধ্যে ক্রিয়াশীল।খ

খ—"পররাজ্য লোলুপ দুর্দান্ত মোগলের আক্রমণ থেকে আশ্রয় ভিখারী দুর্বলকে রক্ষা করতে কথায় কথায় যাকে অস্ত্র ধরতে হবে, অহিংসাময় বৈষ্ণব ধর্ম তার নয়। শক্তি অভিমানী যশোর রাজকুমারের একমাত্র অবলম্বন মহাশক্তির আশ্রয়।" [প্রথম অংক, তৃতীয় দৃশ্য, বঙ্গের প্রতাপাদিত্য।]

জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সাম্প্রদায়িক ঐক্য গড়ে তুলে দেশের মুক্তির আন্দোলনকে সার্থক করে তোলার যে প্রচেষ্টা দেশের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল নাটকের মধ্যে তার প্রভাবও লক্ষ্যণীয়।গ

গ—"হিন্দু মুসলমান এক মায়ের দুই সন্তান। এক অন্নে প্রতিপালিত। এক স্নেহ রসে সিঞ্চিত…এস ভাইসব আমরা এক প্রাণে এক মনে মায়ের দুঃখ দূর করি…মাতৃসেবা কার্যে আর আমরা ব্রাহ্মণ নই, শূদ্র নই, শিখ নই, পাঠান নই—বঙ্গ সন্তান।"

[তৃতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য, বঙ্গের প্রতাপাদিত্য।]

তারাবাঈ (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—স্টার থিয়েটার—২২-১১-১৯০৩)

পৃথিবরাজ কর্তৃক সূর্যমল ও মালবরাজের মিলিত আক্রমণ থেকে চিতোর রক্ষা করা এবং রাজ্যাভিষেকের প্রাক্‌মুহূর্তে জামাতা প্রভুরাওয়ের অত্যাচার থেকে ভগ্নী যমুনাকে উদ্ধার করার সময় প্রভুরাওয়ের চক্রান্তে তাঁর মৃত্যুতে শোকাহতা তাঁর স্ত্রী তারাবাঈ-এর আত্মহত্যা।

নাটকের মূল কাহিনী James Tod-এর Annals and Antiquities of Rajasthan গ্রন্থ হতে নেওয়া হয়েছে।

নাটকের উপর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব বিদ্যমান। শূরতান কন্যা তারাবাঈ কর্তৃক হৃতপিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পালন, চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষার্থে বৃদ্ধ রাণা রায়মল ও পৃথ্বীরাজের কঠোর সংগ্রামের কাহিনীটি বস্তুতপক্ষে ভারতবাসীকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।ক

ক (১)—"যতদিন নাহি উদ্ধারিব মাতৃভূমি
অপর চিন্তাকে স্থান দিব না অন্তরে"

[দ্বিতীয় অংক, পঞ্চম দৃশ্য, তারাবাঈ।]

(২)—"নাহি ডরি মৃত্যুরে।
মরিব আজি ক্ষত্রিয়ের মত
চিতোরের রাণার মতই, অসি করে
যুদ্ধক্ষেত্রে মহানন্দে।" [চতুর্থ অংক, প্রথম দৃশ্য, তারাবাঈ।]

যমুনার পতিব্রতার আদর্শ তুলে ধরে নাট্যকার পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আঘাত থেকে স্বদেশীয় জীবনাদর্শকে রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন।খ

খ—"আমি হিন্দুনারী। হিন্দুধর্ম শিক্ষা দেয় যে স্বামী পাষণ্ড হলেও সে নারীর দেবতা। তাই এতদিন এত সহ্য করেছি।"

[পঞ্চম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য, তারাবাঈ।]

সৎনাম (গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ক্লাসিক—৩০-৪-১৯০৪)

হিন্দু সৎনামী ধর্ম সম্প্রদায়ের উপর মুসলিম রাজশক্তির অত্যাচার নিরসনের জন্য বৈষ্ণবীর প্রেরণায় ও রণেন্দ্রের নেতৃত্বে মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে সৎনামী সম্প্রদায়ের সশস্ত্র সংগ্রাম ও পরাজয়।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের কার্যধারার প্রভাব নাটকের উপর বিদ্যমান।ক

ক—"আমি মহিষমর্দ্দিনী, রণরঙ্গিণী যবনকুল বিনাশিনী…
তলোয়ার তুমি রেখনা আমায় দাও।…অস্ত্রের পূজা করো
…বোঝ না অসির বড় তৃষা। যবনশোণিত পানে বড় তৃষা।"

[প্রথম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, তারাবাঈ।]

পারস্পরিক হিংসা-দ্বেষ, জাত্যাভিমান, শাস্ত্রের কুটিল আচার জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতিকে ব্যহত করছিল। দূরদর্শী ও সমাজ সচেতন দেশীয় নেতারা এই প্রতিকূল অবস্থা প্রতিহত করার জন্য এ বিষয়ে দেশবাসীকে সজাগ করে তুলছিলেন। নাটকের মধ্যে এই রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রভাবও বর্তমান।খ

খ—"হিন্দুর পতন অনৈক্য কারণ
দ্বেষ হিংসা পরস্পরে
উচ্চ নীচ জাতি অভিমান
দৃঢ়ীভূত কুমন্ত্রীর উপদেশে
ধর্ম্ম অভিমানে
স্বজাতি বান্ধব পরিত্যাগ
অযথা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা স্বার্থপর
ব্রাহ্মণের মুখে॥"

[দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য, সৎনাম।]

পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—স্টার—৪-৮-১৯০৫)

দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে মীরকাশিমের যুদ্ধ ঘোষণা এবং যুদ্ধে পরাজিত মীরকাশিমের ফকীর ব্রত ধারণ।

দেশের সমসাময়িক কৃষি-শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক পটভূমিকার প্রভাবে নাটকটি প্রভাবিত।ক

ক (১)—"অত্যাচারে ভাল ভাল তাঁতি সব বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেলেছে। যাতে আর তাঁতে হাত দিতে না হয়। আপনার এই মেদিনীপুরের হুদোয় প্রায় লাকো তাঁতিয়া তুঁতের চাষ করতো। রেশমের ব্যবসা উঠে যাচ্ছে"

[দ্বিতীয় অংক, চতুর্থ দৃশ্য, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত।]

(২)—"দেখতে পাচ্ছ না সমসের। ওই ওই লক্ষ লক্ষ কঙ্কাল—ওই করজোড়ে আবেদন করছে। বলছে নবাব যদি প্রজার দুঃখ দূর করতে পারলে না তো নবাবী নিয়েছিলে কেন? আমাদের শিল্প গেছে, ব্যবসা গেছে, চাষ গেছে, বাস গেছে। দুনিয়ায় দাঁড়াই এমন স্থান নেই……।"

[পঞ্চম অংক, পঞ্চম দৃশ্য, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত।]

স্বাধীনতার আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করার জন্য নাটকটির ইতিবাচক ভূমিকা লক্ষ্যণীয়।খ

খ—"বাঙলার স্বাধীনতা রক্ষা জীবনের সংকল্প করেছি।"

[দ্বিতীয় অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত।]

রাণাপ্রতাপ সিংহ (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—২২-৭-১৯০৫)

মোঘলদের অধীনতা থেকে চিতোর রাজ্য উদ্ধারের জন্য রাণা প্রতাপের নেতৃত্বে মোঘলদের বিরুদ্ধে রাজপুত জাতির আমরণ সংগ্রাম এবং মুমূর্ষু রাণা কর্তৃক চিতোর উদ্ধারের অসম্পূর্ণ কার্যভার তাঁর পুত্র অমর সিংহের উপর অর্পণ।

নাটকের মূল কাহিনী James Tod-এর Annals and Antiquities of Rajasthan থেকে নেওয়া হয়েছে।

নাটকে তৎকালীন জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব বিদ্যমান। এই আন্দোলনের সময় গুপ্ত সমিতির সভ্যরা দেশের মুক্তির মন্ত্রে জীবন উৎসর্গের জন্য 'গীতা' স্পর্শ করে 'মা-কালীর' সম্মুখে সমিতির গুপ্ত মন্ত্র পাঠ করে শপথ গ্রহণ করতেন। এই ভাবেই তাঁরা দেশের কাজে দীক্ষিত হতেন। আলোচ্য নাটকে এই পটভূমিকার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।ক

ক—প্রতাপ—"কালীমায়ের সম্মুখে তবে শপথ কর…আমরা চিতোরের জন্য প্রয়োজন হলে প্রাণ দিব।…মনে থাকে যেন রাজপুত সর্দারগণ যে, আজ মায়ের সম্মুখে নিজের তরবারি স্পর্শ করে এই শপথ করেছো। এ শপথ ভঙ্গ না হয়।" [প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, রাণাপ্রতাপ।]

বিপ্লবী অরবিন্দের আহ্বানে ও নেতৃত্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধ ভারতবাসীর

কাছে ধর্মযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছিল। নাট্যকার এই রাজনৈতিক পটভূমিকার প্রভাব অতিক্রম করতে পারেননি।খ

খ (১) প্রতাপ—"আর এ যুদ্ধে আমাদের দিকে ন্যায়, আমাদের দিকে ধর্ম, আমাদের দিকে রাজপুতগণের কুলদেবতারা। যুদ্ধে জয় হোক, পরাজয় হোক সে নিয়তির হস্তে। আমরা যুদ্ধ করব।"

[দ্বিতীয় অংক, সপ্তম দৃশ্য, রাণাপ্রতাপ।]

(২) প্রতাপ—"মোঘল দূর দেশ থেকে এসেছ। শিখে যাও ধর্মযুদ্ধ কাকে বলে, শিখে যাও একাগ্রতা, সহিষ্ণুতা, প্রকৃত বীরত্ব কাকে বলে, শিখে যাও দেশের জন্য কি রকম করে প্রাণ দিতে হয়।"

[প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, রাণাপ্রতাপ।]

সে সময় শিল্পে সাহিত্যে দেশমাতৃকার রূপ বন্দনার দ্বারা দেশবাসীর মধ্যে দেশপ্রেমকে গভীর করে তোলার প্রচেষ্টা হয়েছিল। এই মানসিকতা দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনে জোয়ারের সৃষ্টি করেছিল।

সমসাময়িক এই রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত দ্বারাও নাট্যকার প্রভাবিত হয়েছেন।গ

গ—প্রতাপ—"জন্মভূমি! সুন্দর মেবার! বীরপ্রসূ মা! এখন এই বেশই তোমাকে সাজে মা। তোমাকে আমার বলে আবার ডাকতে পারি ত তোমার পায়ে স্বহস্তে আবার ভূষণ পরিয়ে দেব। নৈলে তোমাকে এই শ্মশান-চারিনী তপস্বিনীর বেশই পরিয়ে রেখে দেবো মা। মা আমার! তোমাকে আজ মোগলের দাসী দেখে প্রাণ ফেটে যায় মা।"

[প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য, রাণাপ্রতাপ।]

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদেশী দ্রব্য বয়কটের রাজনৈতিক ঘটনার প্রভাবও নাটকের মধ্যে প্রতিফলিত।ঘ

ঘ—প্রতাপ—(১) "দেশের জন্য পর্ণপত্রে এই ফলমূল স্বর্গসুধার চেয়েও মধুর। মায়ের জন্য এ ধূলি শয়ণ কুসুমের শয্যার চেয়েও কোমল"...

[তৃতীয় অঙ্ক, সপ্তম দৃশ্য, রাণাপ্রতাপ।]

(২) "প্রতাপ—যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়
সকলে—যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়
প্রতাপ—ততদিন ভূর্জ্জপত্রে ভক্ষণ করব
সকলে—ততদিন ভূর্জ্জপত্রে ভক্ষণ করব
প্রতাপ—ততদিন তৃণশয্যায় শয়ণ করব
সকলে—ততদিন তৃণশয্যায় শয়ণ করব
প্রতাপ—ততদিন বেশভূষা পরিত্যাগ করব।
সকলে—ততদিন বেশভূষা পরিত্যাগ করব।"

[প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য, রাণাপ্রতাপ।]

মোঘল সম্রাট আকবরের কন্যা মেহেরউন্নিসাকে রাণাপ্রতাপের আশ্রয়দান (৩।৭), প্রতাপের মহত্ত্ব ও উদারতায় মুগ্ধ সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রতাপের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন (৫।৫)—ইত্যাদি ঘটনার বিন্যাসের মধ্য দিয়ে নাট্যকার দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য যত্নশীল হয়েছেন।ঙ

ঙ—(১) আকবর—"মেহেরউন্নিসা তুমি আমার শত্রুকন্যা।…তবুও তোমাকে পরিত্যাগ করব না। এস মা ভিতরে…চল।"

[তৃতীয় অঙ্ক, সপ্তম দৃশ্য, রাণাপ্রতাপ।]

(২) আকবর—"প্রতাপ! তোমার আসন আমার উপরে…তুমি সম্রাট আমি প্রজা…তুমি জয়ী আমি বিজিত।…আজ হ'তে প্রতাপ আর আমার শত্রু নহে। তিনি আমার পরম মিত্র ; কোন মোঘলের সাধ্য নাই যে তাঁর কেশ স্পর্শ করে…।"

[পঞ্চম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য, রাণাপ্রতাপ।]

এটাও তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমিকার প্রভাবজাত।

সিরাজদ্দৌলা (গিরিশচন্দ্র ঘোষ—মিনার্ভা—৯-৯-১৯০৫)

বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পলাশীর প্রান্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার যুদ্ধ এবং সামরিক ও আমলাবাহিনীর প্রধানদের বিশ্বাসঘাতকতায় যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় ও মৃত্যু।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশের নেতাদের একদিকে ইংরেজ বিরোধী পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে হয়েছিল অন্যদিকে ইংরেজদের কূট-চক্রান্তে দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিপন্ন হ'লে সেই সম্প্রীতিকে অটুট রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হয়েছিল। সাহিত্য-শিল্পে এর প্রভাব পড়েছিল। এই নাটকটিও তার ব্যতিক্রম নয়।ক

ক (১) "বঙ্গের সন্তান হিন্দু মুসলমান
বাঙ্গলার সাধহ কল্যাণ—
শত্রুজ্ঞানে ফিরিঙ্গীরে কর পরিহার
বিদেশী ফিরিঙ্গী কভু নহে আপনার
স্বার্থপর চাহে মাত্র রাজ্য অধিকার
হও সবে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত।।"

[প্রথম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য, সিরাজদ্দৌলা।]

(২) "যদি কখনো সুদিন হয়, যদি কখনো জন্মভূমির অনুরাগে হিন্দু-মুসলমান ধর্মবিদ্বেষ পরিত্যাগ করে পরস্পরের মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হয়…যদি সাধারণ শত্রুর প্রতি একতায় খড়্গহস্ত হয়—এই দুর্দম ফিরিঙ্গী দমন তখন সম্ভব"

[দ্বিতীয় অংক, ষষ্ঠ দৃশ্য, সিরাজদ্দৌলা।]

প্রজার মঙ্গলসাধন না করে ইংরেজ সরকার যে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার দ্বারা এ দেশের স্বার্থ ক্ষুন্ন করছে সে সম্পর্কে কৌশলে দেশবাসীকে সচেতন করে দিয়ে নাট্যকার দেশের মধ্যেকার ইংরেজ-বিরোধী মনোভাবকে ঘনীভূত করে তুলেছেন।খ

(খ)—"রাজকার্য্য নহে স্বেচ্ছাচার
নবাব প্রজার ভৃত্য, প্রভু প্রজাগণে।
প্রজার মঙ্গল কার্য্য সতত সাধন
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে ॥"

[প্রথম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য, সিরাজদ্দোলা।]

সুতরাং নাটকটি রাজনৈতিক পটভূমিকার দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত।

পদ্মিনী (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। স্টার—২৩-১২-১৯০৫)

পিতৃব্যকে হত্যা করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করার পর আলাউদ্দিন গুজরাট অধিকার করলেন এবং রাণী পদ্মিনীকে পাবার জন্য আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করলে চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ভীমসিংহ, লক্ষ্মণসিংহের আত্মদান এবং নারীত্বের সম্মান রক্ষার্থে পদ্মিনীর জহরব্রত উদ্‌যাপন।

James Tod-এর Annals and Antiquities of Rajasthan থেকে নাটকের মূল কাহিনী সংগৃহীত।

নাটকের মধ্যে দেশের জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব বর্তমান। চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষার্থে চিতোরবাসীদের আমরণ সশস্ত্র সংগ্রামের ঘটনা প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলনে নতুন প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল।

মীরকাসিম (গিরিশচন্দ্র ঘোষ। মিনার্ভা—১৬-৬-১৯০৬)

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাংলার নবাব মীরকাসিমের সশস্ত্র সংগ্রাম এবং সংগ্রামে পরাজিত মীরকাসিমের রোগগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যু।

অক্ষয়কুমার মিত্রের 'মীরকাসিম' জি. বি. ম্যালসনের "The Decisive Battles of India—ইত্যাদি গ্রন্থের সাহায্যে নাট্যকার নাট্য-কাহিনী গঠন করেছেন। মাতৃভূমি রক্ষার জন্য মীরকাসিমের বলিষ্ঠ মনোভাব এবং তাকে কার্যকরী করে তোলার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার ঘটনার নির্বাচনের মধ্যে দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের প্রভাব লক্ষ্যণীয়।ক

ক—মীরকাসিম—"একদিন এক মুহূর্ত যদি বাংলা ইংরাজ বর্জিত দেখে আমার মৃত্যু হয় সেই মৃত্যু আমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থী। বাংলা বাঙালীর হোক এই আমার প্রার্থনা। যে বঙ্গভূমি রক্ষা করবে সেই নবাব—আমি তার দাসানুদাস।··· স্বাধীনতা পরম রত্ন—স্বর্গীয় রত্ন। স্বর্গ অপেক্ষা গরীয়সী মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করো।"

[চতুর্থ অংক, প্রথম গর্ভাংক, মীরকাসিম।]

নাটকে দেশের শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা তুলে ধরার ক্ষেত্রে নাট্যকার তৎকালীন অর্থনৈতিক পটভূমিকার দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন ।খ

খ—মীরকাসিম—"কোম্পানীর সেপাই, তাদের কর্মচারীদের সেপাই, কেউ বা সেপাই সাজিয়ে প্রজাদের ধরে নিয়ে যায়, শিল্পীদের পীড়ন করে দাদন দিয়ে মুচলেখা লিখিয়ে নেয়, বণিকদের নিকট মুচলেখা লিখিয়ে নিয়ে অল্পমূল্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে আর দশগুণ মূল্যে বিক্রয় করে। এতে সমস্ত প্রজা দিন দিন নিঃস্ব হচ্ছে, এ সকল অত্যাচার নিবারণ না হলে এক কপর্দকও কর আদায় হবে না, রাজকোষ অর্থশূন্য হবে।

[প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাংক, মীরকাসিম।]

এ ছাড়া নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজায় রাখার ক্ষেত্রেও যত্নশীল হয়েছেন ।গ

গ—তারা—"…বিদেশী ভেদমন্ত্রেই হিন্দু মুসলমানের প্রভেদ।"

[দ্বিতীয় অংক, পঞ্চম দৃশ্য, মীরকাসিম।]

"রক্তের বদলে রক্ত এবং রক্তপাতের মধ্যেই দেশের স্বাধীনতা আনা সম্ভব"—অনুশীলন সমিতি ও গুপ্ত সমিতির সদস্যদের এই রাজনৈতিক আদর্শের প্রভাব নাটকে প্রতিফলিত ।ঘ

ঘ—তারা—"…মা তৃষ্ণায় হা হা করছে। মার তৃষ্ণা নিবারণ করো; সামান্য বারিপানে সে তৃষ্ণা দূর হবে না—শোণিত পিপাসা; বক্ষের শোণিত দান করো;…স্বদেশপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, সেই প্রেমে বক্ষের শোণিত দানে প্রস্তুত হও।" [প্রথম অংক, চতুর্থ গর্ভাংক, মীরকাসিম।]

দুর্গাদাস (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। মিনার্ভা—৮-১২-১৯০৬)

স্বদেশের স্বাধীনতা এবং সম্মান রক্ষার্থে পররাজ্য লোভী মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে রাঠোর সেনাপতি দুর্গাদাসের কঠোর সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ।

নাটকের মূল কাহিনী James Tod-এর Annals and antiquities of Rajasthan থেকে নেওয়া হয়েছে।

আলোচ্য নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার দেশমাতৃকার পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলার জন্য দেশবাসীর মধ্যে সংগ্রামী মনোভাবকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন, দেশবাসীর মধ্যে বীরভাবের উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছেন এবং দেশের মুক্তির প্রয়োজনে একতাবদ্ধভাবে সংগ্রামের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন ।ক

ক (১) রাণী—"তোমরা কি নিশ্চিন্ত উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে তোমাদের জন্মভূমিকে পরপদদলিত, নিষ্পেষিত বিধ্বস্ত হতে দেখবে…একবার দৃঢ় পণ করে ওঠো। ওঠো যেমন তূরীশব্দে সুপ্তসিংহ জেগে ওঠে…স্বেচ্ছায় দেশের জন্য, পরের জন্য, কর্তব্যের জন্য মৃত্যুই সুখমৃত্যু।"

[তৃতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য, দুর্গাদাস।]

(২) দুর্গাদাস—"ওরে হতভাগ্য! একদিনের জন্য এক হ দেখি! একদিন নিজের চিন্তা ছেড়ে সবাই ভায়ের চিন্তা কর দেখি! একদিন সবাই নতজানু হয়ে করজোড়ে আমাদের এই মাকে প্রাণ ভরে মা বলে ডাক্ দেখি। দেখ এই অত্যাচার, এই অন্যায় এই স্বেচ্ছাচার চূর্ণ হয়ে যায় কিনা—"

[চতুর্থ অংক, অষ্টম দৃশ্য, দুর্গাদাস।]

জাতীয় আন্দোলনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নতুন উপাদানে জাতীয় চরিত্র গঠনের প্রতি নাট্যকার দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।খ

খ—দুর্গাদাস—"···আবার নূতন উপাদানে জাতীয় চরিত্র গঠন করতে হবে। নূতন বলে উঠতে হবে, নূতন তেজে কম্পমান হতে হবে···।"

[চতুর্থ অংক, ষষ্ঠ দৃশ্য, দুর্গাদাস।]

আবার দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদাত্মক পথকে সবলে পরিহার করে সাম্প্রদায়িক প্রীতি বজায় রাখার গুরুত্বকেও তিনি নাটকের মধ্যে তুলে ধরেছেন।গ

গ—দুর্গাদাস—"ঠিক বলেছ কাশিম ; দুর্গাদাস তোমার দেওয়া খুদকুড়োই খাবে। (দুর্গাদাস উঠিয়া কাশিমকে আলিঙ্গণ করিয়া কহিলেন) ভাই কাশিম! আজ হতে আমরা দুই ভাই···।" [পঞ্চম অংক, অষ্টম দৃশ্য, দুর্গাদাস।]

এ সবই তদানীন্তন রাজনৈতিক পটভূমিকার প্রভাবজাত।

চাঁদবিবি (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। কোহিনূর—১১-৮-১৯০৭)

আমেদনগরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে চাঁদবিবির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং চাঁদবিবির সঙ্গে যুদ্ধে বিপর্যস্ত মোঘলবাহিনী কর্তৃক স্বেচ্ছায় চাঁদবিবির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন।

নাট্যঘটনার নির্বাচনের মধ্যেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকার প্রভাব বিদ্যমান।

নন্দকুমার (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। স্টার—১৪-৮-১৯০৭)

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হেস্টিংসের স্বার্থ-বিরোধী কার্যে নন্দকুমার যুক্ত থাকার ফলে হেস্টিংসের চক্রান্তে মিথ্যা অভিযোগে নন্দকুমার ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ দিলেন।

দেশের মুক্তি আন্দোলনের জন্য দেশের মধ্যে শক্তি সঞ্চারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এর জন্য দেশের মধ্যে একদিকে বীর-চরিত্রের পঠন-পাঠন শুরু হয় অপরদিকে শক্তি-সাধনার মাধ্যম হিসাবে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার আয়োজন হয়। এই পরিমণ্ডলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই নাট্যকার দেশের মুক্তির জন্য শক্তি-আরাধনার সাধন-পীঠে 'কালী' পুজোর আয়োজন করতে বলেছেন।ক

(ক) "কিরূপ বলি দিলে দেশরক্ষা হয় একবার বল···যে পুষ্পাঞ্জলী গ্রহণ করেতুমি মধুকৈটভ বিনাশ করেছিলে জগদম্বিকে সেই পুষ্প আমি তোমার পদমূলে উপস্থিত করলুম···।" [তৃতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য, নন্দকুমার।]

(২) "শক্তিলোপেই আর্য জাতির পতন। যদি কোন সাধক কখনো তোমার শবে আসন করে এই মহাশ্মশানে কোন নির্ভীক হৃদয়ে চৈতন্যস্বরূপিনী, অসুর-নাশিনী বরাভয়দায়িনী মহাশক্তিকে ডাকতে পারে…তবেই দেশের মুক্তি।" [পঞ্চম অংক, নবম দৃশ্য, নন্দকুমার।]

দেশের সার্বিক মুক্তির জন্য নারীশক্তির জাগরণের ভাবধারার দ্বারাও নাট্যকার প্রভাবিত হয়েছেন।খ

খ—"এক পক্ষে ভর দিয়ে পক্ষী উড়তে পারে না। শুধু পুরুষের সাহায্যে জাতি ওঠে না। উন্নতির মুখে তাকে তোলবার জন্য পুরুষ-প্রকৃতির মিলন চাই।" [তৃতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য,'নন্দকুমার।]

জাতি ধর্মের অভিমান ত্যাগ করে জাতির দাসত্ব-শৃংখল মোচনের জন্য নাট্যকার দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।গ

গ—"রাজা…অন্ধ জাত্যভিমানে আপনি শুধু নিজের দাসত্ব আনছেন না, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাতির দাসত্ব আনছেন।"

[তৃতীয় অংক, চতুর্থ দৃশ্য, নন্দকুমার।]

এসবই দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিচয় বহন করছে।

ছত্রপতি শিবাজী (গিরিশচন্দ্র ঘোষ। মিনার্ভা—১৬-৮-১৯০৭)

মোগল সম্রাট ঔরংজেবকে যুদ্ধে পরাজিত করে বীর শিবাজী মহারাষ্ট্রে স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন।

নাট্যকার এই নাটকের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলেছেন, "শিবাজীতে আমি এই আদর্শ দেখাবার চেষ্টা করেছি যে ধর্মের উপর ভিত্তি করে সনাতন ধর্ম রক্ষার জন্য অত্যাচারিত দুর্বল, পীড়িতকে রক্ষা করার জন্য ত্যাগের উপর সেই মহাবীর মহারাষ্ট্র গঠন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন"।[৪২] এই উদ্দেশ্যমুখীনতাই প্রমাণ করে যে নাট্যকার দেশের তৎকালীন ধর্মীয় বাতাবরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।ক

ক—শিবাজী—"একবার নয়ন উন্মীলন করে জন্মভূমির অবস্থা দেখুন। দেবভূমি আর্যভূমি বিধর্মী পীড়িত…আপনার মাতৃভূমে সেই গোহত্যা নিত্য উদাস ভাবে আর কতদিন সহ্য করবেন?…কতদিন ধর্মের গ্লানি, প্রতিমা ভগ্ন উপেক্ষা করবেন?…দেশে অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, ধর্ম নাই, সকলই শেষ হলো…আর্য সন্তান বীরদম্ভে উত্থিত হোন…।" [প্রথম অংক, তৃতীয় গর্ভাংক, ছত্রপতি শিবাজী।]

স্বদেশী আন্দোলনের সময়কার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের প্রভাবও নাটকে প্রতিফলিত।খ

খ (১) রামদাস—"যে মহাপুরুষ মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত তারই মন্ত্র সফল, যে জন্মভূমি ভক্ত তারই ভক্তি সফল, যে জন্মভূমির নিমিত্ত স্বার্থত্যাগী তারই ত্যাগ সফল—" [চতুর্থ অংক, ষষ্ঠ দৃশ্য, ছত্রপতি শিবাজী।]

(২) রামদাস—"যে যথায় স্বাধীনতা সংস্থাপনে উদ্যমশীল হবে, যথায় বিজাতীয় শৃঙ্খল ভার বোধ হবে...এই মহান আত্মা তথায় সর্বদা অবস্থান করবেন। ...যথায় মাতৃভূমি বৎসল সম্মিলিত, যথায় স্বাধীনচেতা অস্ত্রধারী...যথায় জাতীয়তার উদ্বোধন, সেই স্থানে এই মহান আত্মা চিরদিন বিরাজ করবেন। শিবাজীর নামকীর্তনে দাসত্ব শৃঙ্খল মোচন হবে।"

[পঞ্চম অংক, দশম দৃশ্য, ছত্রপতি শিবাজী।]

নাটকের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক ঐক্য রক্ষার প্রতি আহ্বান জানিয়ে নাট্যকার যুগোচিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন।গ

গ—শিবাজী—"প্রজা আমার পুত্র, এতে হিন্দু মুসলমান নাই। তাদের মসজিদ ভঙ্গ হয়েছে। শিব মন্দির ভঙ্গের ন্যায় আমার প্রাণে ব্যথা লেগেছে। তাদের সমাধি খনন হয়েছে, আমার দেব-স্থান কলুষিতের ন্যায় বোধ হচ্ছে।"...

[চতুর্থ অংক, ষষ্ঠ দৃশ্য, ছত্রপতি শিবাজী।]

অশোক (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। মিনার্ভা—৭-৩-১৯০৮)

কনিষ্করাজের সহযোগিতায় সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অশোকের মগধের সিংহাসন লাভ এবং রিপুজয়ী অশোক কর্তৃক নিজের রাজ্যকে ধর্মরাজ্যে রূপান্তরিত করার জন্য বৌদ্ধকৃপানন্দের কাছ থেকে আশীর্বাদ গ্রহণ।

নুরজাহান (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। মিনার্ভা—১৪-৩-১৯০৮)

বধূসত্তা ও মাতৃসত্তা লাঞ্ছিত করে ক্ষমতালিপ্সু নুরজাহান মোগল সাম্রাজ্যের শীর্ষ ক্ষমতা লাভ করলেও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবে তিনি তাঁর সম্রাজ্ঞীসত্তার বিনষ্টি ঘটালেন।

নাটকের মধ্যে কৌশলে ইংরেজদের অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সোচ্চার হবার আহ্বান জানানো হয়েছে।ক

ক—মহাবৎ—"যদি এ শাসন একটা বিরাট অত্যাচার মাত্র হয়, যদি হিন্দুর এই অসীম ঔদাসিন্যকেও ক্ষেপিয়ে তোলেন, নিমেষে মোগল সাম্রাজ্য প্রভাতে কুজ্ঝটিকার মত বিলীন হয়ে যাবে।"

[চতুর্থ অংক, ষষ্ঠ দৃশ্য, নুরজাহান।]

আচার-বিচারের সংকীর্ণ স্রোতধারায় আবদ্ধ হবার ফলে জাতির অগ্রগতি ব্যাহত হয়ে পড়ে। এই দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠে আরও উদার মনোভাব গ্রহণ করার জন্য নাট্যকার জাতিকে সজাগ করে তুলতে চেয়েছেন। দেশের সার্বিক মুক্তির জন্যই যে এর প্রয়োজন নাট্যকার সেদিকেও আলোকপাত করেছেন।খ

খ—কর্ণ—"যখন মনে হয় যে মহাবৎ খাঁর মত ধর্মভীরু কর্মবীর ব্যক্তিকে গুটিকতক আচারগত বৈষম্যের জন্য আপনার বলে জাতির মধ্যে আলিঙ্গণ করে নিতে পারি না তখন বুঝি কেন আমাদের অধঃপতন হয়েছে।"

[চতুর্থ অংক, পঞ্চম দৃশ্য, নুরজাহান।]

নাটকের মাধ্যমে দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংহতি রক্ষার দায়িত্বও নাট্যকার পালন করেছেন।গ

গ—সাজাহান—"কর্ণসিংহ আজ থেকে আমরা দুই ভাই। আর হিন্দু আর মুসলমান ভাই-ভাই।" [পঞ্চম অংক, সপ্তম দৃশ্য, নুরজাহান।]

এ সবের মধ্যে যুগোচিত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামোর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

মেবার পতন (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। মিনার্ভা—২৬-১২-১৯০৮)

মোঘলের আক্রমণ থেকে মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য গোবিন্দ সিংহ প্রমুখ বীরের সহায়তায় রাণা অমর সিংহের কঠোর সংগ্রাম সত্ত্বেও ধর্মীয় আচার ও জাতিগত কুসংস্কার এবং গোঁড়ামির ফলে রাজপুতদের পরাজয় বরণ।

Annals and Antiquities of Rajasthan (by James Tod)—থেকে নাটকের মূল ঘটনা নেওয়া হয়েছে।

নাটকের মাধ্যমে নাট্যকার পরের রাজ্যের প্রতি লোভের মনোবৃত্তিকে দস্যুবৃত্তির মনোভাব বলে আখ্যা দিয়ে কৌশলে ইংরেজদের প্রতি ভারতবাসীর ঘৃণা ও বিদ্বেষের মনোভাবকে জাগিয়ে তুলেছেন।

ক—গোবিন্দ-সিংহ—"দস্যু আমি নই মহারাজ; দস্যু তোমারা। পরের রাজ্য লুঠ কর্তে আমি যাই নাই…তোমরা এসেছ…।"

[পঞ্চম অংক, চতুর্থ দৃশ্য, মেবার পতন।]

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার প্রতি নাট্যকার জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।খ

খ—গোবিন্দসিংহ—"(তরবারি ধীরে ধীরে উন্মোচন করিলেন, পরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন) প্রিয় সঙ্গী আমার…এবার তোমাকে এই মেবার যুদ্ধে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাব…মোঘলের সদ্য উষ্ণ রক্ত পান করাবো।"

[প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, মেবার পতন।]

দেশের মুক্তির প্রয়োজনে প্রকৃত বীরের কর্তব্য পালনের জন্য তিনি দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।গ

গ—সত্যবতী—"বীরের রক্তই জাতিকে উর্বর করে। দুঃখ সে দেশের নয় রাণা যে দেশের বীর মরে, দুঃখ সেই দেশের যে দেশের বীর মরে না।"

[দ্বিতীয় অংক, দ্বিতীয় দশ্য, মেবার পতন।]

সর্বধর্ম সমন্বয়ে আরো বাণী উচ্চারণের দ্বারা নাট্যকার জাতির সাম্প্রদায়িক ঐক্য-বোধকে দৃঢ় করে তুলতে চেয়েছেন।ঘ

ঘ (১) কল্যাণী—"যেমন সব মানুষ এক ঈশ্বরের সন্তান, সেই রকম সব ধর্ম, সেই এক ধর্মের সন্তান—" [দ্বিতীয় অংক, পঞ্চম দৃশ্য, মেবার পতন।]

(২) মহাবৎ—"একবার এক মুহূর্তের জন্য ভুলে যাও যে তুমি হিন্দু, আমি মুসলমান, শুধু মনে কর, যে তুমি মানুষ, আমি মানুষ—"

[পঞ্চম অংক, ষষ্ঠ দৃশ্য, মেবার পতন।]

এ সবের মধ্য দিয়ে নাটকে তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয় কুসংস্কার ও আচার-বিচারকে ত্যাগ করে জাতিকে পুনর্গঠিত করার যে আহ্বান তৎকালের বিভিন্ন মনীষীদের কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল নাটকের মধ্যে তারও প্রতিধ্বনি শোনা যায়।ঙ

ঙ—মানসী—"সে নিজের চোখ বেঁধে আচারের হাত ধরে চলেছে···অতি উদার হিন্দুধর্ম আজ প্রাণহীন একখানি আচারের কঙ্কাল।"

[পঞ্চম অংক, সপ্তম দৃশ্য, মেবার পতন।]

বারট্রাণ্ড রাসেল, টলস্টয় প্রমুখ ব্যক্তিগণের দ্বারা সম্প্রচারিত বিশ্বপ্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শের দ্বারাও নাট্যকার প্রভাবিত হয়েছেন।চ

চ—মানসী—"তুমি তোমার প্রেমকে মনুষ্যত্বে ব্যাপ্ত কর।···বিশ্বপ্রেম প্রতিদান চায় না, যোগ্য অযোগ্য বিচার করে না। সে সেবা করে সুখী।"

[পঞ্চম অংক, সপ্তম দৃশ্য, মেবার পাতন।]

(হরনাথ বসু। কোহিনুর—৩০-১১-১৯০৯)

মোঘল সম্রাট আলমগীরের আক্রমণ থেকে মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার্থে শিবাজীর পুত্র রাজারামের কঠোর সংগ্রাম এবং সশস্ত্র যুদ্ধে লক্ষ্মীবাঈয়ের মৃত্যু।

জন্মভূমি দেশজননীর মাতৃত্বের রূপ চিত্রণের মাধ্যমে দেশের প্রতি দেশবাসীর আরাধ্য কর্ম সম্পাদনের জন্য নাট্যকার দেশের মানুষকে উদ্দীপ্ত করেছেন।ক

ক—"···দেশের মাটি তোমার জন্য কোল পেতেই রেখেছে। মার বুকের রস যেমন দুধ হয়ে বেরুত তেমনি এই দেশের বুকের রস তোমার খাওয়ার জন্য ধান, গম এইসব হয়ে বেরোয় না···এই ভারতের মাটি সারা জীবনটা তোমায় কোলে করে বইছে না।···মা মা বলো, সে মরণও সার্থক হবে।"

[প্রথম অংক, তৃতীয় দৃশ্য, বীরপূজা]

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য শক্তি সাধনার প্রয়োজন। এই শক্তি অর্জনের জন্য নাট্যকার দেশবাসীকে শ্মশানকালীর আরাধনা করতে বলেছেন। এই

আরাধনার একটি প্রতীকী তাৎপর্য্য বিদ্যমান। এক্ষেত্রে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় গুপ্ত সমিতির আদর্শের দ্বারা নাট্যকার প্রভাবিত হয়েছেন।খ

খ—"বন্ধুগণ! ···আমরা করাল বদনা শ্মশানবাসিনীর পূজার অনুষ্ঠান করব। শ্মশানে শ্মশানপ্রিয়ার পূজা; সে পূজার উপাচার আত্মত্যাগ, সে পূজার মহামন্ত্র খর-খড়গের বিপুল ঝঙ্কার···মুক্তি ভোগে নয়··· মুক্তি ত্যাগে। মুক্তি আত্মদানে। মুক্তি স্বধর্মের জন্য জীবন বিসর্জনে। জয় মা অষ্টভূজা।" [প্রথম অংক, তৃতীয় দৃশ্য, বীরপূজা।]

নাট্যকারের উপর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রেমাদর্শের প্রভাব তাঁর আলোচ্য নাটকে প্রতিফলিত। নাট্যকাহিনীর এই বাতাবরণের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সহ ধর্মীয় আন্দোলনের প্রভাব পরিস্ফুট।গ

গ—'সকল সাধনার শ্রেষ্ঠ পথ প্রেম। প্রেমে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।"
[দ্বিতীয় অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, বীরপূজা।]

ময়ূর সিংহাসন (হরনাথ বসু। কোহিনুর, ৮-৫-১৯০৯)

দিল্লীর সিংহাসন লাভের জন্য মোরাদকে কৌশলে নিজের দলভুক্ত করে ঔরংজেব দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হন এবং দারাকে হত্যা করার পর অনুতপ্ত ঔরংজেব সাজাহানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

মূল কাহিনী গ্রন্হনার ক্ষেত্রে নাট্যকার এ সম্পর্কে বিভিন্ন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের লিখিত গ্রন্হের সাহায্য গ্রহণ করেছেন।ক

ক—"ঐতিহাসিক মুল, ডাউ, ইলিয়ট, এলফিনস্টোন, বার্নিয়ার, ট্রাভার্নিয়ার, অর্ম্মি, মেনুশি প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের লিখিত গ্রন্হ হইতে সংগৃহীত।"
[নাটকের ভূমিকা, ময়ূর সিংহাসন।]

সাজাহান (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। মিনার্ভা, ২৯-৮-১৯০৯)

মোঘল সাম্রাজ্যের উত্তরসূরী নির্ধারণের জন্য সাজাহানের জীবদ্দশায় তাঁর চার পুত্রের মধ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের শুরু এবং তার পরিণতিতে দারা ও মোরাদকে হত্যা করে, সুজাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে ও বৃদ্ধ সাজাহানকে বন্দী করে ঔরংজেবের সিংহাসনে আরোহন।

মূল নাট্যকাহিনী বিন্যাসের ক্ষেত্রে নাট্যকার প্রধানত 'জো' প্রণীত ইতিহাস, কফি খাঁর ইতিবৃত্ত এবং বার্নিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ইত্যাদি গ্রন্হের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। [নাটকের ভূমিকা, সাজাহান।]

রানী দুর্গাবতী (হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। কোহিনুর—২৫-১২-১৯০৯)

গড়মণ্ডল ও মালবের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোঘল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে

রানী দুর্গাবতী ও মালবেশ্বর বজবাহাদুরের প্রবল সংগ্রাম সত্ত্বেও সেই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দুর্গাবতীর আত্মহত্যা।

মূলত দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনকে দুর্বার করে তোলার জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল দেশবাসীর মধ্যে সংগ্রামশীলতাকে সুদৃঢ় করে তোলার উদ্দেশ্যে নাট্যকার নাটকটি রচনা করেছেন।ক

ক (১)—"সামান্য নারী হইয়াও দুর্গাবতী ভারতের সেই সুষুপ্তির দিনে কি প্রকারে প্রবল প্রতাপান্বিত মহাকৌশলী আকবরের বিরুদ্ধে অসিচালনায় সাহসী হইয়াছিলেন বঙ্গবাসীর সম্মুখে আজ এই অভ্যুদয়ের দিনে সেই চিত্র উপস্থিত করাই আমার উদ্দেশ্য।' [ভূমিকা, রানী দুর্গাবতী।]

(২) 'ভারতবাসী আজ বহুদিন হতে অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত···ভারতের ঘরে ঘরে চিৎকার করবো দেখি তাতেও এদের নিদ্রাভঙ্গ হয় কিনা'।
[দ্বিতীয় অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, রানী দুর্গাবতী।]

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব এই ভাবেই নাটককে প্রভাবিত করেছে।

বাংলার মসনদ (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। মিনার্ভা—২-৭-১৯১০)

দিল্লীর বাদশা মহম্মদশা-এর সহায়তায় বাংলার নবাব সফররাজের বিরুদ্ধে সফররাজের উজীর আলীবর্দীর সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং বাংলার মসনদের অধিকার গ্রহণ।

মূল নাট্যকাহিনীর গ্রন্থনার ক্ষেত্রে নাট্যকার নিখিলনাথ রায় ও কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ইতিহাস-পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করেছেন।খ

খ—[ভূমিকা, বাঙ্গলার মসনদ]

অশোক (গিরিশচন্দ্র ঘোষ। মিনার্ভা—৩-১২-১৯১০)

পিতার অবর্তমানে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করার পর কলিঙ্গ যুদ্ধে মানুষের দুর্দশা দেখে বেদনাহত অশোক উপগুপ্তের পরামর্শে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হলেন এবং সাধনার দ্বারা ইন্দ্রিয় জয়ের মাধ্যমে তথাগত বুদ্ধের দর্শন লাভ করলেন।

নাট্যকার মূল নাট্য ঘটনার বিন্যাসের ক্ষেত্রে অশোক সম্বন্ধে প্রচলিত ভারতীয় লোক কাহিনী ও সিংহলীয় উপকথার সাহায্য গ্রহণ করেছেন।

(দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। মিনার্ভা থিয়েটার—২২-৭-১৯১১)

মন্ত্রী চাণক্য ও মলয়রাজ চন্দ্রকেতুর সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহারাজ নন্দের কাছ থেকে মগধরাজ্য উদ্ধার এবং গ্রীক সেনাপতি সেলুকসকে পরাজিত করে হিন্দুকুশ থেকে কুমারিকা পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্য স্থাপন।

নাট্য রচনায় নাট্যকার 'পুরাণ' এবং কিছু পরিমাণে 'ইতিহাসের' সাহায্য গ্রহণ করেছেন।

বাজীরাও (মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার—২৭-৭-১৯১১)

দোর্দণ্ড প্রতাপশালী হায়দ্রাবাদের অধীশ্বর নিজাম সহ দিল্লীশ্বরের মুসলিম রাজশক্তিকে পরাজিত করে পেশোয়া বাজীরাও কর্তৃক স্বাধীন মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং রোগ-গ্রস্ত অবস্থায় তাঁর দেহাবসান।

শিবাজীর পর স্বাধীন মহারাষ্ট্র স্থাপনের ক্ষেত্রে বাজীরাওয়ের সংগ্রামশীলতা দেশবাসীর মনে বীরত্বের ও দেশপ্রেমের এক মহান আদর্শ তুলে ধরেছিল। স্বাধীনতার আন্দোলনকে এগিয়ে নেবার জন্য এই আদর্শের প্রচারের প্রয়োজন ছিল। এদিক থেকে নাট্যকাহিনী নির্বাচনে ও নাট্য ঘটনার মধ্যে দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক পটভূমিকার প্রভাব বিদ্যমান।

ধর্মবিপ্লব (মনোমোহন গোস্বামী। স্টার—২৯-৩-১৯১৩)

গৌড় সম্রাট সোলেমান দুহিতাকে বিয়ে করার জন্য হিন্দু সমাজ কর্তৃক লাঞ্ছিত ও পরিত্যক্ত কালাচাঁদের মুসলিম ধর্মগ্রহণ এবং ঘটনাক্রমে কালাচাঁদের প্রিয়জনের মৃত্যুতে হিন্দুধর্মের প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ কালাচাঁদের হৃদয়ের পরিবর্তন।

নাটকের মধ্যে সে সময়ে দেশের ধর্মীয় প্রভাব গভীরভাবে পরিস্ফুট। বিভিন্ন ধর্মের মৌলবাদীদের আঘাত থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার জন্য নাট্যকারের সচেতনতা লক্ষ্যণীয়।ক

ক—"হিন্দু সব সইতে পারে। কিন্তু ধর্মের উপর আঘাত ও সতীর উপর অত্যাচার তাকে উন্মত্ত করে তোলে।"

[প্রথম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, ধর্মবিপ্লব।]

আবার হিন্দুধর্মের মাত্রাতিরিক্ত নিয়মের শাসনের ফলে এবং উচ্চবর্ণের ভণ্ডামী ও স্বার্থপরতার জন্য হিন্দুধর্ম যে ক্রমশ ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ছে এ সম্পর্কেও নাট্যকার তাঁর নাটকের মাধ্যমে দেশবাসীকে সচেতন করে তুলেছেন।খ

খ (১) "হিঁদুয়ানি আবার একটা ধর্ম। অন্য কোন ধর্ম থেকে তো হিঁদু হবার যোই নেই। তার উপর যদি কেউ একটু পা পিছলে পড়ল তো অমনি নিকাল যাও। কেন হে বাপু এত তেজ কিসের··· ।"

[চতুর্থ অংক, তৃতীয় দৃশ্য, ধর্মবিপ্লব।]

(২) "আমাদের অধঃপতনেই হিন্দুর আজ এই দশা। ব্রাহ্মণ যদি পূর্বের ন্যায় ধর্মনিষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ, নিষ্ঠাবান, নির্লোভ ও জিতেন্দ্রিয় থাকতেন তাহলে অপর-জাতির সাধ্য কি যে তারা কদাচারী হয়।"

[তৃতীয় অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, ধর্মবিপ্লব।]

যুগ সচেতন নাট্যকার হিসেবে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার জন্য তাঁর সচেতনতা নাটকে পরিস্ফুট।গ

গ—"আর যিনি আমাদের খোদা। তিনিই আপনাদের ভগবান। যে নামেই ডাকুন না কেন তিনি এক।" [দ্বিতীয় অংক, চতুর্থ দৃশ্য, ধর্মবিপ্লব।]

অহল্যাবাঈ (মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। স্টার—১৫-৮-১৯১৪)

ইন্দোরের রাজার পুত্র কুন্দরাওয়ের সঙ্গে অহল্যার বিবাহ এবং কুন্দরাওয়ের মৃত্যুর পর দিল্লীশ্বরের আক্রমণের বিরুদ্ধে ইন্দোরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অহল্যাবাঈ কর্তৃক ইন্দোরবাসীকে নেতৃত্ব দান।

ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে ভারতীয় নারীসমাজকে যুক্ত করার প্রয়োজন ছিল। অহল্যার বীরত্ব ও সংগ্রামশীলতা এ বিষয়ে নারীজাতির প্রেরণা স্বরূপ। স্বাধীনতার যুদ্ধকে নাট্যকার ধর্মযুদ্ধ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে আরো উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছেন।ক

ক (১) "আমার কর্তব্য জীবনপণ। যতক্ষণ ইন্দোরের একজন অস্ত্রধারী একটিমাত্র রমনী বেঁচে থাকবে ততক্ষণ যুদ্ধ চলবে।"

[চতুর্থ অংক, চতুর্থ দৃশ্য, অহল্যাবাঈ।]

(২) "এ যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ, পাপের বিরুদ্ধে এ আমাদের ধর্মযুদ্ধ···মনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখো। যথা ধর্ম তথা জয়।"

[চতুর্থ অংক, চতুর্থ দৃশ্য, অহল্যাবাঈ]

নাটকের মধ্যে নাট্যকারের এরূপ মননশীলতার পিছনে দেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক পটভূমিকার প্রভাব বিদ্যমান।

মাধবরাও (মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। স্টার—২৭-৪-১৯১৫)

মহীশূরের হায়দর আলী, হায়দ্রাবাদের নিজামশাহী এবং স্বদেশী বিশ্বাসঘাতকদের মিলিত আক্রমণকে প্রতিহত করে মাধবরাও কর্তৃক স্বাধীন ও সার্বভৌম মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

দেশের রাজনৈতিক পটভূমিকার প্রভাব এ নাটকেও ক্রিয়াশীল।

সিংহল বিজয় (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। মিনার্ভা—২-১০-১৯১৫)

অঙ্গরাজ্যের আক্রমণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হ'লে বিজয় সিংহ বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করলেন এবং পরে লঙ্কা দেশ জয় করে নিজের শৌর্য্যবীর্য্যের মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

বাঙালীর শৌর্যবীর্যের জয়গাথা গেয়ে বঙ্গবাসীকে বীররসে উদ্বুদ্ধ করার তৎকালীন রাজনৈতিক মানসিকতার দ্বারা নাটকটি প্রভাবিত। জন্মভূমির মাতৃসত্তার পরিচয় দান করে নাট্যকার দেশবাসীর দেশপ্রেমকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছেন।ক

ক—(১) "জন্মভূমি মানুষ। সে কথা কয়, হাসে, কাঁদে, বুকে জড়িয়ে ধরে। তার চেয়েও বেশী। জন্মভূমি সাক্ষাৎ মা। গর্ভে ধরে স্তন্য দেয়, বুকে জড়িয়ে ধরে।" [প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, সিংহল বিজয়।]

(২) "স্বদেশ কি ভোলা যায়। সুখে-দুঃখে-বিপদে, সম্পদে, আলোকে, অন্ধকারে, গৌরবে, লাঞ্ছনায় স্বদেশ চিরদিনই স্বদেশ।"

[চতুর্থ অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, সিংহলবিজয়।]

বাপ্পারাও (নিশিকান্ত বসুরায়। মনোমোহন—২৬-২-১৯১৬)

বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের দ্বারা সুলতানের আক্রমণ থেকে বাপ্পারাও কর্তৃক চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষার দ্বারা চিতোরের সিংহাসন লাভ এবং তাঁর বিরুদ্ধে স্বীয় পুত্র খোমেনির বিদ্রোহ দমনের পর তাঁর জীবনাবসান।

নাটকের মূল কাহিনী জেমস টড-এর Annals and Antiquities of Rajasthan-থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

বাপ্পারাওয়ের বীরত্বপূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী বিন্যাসের দ্বারা নাট্যকার ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সংগ্রামকে দীপ্ত করতে চেয়েছেন।ক

ক—"ভাইসব আজ রাজপুতের এক কঠোর পরীক্ষার দিন। আমাদের মান সম্ভ্রম, তোমাদের ধর্ম্ম এক রাক্ষসের দানবীয় লালসা গ্রাস কর্তে যাচ্ছে। তার সৈন্যবল, তার অস্ত্রবল তোমাদের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। তা বলে কি তোমরা জড়ের মত খাড়া হয়ে তোমাদের চোখের সামনে তোমাদের রমনীর অবমাননা দেখবে ?…এক্ষেত্রে মরণ অবশ্যম্ভাবী। তোমাদের মধ্যে যারা এই মরণকে স্বেচ্ছায় বরণ করতে প্রস্তুত আছ…তারা আমার সঙ্গে এস।" [দ্বিতীয় অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, বাপ্পারাও।]

বাপ্পার সঙ্গে সুলতান কন্যা নোশেরার বিবাহ (৩।৮), বাপ্পার মৃত্যুর পর তার হিন্দু ও মুসলিম ধর্মাবলম্বী পুত্রদের মধ্যে বাপ্পার শেষকার্য সম্পন্ন করা নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে ঐ বিরোধ অবসানের জন্য বাপ্পার মৃতদেহের ফুলে পরিণত হওয়া (৫।৮), বীর ইয়াজিদের মৃত্যুর পর তার প্রতি বাপ্পার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন (৩৭)—ইত্যাদি ঘটনার দ্বারা নাট্যকার দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক ঐক্য রক্ষার প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন।

মোগল পাঠান (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মনোমোহন—৮-৭-১৯১৬)

দিল্লীশ্বর হুমায়ুনকে চৌসার যুদ্ধে পরাজিত করে বাংলা বিহারের অধিকর্তা রূপে শেরশাহের সিংহাসনে আরোহণ এবং পরবর্তীকালে কালিঞ্জর দুর্গ নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য হুমায়ুনের সঙ্গে যুদ্ধে দুর্ঘটনায় শেরশাহের মৃত্যু।

নাটকটির মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব বর্তমান। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অত্যাচার দূর করার জন্য দেশের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধের গুরুত্বের উল্লেখ করে নাট্যকার ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবাসীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অত্যাচার হতে মুক্তির জন্য সশস্ত্র আন্দোলনের প্রতি দেশবাসীকে প্রকারান্তরে উদ্‌বুদ্ধ করেছেন।ক

ক—"এ স্বার্থ শুধু তোমাতে আমাতে পর্যবসিত নয়। এ স্বার্থ দেশের কল্যাণে, জাতির কল্যাণে উজ্জীবিত। শের, অত্যাচারে অবিচারে দেশ ভরে গিয়েছে···দেশের পুষ্টি সরল কৃষকের রক্তে বিলাস কক্ষ ধৌত করছে···শের অগ্রসর হও।"

—ফকির [প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, মোগল পাঠান।]

অত্যাচারীর অত্যাচারকে বিনষ্ট করে দেওয়া ধর্মশাসিত কার্য· বিশেষ। নাটকের ভিতর নাট্যকারের এহেন মনোভাবের মধ্যে অগ্নিযুগের সশস্ত্র আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ বিপ্লবী অরবিন্দের আদর্শের পরিচয় ফুটে উঠেছে।খ

খ—"ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা নশ্বর জগতের এক অবিনশ্বর কীর্তির সৃষ্টি। পিতা অধর্মের প্রলয় বিষাণ বেজে উঠেছে—এই গম্ভীর নির্ঘোষ স্তব্ধ করে ধর্মের ভেরী আপনাকে বাজাতে হবে।···সম্মুখে বিরাট কর্তব্য আপনাকে আহ্বান করছে। বজ্রহস্তে তরবারি ধরে অগ্রসর হন।"

[প্রথম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, মোগল পাঠান।]

দেশবাসীর প্রতি বিবেকানন্দের কর্মযোগের আহ্বানের জীবনাদর্শের দ্বারাও নাট্যকার প্রভাবিত হয়েছেন।গ

গ—"আদিল কর্ম কর। কর্মই সব। ধর্ম এসে নিজে তোমাকে আলিঙ্গণ করবে।" [প্রথম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, মোগল পাঠান।]

দেবলা দেবী (নিশিকান্ত বসুরায়। মনোমোহন—১৭-৮-১৯১৮)

দেবলাকে বন্দী করে আনার রাজআজ্ঞা পালনে ব্যর্থ হওয়ায় আলাউদ্দিন কর্তৃক পুত্র খিজিরকে প্রাণদণ্ডাদেশ দান এবং পরে কাফুরের ছুরিকাঘাতে দেবলার প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ উন্মত্ত আলাউদ্দিনের মৃত্যু।

ভারতের বুকে প:রাজ্যলোভ। রাজশক্তির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির গুরুত্বকে নাট্যকার নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এইভাবে তিনি পররাজ্যলোলুপ ইংরেজ

শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য ভারতীয় গনমানসে নতুন প্রেরণার সৃষ্টি করেছেন।ক

ক—"ভারত আমাদের! ভাব দেখি একবার কোন সুদূর দেশ থেকে পাঠান এ রাজ্যে এসেছে। ভাব দেখি একবার কিভাবে তারা এ রাজ্যে শাসন করছে? প্রকৃতপক্ষে করবার যা কিছু তা এই দেশবাসী আমরাই করছি। এস ভাই আমাদের হৃতরাজ্য আমরা পুনরুদ্ধার করি…"

[প্রথম অংক, চতুর্থ দৃশ্য, দেবলা দেবী।]

এক্ষেত্রে নাটকের উপর তদানীন্তন রাজনৈতিক পটভূমিকার প্রভাব বিদ্যমান।

●সামাজিক নাটক

বলিদান (গিরিশচন্দ্র ঘোষ। মিনার্ভা—৮-৪-১৯০৫)

পণ-সর্বস্ব সামাজিক বিবাহ ব্যবস্থার চাপে আর্থিক ও সামাজিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত করুণাময় শ্বশুরবাড়ী থেকে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত কন্যার আত্মহত্যায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে আত্মহত্যা করলেন।

নাটকে পণ-সর্বস্ব বিবাহ ব্যবস্থার ফলে শ্বশুরগৃহে বধূ নির্যাতন, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার শোচনীয় আর্থিক ও মানসিক দুরবস্থা এবং বহুবিবাহকে কেন্দ্র করে সামাজিক অত্যাচার ও ব্যাভিচারের ঘটনাকে তুলে ধরে নাট্যকার দেশের তৎকালীন সামাজিক পটভূমিকাকে পরিস্ফুট করেছেন।ক

ক (১) প্রথম প্রতিবেশিনী—"ওমা! এমন জামাই পেলি, এমন ঘরে মেয়ে দিলি হাজার পাঁচেক দে! তা নয় মোটে দুটি হাজার!

মাতঙ্গিনী—ওমা! দুটি হাজার কোথায়? দেড় হাজার।

রমা—দিদি ভাবছ কেন…মেয়ে আটকাও, আধপেটা খেতে দাও।"

[প্রথম অংক, পঞ্চম দৃশ্য, বলিদান।]

(২) করুণা—"কন্যার বিবাহ না দিলে চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হবে। বিবাহ দিতেই হবে। বাড়ী বেচে দিতে হবে, কর্জ্জ করে দিতে হবে, তারপরে সপরিবারে অন্নাভাবে মারা যেতে হবে। না দিলে নয়। পুণ্যাত্ম সমাজ জাতে ঠেলবেন, ঘৃণা করবেন…"

[তৃতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য, বলিদান।]

শিল্পে ও ব্যবসা বাণিজ্যে লাভজনক ভাবে অর্থলগ্নীর সুবিধা না থাকায় বিত্তবান লোকেরা সে সময় দেশে ব্যাপকভাবে মহাজনী কারবারে লিপ্ত হয় এবং মানুষের দারিদ্রের সুযোগে এই মহাজনী কারবারের মাধ্যমে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে বিভিন্ন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। দারিদ্রের চাপে বাধ্য হয়েই দরিদ্র মানুষেরা এই মহাজনদের কাছে লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত হতে থাকে। নানাবিধ অনৈতিক সামাজিক কার্যকলাপের দ্বারা সামাজিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হতে থাকে (৪।১)। দেশের তৎকালীন এই অর্থনৈতিক পটভূমিকার দ্বারাও নাটকটি প্রভাবিত।

শাস্তি কি শান্তি (গিরিশচন্দ্র ঘোষ। মিনার্ভা—৭-১১-১৯০৮)

বিধবা কন্যার বিবাহোত্তর লাঞ্ছনা ও অত্যাচারে এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের মনোবেদনাকে বিকিয়ে দিয়ে আর এক কন্যার ব্যাভিচারে অতিষ্ঠ প্রসন্ন কুমার নিজের কন্যাকে হত্যা করে পরিশেষে আত্মহত্যা করলেন।

অকাল বৈধব্যজনিত যন্ত্রণা থেকে নারীজাতির মুক্তির জন্য তৎকালীন সময়ে ব্রাহ্মসমাজ ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু ব্যক্তিগণ যে বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন, আলোচ্য নাটকটি সেই সামাজিক পটভূমিকার দ্বারা প্রভাবিত। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হলে ঐ বৎসর উমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁর 'বিধবা বিবাহ' নাটকের মধ্যে সে বিষয়টির প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গিরিশচন্দ্রের রক্ষণশীল মনোভাব বিধবা বিবাহের অমঙ্গলজনক দিকটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে প্রকারান্তরে বিধবাদের সংযতভাবে থেকে হিন্দু পতিব্রতার আদর্শ অনুসরণ করতে বলেছেন।ক

ক—পাগল—"...বিধবা বিবাহ প্রচলিত হলে হিন্দু সমাজের দাম্পত্য বন্ধন অন্য রূপ হবে। সতীত্বের উচ্চ মর্যাদা কতক পরিমাণে লাঘব হবে। অর্থলোভে সমাজ-ভয় বর্জিত ব্যক্তি ব্যতীত বিধবাবিবাহ করতে কেউ সম্মত হবে কিনা সন্দেহ। এরূপ অবস্থায় বিধবা বিবাহের পরিণাম অশুভ হওয়াই সম্ভব।"

[দ্বিতীয় অংক, ষষ্ঠ গর্ভাংক, শান্তি কি শান্তি।]

তবে বিধবাদের অসংযত আচরণও যে জীবনের পরিণামকে শোচনীয় করে তোলে সেদিকেও তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যুগের প্রয়োজনে শাস্ত্রবিধির সংস্কারের কথাও বলেছেন।খ

খ—শ্যামা—"যদি সমাজের প্রয়োজন হয়, শাস্ত্রেই বিধি আছে, দেশকাল পাত্র বিবেচনা করে নিয়ম পরিবর্তন করবে।"

[দ্বিতীয় অংক, ষষ্ঠ গর্ভাংক, শাস্তি কি শান্তি।]

এসব দিক দিয়ে নাটকটি তৎকালীন বিধবা বিবাহ, ভ্রূণহত্যা, সামাজিক ব্যাভিচার ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যামূলক সামাজিক পটভূমিকার দ্বারা প্রভাবিত।গ

গ—প্রসন্ন—"হোক দেশাচার বিরুদ্ধ, বিবাহ দিলে তবু একটা নিয়মাধীন থাকবে, ভ্রূণহত্যা হবে না, কন্যা স্বেচ্ছাচারিনী হবে না, একেবারে লোকধর্মে ঘৃণিত হবে না।"

[দ্বিতীয় অংক, সপ্তম গর্ভাংক, শাস্তি কি শান্তি।]

পরপারে (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। স্টার—২৮-৮-১৯১২)

স্ত্রীর সাহায্যে বেশ্যাসক্ত ও মদ্যপ মহিম সুস্থ জীবন লাভ করল। ইহাই নাটকের কথাবস্তু। মদ ও বেশ্যাসক্তিতে আসক্ত যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয়জনিত সামাজিক দুরবস্থার পটভূমিকার প্রভাব নাটকে ক্রিয়াশীল।ক

ক—মহিম—"সহ্য হবে। মদ খাবো। যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ি—অসাড় হয়ে যাই। মৃৎপিণ্ডের মত অনড় না হয়ে যাই। মদ খাবো..."

[চতুর্থ অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, পরপারে।]

সৎসঙ্গ (ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্টার—১১-১১-১৯১১)

অসৎ সংসর্গে পড়ে চরিত্রহীন প্রবোধের সম্পত্তিনাশ এবং সৎসঙ্গজাত শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন বন্ধু সুকুমারের প্রভাবে তার মানসিক ও চারিত্রিক পরিবর্তন ও হৃতসম্পত্তির পুনরুদ্ধার। ইহাই নাটকের কথাবস্তু।

যুবশক্তির নৈতিক অবক্ষয়জনিত সামাজিক পটভূমিকার প্রভাবে নাটকটি প্রভাবিত। বিধবা বিবাহজনিত তৎকালীন সামাজিক সমস্যার প্রভাবও নাটকে পড়েছে—এবং বিধবা বিবাহ সম্পর্কে হিন্দুর সংরক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় নাটকে তুলে ধরা হয়েছে।খ

খ—"বিধবা তুমি। আমাদের হিন্দুসংসারে তোমরাই জাগ্রতা মূর্তিমতী দেবী। পবিত্রতার আধার শুদ্ধাচারিনী ব্রতধারিনী লক্ষ্মী তোমরা। স্বর্গত পতিদেবতার ধ্যানে তোমরা দিবানিশি তন্ময় হয়ে থাকবে, আত্মসুখ বর্জন করে সতত পরহিতব্রতে নিযুক্ত থাকবে।"

[চতুর্থ অংক, চতুর্থ দৃশ্য, সৎসঙ্গ]

গৃহলক্ষ্মী (গিরিশচন্দ্র ঘোষ। মিনার্ভা—২১-৯-১৯১২)

স্ত্রীর অমানবিক আচরণ ও ব্যবহারের ফলে ব্যথিত উপেন্দ্র পুত্রের অসামাজিক কাজ এবং চরিত্রহীন ভাই এর লাম্পট্য সহ্য করতে না পেরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে এবং পরে তার মৃত্যু হয়।

সমসাময়িক সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র নাটকে পরিস্ফুট। সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য নাট্যকার লোকহিতে আত্মবিসর্জনের উদাত্ত আহ্বানও জানিয়েছেন।গ

গ—মন্মথ—"বিষ্ঠার কীট হই। নরকের কৃমি হয়ে থাকি তবু লোকহিত করবো—এই ভেবে যখন লোকহিত করতে পারবি তখন আর কিন্তু থাকবে না। এর নাম আত্মবিসর্জন। পরের জন্য আপনাকে বলি দেওয়া। এর চেয়ে উঁচু কাজ আর নাই।" [পঞ্চম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, গৃহলক্ষ্মী।]

এদিক দিয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনাদর্শের দ্বারাও নাট্যকার উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

বঙ্গনারী (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। মিনার্ভা—২৩-৩-১৯১৬)

বড়ভাই উপেন্দ্রের চক্রান্তে পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবার ফলে তাঁর অর্থনৈতিক সংকটে দেবেন্দ্রের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। পরিশেষে বন্ধু কেদারের সহায়তায় দেবেন্দ্র পুনরায় পিতার সম্পত্তি লাভ করল এবং উইল জাল করার অপরাধে উপেন্দ্রের কারাবাস হল।

বাল্যবিবাহ, পণসর্বস্ব কন্যাদায় ব্যবস্থা, সামাজিক অনুশাসনের নামে নারীর উপর অত্যাচার, ধর্মের ভণ্ডামী, সামাজিক আচার-বিচারের প্রকটতা ইত্যাদি নানান সমস্যামূলক সামাজিক পটভূমিকার প্রভাব নাটকে প্রতিফলিত।ক

ক (১) সদানন্দ—"এই বাল্যবিবাহ জাতটাকে যেমন মজ্জাগতভাবে দুর্বল, অন্নাভাবে শীর্ণ, বলাভাবে ভীরু আর কোন উদ্যমাভাবে অথর্ব করেছে এমন আর কোন প্রথায় করেনি"— [প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, বঙ্গনারী।]

(২) দেবেন্দ্র—"সমাজ! এমন নিয়ম করেছো যে কন্যা গৃহের অভিশাপ স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদায় কর্তে পার্লে বাঁচি। মাতা কন্যা প্রসবে লজ্জিতা হয়, পিতার রং কালীবর্ণ হয়ে যায়। আর ভাববো না। ঐ রাস্তার কুকুরটাও যদি হোতাম! মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাবতে হোত না।"
[প্রথম অংক, তৃতীয় দৃশ্য, বঙ্গনারী।]

(৩) সুশীলা—"যে জাতি অবলা অবলা বলে তার উপর বংশ পরম্পরায় এই অত্যাচার কর্তে পারে সে জাতি উচ্ছনে যাবে না তো কে উচ্ছনে যাবে?"
[দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য, বঙ্গনারী।]

(৪) সদানন্দ—"সনাতন হিন্দু প্রথা যদি একেবারে নির্ভুল হোত তাহলে এ জাতির আজ এ দুর্দশা হোত না। এ প্রথার মধ্যে···অনেক অধর্মের আগাছা এসে শিকড় গেড়েছে তাদের উপরে ফেলতে হবে।"
[প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, বঙ্গনারী।]

উনবিংশ শতাব্দীর নারীজাগরণের আন্দোলনের প্রভাবে মানুষের অধিকারে জীবন-যাপনের প্রবণতা নারীর মধ্যে বিকাশ লাভ করতে থাকে। আলোচ্য নাটকে এই পরিমণ্ডলকে তুলে ধরা হয়েছে।খ

খ—সুশীলা—"আমার নিজের একটা সত্তা আছে। যদি বাবার ইচ্ছা ছিল যে আমায় একটা যে সে খোঁয়াড়ে বেঁধে রেখে আসবেন তার সময় ছিল। সে সময় উত্তীর্ণ হয়েছে। এখন আমি ভাবতে শিখেছি। এখন তিনি যা খুসী তা কর্তে পারেন না।···আমি সমাজের পায়ে নিজেকে বলি দেবো না—থাকে প্রাণ—যায় প্রাণ—" [প্রথম অংক, চতুর্থ দৃশ্য, বঙ্গনারী।]

সাধনা (মনোমোহন গোস্বামী। স্টার—২৩-১২-১৯১৬)

রাধিকানাথের অত্যাচারে তার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর রাধিকানাথ তার দ্বিতীয় স্ত্রীকে হত্যা করলে রাধিকানাথের একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে রাধিকানাথের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার জন্য তার চিকিৎসক রাধিকানাথকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে।

নাটকটি মূলত দেশের সামাজিক পটভূমিকার দ্বারা প্রভাবিত। বাল্যবিবাহ, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে বৃদ্ধলোকেরও বহুবিবাহ

করা, পাশ্চাত্য আদব-কায়দার অন্ধ অনুকরণ প্রবণতা ইত্যাদি সামাজিক দুর্বলতার দিকগুলি নাটকে পরিস্ফুট।ক

ক (১) "দেখ বাল্যবিবাহ আমার এই সর্বনাশ করেছে। চতুর্দশ বৎসরের বালিকা গর্ভবতী হলে অনেক সময় এমনই হয়ে থাকে।"

[দ্বিতীয় অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, সাধনা।]

(২) "ওরা স্ত্রী বর্তমানে বৃদ্ধ বয়সে আবার বিবাহ করতে পারেন। তার উপর বারটানও থাকতে পারে তাতে দোষ নাই। সমাজ তাতে নির্বাক, নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ।" [চতুর্থ অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, সাধনা।]

(৩) "আমরা ইংরাজদের দোষগুলি অনুকরণ করতে বড় পটু।...আমরা মদ খেতে পারি কিন্তু ইংরেজদের স্বজাতিপ্রেম, ও স্বদেশপ্রীতি ধারণা করতে পারিনা।" [চতুর্থ অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, সাধনা।]

মহাজন-জোতদার শ্রেণীর অত্যাচারে চাষীদের শোচনীয় দুরবস্থার কথাও নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। এদিক দিয়ে দেশের সমসাময়িক অর্থনৈতিক পটভূমিকার চিত্রও নাটকে প্রতিফলিত।খ

খ—"আগে নিজেদের সমাজের উন্নতি করুন, দেশের লোক যাতে দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় তার চেষ্টা করুন...কারা চাষ করে, কি করে চাষ হয় সে বিষয়ে এতটুকু মাথা দিয়েছেন কি?...চাষাদের মহাজনদের হাত থেকে বাঁচাতে পারি, তাদের সম্বৎসরের ধানের মাড়াই বেঁধে দিতে পারি... তাদের দৈহিক বলের সঙ্গে আমাদের বুদ্ধিবল মিশ্রিত করে এই স্বপ্নপ্রসূ ভারতে সত্য সত্যই সোনা ফলাতে পারি..."

[প্রথম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, সাধনা।]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজদের হয়ে লড়াই করার জন্য দেশবাসীর মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। নাট্যকার নাটকের মধ্য দিয়ে সেই অবস্থাকে তুলে ধরে তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার পটভূমিকার প্রতি আলোকপাত করেছেন।

গ—"এই দুর্দিনে ইংরাজ বুঝবে যে বাঙ্গালীর ন্যায় বুদ্ধিমান, বাঙ্গালীর ন্যায় ইংরাজ পক্ষপাতী, বাঙ্গালীর ন্যায় রাজভক্ত জগতে বিরল...পিতৃবিরোধী সন্তানও পিতার অপমান প্রত্যক্ষ করতে পারে না—পিতৃশত্রুর প্রতি জিঘাংসার সামনে পশ্চাৎপদ হয় না...এই বাঙ্গালী আর্মি একদিন ইংরাজের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ইংরাজের শত্রু হনন করে যে জয়শ্রী লাভ করবে তা বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।" [পঞ্চম অংক, পঞ্চম দৃশ্য, সাধনা।]

● অন্যান্য নাটক

রঘুবীর (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। মিনার্ভা—৭-১১-১৯০৩)

নারীলোলুপ গুজরাট সম্রাট জাফর খাঁকে সম্মুখ যুদ্ধে হত্যা করে রঘুবীর আশ্রিতা পরীবানুকে রক্ষা করলেন।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে দেশবাসীর আপোষহীন লড়াকু মনোভাবকে দীপ্ত করে তোলার ক্ষেত্রে অত্যাচারী জাফরের বিরুদ্ধে রঘুবীরের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনীটি নতুন শক্তি ও প্রেরণার সৃষ্টি করেছে।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ (অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। ক্লাসিক—১৬-১০-১৯০৫)

বঙ্গভঙ্গের ফলে দেশবাসীর শোক প্রকাশের ঘটনা এবং স্বনির্ভরশীলতার জন্য দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধনের প্রায়াজনে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার কাহিনী এই স্বদেশী ভাবমূলক নাটকটিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

নাটকের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাব বর্তমান। ইংরেজ সরকারের কাছে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা আনার জন্য তৎকালীন দেশের নরমপন্থীদের কর্মপ্রচেষ্টাজনিত পটভূমিকার প্রভাবেও নাটকটি প্রভাবিত।ক

ক (১) "মাতৃহীন হলে এক বৎসর কাল অসুজ থাকে। কিন্তু এ কোন্ মার মৃত্যু হয়েছে জান···আমার মা, তোমার মা, সকম বাঙ্গালীর মা। জন্মভূমি মাতৃভূমি বঙ্গমাতার মৃত্যু হয়েছে, এই অশৌচ দ্বাদশ কর্মব্যাপী।"
[তৃতীয় দৃশ্য; বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ।]

(২) "দোহাই সাহেব। লাটসাহেবকে বুঝিয়ে বল। সাহেবের কথা লাটসাহেব শুনেন।···তোমার ইংরেজ জাতির পায়ে ধরি তোমরা আমাদের জন্য এইটুকু উপকার কর যেন তিনি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ না করেন।"
[প্রথম দৃশ্য, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ।]

সূত্র পরিচিতি

১. "His long article—'An examination into the present system of Education in India and a scheme of Reform', offers a masterly Analysis of all the varied problems of Indian education and constitutes a landmark in the history of education reforms in India, It was published in three issues April to June, 1902"—page-4,—Satish Chandra Mukherjee and the Dawn Magazine (1897-1913), H. Mukherjee, 1953, Calcutta.

২. পৃষ্ঠা-১৪১, জাগৃতি ও জাতীয়তা—যোগেশচন্দ্র বাগল, ১৩৬৬, কলিকাতা।

৩. পৃষ্ঠা-৩৩, নিবেদিতা ও জাতীয় আন্দোলন—শংকরীপ্রসাদ বসু, দেশ (মাসিক) পত্রিকা, ১৪-৮-৮২।

৪. Page—790-793, Indian National Congress (Vol-1), P. C. Ghosh, Calcutta.

৫. পৃষ্ঠা-৩১৪, বিনয় সরকারের বৈঠকে। প্রথমভাগ, ১৯৪৪, কলিকাতা।

৬. পৃষ্ঠা-২৩৫—মুক্তির সন্ধানে ভারত—যোগেশচন্দ্র বাগল, ১৩৬৭, কলিকাতা।

৭. "The following National schools were affiliated to the council during the year upto the fifth standard—1. Jalpaiguri, 2. Giridh, 3. Kamargram, 4. Santipur, 5. Jessore, 6. Noakhali, 7. Rajshahi, 8. Syllet, 9. Maldah. These added to the 'National school at Dacca (which is affiliated upto seventh standard) and those of Rangpur, Dinajpur, Comilla, Mymensingh, Kishorgunj, Chandpur, Khulna, Magura and Majpara (Dacca)—(all of which are affiliated upto fifth standard) made the total number of affiliated institution 19th on the 31st December 1908"—Page-3 to 4, Report of the National Council of Education Bengal,—1908.

৮· পৃষ্ঠা-২৪, বাংলা দেশের ইতিহাস—রমেশচন্দ্র মজুমদার (চতুর্থ খণ্ড), ১৯৭৫, কলিকাতা।

৯· পৃষ্ঠা-৮৫,—ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া, প্রতাপচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৪২, কলিকাতা।

১০· "লর্ড কার্জনের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। যীশুর পূর্বে যেমন জনের আবির্ভাব হইয়াছিল বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের পূর্বে তেমনি টইলরাম আসিয়াছিলেন" —পৃষ্ঠা-২৪৯। আত্মজীবনী, কৃষ্ণকুমার মিত্র। ১৯২৭, কলিকাতা।

১১· "আমরা স্বদেশের কল্যাণের জন্য মাতৃভূমির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমরা অতঃপর দেশ-জাত দ্রব্য পাইলে কোনও বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিব না। এই কার্য করিতে যদি কোনও প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় তাহাও আমরা করিতে প্রস্তুত হইব।"—সঞ্জীবনী, ২০শে জুলাই, ১৯০৫।

১২. বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

১৩. "···but this activity in it's turn provoked a hostile response from non-bhadralok—Muslims. Namasudras and Marwaris who had no desire to be involved"—page-31-32- Elite Conflict in a plural society—J. H. Broomfield, 1998, Bombay.

১৪. "জাতীয় আন্দোলনের অরুণযুগ হইতেই মুসলমানদের মনে হইয়াছিল যে সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দুর হস্তে আধিপত্য আসিলে তাহাদের সংস্কৃতি বিপন্ন হইতে পারে। সুতরাং তাহাদের নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষার জন্য হিন্দুর হইতে দূরে থাকিয়া আন্দোলন ও আত্মোন্নতি পরায়ণ হওয়াই বুদ্ধিমানের কর্ম।" পৃষ্ঠা-৬-৭, ভারতের জাতীয় আন্দোলন—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা।

১৫· "···It is resolved that as the Moslems can not derive any benefit from their co-operation with the Hindus, but rather the Moslems society will suffer from a measure, they should by all means keep themselves aloof from any such political movement···It is resolved that the Government of Lord Curzon should be thanked for the noble schme of the partition of Bengal."—Page-8, Indian Daily News, August-22, 1905.

১৬. "On 30th December, 1906, just after the Mohammedan Education Conference at Dacca, a meeting was held to discuss the formation af a 'Political association.'···A resolution for the formation of a political association stylled 'All India Moslem League' was passed"—Page-158, Indian National Congress,—Dr. P. C. Ghosh, 1960, Calcutta.

১৭. "আগামী ৩০শে আশ্বিন বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালীকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষ রূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনটিকে আমরা বাঙালীর রাখীবন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বাঁধিয়া দিব। রাখিবন্ধনের মন্ত্রটি এই 'ভাই ভাই এক ঠাঁই···"। পৃষ্ঠা-৩৪৭, রাখি বন্ধনের উৎসব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্গদর্শন, সপ্তম সংখ্যা, ৫ম বর্ষ।

১৮. পৃষ্ঠা-১৬৭, মহাত্মা অশ্বিনীকুমার—শরৎকুমার রায়, ৪র্থ সংস্করণ, কলিকাতা।

১৯. "I think the people of Bengal ought to be congratulated on being leaders of that March in the van of Progress···and if the people of India will just learn that lesson from the people of Bengal, I think the struggle is not hopeless."—Page-125-126, India's fiight for freedom.—H. Mukherjee and U. Mukherjee, 1st edition, Calcutta.

২০. "অশ্বিনীকুমার ডাক দিলেন—"যজ্ঞা! গান গেয়ে তোকে জাগাতে হবে এই ঘুমন্ত দেশকে। তোর কাজ হবে চারণের কাজ'। যজ্ঞা কৃতার্থ হোল অশ্বিনীকুমারের আলীঙ্গনে।" পৃষ্ঠা-৫৬,—স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল, হীরালাল দাশগুপ্ত, ১৯৭২, কলিকাতা।

২১. পৃষ্ঠা-৩০৯, বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা, বিপিনচন্দ্র পাল, বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) কার্তিক, সপ্তম সংখ্যা, ৫ম বর্ষ।

২২. "সাঁতার খেলা, লাঠি খেলা, ঘোড়ায় চড়া, মুষ্ঠি-যুদ্ধ করা, সাইকেল চড়া প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। এই সঙ্গে বিশ্বস্ত ছেলেদের কাছে গ্যারিবল্ডী ম্যাট্সনীর জীবনী এবং অন্যান্য বৈপ্লবিক আন্দোলন কি করিয়া পরিচালিত হইয়াছিল তাহার বিষয়ে বক্তৃতা হইত···"পৃষ্ঠা-১৯১, ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা।

২৩. "পি. মিত্র বলেন—বিলাতি লবন বা চিনির পিকেটিং করে কি হবে ? তা দিয়ে স্বাধীনতা হবে ? রাষ্ট্রবিপ্লব হবে ? লাঠিখেলা, বন্দুক, তরোয়াল চালনা শেখ, কুচকাওয়াজ শেখ, সমিতি গঠন কর। শুনে মনটা উত্তেজিত হয়ে উঠল"—পৃষ্ঠা-১০—অগ্নিযুগের কথা—সতীশ পাকড়াশী, ১৩৭৮, কলিকাতা।

২৪. বন্দেমাতরম পত্রিকা, ১০ই মে, ১৯০৭ (National volunteer প্রবন্ধ)।

২৫. "As kali drove out the Demons so should the Bhadralok strengthened by the worship of kali, drive out the British."—Page-30, Elite conflict in a Plural Society,—J. H. Broomfield, 1968, Bombay.

২৬. "ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয়গাথা।
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা ॥
সাজে নয়ন কি হীন বিলাসে শত্রু বিমুগ্ধ যখন পুরপল্লী।
ইংরাজ চরণ বিচিহ্নিত বক্ষে সাজে প্রেয়সীর ভুজবল্লী"
[রণনীতি—বন্দেমাতরম পত্রিকা, ২-৯-১৯০৭]

২৭. "সাজ্ সবে সাজ্ পর আভরণ
বরণের ডালা তুলে নে করে—
মঙ্গল প্রদীপ লয়ে হাতে আন্
মুক্তির আহ্বান করিয়া ঘরে"
['বিপিনের কারামুক্তি', সন্ধ্যা পত্রিকা, ১লা চৈত্র, ১৩১৪]

২৮. "The expression of our desire for autonomy absolutely free from British control. If we may not oppose physical force by physical force, we may yet make the administration in India absolutely impossible any day…our idea is freedom which means absence of all foreign control.…"—Page-638, Memories of my lifc and time—Bipinchandra Pal, 1973, Calcutta.

২৯. "বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতীয় সৈন্যদলের প্রতি বৎসর ১৫,000 নূতন সৈন্য ভর্তি করা হইত। ১৯১৬-১৭ সনে ইহার সংখ্যা হয় ১,২১,000 এবং পরবর্তী বৎসরে ৩,00,000 অর্থাৎ তিন লক্ষ"—পৃষ্ঠা-১৬৩-১৬৪, বাংলাদেশের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড)—রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৯৭৫, কলিকাতা।

৩০. "Linsed from 2,100 Bushels in 1833 to 237,000 in 1834. Even more significant was the rising export of food grains from starving India. It rose from £858000 in 1849 to £3·8 million by 1854, £7.9 million by 1877, £9.3 million by 1901." Page-50,—India Today and Tomorrow, R. P. Dutta—Delhi, 1955.

৩১. "The import of Indian goods to Europe was repressed by prohibitive duties, the export of British goods to India was encouraged by almost nominal duties. The British manufacturers in the words of the Historian Horace Hayman Wilson —employed the arm of political injustice to keepdown and ultimately strugle with whom he could not have contended an equal terms."—Page-VII-VIII, The Economic history of India in the Victorian. Age,—Ramesh Chandra Dutta, fifth edition, London.

৩২. "First product of this plunder of 'Communal and Private Property' of this ryots : whole series of local risings of the ryots against the "land-lords" (conferred on them) involving : in some cases, expulsion of the Zemindars and stepping of the East India Company into their place as owner ; in other cases, improverishment of the Zemindars and compulsory or voluntary sale of their estates of pay tax arrears and private debts. Hence greater part of the province's land holdings fell rapidly into the hands of a few city capitalists who had spare capital and readily invested it in land,"—Page-120,—Notes on Indian History (664-1858)—Karl Marx, Moscow.

৩৩. Indians artisans were torn from their trades and sent into the fields to raise the products required by the machines and machine tending population of Great Britain."—Page-109. The problem of India,—R. S. Shelvankar, 1940, Great Britain.

৩৪. "টাকার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ফলে স্বভাবতই অর্থোপার্জনের আগ্রহ ও ধান্দা বেড়েছে এবং সেইটাই মানুষের কাছে মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে"—পৃষ্ঠা-৫৪, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (দ্বিতীয় খণ্ড)—বিনয় ঘোষ, ১৯৬৩, কলিকাতা।

৩৫. "ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিবার প্রথার মূলে রয়েছে তিনটি প্রভাব। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, নগরমুখী মনোভাব, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা"—পৃষ্ঠা-১৫৫,—সাহিত্য ও সমাজ মানস, নারায়ণ চৌধুরী, ১৩৬৯, কলিকাতা।

৩৬. "বর্তমানকালে ভারতবর্ষে ৭ হইতে ৮ কোটি অচ্ছুত বা অস্পৃশ্য হিন্দুজাতি বিদ্যমান আছে যাহাদিগের নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং ইহাদিগের সহিত আমরা অত্যন্ত পাপাচার ও গর্হিত ব্যবহার করিয়া থাকি। যদিচ ইহারাই হিন্দুজাতির একমাত্র রক্ষক ও স্তম্ভ-স্বরূপ"—পৃষ্ঠা-৮,—সতর্কীকরণ ও হিন্দু সংগঠনের আবশ্যকতা, সদানন্দ স্বামী, ১৩২, কলিকাতা।

৩৭. "আনুষ্ঠানিক ধর্ম-কর্ম যখন এক সম্প্রদায়কে আরেক সম্প্রদায় হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে এবং জ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্ব যখন অধিকাংশ জনসমাজের কাছে দুরধিগম্য বলিয়া বোধ হইয়াছে তখন সম্প্রদায় নির্বিশেষে যাহা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হইয়া ওঠে তাহা হইল প্রেম-ভক্তির সহজ সাধনা"—পৃষ্ঠা-৪৪৯,—ভারতীয় ভক্তি সাহিত্য, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, ১৯৬৪, কলিকাতা।

৩৮. পৃষ্ঠা-৪০,—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, স্বামী বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ রচনাবলী, সম্পাদনা—গোপাল হালদার, ১৯৭৭, কলিকাতা।

৩৯. "দেশে ধর্মভাব যতদিন পুনরুজ্জীবিত না হয়, সত্যের পুনরুদ্ধার না হয়, বিশ্বাস পুনরুজ্জীবিত না হয় এবং উৎসাহ প্রত্যানীত না হয় ততদিন দেশহিতকর কোন কার্যের অনুষ্ঠান কিছুতেই সুফলপ্রদ হইবে না…ধর্মে আস্থাই মনুষ্যত্বের মূলমন্ত্র"—পৃষ্ঠা-৯, আমাদের কর্তব্য'—স্বদেশী, কার্তিক, ১৩১২।

৪০. "এই আবেগেই জাতি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে অত আবেগে আঁকড়ে ধরেছিল…এই আবেগেই পণ্ডিতরা শাস্ত্র মন্থন করে দার্শনিক মাহাত্ম্য প্রচারে নিযুক্ত হয়েছিলেন।…শিল্পীরা অনীত কীর্তি কথা প্রচার করে জাতিকে জাগানোর চেষ্টা করেছিলেন"—পৃষ্ঠা-১১৬,—নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার (প্রথম খণ্ড), সাধনকুমার ভট্টাচার্য, ১৩৮০, কলিকাতা।

৪১. (ক) "জয়দেব নাটকে বৈষ্ণবধর্মের মাহাত্ম্য সুন্দর ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম"—বসুমতী, ১২ই আশ্বিন, ১৩১৯।

(খ) "It is after an age that they have revived a class of play that seemed to be extinct in Bengal although no one can dispute the fact that they were congenial to the soil.··· The time has come when our men of genious should come forward to lend their powerful pen in the cause of religion by asserting the current that is drifting us all to a godless atmosphere···"—The Telegraph,—28-9-1912.

৪২. পৃষ্ঠা-১২,—গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য,—কুমুদবন্ধু সেন, কলিকাতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

● নাট্যবৃত্তের স্বরূপ।

সাহিত্য শিল্পের একটি যৌগিক অবয়ব হিসাবে নাট্যশিল্পের একটি বিশিষ্ট রূপ ও ধর্ম বিদ্যমান। এই রূপ ও ধর্মের অনন্যতায় নাট্যসাহিত্য একাধারে দৃশ্যধর্মী ও শ্রব্যধর্মী। সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গসমূহ কাব্য-গল্প-উপন্যাস যখন রসের স্ফুরণের জন্য কেবলমাত্র শ্রব্যতার উপর নির্ভরশীল, তখন একাধারে শ্রব্যময়তা ও দৃশ্যময়তার সুষ্ঠু ঐকতানের মধ্য দিয়েই নাট্য-রসিকেরা নাট্য-রসের আস্বাদ গ্রহণ করেন। নাট্যকারের জীবন দর্শন, জগত ও জীবন সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী, মনোবাসনা, কেবলমাত্র সুষ্ঠু নাট্য উপস্থাপনার মাধ্যমেই উপলব্ধি করা যায়। লোকবৃত্তানুসারী নাটকের মাধ্যমে জীবনকে দর্শনীয় করে তোলা হয় এবং এর দ্বারা মানুষ নতুন জীবনবোধে উদ্দীপ্ত হয়। পার্থিব জগতের শোক-বেদনা তাড়িত জীবনের দুঃখ পীড়ার ভারমুক্ত হবার জন্য মানুষ নাটক দেখে। ভারমুক্ত হয়ে মানুষ আনন্দ লাভ করে থাকে।[১] নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরত এই দৃশ্য রূপকেই 'লোকবৃত্তানুকরণম্'[২] রূপে বর্ণনা করেছেন। প্রতীচ্যের দার্শনিক এরিস্টটলও নাটককে জীবনের অনুকরণাত্মক রচনা বলে ব্যাখ্যা করেছেন।[৩] এই অনুকরণ বলতে জীবনের হুবহু অনুকরণকে বোঝায় না, জীবনের ভাবানুকরণকে বোঝায়।[৪] এতে বাস্তব জীবনের মায়ার (Illusion) সৃষ্টি করা হয়। জীবন এখানে ঠিক বাস্তব নয়, বাস্তবের মত (As if real)। রসভাব ও ক্রিয়াযুক্ত নাটকের গঠন-ভঙ্গীমার বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। নাটকের সার্বিক সফলতা নাট্যগঠন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিকের সুষ্ঠু সমন্বয়ের উপর নির্ভরশীল। নিম্নে এই গঠন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

● সিদ্ধান্তবাক্য (Premise)।

বীজ থেকে যেমন ফলের উৎপত্তি হয়, তেমনি নাটকের ভবিষ্যৎ বিষয়বস্তু, ঘটনা, চরিত্র এবং ক্রিয়া প্রাথমিক অবস্থায় একটি বীজের মধ্যে সুপ্তভাবে থাকে। এই বীজরূপ আধারই হচ্ছে নাটকের সিদ্ধান্তবাক্য (Premise)। বিভিন্ন নাট্যবিদ্‌গণ এই সিদ্ধান্তবাক্যকে বিভিন্ন রূপে রূপায়িত করেছেন। J. H. Lawson-এর মতানুসারে নাটকের সিদ্ধান্তবাক্য হচ্ছে নাটকের মূলগত ভাব (Root idea)।[৫] চরিত্রের কর্মাবলী তথা নাট্য ঘটনার মধ্য দিয়ে এই মূল ভাবটি প্রতিষ্ঠিত হয়। William Archer-এর দৃষ্টিভঙ্গীতে সিদ্ধান্ত-বাক্য হচ্ছে

নাটকের মূলগত বিষয়বস্তু, নাটকের নির্যাস বা নাটকের মূল কথা বিশেষ।[৬] একেই নাটকের কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিস্তৃত করা হয়। J. L. Styan-এর মতে সিদ্ধান্তবাক্য হচ্ছে নাটকের বিষয়ের প্রকৃত সংহততম প্রকাশ। এইটিই নাটকে কার্যকারণ যোগে সংযুক্ত ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে বিশেষ রূপ লাভ করে।[৭] Lajos Egri বলেন যে নাটকের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সিদ্ধান্তবাক্য প্রমাণ করা। সিদ্ধান্তবাক্যটি যেন সমগ্র নাটকের সংক্ষিপ্তসার। এটি একটি নখাগ্র পরিমান জায়গায় উপস্থাপিত করার মত ক্ষুদ্রকায়।[৮]

যে নামেই সিদ্ধান্তবাক্যকে বিশেষায়িত করা হোক না কেন নাট্যরচনা কালে সর্বপ্রথম নাটকের সিদ্ধান্তবাক্য স্থির করা প্রয়োজন। প্রতিটি সুসংগঠিত নাটকে একটি সুপরিকল্পিত মূল সিদ্ধান্তবাক্য থাকে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে নাটকের বিভিন্ন উপকাহিনীরও এক একটি সিদ্ধান্তবাক্য থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে মূল কাহিনীর সিদ্ধান্তবাক্যই (Premise) মুখ্য সিদ্ধান্তবাক্য রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই সিদ্ধান্তবাক্য গঠন থেকে নাট্য-গঠনতন্ত্রের প্রথম পর্যায়ের সূত্রপাত। সমগ্র নাটকের কেন্দ্রায়িত শক্তি হিসাবে সিদ্ধান্তবাক্যের দৃশ্যায়িত হবার যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়।[৯] সিদ্ধান্তবাক্যের অন্তর্নিহীত শক্তি থেকেই যুক্তিপূর্ণভাবে নাটকের কাহিনী গড়ে ওঠে, নাট্যক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং চরিত্রের মানসিক ও পারস্পরিক সম্পর্কগত অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে নাটককে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং এইভাবে সামগ্রিক দৃষ্টিতে সমগ্র নাট্য-বিন্যাসের মধ্যে সিদ্ধান্তবাক্য একাত্মতা লাভ করে। অর্থাৎ সিদ্ধান্তবাক্যের মধ্যেই ঘটনার 'আদি-মধ্য-অন্ত'র ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সিদ্ধান্তবাক্যকে বিশ্লেষণ করলে মূল নাট্যক্রিয়ার তিনটি পর্যায় লাভ করা যায়। প্রথমত ক্রিয়ার অবস্থা বা শর্ত (Condition of Action), দ্বিতীয়ত ক্রিয়ার কারণ (Cause of Action), তৃতীয়ত ক্রিয়ার ফল বা পরিণতি (Result of Action)। উদাহরণ-স্বরূপ নিম্নোক্ত নাটকের সিদ্ধান্তবাক্যগুলি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

কিংলিয়ার (King Lear—W. Shakespeare) ঃ—

সিদ্ধান্ত বাক্য—অন্ধবিশ্বাস সর্বনাশের কারণ

ক্রিয়ার অবস্থা—বিশ্বাস
ক্রিয়ার কারণ—অন্ধত্ব
ক্রিয়ার পরিণতি—সর্বনাশ ॥

গোষ্ট (Ghost—H. Ibsen) ঃ—

সিদ্ধান্তবাক্য—পিতার পাপকর্মের প্রতিক্রিয়া সন্তানদের উপর বর্তায়।

ক্রিয়ার অবস্থা—সন্তান
ক্রিয়ার কারণ—পিতার পাপ
ক্রিয়ার ফলাফল—প্রতিক্রিয়া বর্তায় ॥

এই তিনটি পর্যায়ের প্রথমটির থেকে নাটকের চরিত্র, দ্বিতীয় পর্যায় থেকে নাটকের দ্বন্দ্ব-ঘন কাহিনী এবং তৃতীয় পর্যায় থেকে নাটকের পরিণতির উন্মেষ হয়ে থাকে। এদিকে লক্ষ্য রেখেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশ্বস্ততার সঙ্গে নাট্যকাহিনীর মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্তবাক্যকে কার্যকর করে তুলতে হয়। সেক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত বাক্যের তিনটি অংশের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা প্রয়োজন। এটাই নাট্য-নীতি। সুচিন্তিত, সুবিন্যস্ত ও যুক্তিনিষ্ঠ সিদ্ধান্তবাক্যের অভাবে নাটক ভারসাম্যহীন ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। সুতরাং নাট্য গঠনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তবাক্য একটি শাশ্বত ও অপরিহার্য উপাদান। সিদ্ধান্তবাক্যের অর্থবহতায় শাশ্বত জীবনবোধের পরিচয় থাকা দরকার। জীবনধর্মের মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে এর অর্থবহতা শুধুমাত্র একক মানুষের বা বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত মানুষের অভিজ্ঞতার দ্যোতক না হয়ে মানবজাতির চিরন্তন শাশ্বতবোধের প্রতিনিধিত্ব করতে পারলে নাটকের গভীরতা অতলান্তিক হয়ে ওঠে। নাটকের আবেদন সার্বিক ও সার্বজনীন রূপ লাভ করে। তখন একটি মানুষের সবলতা-দুর্বলতা, কঠোরতা-কোমলতা, পবিত্রতা-মলিনতা,—শুধুমাত্র বিশেষ মানুষের কথা স্মরণে আনে না। সেই মানুষ একটি মানব সমাজের তথা ক্ষুদ্রানুরূপে সমগ্র বিশ্ব পরিমণ্ডলের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। নাট্যশিল্পের চরম উৎকর্ষ এই বিশ্বমুখীনতার উপরই নির্ভরশীল।[১০]

● **নাট্যবৃত্ত** (Plot)।

নাটকের দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে নাট্যবৃত্ত। সিদ্ধান্তবাক্য গঠিত হবার পর সেই সিদ্ধান্তবাক্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন হয় গল্প রচনার। বৃত্তের মাধ্যমে সেই গল্প গড়ে ওঠে। এই বৃত্তের মধ্যে লোকজীবনের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা মণ্ডিত গতিশীল ঘটনা বাণীরূপ লাভ করে। সুগঠিত বাণীরূপ-ই পরে রস-রূপে নাটকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং ঘটনার দ্বারা সিদ্ধান্তবাক্যকে প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে নাটকে গল্প রচনা করার প্রক্রিয়াকে নাট্যবৃত্ত বলা হয়।

জীবনের সকল ঘটনার সমন্বয়ে নাট্যবৃত্ত রচনা করা যায় না। জীবনের অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত সাময়িক ঘটনার আড়ম্বরকে পরিত্যাগ করে স্থায়ী, আবশ্যিক, গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় ঘটনার নির্বাচনের দ্বারা নাটকের মূল উদ্দেশ্য সম্পাদন করতে হয়। এক্ষেত্রে নাট্যশিল্প নির্বাচিত ঘটনার সাযুজ্য রক্ষার ভূমিকা গ্রহণ করে।[১১] কারণ নির্বাচনের বিচক্ষণতা এবং অনুসন্ধিৎসু মনবীক্ষণের উপর নাট্য-ব্যক্তিত্বের গভীরতা নির্ভরশীল। সুষ্ঠুবৃত্ত গঠনের মাধ্যমে নাট্যকারের অভিপ্রায়, নাটকের উদ্দেশ্য ও নাট্য-সত্তা দৃশ্যায়িত হবার যোগ্যতা লাভ করে। বৃত্ত নাটকের সারাংশ ('essence) নয়, নাটকের লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য আবর্তনশীল ঘটনার সমন্বয়।[১২] যার মাধ্যমে জীবনধর্মের একটি বিশেষ দিকের প্রতি আলোকপাত করে তাকে শিল্পসমৃদ্ধ রসরূপ দান করা হয়।

ঘটনাবহুল জীবন থেকে এই ধরণের নির্দিষ্ট ঘটনাগুলোকে নিধারিত করে নাট্যবৃত্ত রচনা করা প্রয়োজন। নাট্য ঘটনা স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিকভাবে সংঘটিত হয়ে বিশিষ্ট জীবনবোধকে সার্বিকভাবে অর্থবহ ও বিশেষায়িত করে তুলবে এবং নাট্যকারের বৈশিষ্ট্যময় অভিজ্ঞতার কল্পনাপ্রবণ প্রকাশকে শিল্পসত্য রূপ দান করে নাটকের অভিপ্রেত পরিণতিরেখা চিহ্নিত করবে। সুতরাং নাট্যবৃত্ত হচ্ছে নাট্য-গঠন রীতির সাধন-পীঠ। নাট্য-দার্শনিক বুচারের ভাষায় বলা যায়—

"A play is a kind of living organism. Its animating principle is the plot. As in the animal and vgetable world the soul or principle of life is the primary and moving froce, from which the development of the organism proceeds—so it is with the plot."[১৩]

● বৃত্তের প্রকারভেদ

সংস্কৃত নাট্য শাস্ত্রে নাট্যকাহিনীর গুরুত্ব অনুসারে নাট্যবৃত্তকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। আধিকারিক ও প্রাসঙ্গিক।[১৪] মূল কাহিনী অর্থাৎ ফল লাভের জন্য যে কাহিনী পরিকল্পিত হয় তাকে আধিকারিক এবং আধিকারিক ইতিবৃত্তের সমৃদ্ধির জন্য যে ভিন্ন প্রসঙ্গ বা ইতিবৃত্তের উপস্থাপনা করা হয় তাকে প্রাসঙ্গিক কাহিনী বলা হয়।

সাধারণত নাট্যারম্ভের প্রথমেই প্রত্যক্ষভাবে আধিকারিক কাহিনীর উত্থাপন করা হয় ('শকুন্তলা-নাটক')। কিন্তু নাটকের গঠন বৈচিত্র্য অনুসারে প্রথমে অন্য বিষয়ের অবতারনা করে মূল বিষয়বস্তুকে রসযুক্ত করার নিমিত্ত পূর্ব ও পরবর্তী ঘটনার সংযোগ এবং ঘটনা পরম্পরার কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য, পরে আধিকারিক বস্তুর উপস্থাপনা করা হয়। আধিকারিক বস্তুর বিন্যাসের এই প্রক্রিয়া 'সূচ্য-ভাব' নামে পরিচিত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে "রত্নাবলী" নাটকের প্রথম অংক-এর সূচনার পূর্বেই যৌগন্ধরায়ণের স্বগতোক্তির মাধ্যমে সূচ্যভাবে নাটকের আধিকারিক বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে।

পাশ্চাত্ত্য নাট্যসাহিত্যে ইতিবৃত্তের বিভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয়। মূলত ইতিবৃত্তের দুটি রূপ বর্তমান। সরল ইতিবৃত্ত এবং জটিল ইতিবৃত্ত। সরল ইতিবৃত্ত এককভাবে ধারাবাহিক অবস্থায় নাটকের পরিণতি রচনা করে। জটিল ইতিবৃত্ত নাট্য-পরিণতির দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় আরও বিভিন্ন ছোট ছোট বৃত্তের সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকে। এতে অবস্থার বিপর্যয়ে ভাগ্যের পরিবর্তন এবং অজ্ঞাত ঘটনার আবিষ্কার করা হয়।[১৫] সরল ইতিবৃত্তে কাহিনী একক ক্রিয়ার দ্বারা একমুখীগতি লাভ করে। জটিল ইতিবৃত্তে মূল নাট্যক্রিয়া বহুক্রিয়ার সমন্বয়ে স্বীয় লক্ষ্যাভিমুখী হয়। এই জটিল ইতিবৃত্তের মধ্যে মূলকাহিনীর

সহিত সাযুজ্য রক্ষাকারী সহায়ক কাহিনী, উপকাহিনী নামে স্বীকৃত।[১৬] এই উপকাহিনীরও পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। জটিল ইতিবৃত্তে চরিত্রের ক্রিয়াশক্তি ও তার প্রতিক্রিয়াশক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে নাটক দ্বন্দ্বময় হয়ে ওঠে। জটিল ইতিবৃত্তে ঘটনার মধ্যে জটিলতার ধারাবাহিকতা (Continuity) থাকে। আবার কখনো কখনো ঘটনার জটিলতা তাৎক্ষণিক হয়ে ওঠে মাত্র। এই দুই রীতি নাটকে দেখা যায়। নাটকের কোন বিশেষ অংশের উন্নতি বা সমৃদ্ধি সাধনের জন্য তাৎক্ষণিক জটিলতা সময় বিশেষে কার্যকরী হয়। ধারাবাহিক জটিলতা নাটকের সামগ্রীক ক্রমোন্নতি ও গভীরতা আনয়ন করে। অনেক সময় মূল কাহিনীর পাশাপাশি নাটকে একাধিক ছোট ছোট কাহিনী গড়ে ওঠে। তাদের নিজস্ব মেরুবৃত্তে অবস্থানকালীন মূলকাহিনীর সহিত ভাবগত আনুগত্য ও বৈপরীত্য সৃষ্টির দ্বারা নাটকে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করাও হয়। এ সকল কাহিনীকে উপকাহিনী বলা হয়।[১৭] মূল কাহিনীর সমান্তরাল কাহিনীও কখনো কখনো নাটকে উপস্থাপিত করা হয়। নাটকে উপকাহিনী এবং সমান্তরাল কাহিনীর সংখ্যা দুই-এর অধিক হলে নাটক বহু-কাহিনী-বৃত্তের (Multiple Plots) রূপ ধারণ করে থাকে। মূল কাহিনীর সমৃদ্ধির জন্যই নাটকে উপকাহিনী ও সমান্তরাল কাহিনীর সংযোজন প্রয়োজন। এর ব্যতিক্রম হলে নিছক ঘটনার আরোপ নাটককে ভারবাহী ও গতিশীল করে তোলে। কার্য-কারণ সম্পর্ক রচনা করেই মূল কাহিনীর সঙ্গে সকল প্রকার উপকাহিনীর যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এই গঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপকাহিনী মূল কাহিনীকে সমৃদ্ধ করে, নাট্যবস্তুর বিভিন্ন অনালোকিত-দিকের প্রতি আলোকপাত করে এবং নাটকের পরিণতিকে আকর্ষণীয় ও রসসমৃদ্ধ করে তোলে।[১৮]

নাটকের মূলকাহিনীর সমৃদ্ধির জন্যই সংশ্লিষ্ট নাটকের উপকাহিনী যুক্তি-যুক্তভাবে উপস্থাপিত না হলে নাট্যঘটনা অকারণে ছড়িয়ে পড়ে নাটকের সংহতি বিনষ্ট করে। নাট্য রচনার ক্ষেত্রে এটা একেবারে বাঞ্ছিত নয়। উপকাহিনীর আকাঙ্খিত সুষ্ঠু ভূমিকা প্রসঙ্গে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অভিমত স্মরণ করা যেতে পারে।

"নাটকের গতি নদীর স্রোতের মত। অন্যান্য উপনদী তাহার উপর আসিয়া পড়িয়া তাহাকে পরিস্ফুট করিতেছে।"[১৯]

এটাও মনে রাখা দরকার যে নাটকের মূল বিষয়বস্তু ও নাটকের বৃত্ত এতই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত যে এদের একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করা যায় না।[২০] এই দুয়ের পারস্পরিক সুষ্ঠু বিন্যাসের উপর নাট্য রচনার সার্থকতা বহুলাংশে নির্ভরশীল।

নাট্যবৃত্তের প্রকৃতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রতীচ্যের দার্শনিক এরিস্টটল বৃত্তকে স্থান-

কাল ও ঘটনা ঐক্য সমন্বিত রূপে (unity of place, time and action) ব্যাখ্যা করেছেন। বৃত্তের মধ্যে এই ঐক্যত্রয় বৃত্তের আকৃতি ও প্রকৃতির সীমা নির্ধারণ করে। কাহিনীর শিল্প সৌন্দর্য কাহিনীর আয়তন ও সামঞ্জস্যের উপর নির্ভরশীল (on magnitude and order—)। এই উদ্দেশ্যে আবশ্যিকভাবে কাহিনী আদি-মধ্য-অন্ত যুক্ত হবে। কাহিনীর আদি পর্যায় পরবর্তী কার্যসমূহের জনক এবং অন্ত পর্যায় পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহের কার্যকারণ সম্ভূত স্বাভাবিক পরিণতি।[২১] নাট্যকাহিনীর সঞ্চারিত হবার যোগ্যতা থাকা চাই। নাটকের গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাট্যভাব সম্যকভাবে উপলব্ধি করার জন্য কাহিনীর সুবোধ্যতা অপরিহার্য গুণবিশেষ। সার্থক নাটকে কোন ঘটনাকেই মূল নাট্য কাঠামো থেকে পৃথক করা যায় না। পৃথক করলে সকল নাটকের অঙ্গহানী হয়। পক্ষান্তরে সকল ঘটনা তাদের সমন্বয়পূর্ণ সামগ্রিক অবস্থানের দ্বারা নাট্যবস্তুকে ফলযুক্ত করে তোলে।[২২] নাটকের মধ্যে দুটি শক্তির বিপরীত ধর্মী ক্রিয়া যুগপৎ কার্যকরী হয়। এক শক্তির বলে নাট্যকাহিনী ক্রম-গতিশীল হয়ে বিস্তার লাভ করে, অপর শক্তি সেই গতি ও বিস্তারকে সংহত করে তুলে তাকে কেন্দ্রায়িত করে। নাটকের ঐক্য বলতে আমরা সেই শক্তিকে বুঝি যে শক্তির দ্বারা নাটকের সিদ্ধান্তবাক্য (Premise), বৃত্ত (Plo:) এবং ক্রিয়া (Action) একতাবদ্ধ হয়ে নাটকে সামগ্রিকতা (Organic whole) দান করে।

নাট্যক্রিয়ার কার্য ও কারণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে নাট্যকাহিনীকে বিশ্বাস-যোগ্য করে তুলতে হয়। এর ফলেই নাটকে ঘটনার বিকাশ যুক্তিমনস্ক ও গ্রহণ-যোগ্য হয়ে ওঠে এবং কার্যকারণ সম্ভূত ঘটনাধারার পরিণতি স্বাভাবিকতা লাভ করে। এ বিষয়ে John Van Druten-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

"It needs a kind of mathamatical instinct, power to tie pieces together···so that they lead logically (and unexpectedly) from one to another and then turn the whole thing into a neat package for the ending."[২৩]

নাট্য ঘটনায় নাটকীয়ত্ব সৃষ্টির জন্য কাহিনী গ্রন্থনায় উৎকণ্ঠা (Suspense) এবং ঔৎসুক্য (Inquisitivenss) থাকা প্রয়োজন।

নাটকে দু'রকম উৎকণ্ঠা (suspense) থাকে। একটি দীর্ঘায়িত উৎকণ্ঠা. অন্যটি স্বল্পকালীন উৎকণ্ঠা। নাটকের প্রারম্ভ থেকে পরিণতি পর্যন্ত দীর্ঘায়িত মূল উৎকণ্ঠার কাঠামোর মধ্যেই কিছু কিছু স্বল্পকালীন উৎকণ্ঠার উদ্ভব ঘটে। এই দু'রকম উৎকণ্ঠাই নাটকের উৎকণ্ঠা পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করে।

নাটকে ঘটনার কৃতিত্বময় (Credible) বিন্যাসের দ্বারা এবং নাটকের সিদ্ধান্তবাক্যের সফলতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা ও অনিশ্চয়তার দোলাচল বৃদ্ধির দ্বারা দর্শক মনে

উৎকণ্ঠার সৃষ্টি এবং পরবর্তী নাট্য ঘটনা সম্পর্কে ঔৎসুক্যের পরিমণ্ডল রচনা করা দরকার। চরিত্রের গভীর মানসিক উদ্বেগ, সংকটজনক অবস্থা এবং ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে আবর্ত-সংকুল ভাবাবেগ নাটকে একপ্রকার উত্তেজনার (Tension) সৃষ্টি করে। উত্তেজনার সৃষ্টি, উৎকণ্ঠাপূর্ণ অনিশ্চয়তার উদ্ভব ও তার প্রতিপালন এবং উত্তেজক অবস্থার সমাধান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নাটক উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এর অভাবে নাটকের নাটকীয়ত্বের গভীরতা হ্রাস পায় এবং দর্শকের মনে নাট্যাকর্ষণ সৃষ্টি ব্যাহত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রে উল্লিখিত বৃত্তের উপাদানসমূহের কথা উল্লেখযোগ্য। বৃত্তের উপাদান হিসাবে পাঁচটি অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বীজ, বিন্দু, পতাকা, প্রকরী, কার্য।[২৪] যেখান থেকে নাটকীয় ঘটনার উদ্ভব হয়, নাটকের সেই স্তরকে বীজ বলা হয় (রত্নাবলী নাটকের দৈব অনুগ্রহ পুষ্ট যৌগন্ধরায়ণ আখ্যান)। নাটকের মধ্যে বাধা উপস্থিত হলে মূলভাবের বিচ্ছেদ ঘটে। যে ঘটনার দ্বারা বাধা দূর করে সেই মূলভাবটির সূত্র ধরিয়ে দেওয়া হয় তাকে নাটকের বিন্দু বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ 'শকুন্তলা' নাটকের দ্বিতীয় অংকে অনুষ্ঠিত মৃগয়াবন্ধের আদেশদানের পর দুষ্মন্ত কর্তৃক শকুন্তলা প্রসঙ্গের উত্থাপন এই নাটকের বিন্দুস্বরূপ।[২৫] যে কাহিনী ধারাবাহিক, আনুষঙ্গিক ও পৃথক হয়েও প্রধান ঘটনার পরিপোষক, সেই কাহিনী পতাকা নামে পরিচিত।[২৬] এই কাহিনীর নায়কের পরিণতি গর্ভসন্ধি বা বিমর্ষসন্ধিতে শেষ হয়। 'রামচরিতের' সুগ্রীবাদির কাহিনী, শকুন্তলা নাটকে মাধব্যের কাহিনী এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নাটকের প্রয়োজনে নাটকের স্থানে স্থানে একক কাহিনীর (Single incident) বিন্যাসকে নাটকের প্রকরী বলা হয়। দশরূপকের ব্যাখ্যাকার ধনঞ্জয়ের ভাষায় "Sambandham Patoka Khyam Prakarica Pradesabhak"[২৭]-শকুন্তলা নাটকের মাতলি কর্তৃক মাধব্যের ঘাড় মটকানোর বিশেষ ঘটনাটি (ষষ্ঠ অংকের) ঐ নাটকের প্রকরী।

● **নাট্যক্রিয়া** (Action)।

বৃত্তের মাধ্যমে নাটকের বিষয়বস্তু গল্পরূপলাভ করলেও নাটক সম্পূর্ণতা লাভ করে না। নাটকের অন্তর্নিহিত অর্থ কিছু করা (to do something—)। সেজন্য নাটকের গল্পকে ক্রিয়ার মাধ্যমে দৃশ্যায়িত করা প্রয়োজন। সুরের সঙ্গে সঙ্গীতের যে সম্পর্ক, রং তুলির সঙ্গে চিত্রাঙ্কনের যে সম্পর্ক নাটকের সঙ্গে নাট্যক্রিয়ার সেই সম্পর্ক বিদ্যমান। কথা নয়, ক্রিয়াই নাটকের মূল। নাটকের ভাব-ভাবনাকে ক্রিয়ার দ্বারা বিন্যস্ত করতে হয়। ক্রিয়া নাটকের আবশ্যকীয় উপাদান। নাট্যক্রিয়া বলতে নিছক কিছু করাকেই (Activity / Deed) বোঝায় না। ক্রিয়া নাট্যকীয়ত্ব তখনই লাভ করে যখন ক্রিয়া কার্যকারণ সমন্বিত আদি-মধ্য-অন্ত যুক্ত হয়ে দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে

নাটকের গল্পকে গড়ে তোলে, চরিত্রের বিকাশ সাধন করে এবং নাট্যকারের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। ক্রিয়ার মাধ্যমে নাটকের অতীত এবং পূর্বোক্ত ঘটনাকে বর্তমানের পাদপীঠে এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয় যার দ্বারা নাট্য ঘটনা নূতন নূতন সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা সমস্ত নাটকের চরিত্র ও পরিবেশকে ক্রমশঃ পরিণত করে তোলে। অর্থাৎ নাট্যক্রিয়া হচ্ছে নাট্যগল্পের যুক্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিযুক্ত ক্রম পরিণতি দানের ধারক ও বাহক। জাগতিক-মণ্ডলের একটি বিশিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী মানবজীবনের চাওয়া-পাওয়া, আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার ঘাত-প্রতিঘাত লব্ধ যে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা তা নাট্যক্রিয়ার মাধ্যমেই দৃশ্যময় হয়ে ওঠে। নাট্য-ক্রিয়ার দ্বারাই নাটক শুরু হয়। এই ক্রিয়ার পরিণতিতেই সমস্ত নাটক পরিণতরূপ লাভ করে এবং নাট্যকারের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রিয়ার সাহায্যে নাটকের চরিত্রের বাসনা কর্মে রূপায়িত হয়।[২৮] ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঘাতপ্রতিঘাতে চরিত্র এবং ঘটনার মধ্যে নূতন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করে, চরিত্র নূতন জীবনবোধে উদ্দীপ্ত হয়। সুতরাং নাট্যক্রিয়া প্রতিক্রিয়া রূপে বাসনা, কর্ম প্রচেষ্টা এবং আবেগের সৃষ্টি করে থাকে। এর মধ্যেই ক্রিয়ার নাটকীয়ত্ব বিদ্যমান। ক্রিয়ার নাটকীয়ত্ব গভীরভাবে নির্ভর করে ক্রিয়ার ঐক্যের উপর। সিদ্ধান্ত বাক্য অনুযায়ী মূল একক ক্রিয়া আদি মধ্য-অন্ত যুক্ত হয়ে সমগ্র নাট্যচিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। একটি নির্দিষ্ট উৎসমুখ থেকে নির্গত হয়ে নাটকের লক্ষ্য পূরণের জন্য ঐক্যযুক্ত নাট্যক্রিয়া নির্দিষ্ট বিন্দুতে পরিণতি লাভ করে।[২৯] নাট্য সংহতি (Dramatic Economy) রক্ষার জন্য নাট্যক্রিয়ার দৈর্ঘ্য ও আয়তন সামঞ্জস্যপূর্ণ নির্দিষ্ট মাত্রার হওয়া আবশ্যক। নাট্যক্রিয়ার অতিবিস্তৃতি নাট্যগুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। জটিল নাট্যবস্তুে মূল ক্রিয়া ব্যতীত আরও বিবিধ ক্রিয়ার অবস্থান থাকে। সেক্ষেত্রে অন্যান্য ক্রিয়াসকল সামগ্রিকভাবে কার্য-কারণসম্ভূত হয়ে মূল ক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করে এবং পরিণতিতে মূল ক্রিয়ার সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে নাটকের মুখ্যবস্তুকে আকর্ষণীয় করে তোলে। মূল ক্রিয়াই অন্যান্য বিপরীত ক্রিয়াসমূহকে নেতৃত্ব দান করে থাকে।

নাট্যক্রিয়ার প্রতিটি স্তর যুথবদ্ধভাবে ভবিষ্যৎ নাট্যক্রিয়ার ভিত্তিমূল রচনা করবে। ভবিষ্যৎ ক্রিয়াকে নিকটস্থ করে তুলবে। ক্রিয়াকে সুসংগত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলার জন্য ক্রিয়ার মধ্যে যুক্তি, আবশ্যকতা ও সম্ভাব্যতার মেলবন্ধন নির্মাণ করা প্রয়োজন। এর সুপ্রযুক্ত ফল হিসাবে অন্যান্য ক্রিয়া সকল মূল ক্রিয়ার সাহায্যকারী ক্রিয়ারূপে সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রানুগত্যলাভের দ্বারা নাট্যক্রিয়ায় গতির সৃষ্টি করে থাকে।[৩০] এই গতিই পরবর্তীকালে নাট্যচরিত্রের বিকাশ সাধন করে। সুতরাং চরিত্রের সুদৃঢ় ইচ্ছার সঙ্গে গতিশীল ঘটনার সংযোগে ক্রিয়ার অন্তর্নিহিত অর্থ মূর্ত হয়ে ওঠে। ক্রিয়ার এই বিশেষ দিকটির সার্থকতার জন্য ক্রিয়ার সকল অংশই বিষয়গত, গতিযুক্ত এবং অর্থগত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নাট্যক্রিয়া তার গতিধারায় একইসঙ্গে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের উন্মোচন ঘটায় এবং নাট্যবস্তুর বিকাশ সাধন করে। চরিত্রের

বৈশিষ্ট্য উন্মোচনের ক্ষেত্রে নাট্য ক্রিয়া আবেগের প্রতিবেদনে চরিত্রের দৈহিক ও মানসিক এই উভয় প্রকার অবস্থার অভিজ্ঞানের নির্দেশক। মানসিক ক্রিয়া চরিত্রের উত্তেজনাপূর্ণ মানসিক অবস্থার প্রতিফলন নয়। এটি হ'ল ক্রিয়ার সজ্ঞান ইচ্ছানুসারী কার্যাবস্থা। সজ্ঞান ইচ্ছাই ক্রিয়াকে নিছক মানসিক উত্তেজনা এবং আকুলতার স্তর থেকে অনন্যতা দান করে। এই অনন্য বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির সঙ্গে পরিবেশের, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বা ব্যক্তির একসত্তার সঙ্গে আর একসত্তার সাম্য অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। এই পরিবর্তন চক্রের মধ্যে আকস্মিকতার যোগ বাঞ্ছনীয় নয়। নাট্যক্রিয়া এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থার মধ্য দিয়ে ক্রমেই পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই নাট্যক্রিয়া পরিণতি লাভ করে।[৩১] নাট্যকারের উদ্দেশ্য ক্রিয়ার মাধ্যমে শুধুমাত্র গল্পকে দৃশ্যায়িত করা নয়, কিংবা বাস্তবানুগ জীবন্ত নাট্য চরিত্রের সৃষ্টি করা নয়। তার উদ্দেশ্য নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাকে বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে উপস্থাপিত করা।[৩২] সেক্ষেত্রে নাট্যক্রিয়ার নাটকীয়ত্ব থাকা অত্যাবশ্যক।

নাট্যক্রিয়ার স্বরূপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের প্রসঙ্গ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণযোগ্য। সংস্কৃত নাটকের নাট্যক্রিয়া বা কার্যের পাঁচটি পর্ব বিদ্যমান।— আরম্ভ, প্রযত্ন, প্রাপ্ত্যাশা, নিয়ত ফলপ্রাপ্তি ও ফলযোগ।[৩৩]

মুখ্যফল লাভের উদ্দেশ্যে কর্মপ্রচেষ্টার সূচনাকে নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ বলা হয়। নির্দিষ্ট ফললাভের উদ্দেশ্যে অতি ত্বরান্বিত প্রচেষ্টা থেকে নাট্যক্রিয়ার প্রযত্ন পর্ব এবং প্রবহমান ক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট স্তরে ফললাভের আশা এবং ফললাভের বঞ্চিত হবার আশংকার উদ্রেকাবস্থায় নাট্যক্রিয়ার প্রাপ্ত্যাশা পর্বের সৃষ্টি হয়। ক্রিয়ার যে অবস্থায় ফললাভের বাধা দূরীভূত হয়ে ফললাভ নিশ্চিত হয় সেখানে ক্রিয়ার নিয়ত ফলপ্রাপ্তি এবং যে অবস্থায় নাটকের সমগ্র ফলের উদয় হয় সেই অবস্থায় নাটকের ফলযোগ।

● নাট্যসন্ধি।

নাটকের কাহিনীকে অবিচ্ছিন্ন, নাটকের লক্ষ্যকে একমুখী এবং নাট্য-ঘটনার সামঞ্জস্যপূর্ণ উপস্থাপনার উদ্দেশ্যে নাট্যবস্তুর বিভিন্ন অংশের সহিত এক নিগূঢ় সম্বন্ধ রচনার বিধান নাট্যশাস্ত্রে বর্তমান। বস্তু মধ্যস্থ এক অবস্থার সঙ্গে আর এক অবস্থার এই পারস্পরিক সম্বন্ধকে সন্ধি বলা হয়। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে সন্ধিপর্বকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ এবং উপসংহৃতি।[৩৪]

মুখ (exposition)।

নাটক যেখান থেকে আরম্ভ হয় অর্থাৎ যেখান থেকে নাট্য কাহিনীর বীজ সংস্থাপিত হয় সেই স্তরকে নাটকের মুখসন্ধি বলা হয়। এই প্রসঙ্গে শকুন্তলা নাটকের প্রথম অংক এবং রত্নাবলী নাটকের প্রথম অংক স্মরণীয়।

প্রতিমুখ (Progression) ।

মুখসন্ধিতে প্রতিষ্ঠিত নাট্যবীজ প্রতিমুখ সন্ধিতে অনকুল ও প্রতিকুল শক্তির মধ্য দিয়ে ক্রমোন্নতি লাভ করে। শকুন্তলা নাটকের দ্বিতীয় অংক এই প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য।

গর্ভসন্ধি।

গর্ভসন্ধি অর্থে নাটকের চূড়ান্ত মুহূর্ত নির্দিষ্ট হয় না। নাটকের ফললাভের প্রকাশ ও হ্রাস এবং পুনশ্চ অন্বেষণ—এই অবস্থার প্রকাশ এই গর্ভ সন্ধিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।[৩৫]

বিমর্ষ সন্ধি।

এই সন্ধিতে নাটকের কিছু ফললাভ হয় এবং বাকী অংশ ক্রোধ অভিশাপ,প্রভৃতির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। শকুন্তলা নাটকের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংক পর্যন্ত এই বিমর্ষ সন্ধি বর্তমান।

নির্বহন সন্ধি।

এই সন্ধিতে নাটকের বীজ সম্পূর্ণ ফললাভ করে। শকুন্তলা নাটকের সপ্তমঅংকে এই সন্ধির কার্য বর্তমান।

নাটকের প্রতিটি সন্ধি একে অপরের পরিপূরক হয়ে নির্বহন সন্ধিতে নাটককে একমুখী ফলদান করে। সে অবস্থায় নাটকের আকৃতি গোপুচ্ছের ন্যায় হয়। গোরুর হ্রস্ব ও দীর্ঘ রোম সকল যেমন ক্রমশঃ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে শেষ বিন্দুতে এক ভাবে মিশে যায় তেমনি নাটকের সকল অংশ পরিণতিতে একাত্মতা লাভ করে থাকে।[৩৬]

সংস্কৃত নাটকের গঠনরীতি অনুসারে পঞ্চ সন্ধির সমন্বয় গ্রীকনাট্য কাহিনীতে না থাকলেও নাট্য রচনার প্রকৃতি অনুসারে গ্রীক নাটকে পাঁচটি ভাগের সন্ধান পাওয়া যায়। এই ভাগগুলো হল প্রস্তাবনা (prologue)[৩৭], তিনটি ভাগে বিভক্ত কাহিনী (episode) এবং উপসংহার (exodos)। এছাড়া এর সঙ্গে থাকে 'কোরিক সঙ' (choric song)। প্রস্তাবনার পরে একটি কোরাস গান থাকে। একে বলা হয় 'প্রবেশ গীতি' (parodos)।

কাহিনীর প্রত্যেক অংশের পরে একটি কোরাস গান থাকে। কাহিনীর তৃতীয় অংশের পরবর্তী কোরাস গানের শেষের অংশটিকে exodos বলা হয়। কোরাস গান ছাড়া সর্বসমেত নাটকে এই পাঁচটি ভাগ পরিলক্ষিত হয়। নাট্য ভাবনা, স্থান কাল

পাত্র সম্পর্কিত কিছু তথ্য Prologue-এর মাধ্যমে প্রথমে প্রকাশ করা হয়। এরপর Episode-এর অবতারণা করা হয়। Exodos অংশে নাটকের উপসংহার (conclusion) বিন্যস্ত থাকে। গ্রীকনাটকের এই পাঁচটি ভাগই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যে পঞ্চাঙ্ক নাটকে রূপান্তরিত হয়।

সংস্কৃত নাট্যগঠনরীতির দ্বারা বাংলা নাট্যগঠনরীতি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়নি। পাশ্চাত্য নাট্য গঠনরীতিই বাংলানাট্য গঠন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রক। পাশ্চাত্য নাটকের ক্রিয়ার গঠন বিশিষ্ট নিয়মে বিধৃত। এ বিষয়ে গুস্তাভ ফ্রেতাগের মতামত সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গুস্তাভ ফ্রেতাগ নাট্য-গঠন-শৈলীকে পিরামিড আকৃতির সঙ্গে তুলনা করে তার পাঁচটি অবস্থাভেদের কথা উল্লেখ করেছেন।[৩৮] তাঁর মতানুসারে সূচনা (Introduction) থেকে নাট্যকাহিনী আরম্ভ হয়ে ক্রমোন্নতির স্তর পেরিয়ে সংকটের চূড়ান্ত পর্যায়ে (climax) পৌঁছায়। চূড়ান্ত মুহূর্ত বা সংকটের শীর্ষস্থান থেকে নাটক ক্রমহ্রাসমুখী হয়ে শেষাবস্থায় (catastrophe) উপনীত হয়। সূচনা, চূড়ান্ত মুহূর্ত এবং শেষাবস্থা—এই তিনটি অবস্থা ছাড়াও নাট্যক্রিয়ার মধ্যে আরও দুটি ক্রমানুবর্তনের অবস্থা বর্তমান। তাঁর নির্দেশিত নাট্যক্রিয়ার পাঁচটি অবস্থা হল—(ক) Introduction, (খ) Rise. (গ) Climax, (ঘ) Return or Fall, (ঙ) Catastrophe। ক্রিয়ার এই পাঁচটি অবস্থা কার্যকারণসম্ভূত হয়ে নাটকের অংক-দৃশ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকে। সূচনা এবং আরোহণ অংশের মধ্যে (ক) একটি উত্তেজক নাট্যমুহূর্তের অবস্থান নাট্যক্রিয়াকে ঊর্ধ্বগতি দান করে (খ) চূড়ান্তমুহূর্ত (climax) এবং অবরোহণ মুহূর্তের (Falling Action) মধ্যবর্তী মূলক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ামূলক (moment of counter action) একটি ঘটনাবর্ত থাকে, (গ) পরিশেষে নিয়তির প্রাকমুহূর্তে (catastrophe) নতুন উৎকণ্ঠাপূর্ণ (Last suspense) আরও একটি ঘটনা বিদ্যমান থাকে। এরাই নাট্যক্রিয়াকে আকর্ষণীয় করে তোলে। গুস্তাভ ফ্রেতাগ উপরে উল্লিখিত এই তিনটি মুহূর্তের মধ্যে প্রথমটিকে অর্থাৎ Introduction-কে নাটকের আবশ্যিক অঙ্গ বলে মনে করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে নাট্যক্রিয়ার এই পাঁচটি স্তর বিন্যাসের চিন্তাধারা গ্রীক নাটকের সাধারণ পাঁচটি বিভাগের চিন্তাধারার নিকট ঋণী।[৩৯] ফ্রেতাগ নির্দেশিত নাট্যক্রিয়া বিন্যাসের—'পিরামিড গঠনাকৃতি' (Pyramidical Structure) নাট্যগঠন রীতির নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু এই গঠনভঙ্গীমা সর্ববাদীসম্মত নয়। কার্যত দেখা যায় যে এলিজাবেথীয় নাটকসমূহের ক্রিয়ার স্বাভাবিক বিকাশের সঙ্গে ফ্রেতাগ নির্দেশিত পিরামিড গঠন বিন্যাসের সাযুজ্য অনেক

ক্ষেত্রে রক্ষা করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। এলিজাবেথীয় যুগের নাট্য মনীষী শেক্সপীয়রের বিশিষ্ট নাটকের সংকটময় চূড়ান্ত অবস্থার বিস্তৃতি প্রথম অংক থেকে শুরু হয়ে তৃতীয় অংক পর্যন্ত বিদ্যমান এবং ঐ তৃতীয় অংকেই নাট্য পরিণতির প্রাথমিক পর্ব সূচিত হয়ে নাটকের পঞ্চম অংক পর্যন্ত নাট্য পরিণতির ক্রম-ইতিবৃত্তের রচনা কার্যকর করা হয়েছে। 'কিংলিয়ার' নাটকের প্রথম দৃশ্যেই নাট্যসংকটের সূত্রপাত, পক্ষান্তরে 'ওথেলো' নাটকের চতুর্থ অংকের প্রথম দৃশ্য থেকে নাট্যসংকটের আবর্ত লক্ষণীয়। নাট্য-দর্শনের বিবর্তন ধারায় নাট্যক্রিয়ার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাই বিভিন্ন প্রকার চিন্তাধারার প্রতিফলন দেখা যায়।

Lewis Campbell (1904) নাট্যক্রিয়ার বিন্যাসকে পাঁচটি বিশিষ্ট স্তরে বিভক্ত করলেও ক্রিয়ার গঠনভঙ্গীমার আকৃতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণে ফ্রেতাগের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। নাট্যক্রিয়ার বিভাজন প্রণালীর পরিচয় দানের জন্য তিনি (১) নাটকের আরম্ভ, (২) ক্রিয়ার ক্রমোন্নতির স্তর থেকে চূড়ান্ত মুহূর্ত স্তরের আরোহণ পর্বকে নাটকের climax (৩) সঠিক চূড়ান্ত মুহূর্তটি বা শীর্ষ স্থানকে নাটকের Acme এবং (৪) চূড়ান্ত মুহূর্তের পরবর্তী প্রাক্ ক্রমহ্রাস-মুখীনতাকে Sequel এবং (৫) ক্রমহ্রাসমুখী গতির শেষ অবস্থানকে নাটকের পরিণতি (conclusion) রূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতানুসারে নাটকের climax নাটকের চূড়ান্ত সংকট সৃষ্টির মাধ্যম এবং নাটকের Acme সেই মাধ্যমের দ্বারা গঠিত নাটকের চূড়ান্ত সংকটজনক অবস্থা।[৪০] তিনি Rising Action-কেই Climax নাম দিয়ে বুঝিয়েছেন। কারণ climax শব্দের আসল মানে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা। Lewis Campbell-এর নাট্যগঠন ভঙ্গীমার সঙ্গে ফ্রেতাগের নাট্যক্রিয়ার পিরামিডাকৃতির কোন সাদৃশ্য নাই। এর গঠনাকৃতি অধিবৃত্তস্বরূপ (Parabolical)। তাঁর চিন্তাধারা অনুসারে নাঠকের চূড়ান্ত সংকটাবস্থা (Acme) ফ্রেতাগের পিরামিডাকৃতির ন্যায় মধ্য বিন্দুতে অবস্থান করে না। মধ্য বিন্দুর কিছু আগে বা কিছু পরে অবস্থান করে থাকে।[৪১]

J H. Lawson-এর বিশ্লেষণী শক্তি সমগ্র নাট্য কাহিনীর ক্রমঊর্ধ্বমুখী গতি-প্রবণতার মাঝে চারটি বিশিষ্ট অবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর নিরীক্ষায় এই চারিটি বিশিষ্ট অবস্থা হল—.ক) Exposition, (খ) Rising Action. (গ) Clash, (ঘ) Climax। Expoiition-এ নাটকের মূল বস্তুর প্রকাশের পর নাট্যক্রিয়ার ক্রমোন্নতি নাটককে দ্বন্দ্ব ও সংকটমুখী করে তোলে। পরবর্তীস্তরে সেই দ্বন্দ্ব ও সংকট বিস্ফোরক অবস্থায় প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং তারপর জীবন ও জগৎ সম্পর্কে পরিবর্তিত নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে নাট্যক্রিয়া শেষ হয়। নাটকের এই চরম পরিণতিই নাটকের climax—।[৪২] এই বিশ্লেষণ ধারায় climax-এর সঙ্গে সঙ্গে নাট্য ঘটনা পরিসমাপ্তি লাভ করে। ফ্রেতাগের রীতি অনুসারে climax-এর পর অবরোহণ (Falling Action) এবং নির্বহণ (Catastrophe)-এর প্রয়োজনীয়তা Lawson প্রসূত নাট্যক্রিয়ার গঠন ভঙ্গীমায়

পরিলক্ষিত হয় না। প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে নাট্য চরিত্রের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের সূত্রে Lawson নাট্য সংঘর্ষের দুটি রূপের গুরুত্ব নির্দিষ্ট করেছেন। গুরুত্ব অনুসারে এই দুটি রূপকে তিনি প্রত্যাশিত সংঘর্ষ (expected clash) এবং অপ্রত্যাশিত সংঘর্ষ (unexpected clash) রূপে চিহ্নিত করেছেন। প্রত্যাশিত সংঘর্ষ ছাড়াও অপ্রত্যাশিত সংঘর্ষ climax গঠনে সাহায্য করে।

বিংশ শতকের নাট্যবিদ W. H. Hudson-এর মনোবীক্ষণে কিছুটা পরিবর্তিত অবস্থায় ফ্রেতাগ নির্দেশিত নাট্যক্রিয়ার পিরামিডাকৃতির রূপরেখার স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়। ফ্রেতাগের আরম্ভ পর্বকে (exposition) বিভাজিত করে W. H. Hudson একে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি Exposition এবং অপরটি Initial incident। এর অর্থ হল exposition অংশের মধ্যে initial incident বলে তার একটি অংশকে তিনি নির্দিষ্ট করেছেন। Exposition-এর পরে এই initial incident অংশে দ্বন্দ্বের উদ্ভব সূচনা লক্ষ্য করা যায়। এরপরে Progression অংশের শুরু হয়। তাহলে exposition-এর দুটি অংশ ধরলে নাট্যবস্তু গঠনের ভাগ পাঁচটির বদলে ছটি বলা যেতে পারে।[৪৩]

নাট্যক্রিয়ার গঠনভঙ্গীমা সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা লাভের জন্য উপরে আলোচিত নাট্যক্রিয়ার বিভিন্ন পর্বের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

● প্রারম্ভ (Exposition) ঃ

নাট্যকারকে নাটকের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর পটভূমিকা রচনা করার প্রয়োজনে নাটকের প্রারম্ভে নাটকের ঘটনা কাল পরিস্থিতি এবং চরিত্র সম্বন্ধে প্রাথমিক পরিচয় দর্শকগণকে দান করা আবশ্যক। নাটকে নায়কের প্রারম্ভিক ঘটনা তার ব্যক্তি জীবনের প্রথম ঘটনা নয়। নায়কের জীবনের বহুল ঘটনার মধ্যে এমন একটি ঘটনাকে নির্বাচিত করে নাটক আরম্ভ করা হয় যার দ্বারা নাটকের সিদ্ধান্তবাক্য সম্পাদিত হয়। এই অবস্থায় চরিত্র ও ঘটনার প্রাথমিক পরিচয় দানের দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সঙ্গে নাট্যকারকে পালন করতে হয়। মূলনাট্যক্রিয়ার সার্বিক উপলব্ধির জন্য নাটকের প্রথম দৃশ্যে এর ভিত্তিমূল এমনভাবে গঠন করতে হয় যার দ্বারা ভবিষ্যৎ নাট্যক্রিয়ার প্রকৃতি সংযত, সংহত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে।[৪৪] শুধুমাত্র বর্ণনার দ্বারা নয়, ঘটনার মাধ্যমে এর রূপারোপ দান করা প্রয়োজন। সর্বোপরি নাট্যক্রিয়ার এই সন্ধিক্ষণেই নাট্যচরিত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এই সিদ্ধান্তই নাটকের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য স্থির করে থাকে। এই সন্ধিক্ষণেই নাট্যচরিত্রের দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়। এই দ্বন্দ্বই নাটকের চূড়ান্ত মুহূর্ত সৃষ্টি করে নাটককে পরিণত করে তোলে। সেইজন্য নাট্যক্রিয়া সর্বপ্রকার জটিলতামুক্ত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাভাবিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে আপাতদৃষ্টিতে সমগ্র নাট্যক্রিয়ার যেমন একটি আরম্ভ স্তর থাকে তেমনি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে নাট্যসন্ধির প্রতিটি স্তরে নাট্য-

ক্রিয়ার ঐ অংশের নিজস্ব আরম্ভের (exposition) স্থান বর্তমান। সেজন্য নাট্য-পরিস্থিতি এবং ঘটনার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে নতুন তথ্যের সংযোজনকারী হিসাবে নাটকের চূড়ান্ত মুহূর্তের (climax) মধ্যেও তার নিজস্ব প্রারম্ভ স্তর (self expository) লক্ষ্য করা যায়। নাটকের সিদ্ধান্তবাক্য প্রতিপাদনের জন্য নাটকের প্রারম্ভস্তর (exposition) নাটকের মূল নাট্যক্রিয়ার (Root Action) সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নাট্যক্রিয়ার দ্বারা নাট্যচরিত্র এবং পরিস্থিতির সাম্যাবস্থার পরিবর্তনের সার্থকতা নির্ভর করে নাটকের প্রারম্ভ স্তরের যুক্তিনিষ্ঠ শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রকাশ ভঙ্গীমার গভীরতার উপর। নাটকের প্রারম্ভ স্তরের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও তথ্যের সরাসরি উপস্থাপনা নাটকের গুরুত্বকে হ্রাসমুখী করে তোলে, এবং এর ফলে নাট্যউদ্দীপনা এবং নাট্যগতির ভারও লাঘব হয়ে পড়ে। নাটকের স্থান, কাল, পরিবেশ এবং নাট্যচরিত্র সম্বন্ধীয় প্রাথমিক তথ্য পরিবেশনার পর, নাটকের প্রারম্ভস্তরে চরিত্রের নির্দিষ্ট লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তথ্য ও ঘটনাকে এমনভাবে উপস্থিত করা প্রয়োজন যারফলে ঘটনা ও চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রের পক্ষে ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তীব্র উৎকণ্ঠা, অনিশ্চয়তা ও সংশয় নাট্য পরিধিকে আবৃত করে রাখতে পারে।[৪৫] ফ্রেতাগ নির্দেশিত নাট্যক্রিয়ার গঠনভঙ্গীমার সূচনা স্তর (Introduction) বিশ্লেষণ করলে তারমধ্যে সূচনাস্তর উপস্থাপনার এই বিশেষ প্রক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর Introduction-এর প্রাথমিক স্তরে নাটকের স্থান, কাল, ঘটনা ইত্যাদি সম্বন্ধীয় প্রাথমিক তথ্য সরবরাহের উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী স্তরে নাটকের উদ্দীপক শক্তিজাত (exciting force) নাটকের নাটকীয়ত্বের বিকাশ কার্য সম্পাদনের কথা বলা হয়েছে।[৪৬] প্রাথমিক পরিচয়দান সম্পর্কিত ঘটনাবলীর সাহায্যে নাটকের মধ্যে এই স্তরে একটা বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এর ফলে ক্রিয়া থেকে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে চরিত্রের বাসনাপূরণের নিমিত্ত সুদৃঢ় ইচ্ছাই (Strong volition) চরিত্রকে কর্ম্ম-মুখী করে তুলবে এবং নাট্যকারের বক্তব্য প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। পরিশেষে বলা যায় যে নাটকের আরম্ভস্তর শুধুমাত্র নাট্য কৌতূহল এবং নাট্যক্রিয়া সংকটের সৃষ্টিকারক নয়, নাটকের ভবিষ্যৎ ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রসূত নাট্যপরিণতি এবং নাট্য প্রকৃতি সম্বন্ধীয় সার্বিক ধারণার ইঙ্গিতবাহী।[৪৭]

● **আরোহন (Rising Action) ঃ**

নাট্যক্রিয়ার এই আরোহন সন্ধি থেকে চরিত্রের বাসনা উত্তরোত্তর কর্ম্মপ্রচেষ্টার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে লক্ষ্যানুগামী হয়। চরিত্রের বিশিষ্ট ভাব (Mood), গভীর অনুরাগ (Passion), সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি (Sound Volition) এবং বলিষ্ঠ উদ্দীপনা (Strong stimulation) এক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। ব্যাপক অর্থে প্রত্যেক নাট্য সন্ধিতেই নাট্য ক্রিয়ার আরোহণ পর্ব থাকে। কিন্তু

সামগ্রিকভাবে এই স্তর থেকেই নাট্যক্রিয়ার ক্রম-আরোহণ বিশেষ ভাবে সূচীত হয় এবং সিদ্ধান্তবাক্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে ক্রিয়ার ক্রম আরোহণকে নাট্যবস্তুনিষ্ঠ ও নাট্যানুগ করে তোলা হয়।

● শীর্ষ অবস্থা (climax):

ফ্রেতাগের সূত্রানুসারে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের দ্বারা সংঘটিত নাট্য দ্বন্দ্বের শীর্ষ অবস্থাই নাটকের climax।[৪৮] দ্বন্দ্বসংকুল দুই বিপরীত শক্তির মধ্যস্তরে এই শীর্ষ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। বাসনাকে (wish) কর্মে রূপায়িত করার জন্য চরিত্রের সুদৃঢ় কর্মপ্রচেষ্টা নাট্যক্রিয়ার এই স্তরে তার সম্ভাব্য প্রকৃতি লাভ করে থাকে এবং এরপর থেকে নাট্যক্রিয়ার গতি ক্রমহ্রাসমুখী হতে থাকে। বিভিন্ন নাট্যবিদ্‌গণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ক্লাইম্যাক্স-এর স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন। Lewis Campbell-এর বিশ্লেষণ ধারায় নাটকের প্রাথমিক অবস্থার ক্রম-আবর্তনের ফলে নাটকের মধ্যে যে চূড়ান্ত বা মুখ্য সংকটের সৃষ্টি হয় তাই নাটকের climax। J. H. Lawson-এর নিরীক্ষা অনুযায়ী, যে স্থানে ক্রিয়া সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছায় সেটাই ক্রিয়ার চূড়ান্ত স্তর। নাট্যক্রিয়া এই পর্যায়েই সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করে, ঘটনার আবর্তন শেষাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং এরপর ক্রিয়ার হ্রাসমুখীনতার আর সম্ভাবনা থাকে না। মনে রাখা প্রয়োজন যে গভীর আবেগের বা প্রগাঢ় অনুরাগের (Passion) চরম মুহূর্ত দ্বারা climax গঠন করা যায় না। climax বলতে গভীর অর্থপূর্ণ ক্রিয়ার শেষাবস্থাকেই বোঝান হয়। এরপরে নাটক সম্পর্কে আর কিছু জানার বাকি থাকে না। এখানেই সব কিছুর কৌতূহল পরিসমাপ্তি লাভ করে। প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন দৃশ্য দ্বারা সংগঠিত নাটকের প্রতিটি অংকেই এক একটি চূড়ান্ত মুহূর্ত থাকে। কিন্তু নাটকের প্রধান চূড়ান্ত মুহূর্তের (Grand climax—) সহায়ক হিসাবে ঐ সকল মুহূর্তের কার্যকারিতা বাঞ্ছনীয়। এর ব্যতিরেকে নাটক বিকেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় Macbeth নাটকের প্রথম দুই অংকের ডানকানকে হত্যা করার চূড়ান্ত মুহূর্তটি পরবর্তী কার্যপ্রবাহের মাধ্যমে ম্যাকবেথের ধ্বংসের চূড়ান্ত মুহূর্তকেই সমৃদ্ধ করেছে।

● অবরোহণ (Falling Action):

চূড়ান্ত মুহূর্ত প্রাপ্তির পর নাট্যক্রিয়া চরিত্রের বাসনাপূরণের জন্য তার কর্ম-প্রচেষ্টাজাত অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থায় অগ্রসর হয়ে পরিণামাভিমুখী হয়ে ওঠে।[৪৯] নাটকের পরিণতির মুহূর্তকে সুসংবদ্ধ, যুক্তিসঙ্গত ও আকর্ষণীয় করে তোলা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে নাটকের কৌতূহলকে এই স্তরে ধরে রাখা আবশ্যক। এর দ্বারা নাটকের পরিণতির প্রতি দর্শকের মানসিক প্রস্তুতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এলিজাবেথীয়

যুগে নতুন ঘটনার সংযোজনার দ্বারা নাট্যগঠনের এই বিশেষ সন্ধিতে নাট্যকৌতূহলকে পুনরায় জাগরিত করা হোত। 'Julius Caeser' নাটকের চতুর্থ অংকের তৃতীয় দৃশ্যে 'Brutus' এর সামনে Caeser'রের প্রেতাত্মার আবির্ভাব এবং Brutus চরিত্রের ভবিষ্যৎ পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত দান,[৫০] Romeo and Juliet নাটকের পঞ্চম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে Julset'এর কবর স্থানে Romeo'র পদচারণা পূর্বক কবরের মধ্যে প্রবেশ,[৫১] ইত্যাদি নাট্য ঘটনা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। Lawson এর মতে নাট্যগঠন ভঙ্গীমায় এই বিশেষ সন্ধির কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর মতানুসারে জীবন-বিমুখ নাটক যখন নিছক ভাবাবেগ সর্বস্ব একটি যান্ত্রিক বিন্যাস ধারায় গঠিত হয়, তখনই নাট্যগ্রন্থিতে এই বিশেষ সন্ধির প্রয়োজন হয়।

● পরিণতি (Denoument) :

এই স্তর নাট্যক্রিয়ার শেষতম উপসংহারমূলক অবস্থার দ্যোতক। গ্রীক নাটকে এই স্তর Exodus নামে পরিচিত। পূর্বের সংকট-সংঘাত ও দ্বন্দ্ব বিজড়িত অবস্থাকে অতিক্রম করে নতুন জীবনবোধের দ্বারা সমৃদ্ধ নাট্য চরিত্র এই স্তরে স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই স্তরেই সকল নাট্য কর্মের অবসান ঘটে।[৫২] এই সন্ধিতে কার্যকারী আবশ্যিক ঘটনা ও সংলাপ ব্যতীত, অপ্রয়োজনীয় ঘটনা ও সংলাপ পরিহার করে নাটককে ঘটনানুগ এবং চরিত্রানুগ করে তোলা প্রয়োজন। এরজন্য নাট্য-দৃশ্যের সরলতা ও সংক্ষিপ্ততাও প্রয়োজন। অন্যথায় নাট্য পরিণতির বিপথগামী হবার সম্ভাবনা থাকে। এটা সর্বদাই মনে রাখা প্রয়োজন।

● অংক (Act) :

নাট্যবস্তুকে সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপিত করার জন্য বৃত্তের ক্রমানুবর্তন অনুসারে সমগ্র নাট্যক্রিয়াকে কয়েকটি নির্দিষ্টভাগে বিভক্ত করা হয়। এক একটি বিভাগ এক একটি অংক নামে পরিচিত। অংক হচ্ছে নাট্যক্রিয়ার সময়ের বিভাগ (Time division)। প্রতিটি অংকের নাট্যকাহিনীর কিছু কিছু অংশের উপস্থাপনার দ্বারা সমস্ত অংকের সাহায্যে নাট্য কাহিনীর অগ্রগতির মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণতা আনয়ণ করা হয়।[৫৩] অংক বিভাগ পারস্পরিক কার্যকারণ সম্ভূত যুক্তি নির্ভর হওয়া বাঞ্ছনীয়। নাটকের সিদ্ধান্তবাক্যের প্রামাণ্য চিত্র এ সকল অংকের মধ্য দিয়ে নিটোল রূপ লাভ করে। সিদ্ধান্তবাক্যের পরিপূরক হিসাবে প্রতিটি অংকের মধ্যে এক একটি উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। অর্থাৎ একটি অংকের মধ্যে মূল নাট্যক্রিয়ার কোন বিশিষ্ট অংশ বা কার্য্য (deed), অনুকূল বা প্রতিকূল শক্তির অবস্থা বা উভয়ের দ্বন্দ্বময় অবস্থা, পূর্ববর্তী ক্রিয়ার পরিণত অবস্থা এবং পরবর্তী ক্রিয়ার সম্ভাব্যতার বীজ বিন্যস্ত থাকে। সুসংগঠিত ক্রিয়ার ধারক হিসাবে প্রতিটি অংকে প্রবাহিত নাট্যগতির নিজস্ব আরম্ভ,

(exposition), আরোহণ (rising) ও চূড়ান্ত অবস্থা (climax) বিদ্যমান। সকল অবস্থা পরবর্তীকালে মূল নাট্যগতিকে পরিণত-রূপ দান করে থাকে।

● দৃশ্য (scene) ঃ

নাটকে অংকের পরিমণ্ডল কতকগুলি দৃশ্য দ্বারা সংগঠিত। দৃশ্য হচ্ছে অংকের অংশ বা ক্রম-বিভাগ (sequence division of act—)। দৃশ্যের মাধ্যমে অংকের অন্তর্নিহিত অর্থকে সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করা হয়। সুতরাং দৃশ্য ব্যাপক অর্থে মূল নাট্যক্রিয়ারও অংশস্বরূপ। স্থান ও কাল নিয়ে গঠিত নাট্য-পরিস্থিতির সঙ্গে নাট্যচরিত্রের মানসিকতাকে প্রকাশ করার জন্য দৃশ্যের মধ্যে একাধারে কতকগুলি নাট্যমুহূর্ত বিকাশ লাভ করে এবং এরদ্বারা নাটকের মূল গতিধারাও পরিণত হয়ে ওঠে। নাট্যমুহূর্ত বলতে বিশেষ স্থানের বিশেষ নাট্যাবস্থাকে বোঝানো হয়। এর অভাবে নাটক পরিণতিতে ভিন্নমুখী (inextricable confusion) হয়ে ওঠে। নাটকে দৃশ্যের গুরুত্ব বলতে দৃশ্যের তিন প্রকার কার্যাবলীকে বোঝান হয়। প্রথমত দৃশ্য নাটকের ক্রিয়ার স্থান ও কালের পরিচয় দান করে। দ্বিতীয়ত দৃশ্যের মধ্যে নাট্য পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাহায্যে গঠিত নাট্য চরিত্রের মানসিক প্রতিফলন ঘটানো হয় এবং তৃতীয়ত পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত হয়ে নাটকের দৃশ্যগুলি মূল নাট্যক্রিয়াকে অগ্রগতি দান করে। প্রতিটি দৃশ্যের নাট্যক্রিয়া নাটকের প্রধান ক্রিয়ার অনুসারী হয়ে মূল কাহিনীকে ক্রমবিবর্তন দান করে। সেক্ষেত্রে প্রধান নাট্যক্রিয়া যেমন আদি-মধ্য-অন্ত যুক্ত হয়ে থাকে সেই রকম প্রতিটি দৃশ্যের মধ্যে সংঘটিত প্রধান নাট্যক্রিয়ার অংশও আদি-মধ্য-অন্ত যুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।[৫৪] যুক্তি এবং কার্য-কারণের নিরীখে সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলার সঙ্গে সকল দৃশ্য যুথবদ্ধভাবে একে অপরকে আবশ্যকীয় এবং অবশ্যম্ভাবী করে তুলবে।[৫৫] সেক্ষেত্রে প্রতিটি দৃশ্য একে অপরের পরিপূরক হওয়ায় কোন দৃশ্যকে অপরাপর দৃশ্য থেকে বা মূল নাট্যপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে সমগ্র নাট্য প্রবাহের মধ্যে ছেদ পড়বে। এই নিবিড় ঐক্য দ্বারাই নাটকের ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে একান্ত প্রয়োজনীয় সংহতভাব (compactness) সৃষ্ট হয়। দৃশ্য বিন্যাসের এই মিতব্যায়িতা এবং পারস্পরিক ঐক্যের জন্য প্রতিটি দৃশ্যই নাটকের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক দৃশ্যরূপে চিহ্নিত হয়ে ওঠে।[৫৬] দৃশ্যের মধ্যে নাটকের সিদ্ধান্তবাক্যকে ক্রমে ক্রমে পরিণত করে তোলার প্রাথমিক দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। সেই দায়িত্বপূরণের জন্য প্রতিটি দৃশ্যের উদ্দেশ্য এবং কার্য্য প্রাসঙ্গিক এবং সম্বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। নাট্যক্রিয়ার বিভিন্ন অংশকে দৃশ্যাদির মধ্যে এমনভাবে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন যাতে পূর্ব অংশ পরবর্তী অংশকে নতুন শক্তি দান করতে পারে। এই শক্তির দ্বারাই নাট্য-কাহিনী ও নাট্য চরিত্র পরিণতির পথে এগিয়ে যায়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চের জন্য প্রস্তুত নাট্যগঠন ক্রিয়ায় অনেক সময়ে আর্থিক আনুকূল্য লাভের জন্য কোন কোন দৃশ্য রচনা করা প্রয়োজনীয়

হয়ে ওঠে। এ মনোভাব শিল্পোচিত সৃজন ক্রিয়ার পরিপন্থী। নাটককে যথাযোগ্য শিল্পরূপ দানের জন্য নাট্যক্রিয়ার মধ্যে দৃশ্যের নাটকীয়ত্বই দৃশ্যের যাথার্থ্য নির্ণয়ের মানাঙ্ক স্বরূপ।

নাট্যগঠন সম্পর্কে এ সকল তত্বের আলোচনার ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীর নাটক ও সেইসব নাটকের বস্তু-গঠন সম্পর্কে বিচার বিশ্লেষণ শুরু করা হল :—

● পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের বৈশিষ্ট্য :

পৌরাণিক নাটকে প্রধান ঘটনা এবং প্রধান চরিত্র পুরাণ থেকে নেওয়া হয়। অপ্রধান ঘটনা এবং চরিত্র পুরাণের অন্তর্গত না হয়ে কাল্পনিক হতে পারে। কিন্তু সে ঘটনা এবং চরিত্রে এমন পৌরাণিক রঙ আরোপ করা প্রয়োজন যার ফলে সে ঘটনা এবং চরিত্র চট্ করে অপৌরাণিক বলে মনে না হয়। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষায় বলা যায়—

"অলৌকিক বিষয় কিংবা অলৌকিক চরিত্র নাটকে কিভাবে ব্যবহার করা হয় তাহার উপরই পৌরাণিক নাটকের নাটকত্ব নির্ভর করে।"[৫৭] পৌরাণিক নাটকে দেব-দ্বিজে ভক্তি ও আস্থা, নীতিবোধ, ন্যায়পরায়ণতা, কর্তব্যবোধ, ব্রাহ্মণের ক্ষমা, ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব, অতিথি সৎকার, আর্তের ত্রাণ, দুর্বলকে রক্ষা, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দান—এ সকলকে স্থান দিতে হয়। আবার ধর্মের জয়, অধর্মের পরাজয়, ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণতা, অভিশাপের সক্রিয়তা, দৈববানী, বিভিন্ন অলৌকিক কার্যাবলী—ইত্যাদির দ্বারা পৌরাণিক পরিমণ্ডল গঠন করা হয়। পুরাণের দ্বারা আগের থেকে নাট্যচরিত্রের প্রকৃতি ও পরিণতি নির্দিষ্ট থাকে এবং চরিত্রের মধ্যে ভক্তিভাবের বিশেষ প্রাধান্য বজায় থাকে। চরম বিপর্যয় ও শোচনীয় পরিণতির মধ্যে ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের দ্বারা সর্ব দুঃখ কষ্টের অবসানে মানসিক প্রশান্তি লাভই চরিত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠায়—পুরাণ চরিত্রের দ্বারা বিয়োগান্ত ইতিবৃত্ত রচনা করা সচরাচর সম্ভব হয় না।[৫৮]

নাটকে চরিত্রের পুরুষকার অপেক্ষা চরিত্রের উপর দৈবের প্রাধান্যই দেখান হয়। এরফলে পৌরাণিক নাটক মূলত নিয়তিবাদকে প্রতিষ্ঠিত করে থাকে। তাই বলে পৌরাণিক নাট্যকার যুগের প্রভাবকে এড়িয়ে যেতে পারেন না। নাটক রচনার সময় নাট্যকার তাঁর যুগের বিভিন্ন সমস্যা, বিভিন্ন ধ্যান ধারণাকে নানান কৌশলে ও সুযোগে নাটকের মধ্যে তুলে ধরেন। শুধুমাত্র পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্রের দ্বারা নাটক রচনা করলে সার্থক পৌরাণিক নাটক রচনা করা সম্ভবপর হয় না। নাটকের সার্থকতা নির্ভর করে পুরাণকে অবলম্বন করে নাট্যকারের নাট্যবস্তু নির্মাণ দক্ষতার উপর। আধুনিক দৃষ্টিসম্পন্ন অনেক নাট্যকার, পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্রের বিশ্লেষণমূলক উপস্থাপনার দ্বারা কাহিনী ও চরিত্রের কোন বিশেষ সংকেতবাহী দিককে অবলম্বন করে তার আধুনিক ব্যাখ্যা দান করেন। পুরাণের সহযোগিতায় নাট্যকারের শিল্পক্ষমতা এক অপূর্ব অনাস্বাদিত নাট্যবস্তু গড়ে তোলে।

সুতরাং বলা যায় যে সার্থক পুরাণ নাটকে পুরাণ. বড় কথা নয়। বড় কথা "অপূর্ব বস্তুনির্মাণ ক্ষম শিল্পীর প্রজ্ঞা"।[৫৯]

পৌরাণিক নাটকগুলি ভক্তিমূলক। তাহলেও পুরাণ কাহিনী অবলম্বন না করেও ভক্তিমূলক নাটক রচিত হতে পারে। বিশেষ কোন ধার্মিক চরিত্র অবলম্বনে অথবা মঙ্গল কাব্যাদির কাহিনী অবলম্বনেও ভক্তিমূলক নাটক রচিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, 'সাবিত্রী' নাটক পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক, 'রামানুজ' ও 'বেহুলা' পৌরাণিক নয়, কিন্তু ভক্তিমূলক নাটক।

● ঐতিহাসিক নাটকের বৈশিষ্ট্য ঃ

ঐতিহাসিক নাটকের প্রধান ঘটনা ও প্রধান চরিত্র ইতিহাসের হবে। অপ্রধান ঘটনা ও অপ্রধান চরিত্র কাল্পনিক হতে পারে কিন্তু তাতে যে যুগের ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করা হয়েছে সেই যুগের রঙ আরোপ করতে হবে। ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাস বিরোধী ঘটনাকে যেমন স্থান দেওয়া উচিত নয় তেমনি ঐতিহাসিক ঘটনাকে বিকৃত করে নাটকে উপস্থাপিত করা যায় না। ইতিহাসকার ঘটনা ও চরিত্র সম্পর্কে তথ্য দেন। নাট্যকার সেই তথ্যকে অবলম্বন করে সুষ্ঠু নাট্যক্রিয়ার বিন্যাস দ্বারা সে সকল তথ্যকে শৃঙ্খলবদ্ধ অবস্থায় নাটকে উপস্থাপিত করেন, চরিত্রকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন দর্শনের পরিচয় দেন।[৬০] এই ব্যাখ্যা যুক্তিগ্রাহ্য, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও যথাযথভাবে গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রয়োজন। ঘটনা ও চরিত্রের রূপারোপের জন্য এক্ষেত্রে নাট্যকারের কল্পনার স্বাধীনতা বর্তমান। তাই বলে কল্পনার আতিশয্যে নাটককে অতিনাটকে (Melodrama) পর্যবসিত করে ইতিহাসের অবমাননা করা উচিত নয়।

ঐতিহাসিক ঘটনা হলেও কেবলমাত্র এক বা একাধিক ঐতিহাসিক ঘটনার বিবৃতি, সংলাপের দ্বারা বিন্যস্ত করে ঐতিহাসিক নাটক গঠন করা যায় না। কারণ ইতিহাস সত্য ও শিল্প সত্য এক জিনিস নয়। ইতিহাসের সত্য যেখানে ঘটনা ও চরিত্র সম্বন্ধে নির্বিচারে একনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহমুখী, নাট্যশিল্প সেখানে সেই তথ্যকে ও ঘটনাকে বিকৃত না করে মানবজীবনের কামনা বাসনার এক বিশিষ্ট রস-রূপ অঙ্কনে প্রয়াসী। এ প্রসঙ্গে "ভাষা ও ছন্দ" কবিতায় রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

"সেই সত্য যা রচিবে তুমি
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান অযোধ্যার চেয়েও সত্য জেনো।"

এইজন্য ইতিহাসের ঘটনা এবং ব্যক্তির জীবন সম্বন্ধীয় ইতিহাসের তথ্যকে ভাল ভাবে পর্যবেক্ষণ, বিচার ও বিশ্লেষণের জন্য নাট্যকারের খুবই সচেতন দৃষ্টি থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ ইতিহাসের তথ্যকে আশ্রয় করে মানবজীবনের রসরূপ সৃষ্টিই

নাট্যকারের লক্ষ্য। তদুপরি ঐতিহাসিক ঘটনা ও তথ্যকে কিভাবে সাহিত্যিক গুণসম্পন্নভাবে বিন্যস্ত করার দ্বারা পাঠক ও দর্শক মনে অনির্বচনীয় আনন্দ উপলব্ধির সহায়ক করে তোলা যায়, ইতিহাসের তথ্যকে অবলম্বন করে দেশ ও কালের সমস্যাকে ফুটিয়ে তোলা যায় সেদিকেও নাট্যকারের তীক্ষ্ন দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। তাই ঐতিহাসিক নাটক রচনার জন্য নাট্যকারকে একদিকে ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ত হতে হয় অপরদিকে মানবজীবনের প্রতিও তাঁকে অনুগত থাকতে হয়।

● সামাজিক নাটকের বৈশিষ্ট্য :

নাটক সামাজিক কর্ম। সামাজিক চিন্তা ও চেতনায় সমৃদ্ধ নাট্যকারের অভিজ্ঞতা নাটকে রসরূপ লাভ করে। যুগের ও সমাজের বিবিধ সমস্যার ও নানাবিধ ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে লৌকিক জীবনের অবস্থার প্রতিফলন সামাজিক নাটকে লক্ষ্যনীয়। সামাজিক নাটক রচনার ক্ষেত্রেও নাট্যকার কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তবে সুষ্ঠু নাট্য রচনার জন্য নাট্যকারের কল্পনা সংহত ও নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাস্তবের সঙ্গে যোগ না থাকলে নাটক কাল্পনিক হয়ে ওঠে। সেজন্য সামাজিক নাটকের ঘটনা ও চরিত্র পাঠকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা প্রয়োজন। এর উপর নাটকের সার্বজনীন আবেদন নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে ঘটনা ও চরিত্র বাস্তবানুগ এবং সম্ভাব্যতাপূর্ণ (Probable and Plausible) হওয়া দরকার।[৬১] গণমানসে সামাজিক শাশ্বতমূল্য বোধকে জাগিয়ে তোলার মহান দায়িত্ব নাটকের মাধ্যমে নাট্যকারকে পালন করতে হয়। সেজন্য নাটকের কাহিনীর সঙ্গে ন্যায় ও নীতিবোধের সম্পর্ক রচনা করা বাঞ্ছনীয়। সমাজ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারাই নাট্যকার এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

● পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের বৃত্ত গঠনের বিশ্লেষণ :

সাবিত্রী (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ) :

একনিষ্ঠ পতিব্রতা শক্তির দ্বারা সাধ্বী নারী অসাধ্য সাধনে সক্ষম হন। ইহাই নাটকের সিদ্ধান্ত বাক্য।

প্রথমে নাটকের প্রস্তাবনা অংশে জীবন ও জগতের প্রাণকেন্দ্রে সতীত্বের গুরুত্ব ও মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রস্তাবনা দৃশ্য ছাড়া মোট পাঁচটি অংকে ও উনিশটি দৃশ্যের দ্বারা নাট্যবৃত্ত গড়ে উঠেছে। শেষের ক্রোড় অংকে সাবিত্রী ও সত্যবানের সঙ্গে পরিবারের সকলের মিলন দৃশ্য রচনার দ্বারা নাটকের মধ্যে মেল বন্ধন রচনা করা হয়েছে। নাটকের প্রথম অংকে মহারাজ অশ্বপতির নির্দেশে উপযুক্ত পাত্রের খোঁজে স্বয়ং সাবিত্রীর যাত্রার ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে দৈববিধান অনুযায়ী স্বল্পায়ু সত্যবানকেই সাবিত্রীর পতিরূপে বরণ করার কাহিনী

উপস্থাপিত করা হয়েছে। তৃতীয় অংকে দৈববিধান খণ্ডন করার জন্য সাবিত্রীর সতীব্রত উদযাপন ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে। চতুর্থ অংকে বনমধ্যে সত্যবাণের প্রাণত্যাগ এবং সত্যবানের প্রাণ নিতে আসার জন্য উপস্থিত যমের কাছ থেকে সাবিত্রীর তিনটি বরলাভের ঘটনা বিধৃত হয়েছে। পঞ্চম অংকে সাবিত্রীর সতীত্বে মুগ্ধ যমরাজ কর্তৃক সত্যবানকে পুনর্জীবিত করার ঘটনা দেখান হয়েছে। সাবিত্রী কর্তৃক সতীত্বের জোরে যমরাজের কাছ থেকে তিনটি বরলাভ সহ মৃত স্বামীর প্রাণ-লাভের মূল ঘটনা ছাড়া 'মালিনী' ও 'তুরঙ্গ'কে কেন্দ্র করে নাটকের মধ্যে একটি চটুল হাস্যরস মূলক উপকাহিনীর উপস্থাপনা করা হয়েছে। এ ছাড়া উপকাহিনী হিসাবে এর অন্য কোন বিশেষত্ব নেই।[৬২]

সিদ্ধান্তবাক্যের সঙ্গে যোগ না থাকায় দ্বিতীয় অংকের ১ম, ৩য়, ৫ম, চতুর্থ অংকের ২য়, পঞ্চম অংকের ১ম, ইত্যাদি দৃশ্য নাটককে ভারবাহী করে তুলেছে। প্রস্তাবনা অংশে সতীত্বের মাহাত্ম্য বর্ণনার পর, তৃতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে মান্ডব্য ও সনাতনের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সতীর মাহাত্ম্যের উপস্থাপনায় নাটকের মধ্যে একই ভাবযুক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে নাটক একঘেয়েমিতা দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছে। নাটকে অধিক সংখ্যক অপ্রয়োজনীয় দৃশ্যের অবস্থান সম্পর্কে মনে রাখা দরকার যে তৎকালীন দিনে নাটক পাঁচ ঘণ্টা ধরে অভিনীত হোত। অনেক সময় দর্শকদের সংগীত রস তৃষ্ণা নিবারণের জন্য শুধুমাত্র সংগীত প্রয়োগ দ্বারাই এক একটি দৃশ্য গঠনের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়েছিল। উপরন্তু এক দৃশ্য থেকে অপর দৃশ্যের পরিবর্তনের সময় দর্শকদের আকৃষ্ট করে রাখার জন্যও নতুন দৃশ্যের উপস্থাপনাও করা হোত। কারণ দীর্ঘ সময় ধরে নাটক দর্শণ না হোলে দর্শক সাধারণ সন্তোষ লাভ করতেন না। এর ফলে এ সকল দৃশ্যের সঙ্গে মূল কাহিনীর যোগ না থাকলেও এইভাবে দৃশ্য গঠন করাই ছিল তৎকালীন থিয়েটারের রীতি। নাট্যকারদের এ রীতি মেনে চলতে হত।

নাটকের প্রথম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজা অশ্বপতি ও মালবীর অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস ও দৈবনির্ভরশীলতা, অশ্বপতির দেব-দ্বিজে ভক্তি, প্রথম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে ও দ্বিতীয় অংকের পঞ্চম দৃশ্যে সতীধর্মের প্রচারের জন্য দেবী সাবিত্রীর অশ্বপতির গৃহে কন্যারূপে জন্মগ্রহণের ঘটনা, চতুর্থ অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে বনমধ্যে সংঘটিত বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার সমন্বয়, পঞ্চম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে বরদান ফলের ক্রিয়াশীলতা, ভবিষ্যৎবাণীর কার্যকারিতা, পঞ্চম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে সতীত্বের জয়—এ সকল উপাদানের সাহায্যে নাটকের মধ্যে পৌরাণিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা হয়েছে।

নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ ও পরিণতির গতিরেখা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রথম অংকের প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যে নাট্য ঘটনার প্রাথমিক পর্বের সূচনা হয়েছে। প্রথম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে উপযুক্ত পাত্রের খোঁজে সাবিত্রীর উদযোগ গ্রহণ ঘটনার মাধ্যমে নাটকের মধ্যে নাটকীয় ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করা হয়েছে। এরপর থেকে নাট্যক্রিয়া ক্রমশ

বিস্তার লাভ করতে থাকে। তৃতীয় অংকে পুরুষকারের দ্বারা দৈববিধানকে খণ্ডন করার জন্য সাবিত্রীর মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ, সতীব্রত উদ্‌যাপন, এ সকল ঘটনার মাধ্যমে নাট্যক্রিয়ার গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। চতুর্থ অংকে যমকে সন্তুষ্ট করে তাঁর কাছ থেকে তিনটি বরসহ সাবিত্রীর শতপুত্র লাভের ঘটনার দ্বারা নাট্যক্রিয়ার নির্বহনের প্রাক্‌মুহূর্তে নূতন উৎকণ্ঠাময় অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পঞ্চম অংকে সত্যবাণের পুনর্জীবনলাভের মধ্যে সতীত্বের অসীম শক্তিমত্তার প্রকাশের মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া পরিণতি লাভ করেছে।

উলুপী (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ) ঃ

পতি পরায়ণা রমণী যে কোন মূল্যে পতির মঙ্গল সাধনে ব্রতী হয়। নাটকের এই মূলগতভাবকে কেন্দ্র করে পাঁচটি অংকে ও একুশটি দৃশ্যে নাট্যবস্তু গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে গঙ্গার অভিশাপে অর্জুনের রৌরব-নরকবাস থেকে উদ্ধারের জন্য গঙ্গার বিধান অনুসারে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিজপুত্রের হাতে অর্জুনকে মারার পরিকল্পনা কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে উলুপীর উদযোগ গ্রহণের ঘটনাকে দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে নিজপুত্র ইলাবন্তকে অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিযুক্ত করার জন্য উলুপীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়া এবং উলুপীর নির্দেশে চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহন কর্তৃক অর্জুনের অশ্বমেধের ঘোড়া আটকানোর কাহিনী বিন্যস্ত। তৃতীয় অংকে চিত্রাঙ্গদার নির্দেশে অশ্বমেধের ঘোড়া ফেরত দিতে গিয়ে অর্জুনের কাছ থেকে বভ্রুবাহনের অপমানিত হওয়া ও উলুপীর নির্দেশে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের বিরুদ্ধে বভ্রুবাহনের যুদ্ধে সম্মত হওয়ার বৃত্তান্ত উপস্থাপিত করা হয়েছে। চতুর্থ অংকে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে ইলাবন্তের সঙ্গে যুদ্ধে ইলাবন্তকে নিধন করার জন্য বভ্রুবাহনকে উলুপীর উৎসাহিত করার ঘটনা বিধৃত হয়েছে। পঞ্চম অংকে বভ্রুবাহনের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুনের পতন ও মৃত্যু এবং প্রাণদায়ী মণির সাহায্যে উলুপীর অর্জুনকে পুনর্জীবিত করার ঘটনা দেখান হয়েছে।

নাটকে মূল ঘটনা ছাড়া অর্জুন পত্নী চিত্রাঙ্গদাকে কেন্দ্র করে একটি উপকাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। এই উপকাহিনীর দ্বারা মূলভাব 'পতি পরায়ণতা'কে আরও ঘনীভূত করা হয়েছে। নাটকের মূলভাবের (Root idea) সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্ক না থাকায় প্রথম অংকের ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ দৃশ্য, দ্বিতীয় অংকের ১ম ও ৩য় দৃশ্য, তৃতীয় অংকের ৪র্থ দৃশ্য—ইত্যাদি দৃশ্য নাটককে ভারগ্রস্ত করে তুলেছে। পঞ্চম অংকের শেষে পট পরিবর্তনের সাহায্যে যুদ্ধে মৃত ইলাবন্তের জগবন্ধুর কোলে আশ্রয়লাভের ঘটনার দ্বারা নাটকে ভক্তিভাবকে রসঘন করে তোলা হয়েছে এবং এর দ্বারা সমস্ত নাটকের মধ্যে একটা মেল-বন্ধন রচনা করা হয়েছে।

নারদের ভবিষ্যৎ বাণীর ক্রিয়াশীলতা (১।৪), গঙ্গার অভিশাপ (১।৭), জীবনপ্রদায়ী মণির অলৌকিক শক্তির কার্যকারিতা (১।২, ৫।৩), উলুপীর পতিভক্তি, দেব-দ্বিজে ভক্তি—এ সকলকে অবলম্বন করে নাটকের মধ্যে পৌরাণিক পরিমণ্ডল রচনা করা হয়েছে।

সমগ্র প্রথম অংকের মধ্যে নাটকের মুখ-পর্ব বিন্যস্ত। প্রথম অংকের চতুর্থ দৃশ্যে উলুপীর পুত্র শোকলাভ করা এবং স্বামীঘাতিনী হওয়া সম্পর্কে নারদের ভবিষ্যৎবানী দান-ঘটনা থেকে নাটকের শুরু। এরপর নাট্যক্রিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে থাকে। তৃতীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্যে অর্জুনের দ্বারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত বভ্রুবাহন কর্তৃক অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঘটনার মাধ্যমে নাট্যক্রিয়া আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। তৃতীয় অংকের চতুর্থ দৃশ্য থেকে পঞ্চম অংকের প্রথম দৃশ্য পর্যন্ত নাট্যক্রিয়া ক্রমহ্রাসমুখী হতে থাকে। পঞ্চম অংকের দ্বিতীয়, তৃতীয় দৃশ্যের মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া পরিণতি লাভ করে।

ভীষ্ম (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ) :

সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তি যে কোন মূল্যে নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন।

উপরোক্ত মূলগতভাবকে অবলম্বন করে ভীষ্ম নাটকের নাট্যবৃত্ত গড়ে উঠেছে। প্রস্তাবনা দৃশ্যে ছাড়া নাটকটি পাঁচটি অংক ও সাতাশটি দৃশ্যে বিন্যস্ত। প্রথম অংকে ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মের আজন্ম কুমার থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে বীর্যশুল্কে অম্বাকে গ্রহণ করা, বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে অম্বার বিবাহ দিতে চাওয়া এবং এ নিয়ে পরশুরামের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হওয়ার ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় অংকে প্রতিশোধ নেবার জন্য অম্বার মহাদেবের তপস্যা করা এবং তাঁর দেহান্তর গ্রহণের মধ্য দিয়ে প্রতিশোধ নেবার কথা বিধৃত হয়েছে। চতুর্থ অংকে অম্বার শিখণ্ডী রূপে জন্মগ্রহণ বৃত্তান্ত গ্রথিত হয়েছে। পঞ্চম অংকে শিখণ্ডীর সঙ্গে যুদ্ধে ভীষ্মের শরশয্যা ও মৃত্যুর ঘটনা দেখান হয়েছে।

ভীষ্মের কুমার-ব্রত ধারণ ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাঁর শরশয্যা ও মৃত্যুর প্রধান কাহিনী ব্যতীত (ক) ভীষ্ম ও দ্যুতির বিরহজনিত প্রণয়মূলক উপঘটনা ও (খ) শাল্ব-অম্বাকে আশ্রয় করে আরও একটি উপঘটনা—এই মোট দুটি উপঘটনা স্থান বিশেষে অভিনয়ের আকর্ষণ বৃদ্ধি করলেও—এই দুটি উপকাহিনীর দ্বারা মূল কাহিনী সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি।

দৃশ্য বিভাজনের ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় পরবর্তী দৃশ্য পূর্ববর্তী দৃশ্যের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ হয়ে ওঠেনি। পরবর্তী দৃশ্যের ফলাফল (৩।৫ দৃশ্য) পূর্ববর্তী দৃশ্যে (১।১ ও ৩।৪ দৃশ্য) ব্যক্ত করার জন্য নাটকের মধ্যে একমুখী উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা ব্যাহত হয়েছে। চতুর্থ অংকের প্রথম দৃশ্যে শিখণ্ডীর দ্বারা ভীষ্ম বধের বৃত্তান্তের উল্লেখ করা হয়েছে। এরফলে পরবর্তী দৃশ্যে (৪।৩, ৪।৫) ভীষ্ম ও শিখণ্ডীর প্রথম সাক্ষাতের সময় উভয়ের মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার উত্তুঙ্গমুখীনতা খর্ব হয়েছে। পঞ্চম অংকের চতুর্থ দৃশ্যে ভবিষ্যতে কৃষ্ণের হাতে ইচ্ছামৃত্যু—ভীষ্মের দেহাবসানের ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে। এর ফলে পঞ্চম অংকের সপ্তম দৃশ্যে ভীষ্মের অন্তিম অবস্থার সময় নাট্যঘটনার ঔৎসুক্য ঘনীভূত হয়ে উঠতে পারেনি। সর্বোপরি দৃশ্যের পুনরাবৃত্তিতে (৫.৭) নাট্যগীত মন্থর হয়ে পড়েছে। মূল কাহিনীর সঙ্গে যোগ না থাকায় ১।১, ২।২, ৩।১, ২, ৪, ৪।২, ৪, ৫।১, ২—এ সকল দৃশ্য নাটককে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

তৃতীয় অংকের পঞ্চম দৃশ্যে পরশুরাম ও ভীষ্মের সশস্ত্র সংগ্রামের ঘটনার মধ্য দিয়ে একদিকে ব্রাহ্মণের ক্ষমা ও ত্যাগধর্ম অপরদিকে ক্ষত্রিয়ের ক্ষাত্রধর্ম,—একদিকে শিষ্যের রণনিপুণতা ও জয়ের জন্য গুরু পরশুরামের চরমানন্দের প্রকাশ, অপরদিকে শাস্ত্রগুরু পরশুরামের পরাজয়ে শিষ্যের নিবীড় বেদনাবোধের পরিচয়ে দৃশ্যটি খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এই দৃশ্যের সাহায্যে গুরুর প্রতি শিষ্যের শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসা তথা হৃদয়াবৃত্তির এক অপূর্ব ভাবসঙ্গমের সৃষ্টি করা হয়েছে। চতুর্থ অংকের তৃতীয় দৃশ্যে ভীষ্মের মানসিক প্রতিফলন চিত্রণে, চতুর্থ অংকের পঞ্চম দৃশ্যে প্রতিশোধমুখী শিখণ্ডীরূপী অম্বার চরিত্রায়ণে দৃশ্যগুলি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

নাটকের প্রস্তাবনা দৃশ্যে অভিশাপের ক্রিয়াশীলতা, প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে অবতারবাদের প্রতিষ্ঠা (বিষ্ণুর অবতাররূপে পরশুরামের জন্ম), প্রথম অংকের প্রথম ও পঞ্চম অংকের চতুর্থ দৃশ্যে ভবিষ্যৎ বাণীর কার্যকারিতা, নাটকের মধ্যে একাধিক বরদানের ঘটনা (১। ৩, ৪। ১, ৫), ভাগ্যনিয়ন্ত্রণতা, প্রধান চরিত্রের দেব-দ্বিজে ভক্তি ও আস্থা (১। ১, ২। ৫, ৪। ৫, ৫। ৭) ব্রাহ্মণের ক্ষমা, ও নিঃসহায়কে সাহায্যদান (২। ৬), প্রধান চরিত্রের ন্যায়পরায়ণতা (১। ৩, ৫। ২), আকাশ হতে দেবী-দ্যুতির আবির্ভাবের অলৌকিকত্ব (৪। ৫), এ সকল উপাদানের সাহায্যে নাট্যকার পৌরাণিক পরিবেশকে গড়ে তুলেছেন।

নাট্যক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে নাটকের প্রস্তাবনা দৃশ্যে মূল ক্রিয়ার অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচয় দান করা হয়েছে। এর ফলে নাটকের ঔৎসুক্য ক্ষুন্ন হবার কথা। তবে পৌরাণিক নাটকের ঘটনা দর্শক এবং পাঠকদের কাছে পূর্ব পরিচিত। সেজন্য নাটকে পৌরাণিক কাহিনীর কোন কোন অংশ গ্রহণ করা হয়েছে প্রস্তাবনা দৃশ্যে সেটা বলে দেবার ব্যবস্থা হয়। এটা পৌরাণিক নাট্যরচনার রীতি। কারণ পৌরাণিক নাটকে কি ঘটনা থাকবে বা থাকবে না তার উপরেই ঘটনার ঔৎসুক্য নির্ভর করে না। ঔৎসুক্য নির্ভর করে সেই জানা ঘটনাকে নাট্যকার কিভাবে নাটকে উপস্থাপিত করছেন তার উপর। প্রথম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে ভীষ্মের আজন্ম ব্রহ্মচারী থাকার বাসনা গ্রহণ ঘটনার দ্বারা নাট্যক্রিয়ার মধ্যে নাটকীয়ত্বের সূচনা হয়েছে। এই ঘটনাই ক্রিয়াকে ক্রম-উর্ধ্বমুখী করে তোলে। দ্বিতীয় অংকের চতুর্থ দৃশ্যে ভীষ্ম কর্তৃক বীর্যশুল্কে আণীত অম্বাকে বিবাহে অস্বীকার করার ঘটনায় ক্রিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্বের ছায়াপাত ঘটতে থাকে। এই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে নাট্যসংকট বিস্তৃত হতে থাকে। কিন্তু নাট্যক্রিয়া গঠনের ত্রুটির জন্য নাট্য মধ্যস্থ এই দ্বন্দ্ব ও সংকট ঘনীভূত রূপ ধারণ করতে পারেনি। নাটকের তৃতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রথম সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। পরবর্তী তৃতীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্যে ও চতুর্থ অংকের তৃতীয় দৃশ্যে এই সংঘর্ষের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং পঞ্চম অংকের সপ্তম দৃশ্যে চূড়ান্ত সংঘর্ষে ভীষ্মের দেহবসানে নাট্য-ক্রিয়া পরিণতি লাভ করে।

শঙ্করাচার্য্য (গিরিশচন্দ্র ঘোষ) ঃ

ধর্মাচরণে অদ্বৈতবাদই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

নাটকের প্রস্তাবনা দৃশ্যে নাটকের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। পরে এই সিদ্ধান্তবাক্যকে অবলম্বন করে পাঁচটি অংকে এবং পঁয়ত্রিশটি দৃশ্যে নাট্য কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। প্রথম অংকে গুরু গোবিন্দের কাছে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হয়ে শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক সঠিক বেদান্ত ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য উদযোগ গ্রহণের ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংকে যথাক্রমে ভ্রষ্টাচারি বৌদ্ধ কাপালিকদের পরাস্ত করা এবং তর্কযুদ্ধে কর্মকাণ্ডবিদ মণ্ডণমিশ্রকে পরাজিত করার কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। চতুর্থ অংকে উভয়ভারতীকে শাস্ত্রালোচনায় পরাজিত করার ঘটনা বিধৃত হয়েছে। পঞ্চম অংকে কাপালিক উগ্রভৈরবকে দমন করার পর শঙ্করাচার্য কর্তৃক অভিনবগুপ্ত ও কাশ্মীরের সারদাপীঠের পণ্ডিতগণকে অদ্বৈতভাষ্য দানের মাধ্যমে সমগ্র ভারতবর্ষে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠার ঘটনা উপস্থাপিত করা হয়েছে।

নাটকের মূল বিষয়ের সঙ্গে যোগ না থাকায় প্রথম অংকের ২, ৩, ৬, দ্বিতীয় অংকের ১, ২, ৩, ৪, ৭, চতুর্থ অংকের ১, ৩, ৪, ৫, পঞ্চম অংকের ৭ দৃশ্যগুলি নাট্যগতিকে মন্থর করে তুলেছে।

নাটকে পৌরাণিক পরিমণ্ডল রচনায় নাট্যকারের বিশেষ উদযোগ লক্ষ্য করা যায়। ১ম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক মন্ত্রবলে স্রোতস্বিনীকে গৃহের সম্মুখে আনয়ণ, সপ্তম দৃশ্যে অশান্ত নর্মদাকে কমণ্ডলুতে ধারণ, দ্বিতীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্যে গঙ্গাবক্ষে শঙ্করাচার্য্যের প্রতি পদক্ষেপে পদ্মফুলের আবির্ভাব, চতুর্থ দৃশ্যে কমণ্ডলু থেকে জল নিক্ষেপ দ্বারা কাপালিকগণকে নিস্পন্দ করা, চতুর্থ অংকের প্রথম দৃশ্যে মৃত নরপতির দেহে শঙ্করাচার্য্যের প্রবেশ, পঞ্চম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে শঙ্করাচার্যের ধ্যান অনুসারে সনন্দনের হঠাৎ নৃসিংহরূপ ধারণ, পঞ্চম অংকের সপ্তম দৃশ্যে মুমূর্ষু মায়ের আহ্বানে বহু দূরাঞ্চল থেকে শঙ্করাচার্য্যের মাতৃসমীপে আসা, ইত্যাদি জনমত নির্ভরশীল অলৌকিক ঘটনাবলী সম্পর্কে মতদ্বৈততা থাকলেও নাটকের মধ্যে এ সকল ঘটনাই অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। দ্বিতীয় অংকের পঞ্চম দৃশ্যে অকস্মাৎ কুমারিল ভট্টের দেহে অগ্নির উদগীরণ, তৃতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে মন্ত্রবলে শিউলি কর্তৃক বৃক্ষের মস্তক অবণত করা, চতুর্থ অংকের পঞ্চম দৃশ্যে ধূলামুষ্ঠির সাহায্যে উগ্রভৈরবের বটবৃক্ষ ভষ্মীভূত করা,—এ সকল ঘটনার সাহায্যেও অলৌকিক শক্তির আধিপত্য বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এতদ্ব্যতীত শঙ্করাচার্যের দেবদ্বিজ ভক্তি, ধর্ম সংস্থাপনের জন্য মহাদেবের নবরূপ ধারণ (প্রস্তাবনা দৃশ্য ও দ্বিতীয় অংকের প্রথম দৃশ্য), মহামায়ার নারীরূপ ধারণ (প্রথম অংকের প্রথম ও ষষ্ঠ দৃশ্য), দৈববানীর ক্রিয়াশীলতা (পঞ্চম অংকের দশম দৃশ্য), ইত্যাদির দ্বারা নাটকে পৌরাণিক পরিবেশ রচনা করা হয়েছে।

প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যেই নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ লাভ করেছে। প্রথম অংকের সপ্তম দৃশ্যে গুরুদেব গোবিন্দর কাছ থেকে দীক্ষালাভ করে শঙ্করের সন্ন্যাসধর্ম

গ্রহণ-ঘটনা থেকে নাট্যক্রিয়া ক্রমশঃ উন্নত হতে থাকে। দ্বিতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে মহাদেব কর্তৃক শঙ্করকে অদ্বৈতজ্ঞান প্রচারের ভার গ্রহণের নির্দেশ, দ্বিতীয় দৃশ্যে ব্যাসদেব কর্তৃক শঙ্করকে সঠিক বেদান্তভাষ্য রচনার দায়িত্ব অর্পণ, এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া ক্রমশ গতিময় হয়ে ওঠে। অদ্বৈতজ্ঞান-এর বিস্তারের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য দ্বিতীয় অংকের চতুর্থ দৃশ্যে শঙ্করাচার্য কর্তৃক বৌদ্ধ কাপালিককে দমন, তৃতীয় অংকের অষ্টম দৃশ্যে কর্মকাণ্ডবিদ মণ্ডনমিশ্রকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করা, চতুর্থ অংকের সপ্তম দৃশ্যে কামকলায় পারদর্শী শঙ্করের নিকট উভয়ভারতীর পরাজয় গ্রহণ, পঞ্চম অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে উগ্রভৈরব সহ সকল কাপালিককে দমন—এসকল ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। নাট্য গঠনরীতির ত্রুটির জন্য এ সকল ঘটনার দ্বারা নাট্যক্রিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতজনিত ক্রিয়ার সংকটের উত্তুঙ্গ অবস্থা সৃষ্ট হতে পারেনি। পঞ্চম অংকের নবম দৃশ্যে কাশ্মীরের সারদাপীঠের পণ্ডিতগণকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করে ভারতবর্ষে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠার কার্য সম্পন্ন করার পর শিষ্যগণকে যথোপযুক্ত নির্দেশ দান করার (৫। ১০) মধ্যে ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটে।

তপোবল (গিরিশচন্দ্র ঘোষ) ঃ

একনিষ্ঠ তপস্যার দ্বারা চরিত্রের গুণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অভীষ্ঠ লাভ সম্ভব হয়।

এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে পাঁচটি অংকের মোট পঁয়ত্রিশটি দৃশ্যের সাহায্যে নাট্যবৃত্ত গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে যুদ্ধে বশিষ্ঠের কাছে পরাজিত বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভের বাসনা প্রকাশের কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে তপস্যার প্রভাবে বিশ্বামিত্রের রাজর্ষিত্ব লাভের ঘটনা দেখান হয়েছে, তৃতীয় অংকে মেনকা কর্তৃক বিশ্বামিত্রের সাধনায় বিঘ্ন উৎপাদন করার ঘটনা উপস্থাপিত করা হয়েছে। চতুর্থ অংকে শুনঃশেফকে বাঁচানোর জন্য আত্মত্যাগে উদ্যত বিশ্বামিত্রের মহর্ষিত্ব লাভ এবং পঞ্চম অংকে ক্ষমা গুণের অধিকার অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভের কাহিনী বিধৃত হয়েছে। বিশ্বামিত্র কর্তৃক তপস্যার দ্বারা রাজর্ষিত্ব, মহর্ষিত্ব লাভের পর ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভের মূল ঘটনা ব্যতিরেকে (ক) বিশ্বামিত্র-সুনেত্রার দাম্পত্য কাহিনী, (খ) রাজা ত্রিশঙ্কুর কাহিনী, (গ) বিশ্বামিত্র-মেনকা কাহিনী, (ঘ) কল্মাষপাদের পাপমুক্তির ঘটনা, (ঙ) রম্ভার অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভের ঘটনা, (চ) অম্বরিষের নরমেধ যজ্ঞের কাহিনী, (ছ) ব্রহ্মন্যদেব-সদানন্দের ঘটনা (জ) বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর কাহিনী,—এ সকল উপঘটনা নাটকে বিদ্যমান। এ সকল উপঘটনার মধ্যে ঘ, ছ, জ, উপকাহিনীর সঙ্গে মূল কাহিনীর যোগ নেই। নাট্য কাহিনী গ্রন্থনায় নাট্যকার পূর্বাপর গতানুগতিকতায় আশ্রয় গ্রহণ করেছেন[৬৩] এবং উপকাহিনীর ভারে নাটকের গতি স্থানে স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

নাটকে বিধৃত (চ) উপকাহিনী অনুযায়ী অম্বরিষের নরমেধ যজ্ঞের জন্য আনা শুনঃশেফকে বাঁচানোর নিমিত্ত বিশ্বামিত্রের আত্মোৎসর্গের ঘটনার সঙ্গে 'ঐতরেয়

ব্রাহ্মণ' এবং রামায়ণে উল্লিখিত এতদসম্পর্কিত ঘটনার মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। নাটকের মধ্যে এই উপ-ঘটনার সংযোজনার ক্ষেত্রে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র স্বীয় কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

মূল কাহিনীর সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্ক না থাকায় ১।৪, ৫, ২।১, ৩,৫,৬,৯, ৩।২, ৩, ৪,৫,৬, ৪।৫, ৬, ৫।৪—এ সকল দৃশ্যমধ্যস্থ ঘটনার দ্বারা নাটকে সংহতি ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে।

নাটকের ১।১ দৃশ্যে কামধেনু শবলার এক এক হুঙ্কারে তার সর্বাঙ্গ হতে নানা বর্ণের সৈন্য সৃষ্টি, ২।৭, দৃশ্যে ত্রিশঙ্কুর শূন্যে অবস্থান, ৩।৬ দৃশ্যে অগ্নিকুণ্ড হতে অগ্নিদেবের আবির্ভাব, ৪।২ দৃশ্যে তুষারবৃতস্থানে হঠাৎ কুসুম বিকাশসহ বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব, ৪।৭ দৃশ্যে বলির জন্য উদ্যত খড়্গ হঠাৎ ভেঙে যাওয়া, ৫।১ দৃশ্যে হিমালয় পর্বতে তপঃ প্রভাবে চতুর্দিকে অগ্ন্যুৎপাদন—এসকল অলৌকিক ঘটনার দ্বারা নাটকে পৌরাণিক পরিমণ্ডল রচনা করা হয়েছে। তদুপরি দেবতাদের ইচ্ছামত নবরূপ ধারণ করে মর্ত্তে আগমণ (২।৫), অভিশাপের কার্যকারিতা (২।৩, ২।২) ব্রাহ্মণের কৃপায় অভিশাপমুক্ত হওয়া (৩।৫), আকাশবানীর প্রয়োগ (৩।৫), সতীত্বের জয় (৪।৫, ৪।৬), ব্রাহ্মণের ক্ষমাধর্মের ক্রিয়াশীলতা, আর্তের ত্রাণ (৪।৪)—এ সকল ঘটনা পৌরাণিক পরিমণ্ডলকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

নাটকের প্রথম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে বশিষ্ঠের কাছে পরাজিত বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভের বাসনা প্রকাশের ঘটনা থেকে নাট্যক্রিয়ার মধ্যে নাটকীয়ত্বের সঞ্চার হয়েছে। ঐ বাসনার চরিতার্থতার জন্য ২।১ দৃশ্যে তপঃ সাধনার দ্বারা বিশ্বামিত্রের রাজর্ষিত্ব লাভ, নাট্যক্রিয়াকে উর্ধ্বগতি দান করেছে। ক্রিয়ার ক্রমোন্নতির সময় বিশ্বামিত্র কর্তৃক জড়শক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে নতুন স্বর্গের সৃষ্টি (২।৭, ৮), রিপুর বশবর্ত্তী হয়ে মেনকার সংসর্গ লাভ করা (৩।৪), সাধনায় বিঘ্ন সম্পাদনের জন্য রম্ভার উম্মাদনার সৃষ্টি, এ সকল ঘটনার মাধ্যমে নাট্যক্রিয়া ক্রমশঃ বহির্দ্বন্দ্বময় হয়ে ওঠে। পঞ্চম অংকের ষষ্ঠ দৃশ্যে বিশ্বামিত্র কর্তৃক আয়োজিত বশিষ্ঠের বিনাশযজ্ঞে বশিষ্ঠের আত্মাহুতি দানের ঘটনাটি খুবই সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি করে নাটকের উৎকণ্ঠাকে একমুখী করে তোলে এবং পরিশেষে ব্রাহ্মণের প্রকৃত গুণ ক্ষমাধর্ম অর্জনের দ্বারা বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভের মধ্যে নাট্যক্রিয়া পরিণতি লাভ করে।

ঐন্দ্রিলা। (মনোমোহন রায়) ঃ

স্ত্রীর অন্যায় আবদারে পরস্ত্রীকে লাঞ্ছিত করলে সর্বনাশ হয়। এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে ঐন্দ্রিলা নাটকের নাট্যবৃত্ত রচিত হয়েছে। নাটকটি পাঁচটি অংকে এবং তিরিশটি দৃশ্যে গঠিত। প্রথম অংকে ঐন্দ্রিলার অভিলাষ অনুযায়ী ইন্দ্রপত্নী শচীকে হরণ করে তাঁকে তার দাসীরূপে নিয়ে আসার জন্য—ঐন্দ্রিলার নিকট বৃত্রাসুরের প্রতিশ্রুতি দানের ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে শচীকে ধরতে গিয়ে নৈমিষ কাননে দৈত্য সেনাপতি দূষণের মৃত্যুর কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। তৃতীয় অংকে বৃত্রাসুর-পুত্র রুদ্রপীড়ের সঙ্গে যুদ্ধে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের মূর্চ্ছা এবং

বৃত্রাসুর বধের জন্য গৌরীর শঙ্করের উপাসনার কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। চতুর্থ অংকে রুদ্রপীড়ের হস্তে বন্দী শচীকে ঐন্দ্রিলার লাঞ্ছনা দান ও বৃত্রাসুর বধের জন্য দধিচী অস্থি সংগ্রহের নিমিত্ত ইন্দ্রের দধিচী আশ্রমে গমনের কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। পঞ্চম অংকে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে পুত্র রুদ্রপীড় ও স্বামী বৃত্রাসুরের মৃত্যুতে শোক-সন্তপ্তা ঐন্দ্রিলার মন্দাকিনী নদীতে আত্মবিসর্জনের ঘটনা দেখান হয়েছে।

স্ত্রীর মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য বৃত্রাসুর কর্তৃক ইন্দ্রপত্নী শচীকে হরণ করে তাঁকে লাঞ্ছিত করা এবং ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে বৃত্রাসুরের মৃত্যুসহ সমগ্র পরিবারের শোচনীয় পরিণামের মূল কাহিনী-ভিন্ন ইন্দুবালা-রুদ্রপীড়কে আশ্রয় করে নাটকে একটি উপকাহিনীও গড়ে উঠেছে। এই উপকাহিনীর দ্বারা বৃত্রাসুর পত্নী ঐন্দ্রিলা ও রুদ্রপীড় পত্নী ইন্দুবালার মধ্যে চরিত্রগত বৈপরীত্য সৃষ্টির দ্বারা নাটককে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে।

পুরাণের বৃত্রাসুর বধ আখ্যায়িকাকে কেন্দ্র করে নাট্যগঠনের ক্ষেত্রে নাট্যকার হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে প্রেরণালাভ করেছেন।[ক] সেক্ষেত্রে নাট্যবস্তুর মূলকাহিনী, চরিত্র ও সংলাপ রচনায় হেমচন্দ্রের প্রভাব থাকলেও তাঁর নাট্যশৈলী 'বৃত্রাসুর বধের' অবিকল অনুকরণ নয়।

নাট্য গঠনে দৃশ্যবিন্যাসের ক্ষেত্রে পারস্পরিক আদি-মধ্য-অন্ত যোগ রক্ষিত হয়নি। এর জন্য নাটকের আয়তন অতি বিস্তৃত হয়ে পড়েছে ও নাট্য ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। দৃশ্যের মধ্যে উপস্থাপিত ঘটনার সঙ্গে মূলভাবের যোগ না থাকায় অনেক দৃশ্যই দৃশ্যই নাটকের গল্প গড়ে তোলার ও চরিত্রের বিকাশ সাধন করার ক্ষেত্রে উপযোগী হয়ে ওঠেনি। এইজন্য ১।২, ৩, ২।৪, ৫, ৩।২, ৪, ৪।২, ৩, ৫।২—এ সকল দৃশ্যগুলি নাট্যবস্তুগঠনে অনাবশ্যক হয়ে পড়েছে। পঞ্চম অংকের ষষ্ঠ দৃশ্যে দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রাকমুহূর্তে সংশয়াতুর বৃত্রাসুরকে ঐন্দ্রিলার প্রেরণা দানের ঘটনা এবং ঐ অংকের অষ্টম দৃশ্যে ঐন্দ্রিলার স্ত্রীসত্বা ও মাতৃসত্বার নিষ্পেষণে প্রতিশোধ স্পৃহার জাগরণের ঘটনা নাটককে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

নাটকের প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে নিয়তিবাদের ক্রিয়াশীলতা, পুরুষকার অপেক্ষা দৈবশক্তির প্রাধান্য, ভবিষ্যৎবানীর কার্যকারিতা (৩।৫), সতীশক্তির মাহাত্ম্য বর্ণন (৩।২), অলৌকিক শক্তির প্রভাবে মায়াকাননের সৃষ্টি (২।৬), সংহার ত্রিশূল হরণ করার জন্য আকাশপথে শ্বেতহস্তের আবির্ভাব (৫।৭)—এ সকল উপাদানের সাহায্যে নাটকে পৌরাণিক রঙ আরোপ করা হয়েছে।

নাটকের প্রথম অংকেই নাটকের মুখপর্ব গঠিত। প্রথম অংকের পঞ্চম দৃশ্যে ঐন্দ্রিলার ইচ্ছাপূরণের জন্য শচীকে ধরে আনার ব্যাপারে বৃত্রাসুরের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঘটনা থেকে নাট্যক্রিয়ার গতির সঞ্চার ঘটে। দ্বিতীয় অংকে শচীকে ধরতে গিয়ে

ক—বৃত্রাসুর বধ কাব্য হেমচন্দ্রকে অমর করিয়াছে। স্বর্গগত হেমচন্দ্রে পরবর্তী বঙ্গীয় লেখকদিগের হৃদয়েও তাঁহার ঐন্দ্রিলা বা বৃত্র বা ইন্দুবালার আধিপত্য বড় কম নহে।" —নাটকের ভূমিকা

নৈমিষ কাননে দৈত্য সেনাপতি দূষণের মৃত্যুতে নাট্যক্রিয়া ক্রমশঃ উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে বিস্তৃত হতে থাকে। তৃতীয় অংকে রুদ্রপীড়ের হস্তে শচীর বন্দীত্ব ঘটনার মধ্যে নাটকের সংকট ঘনীভূত হয়। চতুর্থ অংকে ১ম ও ষষ্ঠ দৃশ্যে শচীর প্রতি ঐন্দ্রিলার অশালীন ব্যবহার ও লাঞ্ছনাদানের মধ্য দিয়া নাট্যক্রিয়া ক্রমহ্রাসমুখী হয়ে পড়ে। পঞ্চম অংকে ইন্দ্রের হস্তে রুদ্রপীড় ও বৃত্রাসুরের মৃত্যুতে নাট্যক্রিয়া পরিণতি লাভ করে। পঞ্চম অংকের নবম দৃশ্যে ঐন্দ্রিলার আত্মবিসর্জনের ঘটনার মাধ্যমে নাট্যকার শিল্পগত আদর্শের বিচার (Poetic justice) সম্পন্ন করেছেন।

বিশ্বামিত্র (হরিশ্চন্দ্র সান্যাল) ঃ

'তপোবল' নাটক প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে (২৬·৮·১৯১১) হরিশচন্দ্র সান্যালের 'বিশ্বামিত্র' নাটকের কথা উল্লেখযোগ্য।

সাধনার দ্বারা সর্বরিপু দমন এবং ক্ষমাগুণের অধিকারী হলেই ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করা যায়—এই মূল ভাবকে কেন্দ্র করে নাটকটি গড়ে উঠেছে। পাঁচটি অংকে এবং তিরিশটি দৃশ্যে নাট্যকাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। প্রথম অংকে বশিষ্ঠের কামধেনুকে কেন্দ্র করে বশিষ্ঠের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে পরাজিত বিশ্বামিত্র কর্তৃক যোগবল লাভের দ্বারা বশিষ্ঠকে পরাজিত করার ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে শিব প্রদত্ত পাশুপত অস্ত্রের দ্বারা বশিষ্ঠ নিধনে ব্যর্থ বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভের জন্য তপোমগ্ন হওয়া ও মেনকার প্রতি আসক্তিতে তপোঃভঙ্গ হবার ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে। তৃতীয় অংকে মেনকার প্রতি বিশ্বামিত্রের মোহভঙ্গ, ও সাধনার দ্বারা রাজর্ষিত্ব লাভের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। চতুর্থ অংকে অম্বারষের নরমেধ যজ্ঞে শুনঃশেফকে বাঁচাবার জন্য বিশ্বামিত্রের আত্মোৎসর্গের দ্বারা মহর্ষিত্ব লাভের কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। পঞ্চম অংকে ক্ষমাগুণের অধিকারী হওয়ার দ্বারা বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মর্ষিত্ব অর্জনের কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। সাধনার দ্বারা বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভের মূল ঘটনা ব্যতিত নাট্য কাহিনীতে (ক) বিশ্বমিত্র-শতদ্রুমি'র দাম্পত্য জীবনের ঘটনা, (খ) ত্রিশঙ্কুর স্বর্গারোহণের ঘটনা, (গ) বিশ্বামিত্র মেনকার ঘটনা, (ঘ) বিশ্বামিত্র-রম্ভার ঘটনা (ঙ) অম্বরিষের নরমেধ যজ্ঞের ঘটনা—এ সকল উপঘটনা বিদ্যমান। এ সকল উপকাহিনীর মধ্যে 'ক' উপকাহিনীর সঙ্গে মূল কাহিনীর কোন যোগ নেই। 'খ' 'গ' 'ঘ' উপকাহিনীর অতি বিস্তৃতি নাট্যসংহতিকে ব্যাহত করেছে। সংসারে ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার জন্য বিশ্বামিত্রের মাধ্যমে সংসার জগতে তার প্রতিষ্ঠা পরিকল্পনার বিষয়টি নাটকের প্রথম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে 'যোগমায়া-নারদ' মুখে ব্যক্ত হয়েছে।[ক] কিন্তু পরবর্তী

ক—যোগমায়া—বৎস ঃ আবার বলি ব্রাহ্মণত্ব উদ্ধারের উপায় বিধান কর।

নারদ···বিশ্বামিত্র তপোবনে

নারদ আমার নাম

অঘটন ঘটাই ধরায়—

হেরি নান্দীপাঠে কি করে নারদ—১।২ 'বিশ্বামিত্র'

ঘটনার বিন্যাসের মধ্যে নাটকীয়ত্বের অভাবে এ সম্পর্কিত নাট্য কৌতূহলকে ধরে রাখা যায়নি। সেক্ষেত্রে তপোবল নাটকের প্রথম অংকের মধ্যে বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভের বাসনার প্রকাশের ঘটনা অধিক আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে পাশুপত অস্ত্রদ্বারা বশিষ্ঠ নিধনে ব্যর্থ বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভের বাসনা থেকে নাট্যক্রিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে থাকে এবং বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে ক্রিয়া পরিণতি লাভ করে। বিশ্বামিত্র কর্তৃক আয়োজিত বশিষ্ঠ নিধন যজ্ঞের ঘটনাটি তপোবল নাটকের নাট্য সঙ্কটকে ঘনীভূত করে তুলেছে (৫।৬ দৃশ্য)। আলোচ্য নাটকে ৫।৩ এবং ৫।৪ দৃশ্য জুড়ে এই ঘটনা বিন্যস্ত থাকলেও নাট্য-গঠনের ত্রুটির জন্য নাট্যসঙ্কট ঐরূপ উত্তুঙ্গ হয়ে ওঠেনি। উপরন্তু ৫।২ দৃশ্যে স্বয়ং বশিষ্ঠ কর্তৃক বিশ্বামিত্রকে উপবীত দানের মাধ্যমে বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মর্ষিত্ব দান এবং বিশ্বামিত্রের সেই দানকে প্রত্যাখানের দ্বারা বিশ্বামিত্রের প্রতি বশিষ্ঠের এবং বশিষ্ঠের প্রতি বিশ্বামিত্রের মনোভাব পূর্ব থেকে ব্যক্ত হবার ফলে পরবর্তী ৫।৩ এবং ৫।৪ দৃশ্যে বিশ্বামিত্র কর্তৃক আয়োজিত বশিষ্ঠের মারণ যজ্ঞে বশিষ্ঠের আহূতি দান দৃশ্যের নাটকীয় উৎকর্ষতা ক্ষুন্ন হয়ে পড়েছে। বশিষ্ঠের উপবীত দানকে প্রত্যাখান করার পর বিশ্বামিত্র পুনরায় তপস্যায় রত হন এবং ধ্যান নেত্রে বশিষ্ঠের চতুবর্গ ব্রহ্মার রূপ সন্দর্শন করেন। এই ঘটনার মাধ্যমে নাটকীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টির দ্বারা নাট্য পরিণতির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। মূল ঘটনার সঙ্গে কার্য-কারণ সম্পর্ক না থাকায় নাটকের ২।১, ৩, ৪, ৩।১, ৬, ৪।১, ৫, ৬, ৫।১ দৃশ্যগুলি নাট্যগতিকে স্থানে স্থানে মন্থর করে তুলেছে। নাটকে পৌরাণিক পরিমণ্ডল রচনার জন্য নাট্যকার আকাশবানী (২।৫), সতীত্বের জয় (৩।১), মন্ত্রশক্তির কার্যকারিতা (৪।১), অভিশাপের ক্রিয়াশীলতা (৩।৩, ৪।৩, ৫।৩), বিভিন্ন অলৌকিক শক্তির উপস্থাপনা, —এ সকল উপাদানের সাহায্যে গ্রহণ করেছেন।

জয়দেব (হরিপদ চট্টোপাধ্যায়)ঃ

শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার—নাটকের এই মূলগতভাব অবলম্বনে নাট্যকাহিনী রচনা করা হয়েছে। প্রস্তাবনা দৃশ্যে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাট্যকাহিনী গ্রন্থনার মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়েছে।[ক] প্রস্তাবনা দৃশ্য ছাড়া নাটকে পাঁচটি অংক ও :৪টি দৃশ্য বিদ্যমান। প্রথম অংকে আশৈশব জয়দেবের কৃষ্ণভক্তির প্রকাশে শঙ্কিত রাজগুরু কর্তৃক রাজা লক্ষণসেনকে বৈষ্ণব

ক—শ্রীকৃষ্ণ…কলিযুগে ধন্য কেন্দুবিল্বগ্রাম অজয় পুলিনে,
তথা জয়দেব নামে পণ্ডিত অগ্রণী,
মহাকবি দ্বিজ চূড়ামণি—
শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্যে—
করিবে কীর্তন সমগুণগান
প্রেমামৃত গান করিবে ধরার জীব।।—প্রস্তাবনা দৃশ্য, জয়দেব।

ধর্মবিরোধী করে তোলার ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে কৃষ্ণ দর্শনের জন্য ব্যাকুল জয়দেবের পদধূলির স্পর্শে রাজা লক্ষ্মণ সেনের অসুস্থ পুত্রের আরোগ্য লাভের ঘটনায় লক্ষ্মণ সেনের বৈষ্ণব ধর্মাসক্ত হয়ে পড়ার কাহিনী উপস্থিত করা হয়েছে। তৃতীয় অংকে জয়দেবের গীতগোবিন্দ রচনা এবং পদ্মাবতীর সঙ্গে জয়দেবের বিবাহের কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। চতুর্থ অংকে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক জয়দেবের গীত-গোবিন্দের পদপূরণের ঘটনা দেখান হয়েছে। পঞ্চম অংকে রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে পদ্মাবতী-জয়দেবের মিলন দৃশ্য বিধৃত হয়েছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ রচনা ও কৃষ্ণের দর্শন লাভের মূল ঘটনার সঙ্গে 'পরাশর বিমলাকে' আশ্রয় করে একটি উপঘটনা বিদ্যমান। এর দ্বারা মূল কাহিনীর পতিভক্তি ও দেবভক্তির ভাবকে ঘনীভূত করা হয়েছে।

নাট্যকার নাটকের মধ্যে স্বপ্নাদেশ (১।৪), দৈববানী (২।৬), ও অলৌকিক ঘটনার উপস্থাপনা করেছেন। রাধার দেহ হতে পদ্মার উৎপত্তি (প্রস্তাবনা), শূন্যে শ্রীকৃষ্ণের ছায়ার বিকাশ (১।৩), জয়দেবের মাহাত্ম্যে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির নির্বাপিত হওয়া (১।৩), জয়দেবের হরিসংকীর্তনে রাজা লক্ষ্মণের মৃত পুত্রের প্রাণলাভ (২।৭), শূন্যে কৃষ্ণের দশমূর্ত্তি ধারণ (৩।৩), সমুদ্রবক্ষে জয়দেবের অশ্রু হতে কনকপদ্মের উৎপত্তি ও সমুদ্রবক্ষে গীতগোবিন্দ বক্ষে নিয়ে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব (৩।৫), শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গীতগোবিন্দের পদপূরণ, অজয়ের কদম্ব ঘাটে গঙ্গার আবির্ভাব (৫।১), জয়দেবের কাটা হাত জুড়ে যাওয়া—এ সকল ঘটনা খুবই উল্লেখযোগ্য। নাট্যবৃত্তের গঠন অনুযায়ী নাট্যক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে মাধবের পায়ে নিজেকে বাঁধা দেবার জন্য জয়দেবের বাসনার প্রকাশের মধ্য দিয়ে ক্রিয়ার আরম্ভ হয়েছে। এরপর ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে ক্রিয়ার বিস্তৃতি ঘটেছে। কাহিনীর মধ্য দিয়ে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে ক্রিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব সঙ্কট দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। মূল ক্রিয়ার সঙ্গে কার্যকারণ যোগ না থাকায় ১।২, ৬, ২।২, ৪, ৩।২।৭, ৪।১, ৬, ৫।৪ —এ সকল দৃশ্য নাটককে ভারগ্রস্ত করে তুলেছে এবং এরফলে নাট্যক্রিয়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

চক্রবীর (ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) ঃ

সন্তানের অকালমৃত্যুতে সমগ্র পরিবার দুঃখের সাগরে পতিত হয়।

প্রথম অংকে আসন্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে মায়ের নিকট হতে ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য সম্বন্ধে অভিমন্যুর অবহিত হওয়ার ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে চক্রব্যূহ যুদ্ধে অভিমন্যুর সেনাপতির ভার গ্রহণের কাহিনী বিন্যস্ত। তৃতীয় অংকে পান্ডব পরিবার থেকে বিদায়গ্রহণ করে অভিমন্যুর রণযাত্রা ও চক্রব্যূহ মধ্যে প্রবেশের কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। চতুর্থ অংকে চক্রব্যূহ যুদ্ধে অভিমন্যুর মৃত্যুর ঘটনা উপস্থাপিত করা হয়েছে। পঞ্চম অংকে অভিমন্যুর মৃত্যুতে পান্ডব পরিবারে শোক-বিলাপের ঘটনা দেখান হয়েছে।

কৌরবের বিরুদ্ধে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে চক্রব্যূহ যুদ্ধে অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও মৃত্যু বরণের মূলকাহিনী ভিন্ন নাট্যবৃত্তে (ক) অভিমন্যু-রোহিনী কাহিনী, (খ) কর্ণ-কুন্তি কাহিনী, (গ) সোমদাস-প্রবর কাহিনী—এই তিনটি উপকাহিনী বিদ্যমান। এতগুলি উপকাহিনীর ভারে নাট্যগতি স্থানে স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং পরিণতিতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

মূলভাবের সঙ্গে যোগ না থাকায় ১।১, ৩, ৫, ২।২, ৩,৬, ৩।২, ৩, ৪।১, ৩, ৬, ৫।১—এসকল দৃশ্য অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। এর ফলে নাট্যসংহতি ব্যাহত হয়েছে। দ্বিতীয় অংকের ষষ্ঠদৃশ্যে কুন্তী কর্তৃক কর্ণকে মাতৃপরিচয়দানের ঘটনার উপস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' কাব্যের প্রভাব বিদ্যমান।

প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে অদৃষ্টবাদের প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্যে গর্গ ঋষির অভিশাপের ক্রিয়াশীলতা, আশ্রয়প্রার্থী রোহিনীকে আশ্রয় শিবিরে আশ্রয় দান, চতুর্থ অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে অলৌকিক শক্তির বলে রোহিনী কর্তৃক কর্ণের সম্মুখে তাঁর ভবিষ্যৎ নিধনের চিত্রপ্রকাশ, এই অংকেরই চতুর্থ দৃশ্যে চক্রব্যূহ যুদ্ধে দেহত্যাগের পর দিব্যরথে ও দিব্যদেহে রোহিনীর সঙ্গে অভিমন্যুর শূন্যপথে গমন—এ সকল ঘটনার দ্বারা সমগ্র নাট্যকাহিনীতে পৌরাণিক রঙ লাগানো হয়েছে।

প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যেই পুরাণ কাহিনীর কোন অংশ নাট্যকার গ্রহণ করেছেন তা বলা হয়েছে এবং মূল কাহিনীর সংক্ষিপ্তসারের কথাও আলোচিত হয়েছে। এরদ্বারা নাট্যকার পৌরাণিক নাটকের বিশেষ রীতি গ্রহণ করলেও নাট্য ঘটনার মধ্য দিয়ে সেই কাহিনীর নাটকীয় উৎকর্ষ যথোপযুক্তভাবে সাধন করতে পারেন নি। ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া দ্বন্দ্বহীনভাবে পরিণতি লাভ করেছে।

রামানুজ (অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) ঃ

বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও তার প্রতিষ্ঠা—এই মূল ভাবকে কেন্দ্র করে নাট্যবৃত্ত রচনা করা হয়েছে। নাটকে পাঁচটি অংক ও সাঁইত্রিশটি দৃশ্য বিদ্যমান। প্রথম অংকে বাল্যকাল থেকে লক্ষ্মণের দ্বৈতবাদী ধর্মজ্ঞানের প্রকাশ ও তাঁর নিকট অদ্বৈতবাদী যাদব প্রকাশের পরাজয়ের কাহিনী-বিন্যস্ত। দ্বিতীয় অংকে দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব প্রধান যামুনাচার্যের তিনটি বাসনাপূরণের জন্য লক্ষ্মণের সম্মতিদান এবং তাঁর দেহাবসানের পর দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব কর্ণধার রূপে লক্ষ্মণের অভিষেকের ঘটনা দেখান হয়েছে। তৃতীয় অংকে 'গোষ্ঠীপূর্ণে'র কাছ থেকে রামানুজের কৃষ্ণমন্ত্র লাভ এবং যামুনাচার্যের প্রধান শিষ্যগণ কর্তৃক তাঁকে 'রামানুজ' নাম-দানের ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে। চতুর্থ অংকে রামানুজের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অদ্বৈতবাদী অজগর পণ্ডিত ও দ্বিগ্বিজয়ী যজ্ঞমূর্তির পরাজয় এবং তাঁদের রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণের দ্বারা বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তার লাভের ঘটনা গ্রথিত হয়েছে। পঞ্চম অংকে দাক্ষিণাত্যের শৈবধর্মী চোলরাজার বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ এবং দাক্ষিণাত্যের সমগ্র বিষ্ণুমন্দিরে দিল্লীর সম্রাট-দুহিতা লচিমার বিগ্রহ স্থাপন ও পূজার নির্দেশ দানের দ্বারা রামানুজ কর্তৃক সকলধর্ম অপেক্ষা বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন ও সমগ্র দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠার কাহিনী দেখান হয়েছে।

রামানুজ কর্তৃক অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের দ্বারা সমগ্র দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠার প্রধান কাহিনী ছাড়া নাটকে (ক) ব্যাধ ও ব্যাধপত্নীর কাহিনী, (খ) কার্পাসা, কার্পাসাপত্নী ও জয়শীলকে অবলম্বন করে একটি কাহিনী (গ) দিল্লীর সম্রাট-দুহিতা লচিমাকে আশ্রয় করে আরও একটি কাহিনী—এ সকল তিনটি উপকাহিনী বিদ্যমান। (ক) উপকাহিনীর সঙ্গে মূল ঘটনার যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনা হয় নি। (খ) এবং (গ) উপকাহিনীদ্বয় মূল কাহিনীর ভাবগত পরিপ্রেক্ষিতকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে।

প্রথম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে লক্ষ্মণের পাদস্পর্শে কাঞ্চী রাজকুমারীর ব্রহ্মশাপ মুক্তি লাভের ঘটনা দেখান হয়েছে। এই ঘটনার দ্বারা লক্ষ্মণের নিকট অদ্বৈতবাদী যাদব প্রকাশের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়ার মধ্যে নাটকীয়ত্বের সূচনা হয় এবং এর পর বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরার ভিতর দিয়ে নাটক পরিণতি লাভ করে। নাটকের ২।৫ দৃশ্যে দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব কর্ণধাররূপে লক্ষ্মণের প্রতিষ্ঠা, ৩।৭ দৃশ্যে জীবসেবায় আত্মমগ্ন লক্ষ্মণের রামানুজ নাম লাভ, ৫।৫ দৃশ্যে রামানুজের আহ্বানে দিল্লীর সম্রাট দুহিতার আরাধ্য মৃন্ময় রমাপ্রিয় মূর্ত্তির চিন্ময় রূপ ধারণ,—এ সকল দৃশ্যগুলি নাট্যক্রিয়ার গতিমুখে স্থানে স্থানে বিশেষ নাট্যমুহূর্তের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এ সকলের দ্বারা সামগ্রিকভাবে নাট্যক্রিয়া দ্বন্দ্ব ও সঙ্কটময় হয়ে ওঠে নি। নাটকের মূলভাবের সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্ক না থাকায় ১।৪, ৬, ৭, ২।১, ২, ৪, ৩।১, ২,৩,৪,৬, ৪।৪, ৮, ১০, ৫।২—এ সকল দৃশ্যগুলি নাট্যক্রিয়াকে ভারগ্রস্ত করে তুলেছে। নাটকের মধ্যে দৈববানী (১।৩), আকাশবানী (৩।৫), অভিশাপের কার্যকারিতা (৩।২), এবং কয়েকটি দৃশ্যে (১।৩, ৪।২, ৮, ৫।৭) দ্বৈতবাদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের জন্য নানান রকম অলৌকিক শক্তির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এ সবের দ্বারা দ্বৈতবাদীর ক্ষমতা প্রকাশের চেষ্টা করা হলেও মূল নাট্যক্রিয়ার বিশেষ সমৃদ্ধি সাধন করা সম্ভব হয়নি। নাটকে ভক্তির ভাবকে স্থান দেবার জন্যই এগুলি গৃহীত হয়েছে।

● ঐতিহাসিক নাটকের বস্তু গঠনের বিশ্লেষণ :

বঙ্গে প্রতাপাদিত্য : (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ) :

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রচেষ্টা দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের জন্য ব্যর্থ হয়ে যায়। —এই মূল ভাবকে অবলম্বন করে পাঁচটি অংকে এবং উনত্রিশটি দৃশ্যের মাধ্যমে নাট্যবস্তু গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে দিল্লীশ্বরের প্রতি প্রতাপের বৈরী মনোভাবের পরিবর্তনের জন্য বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় কর্তৃক তাকে আগ্রায় প্রেরণের ঘটনা উপস্থাপিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে আগ্রায় যাবার পথে নবাব তহশীলদারের আক্রমণের হাত থেকে প্রতাপ কর্তৃক কল্যানীর মর্যাদা রক্ষার কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। তৃতীয় অংকে যশোরেশ্বর হিসাবে আকবরের কাছ থেকে প্রতাপের ফরমান লাভ এবং

শেরখাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভূঁইয়া হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার ঘটনা দেখান হয়েছে। চতুর্থ অংকে প্রতাপের সঙ্গে যুদ্ধে পর্যুদস্ত মোঘল সেনাপতি আজম খাঁর সন্ধি স্থাপনের ঘটনা গ্রথিত হয়েছে। পঞ্চম অংকে যশোরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোঘল সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও ভবানন্দের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রতাপের পরাজয়ের কাহিনী সংকলিত হয়েছে। নাটকের ক্রোড়াঙ্কে বন্দী প্রতাপাদিত্যকে বিজয়ার সান্ত্বনা ও আশ্বাস-বাণী দানের ঘটনা দেখান হয়েছে।

যশোরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোঘলের বিরুদ্ধে প্রতাপের সংগ্রাম ও পরাজয় বরণের মূল ঘটনা ব্যতীত নাটকে (ক) "শঙ্কর-কল্যানী" ও (খ) "বিজয়া-প্রতাপ"—এই দুইটি উপকাহিনী বিদ্যমান। মূল কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনী-দ্বয়ের সংযোগ না থাকায় এর দ্বারা নাটক ভারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে ও নাট্যক্রিয়ার গতি ব্যাহত হয়েছে। বাস্তববোধকে উপেক্ষা করে নাট্যকার কল্পনার আতিশয্যে 'বিজয়া-প্রতাপ' উপকাহিনীর অধিক বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন। এতে নাট্যসংহতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। নাটকের মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্ক না থাকায় নাটকের প্রথম অংকের ১, ২, ৭, ৮, দ্বিতীয় অংকের ২, ৪, ৫ চতুর্থ অংকের ১, ৩ এবং পঞ্চম অংকের ২-এ সকল দৃশ্যগুলি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। নাট্য কাহিনী গঠনে ক্রোড়াঙ্ক দৃশ্যের প্রয়োজন না থাকলেও তৎকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই দৃশ্যের অবতারনার দ্বারা গণমানসে দেশপ্রেম ও বীরত্বের প্রবাহকে উদ্দীপ্ত করে তোলা হয়েছে। এটা নাট্যকারের যুগচেতনার পরিচয় বহন করে। নাট্যবৃত্ত রচনাকালে নাট্যঘটনার উপর দৈবীভাবের প্রভাব (৩।২ দৃশ্য), ভবিষ্যৎবাণীর প্রয়োগ—এ সকলের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক নাট্যবস্তুগঠনে নাট্যকারের পৌরাণিক মানসিকতার প্রভাব বিদ্যমান। তদুপরি আধ্যাত্মিক শক্তির উপর নাট্যকারের ব্যক্তিগত বিশ্বাস প্রবণতাও এর মাধ্যমে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে।[৬৪]

নাটকের ভূমিকায় মন্মথমোহন বসু বলেছেন "কিছু অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও প্রতাপাদিত্যকে স্বচ্ছন্দে ঐতিহাসিক নাটক বলা যাইতে পারে। কারণ ইহার মূল ভিত্তি ইতিহাস।" কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে যশোরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নাটকে বিন্যস্ত প্রতাপের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী সম্পূর্ণভাবেই অনৈতিহাসিক। উপরন্তু তৎকালীন বাংলার গভর্ণর শেখ আলাউদ্দীনের আনুগত্য লাভের জন্য প্রতাপাদিত্যের হীনমন্যতার পরিচয়ই ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইসলাম খাঁ নামধারী বাংলার শাসক শেখ আলাউদ্দীনের সঙ্গে ধূমঘাট ও কগরঘাটখাল—যমুনার সংযোগস্থলে প্রতাপ-পুত্র উদয়াদিত্যের নেতৃত্বে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং যুদ্ধে উদয়াদিত্য পরাজিত হন। প্রতাপাদিত্য কখনই সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি।[৬৫] প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব সম্পর্কিত ব্যাপারে 'আকবরীনামা' The Ain-i-Akbari, The Tuzuk—এর নীরবতাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

তবে ক্রোড়াঙ্কে বন্দী প্রতাপাদিত্যের শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ার ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের সাযুজ্য বিদ্যমান।[৬৬]

নাট্যবস্তুর ক্রিয়াগঠনের ক্ষেত্রে J. H. Lawson কর্তৃক অনুসৃত নাট্যক্রিয়া তত্ত্বের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে মোঘল শক্তির পাশ থেকে দেশ ও দেশবাসীর উদ্ধার কল্পে প্রতাপাদিত্যের দৃঢ় বাসনা প্রকাশের ঘটনা থেকে নাট্যক্রিয়া আরম্ভ (exposition) হয়। এরপর ক্রিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে থাকে (Rising Action)। ক্রমান্বয়ে ২।৫ দৃশ্যে নবাব তহশিলদারের সঙ্গে, ৩।৩ দৃশ্যে শেরখাঁর সঙ্গে, ৪।৩ দৃশ্যে আজমখাঁর সঙ্গে এবং ৫।৪ দৃশ্যে মোঘল সেনাপতি মানসিংহের সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে (clash) প্রতাপের পরাজয় ও বন্দীত্বের মধ্যে (৫।৬ দৃশ্য) নাট্যক্রিয়া নূতন পরিণত অবস্থা (climax) লাভ করে।

পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ) :

স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিকরা আপোসহীন সংগ্রামের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা বজায় রাখতে প্রয়াসী হয়।

উপরোক্ত মূল বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে পাঁচটি অংকে ও তেত্রিশটি দৃশ্যের দ্বারা নাট্যবস্তু রচিত হয়েছে। প্রথম অংকে মীরজাফরের বিরুদ্ধে মীরকাশিমের বিদ্রোহ ঘোষণা ও মীরকাশিমের নবাবী পদ লাভের প্রচেষ্টার ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে কোম্পানীর নিকট মীরজাফরের ক্রমশঃ দেনাগ্রস্ত হয়ে পড়ার কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। তৃতীয় অংকে মীরকাশিম কর্তৃক ইংরেজদের বকেয়া দেনা শোধ ও নবাবী পদলাভের ঘটনা উপস্থাপিত করা হয়েছে। চতুর্থ অংকে দেশের ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। পঞ্চম অংকে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে মীরকাশিমের পরাজয় ও মীরজাফরের পুণরায় নবাবী পদ লাভের ঘটনা দেখান হয়েছে।

নাটকে নবাবী পদ গ্রহণের পর দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইংরেজদের সঙ্গে আপোষহীণ যুদ্ধে মীরকাশিমের পরাজয়ের মূল কাহিনী ব্যতীত (ক) 'বাহার-গুলফণের' প্রেমমূলক ঘটনা, (খ) 'রামনারায়ণ-মতিবিবির' ঘটনা, (গ) 'ঘসেটি বেগম' ও আমিনাবেগমের ঘটনা—এ তিনটি উপঘটনা নাটকে বর্তমান। এ সকল উপঘটনার সঙ্গে মূল কাহিনীর কোন যোগ নেই। এর ফলে নাট্যকাহিনীর আয়তনের অতিবিস্তৃতি নাট্যসংহতিকে ক্ষুন্ন করেছে। ঘটনার প্রত্যাশিত ফল হিসাবে নাট্যমধ্যস্থ ঘটনাগুলির যোগসূত্রে রচিত হয়নি। মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে যোগ না থাকায় প্রথম অংকের ৩, ৪, ৬, দ্বিতীয় অংকের ১, ২, ৬, ৭, তৃতীয় অংকের ২, ৫, ৬, চতুর্থ অংকের ৭ম দৃশ্যগুলি নাট্যক্রিয়ার একমুখী গতিধারাকে স্থানে স্থানে ব্যাহত করেছে। পঞ্চম অংকের সপ্তম দৃশ্যে পরাজিত মীরকাশিমের সম্মুখে বঙ্গজননীর আবির্ভাবজনিত অলৌকিক দৃশ্য রচনার মধ্যে নাট্যবস্তু রচনায় নাট্যকারের উপর পৌরাণিক মানসিকতার প্রভাব বিদ্যমান।

মূল ঘটনায় ইতিহাসের অনুসরণ থাকলেও নাটকের প্রথম অংকের ষষ্ঠ দৃশ্যানুযায়ী মীরকাশিম কর্তৃক সিরাজকন্যা গুলফনের দায়িত্ব গ্রহণ এবং যুদ্ধ শেষে মীরকাশিমের ফকীর ব্রত ধারণের (৫।৭ দৃশ্য)—ঘটনার প্রতি ইতিহাসের সমর্থন পাওয়া যায় না।[৬৭]

নাট্যক্রিয়ার গতিরেখায় লসন অনুসৃত চারপর্বের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বিদ্যমান। প্রথম অংকের পঞ্চম দৃশ্যে দেশের স্বার্থরক্ষার জন্য নিজের শক্তি বৃদ্ধির প্রয়াসে মীরকাশিম কর্তৃক নবাবী পদ লাভের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ (exposition)। তৃতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে মীরকাশিম কর্তৃক ইংরেজদের বকেয়া অর্থের পরিশোধ, ঐ অংকের তৃতীয় দৃশ্যে মীরজাফরের গদীচ্যুত হওয়া এবং মীরকাশিমের নবাবী পদ লাভ, চতুর্থ দৃশ্যে দেশের স্বাধীনতা অটুট রাখার জন্য মীরকাশিম কর্তৃক তকী খাঁ প্রমুখ ব্যক্তিদের সঙ্গে সৌভ্রাত্র স্থাপন, ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া উর্ধ্বগতি (Rising action) লাভ করে। চতুর্থ অংকের তৃতীয় দৃশ্যে মীরকাশিম কর্তৃক স্বদেশী, বিদেশী সকল ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক মাশুল রদের ব্যবস্থা গ্রহণই ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের কারণ স্বরূপ। এরপর চতুর্থ অংকের ষষ্ঠ দৃশ্যে ইংরেজ কর্তৃক মীরকাশিমের দূতকে বন্দী করা, পঞ্চম অংকের প্রথম দৃশ্যে ইংরাজদের কাশিমবাজার অধিকার করার প্রচেষ্টা, দ্বিতীয় দৃশ্যে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে মীরকাশিমের সেনাপতি তকী খাঁর মৃত্যু, চতুর্থ দৃশ্যে উদয়নালার যুদ্ধে মীরকাশিমের পরাজয়, ষষ্ঠ দৃশ্যে ইংরেজদের মুঙ্গের দুর্গ দখল—এ সকল ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া সংঘর্ষমুখী (clash) হয়ে ওঠে। সপ্তম দৃশ্যে পরাজিত মীরকাশিমের ফকীরবেশ ধারণের মধ্যে নাট্যক্রিয়া পরিণতি লাভ করে।

● **পদ্মিনী : (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ) :**

কেবলমাত্র ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা সর্বক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করা যায় না। নাটকের এই মূল বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে নাট্যবৃত্ত রচিত হয়েছে। পাঁচটি অংকে ও একত্রিশটি দৃশ্যে নাট্যকাহিনী বিধৃত, প্রথম অংকে কৌশলে ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা পিতৃব্যকে হত্যা করে আলাউদ্দীনের দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ ও গুজরাট এবং চিতোর অভিযানের সংকল্প গ্রহণের কাহিনী বিন্যস্ত। দ্বিতীয় অংকে আলাউদ্দীনের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য চিতোর রাণা ভীম সিংহের প্রস্তুতি গ্রহণের ঘটনা দেখান হয়েছে। তৃতীয় অংকে ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা আলাউদ্দীনের গুজরাট দখল এবং চিতোর জয়ের জন্য সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। চতুর্থ অংকে রাজপুতদের বীরত্বে চিতোর জয়ের জন্য আলাউদ্দীনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে পদ্মিনীকে পাবার জন্য আলাউদ্দীন কর্তৃক কৌশলে ভীমসিংহকে বন্দী করা ও পদ্মিনীর বুদ্ধিমত্তায় ভীমসিংহের মুক্তিলাভের কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। পঞ্চম অংকে পদ্মিনীকে লাভ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগের দ্বারা আলাউদ্দীন কর্তৃক চিতোর ধ্বংস করা এবং জহরব্রত উদযাপনের দ্বারা পদ্মিনীর আত্মোৎসর্গের ঘটনা বিধৃত হয়েছে। ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা পদ্মিনীকে লাভ করার জন্য আলাউদ্দীন কর্তৃক চিতোর ধ্বংসের মূল কাহিনী ব্যতীত নাটকে (ক) 'আলাউদ্দীন—নসীবনের' ঘটনা, (খ) 'অরুণসিংহ—রুক্মার' প্রণয়মূলক ঘটনা, (গ) 'নসীবন—কাশীম' ঘটনা,

(ঘ) 'ভীমসিংহ—পদ্মিনীর' ঘটনা, এ সকল চারটি উপঘটনা বিদ্যমান। (ক) এবং (খ) উপঘটনার সঙ্গে মূল ঘটনার কোন যোগ নেই। উপকাহিনীর অতিবিস্তৃতির জন্য নাটকের আয়তন ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে এবং নাট্য সংহতির অভাবে নাট্যক্রিয়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রথম অংকের ষষ্ঠ দৃশ্যে আলাউদ্দীনের প্রাসাদে এসে তার সামনে সম্রাট সহোদর আলমাসকে পদ্মিনীর ভ্রাতুষ্পুত্র কর্তৃক হত্যা করা, দ্বিতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে আলাউদ্দীনকে বন্দী করার জন্য চিতোর রাণার কাছে আলাউদ্দীনের প্রণয়ী নসীবনের আবেদন ও উদযোগ গ্রহণ,—এ সকল ঘটনার সংস্থাপনার দ্বারা নাট্যকারের অতিচারি কল্পনাশক্তি ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল রচনার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছে। নাটকের মূল ক্রিয়ার সঙ্গে কার্য-কারণ সম্পর্ক না থাকায় প্রথম অংকের ২, ৪, ৫, ৬, দ্বিতীয় অংকের ১, ৩, ৪, ৫, তৃতীয় অংকের ২, ৩, ৪, চতুর্থ অংকের ১, ৮, পঞ্চম অংকের ২ ইত্যাদি দৃশ্য নাটকে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

পদ্মিনীকে পাবার জন্য আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণের মূল নাট্য ঘটনার সঙ্গে Col. James Tod—এর 'Annals and Antiquities of Rajasthan' (Vol 1—3) পুস্তকে বর্ণিত ঘটনার সাযুজ্য বিদ্যমান। কিন্তু এই ঘটনা সম্পর্কে ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে মতদ্বৈততা বিদ্যমান। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ আলাউদ্দীন-পদ্মিনীর ঘটনাকে ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন নিছক গল্প বলে মনে করেন।[৬৮]

প্রথম অংকের ষষ্ঠ দৃশ্যে চিতোর রানী পদ্মিনীর রূপের কথা শুনে তাঁকে লাভ করার জন্য আলাউদ্দীনের বাসনার প্রকাশের ঘটনা থেকে নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ হয়েছে। দ্বিতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে আলাউদ্দীনের আক্রমণ থেকে চিতোর রক্ষার জন্য চিতোর রাণার যুদ্ধ প্রস্তুতি, তৃতীয় অংকের পঞ্চম দৃশ্যে আলাউদ্দীন কর্তৃক চিতোর জয়ের জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার উদ্‌যোগ গ্রহণ, ষষ্ঠ দৃশ্যে গুজরাট দখলের দ্বারা তাঁর সামরিক শক্তি সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব বৃদ্ধি পাওয়া, চতুর্থ অংকের প্রথম দৃশ্যে যুদ্ধের দ্বারা চিতোর জয়ের জন্য আলাউদ্দীনের প্রচেষ্টা, চতুর্থ অংকের চতুর্থ ও পঞ্চম দৃশ্যে পদ্মিনীকে পাবার জন্য আলাউদ্দীন কর্তৃক কৌশলে ভীম সিংহকে বন্দী করা, এ সকল ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া ক্রমশঃ উন্নত ও বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এরপর চিতোর ধ্বংসের জন্য বদ্ধপরিকর আলাউদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধে রাজপুত বীরগণের বীরত্ব-পূর্ণ সংগ্রাম ও মৃত্যু বরণের ঘটনার (৪।৮, ৫।১, ৫।২) মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া ক্রম-হ্রাসমুখী হয়ে পড়ে। পঞ্চম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে পদ্মিনীর জহরব্রত উদ্‌যাপনের উদযোগ গ্রহণ এবং চতুর্থ দৃশ্যে ঐ আয়োজনের মধ্যে দিয়ে পদ্মিনীর আত্মোৎসর্গের ঘটনায় নাট্যক্রিয়ার পরিণতি সূচিত হয়েছে।

● **চাঁদবিবি : (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ) :**

লোভের বশে বিশ্বাসঘাতকতা করলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়।—এই মূল ভাবকে আশ্রয় করে পাঁচটি অংকে ও তিরিশটি দৃশ্যে নাট্যকাহিনী রচিত হয়েছে।

প্রথম অংকে চাঁদবিবির প্রচেষ্টায় আমেদনগরের সিংহাসন লাভের জন্য তথাকার রাজকর্মচারিদের কলহের সুযোগে বিশ্বাসঘাতক মিয়ানমঞ্জু ও নেহাঙ খাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবার ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে আমেদনগরের সুলতান পত্নী মরিয়ামের দ্বারা অপমানিত হয়ে বীজাপুর সুলতান আদিলশার আমেদনগর আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাহিনী উপস্থাপিত করা হয়েছে। তৃতীয় অংকে বীজাপুরের আক্রমন প্রতিহত করার জন্য আমেদনগরের অধিপতি ইব্রাহিমের প্রস্তুতি গ্রহণের ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে। চতুর্থ অংকে আমেদনগরের সর্দার মিয়ানমঞ্জুর বিশ্বাসঘাতকতায় মোঘল সৈন্যের আমেদনগর দখলের অভিযান প্রতিহত করতে বিজাপুরের চাঁদবিবি ও আমেদনগরের অধিপতি ইব্রাহিমের যৌথ উদযোগ গ্রহণের কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। পঞ্চম অংকে চাঁদ সুলতানার কাছে মোঘল সৈন্যের পরাজয় এবং বিশ্বাসহন্তা মিয়ানমঞ্জুর ছুরিকাঘাতে চাঁদসুলতানার মৃত্যুর ঘটনা বিধৃত হয়েছে। আমেদনগরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমেদাধিপতি ও বীজাপুরাধিপতির পত্নী চাঁদবিবির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও বিশ্বাসঘাতকের ছুরিকাঘাতে চাঁদ সুলতানার মৃত্যু—এই মূল কাহিনী ছাড়া নাটকে (ক) 'আদিল শা—মরিয়ম' (খ) 'মল্লজী—যশোদা' (গ) 'ইব্রাহিম-ফয়জান'—এ সকল তিনটি উপকাহিনী বিদ্যমান। এ সকল উপকাহিনীর সঙ্গে মূল কাহিনীর কার্যকারণ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি এবং এর ফলে মূল কাহিনীর উৎকর্ষ ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে। নাট্যক্রিয়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মূল ভাবের সঙ্গে যোগ না থাকায় দ্বিতীয় অংকের ১, ২, ৪, তৃতীয় অংকের ১, ২, ৩ চতুর্থ অংকের ৭, পঞ্চম অংকের ১, ৪, ৬—এ সকল দৃশ্য নাটককে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। নাট্যক্রিয়ার মধ্যে স্থানে স্থানে বহির্দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটলেও তা নাটকের সংকটকে গভীরতর করে তুলতে পারেনি।

নাট্যবৃত্ত গঠনে ইতিহাসকে সর্বত্র বিশ্বস্ততার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়নি। চতুর্থ অংকের তৃতীয় দৃশ্যে বলা হয়েছে যে মারহাট্টা সরদার মল্লজীর প্রতি আমেদনগরের সুলতান ইব্রাহিম শা অধিক আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করেন। এতে রাজ্যের হাবসি সরদার ও উজিররা মল্লজীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হন। এর জন্যই তারা মোঘলদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেশদ্রোহীমূলক কার্যে লিপ্ত হয়। এই ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের যোগ নেই। প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের উত্তরাধিকার সূত্র নিয়ে দেশীয় সরদারদের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে দেশীয় নেতা মিয়ানমঞ্জু দেশের মধ্যে এই রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ বন্ধের জন্যই মোঘল শাসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন।[৬৯] নাটকের শেষের আগের দৃশ্যে (৫।৭) চাঁদবিবির নিকট মোঘল সৈন্যের পরাজয়ের ঘটনা দেখান হয়েছে। এই ঘটনা ইতিহাস সম্মত নয়। ইতিহাস অনুযায়ী যুদ্ধের সময় উভয়পক্ষই চরম সংকটজনক অবস্থার মধ্যে পড়ে। এর ফলে সন্ধির মাধ্যমে উভয়পক্ষই সহ-অবস্থানের নীতি গ্রহণ করেন।[৭০]

পঞ্চম অংকের অষ্টম দৃশ্যানুসারে মোঘলের সঙ্গে যুদ্ধেজয়ী চাঁদবিবিকে বিশ্বাস-ঘাতক মিয়ানমঞ্জুর হত্যা করার ঘটনার সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যের সাযুজ্য রক্ষিত হয়নি। প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখযোগ্য যে চাঁদবিবির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করার পর মোঘল সৈন্য

১৫৯৬ সালে ২০শে মার্চ আমেদনগর ত্যাগ করে 'বেরার' যাত্রা করে। পরবর্তীকালে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে এক চক্রান্তের ফলে চাঁদবিবিকে হত্যা করা হয়।[৭১]

নাট্যক্রিয়ার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে নাট্যবৃত্ত গঠনের ত্রুটির জন্য নাট্যক্রিয়া সুষ্ঠুরূপ লাভ করতে পারে নি। প্রথম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে মিয়ানমঞ্জুর সহায়তায় নেহাঙ খাঁয়ের আমেদনগর আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ থেকে নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ। প্রথম অংকের চতুর্থ-পঞ্চম দৃশ্যে চাঁদবিবির প্রচেষ্টায় বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা, দ্বিতীয় অংকের পঞ্চম দৃশ্যে বীজাপুররাজ ও আমেদনগরের সুলতানা পত্নীর সঙ্গে মনোমালিন্যের ফলে (চতুর্থ অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে) আমেদনগরীর বিরুদ্ধে বিজাপুর রাজ্যের যুদ্ধযাত্রা, মোঘলের আক্রমণে আমেদনগরের স্বাধীনতা বিপন্ন হলে আমেদনগরের হয়ে বীজাপুররাজ আদিল শা ও তাঁর পত্নী চাঁদ সুলতানার মোঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা (৪।৪, ৭, ৫।১, ৩, ৫) ও চাঁদ সুলতানার হস্তে মোঘলের পরাজয়—এ সকল ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়ে পড়ে। পরিশেষে বিশ্বাসঘাতক মিয়ানমঞ্জুর ছুরিকাঘাতে চাঁদবিবির মৃত্যুতে নাট্যক্রিয়া পরিণতি লাভ করে।

নন্দকুমার : (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ) :

ভালো কাজের জন্যও রাজশক্তির বিরোধিতা করলে জীবন বিপন্ন হয়। এই কেন্দ্রিয় ভাবকে আশ্রয় করে পাঁচটি অংকে ও বাইশটি দৃশ্যে নাট্যকাহিনী গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে ইংরেজদের বে-আইনী ব্যবসায় বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ কোম্পানী এবং হেস্টিংসের স্বার্থ বিরোধী কাজ করার জন্য নন্দকুমারের উপর উভয়ের শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠার কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে নন্দকুমার কর্তৃক ত্রিবেনীর পুণ্য স্নানে বাধাদানকারি ইংরেজ সৈন্যদের সেখান থেকে হঠিয়ে দেওয়ার ঘটনা দেখান হয়েছে। তৃতীয় অংকে ত্রিবেণীতে রাজকার্যের বিরোধিতা করায় হেস্টিংস কর্তৃক নন্দকুমারকে বন্দী করা ও মীরজাফরের প্রচেষ্টায় বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ান পদে নন্দকুমারের নিযুক্ত হওয়ার কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। চতুর্থ অংকে নন্দকুমারের কর্মদক্ষতায় ইংরাজদের বে-আইনী ব্যবসা বন্ধ হওয়া এবং মীরজাফরের মৃত্যুর পর ইংরেজদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মীরকাশিমের পুত্র 'বাহারকে' নবাব করার জন্য নন্দকুমারের উদযোগ গ্রহণের কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। পঞ্চম অংকে বারংবার রাজকার্যের বিরোধিতা করায় রাজরোষে পতিত নন্দকুমারের কলকাতায় বন্দী হওয়া এবং হেস্টিংসের ষড়যন্ত্রে সই জাল করার অভিযোগে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড কার্যকরী হওয়ার কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে।

দেশের স্বার্থে রাজকার্যের বিরোধিতা করায় নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের মূল কাহিনী ব্যতীত নাটকে (ক) 'বাপুদেব-প্রমদা-রাধিকা'কে কেন্দ্র করে একটি ঘটনা, (খ) 'প্রমদা-বাহার'কে আশ্রয় করে একটি কাহিনী, (গ) 'মীরজাফর-মাণবেগম'কে কেন্দ্র করে আর একটি ঘটনা,—এ সকল মোট তিনটি উপঘটনা বিদ্যমান। এ সকল উপকাহিনী

নাটকের মূলকাহিনীকে সমৃদ্ধ করতে পারেনি। নাটকের আয়তন অনাবশ্যকভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। নাট্যক্রিয়া দ্বন্দ্বঘন রূপ লাভ করেনি। মূল বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ না থাকায় এবং দৃশ্য সংস্থাপনে সম্ভাব্যতা ও আবশ্যকতার যোগ না থাকায় প্রথম অংকের ২, ৩ দ্বিতীয় অংকের ৪, ৫ তৃতীয় অংকের ৩, চতুর্থ অংকের ২, পঞ্চম অংকের ৬, ৭, ৯ দৃশ্যেগুলি নাট্যবস্তু গঠনের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমিকা প্রসঙ্গে বলা যায় যে ইতিহাসের বিচারে নন্দকুমার কখনই দেশপ্রেমিকের মর্যদা লাভ করেন নি। উপরন্তু সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে তিনি যে ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন—এ ঘটনা ইতিহাস স্বীকৃত।[৭২] নাটকে উল্লিখিত জালিয়াতির অভিযোগে নন্দকুমারের ফাঁসী হবার ঘটনার কথা ইতিহাসে বিদ্যমান।[৭৩]

নাট্যবস্তু গঠনের ত্রুটির জন্য নাটকে নাট্যক্রিয়া সুষ্ঠুরূপ লাভ করেনি। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে নন্দকুমার কর্তৃক ইংরাজদের স্বার্থবিরোধী কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ হয়েছে। এরপর পরবর্তী স্তরে নাট্যক্রিয়া ক্রমোন্নত হয়ে ওঠে। নাট্যক্রিয়ার মধ্যে ২।৬ দৃশ্যে ও ৪।১ দৃশ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়। ৩।৮ দৃশ্যে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের ঘটনার মধ্যে নাট্যক্রিয়া পরিণতি লাভ করে।

অশোক (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ) :

অসংযমী প্রবৃত্তির নিরসনের মাধ্যমে মানুষের মনে ধর্মভাবের উদয় হয়। এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে পাঁচটি অংকে ও তেত্রিশটি দৃশ্যে নাট্যকাহিনী গঠিত হয়েছে। প্রথম অংকে বিন্দুসারের আদেশে অশোকের রাজপ্রাসাদ ত্যাগের ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে শাঙ্গর্দেব কর্তৃক রাজসভায় উপস্থিত অশোককে রাজ্যের যোগ্য উত্তরাধিকার রূপে স্থিরিকরণের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। তৃতীয় অংকে বিন্দুসার কর্তৃক তাঁর উত্তরাধিকাররূপে বীতশোককে মনোনীত করার কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। চকুর্থ অংকে অশোকের কণিষ্ক রাজ্য লাভের কাহিনী বিধৃত হয়েছে। পঞ্চম অংকে [illegible] যুদ্ধে পরাস্ত করে অশোকের মগধের সিংহাসন লাভ এবং কৃপানন্দ ও শাঙ্গরবের মাহাত্ম্য দর্শনে হিংসাশ্রয়ী অশোকের অসংযত প্রবৃত্তির নিরসন ও তাঁর ধর্ম মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠার ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে।

অশোক কর্তৃক মগধের সিংহাসন লাভ ও তার ধর্মাশোকে পরিণত হওয়ার মূল কাহিনী ভিন্ন নাটকে (ক) 'বিন্দুসার—চিত্রার' কাহিনী, (খ) 'কৃপানন্দ—শাঙ্গধর' কাহিনী,—এই দুটি উপকাহিনী বিদ্যমান। (ক) উপকাহিনীর অতি বিস্তৃতি নাট্য-সংহতিকে ব্যাহত করেছে। (খ) উপকাহিনীর সঙ্গে মূল কাহিনীর যোগ বিদ্যমান। মূল কাহিনীর সঙ্গে যোগ না থাকায় প্রথম অংকের ১,৪,৫, দ্বিতীয় অংকের ১,২,৩ তৃতীয় অংকের ১,২ চতুর্থ অংকের ১,৩, পঞ্চম অংকের ৩য় দৃশ্য নাটকের পক্ষে ভার-স্বরূপ হয়ে পড়েছে। চতুর্থ অংকের পঞ্চম দৃশ্যে কৃপানন্দের কৃপায় অন্ধ কুণালের

দিব্যদৃষ্টি লাভ, পঞ্চম অংকের পঞ্চম দৃশ্যে কৃপানন্দের মাহাত্ম্যে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত শার্ঙ্গরব ও কুণালের পুনর্জীবন লাভ, এ সকল অলৌকিক ঘটনার সংযোজনার ফলে নাটকের মধ্যে সুষ্ঠু ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠেনি। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক নাট্য রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকারের পৌরাণিক মানসিকতার প্রভাব পড়েছে।[৭৪]

নাট্যকাহিনীর বিন্যাসে নাট্যকার ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করতে পারেননি। প্রথমত সিংহাসন লাভের জন্য পিতা বিন্দুসার ও ভ্রাতা বীতশোকের সঙ্গে তাঁর সশস্ত্র যুদ্ধের ঘটনা (৫।১ দৃশ্য) ইতিহাস সমর্থিত নয়।[৭৫] চিত্রা ও বিন্দুসারের কাহিনী (১।১, ৪।৩), কণিষ্ক রাজার কাহিনী (৩।৩), কণিষ্কের গৃহে অশোকের স্ত্রী অনীতার আশ্রয় গ্রহণ (৩।৪), মহেন্দ্রের কাছ থেকে ক্ষুধার্ত্ত অশোকের খাবার কেড়ে নেওয়া (৩।৫), কণিষ্করাজ কর্তৃক অনীতার সঙ্গে অশোকের বিবাহ দান ও কণিষ্কের সিংহাসনের দায়িত্বভার অশোককে অর্পণ (৪।২), পুত্র কুণালের চক্ষুৎপাটন (৪।৫), এ সকল ঘটনার সংযোজনায় নাট্যকার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন ও কোন কোন ক্ষেত্রে (৪।৫) নাট্যকার এ বিষয়ে ভারতে প্রচলিত লোক কথাকে উপাদান স্বরূপ ব্যবহার করেছেন। কৃপানন্দ ও শার্ঙ্গরবের মাহাত্মদর্শনে (৫।৫) অশোকের মনে ধর্মভাবের উদয় হওয়ায় ঘটনাটি সংযোজনার ক্ষেত্রেও নাট্যকার প্রচলিত ভারতীয় লোক কথার সাহায্য গ্রহণ করেছেন।[৭৬] এবং এ ঘটনাটি ইতিহাস সিদ্ধ নয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কলিঙ্গযুদ্ধে মানুষের ভয়াবহ শোচনীয় দুরবস্থা দর্শনের ফলে অশোকের মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে তার মন পরিবর্তিত হতে থাকে।' পরিশেষে চন্দ্রাশোক অশোক ধর্মাশোকে রূপান্তরিত হন। এটাই ইতিহাস সত্য।[৭৭]

নাট্য গঠনরীতির ত্রুটির জন্য নাট্যক্রিয়ার পরিণতি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। প্রথম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে মগধের সিংহাসন লাভের জন্য অশোকের সুদৃঢ় বাসনা প্রকাশের ঘটনার মধ্য দিয়ে ক্রিয়ার আরম্ভ সূচীত হয়েছে। প্রথম অংকের চতুর্থ দৃশ্য থেকে চতুর্থ অংকের পঞ্চম দৃশ্য পর্যন্ত নাট্যক্রিয়ার ক্রমোন্নতির স্তর বিস্তৃত। পঞ্চম অংকের প্রথম দৃশ্যে পিতা বিন্দুসার ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বীতশোকের সঙ্গে যুদ্ধ করে মগধের সিংহাসন লাভের মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এরপর পঞ্চম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে চতুর্থ দৃশ্য পর্যন্ত ক্রিয়ার বিস্তৃতির মাধ্যমে অশোকের অসংযত ও অমানুষিক প্রবৃত্তির প্রচণ্ডতা দেখান হয়েছে। পঞ্চম অংকের পঞ্চম দৃশ্যে এই অসংযত প্রবৃত্তির নিরসনের মাধ্যমে অশোকের ধর্মভাবের উদয় হবার সঙ্গে নাট্যক্রিয়া পরিণতি লাভ করেছে।

রিজিয়া (মনোমোহন রায়) ঃ

ব্যর্থ প্রেমে হিংসার প্রশ্রয় দিলে পরিণাম শোচনীয় হয়ে ওঠে। এই সিদ্ধান্ত-বাক্যকে আশ্রয় করে পাঁচটি অংক ও ঊনত্রিশটি দৃশ্যের দ্বারা নাট্যকাহিনী রচিত হয়েছে। প্রথম অংকে কর্ণাট নৃপতি বীরেন্দ্র সিংহ কর্তৃক ইন্দিরাকে গান্ধর্ব মতে

বিবাহ করা এবং রিজিয়ার কোপানল থেকে তাঁকে বাঁচাবার জন্য গোপনে ইন্দিরাকে কুসুম দুর্গে রেখে আসার ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে মালবরাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে রিজিয়া কর্তৃক বীরেন্দ্র সিংহকে সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ এবং বীরেন্দ্রের বিবাহের সংবাদ সম্বন্ধে রিজিয়ার অবগত হওয়ার কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় অংকে রিজিয়ার নির্দেশে বীরেন্দ্রের অগোচরে ইন্দিরাকে কৌশলে কুসুমদুর্গ থেকে সরিয়ে এনে যমুনা নদী তীরস্থ দুর্গে রেখে দেওয়া এবং মালবযুদ্ধে বিজয়ী সেনাপতি বীরেন্দ্রকে রিজিয়ার পুরস্কৃত করার কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। চতুর্থ অংকে রিজিয়ার কাছে প্রেম নিবেদনে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তাতার সেনাপতি বক্তিয়ারের রিজিয়াকে সিংহাসন চ্যুত করার জন্য মালবরাজ ও সৌরাষ্ট্ররাজের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া এবং রিজিয়ার প্রেমকে স্বীকৃতি না দেওয়ায় ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় প্রতিহিংসাময়ী রিজিয়ার বীরেন্দ্রকে হত্যার আদেশ দানের ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে। পঞ্চম অংকে ঘাতকের হস্তে বীরেন্দ্রর হত্যা এবং বিদ্রোহী বাইরামের সঙ্গে যুদ্ধে বক্তিয়ারের বিশ্বাসঘাতকতায় রিজিয়ার পরাজয় ও বন্দিনী রিজিয়ার কারাগারে আত্মহত্যার কাহিনী দেখান হয়েছে।

বীরেন্দ্রের প্রতি অসফল প্রেমের জ্বালায় প্রতিহিংসাময়ী রিজিয়ার নির্দেশে বীরেন্দ্রের হত্যা এবং বাইরামের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত বন্দিনী রিজিয়ার আত্মহত্যার মূল কাহিনী ছাড়া নাটকে (ক) ইন্দিরা—'বীরেন্দ্রের' দাম্পত্য জীবনের ঘটনা, (খ) ইন্দিরার প্রতি সমরেন্দ্রের গোপন প্রেমের কাহিনী এবং (গ) ভাগ্যান্বেষণে রত পান্নালালের ভবঘুরে জীবনের কাহিনী—এই মোট তিনটি উপকাহিনী বিদ্যমান। এর মধ্যে (খ) উপকাহিনীর সঙ্গে মূল কাহিনীর কোন যোগ নেই। (গ) উপকাহিনীর দ্বারা কার্যকারণ সম্ভূতভাবে মূল কাহিনীর সঙ্গে সাযুজ্য রচনা করা হয়নি। এর ফলে উপকাহিনীর ভারে নাটক ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে এবং পরিণতিতে নাট্যক্রিয়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। যুক্তিনিষ্ঠ শৃঙ্খলার সাহায্যে মূলভাবের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে না ওঠায় প্রথম অংকের ১, ৩, ৫, দ্বিতীয় অংকের ২, ৩, ৪, তৃতীয় অংকের ১, ৫, চতুর্থ অংকের ১, ৪ এবং পঞ্চম অংকের ১, ৩, ৪, দৃশ্যগুলি নাট্যক্রিয়ার গতিকে স্থানে স্থানে শিথিল করে তুলেছে।

ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে দাস বংশীয় সুলতান ইলতুৎমিসের কন্যা রিজিয়া ১২৩৬-৪০ সাল পর্যন্ত দিল্লীর সুলতানা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নাটকের ঘটনার বিন্যাস রিজিয়াকে আশ্রয় করে গড়ে উঠলেও, নাটকের মধ্যে বিন্যস্ত সকল ঘটনা সম্পর্কে ইতিহাসের স্বীকৃতি নেই। প্রথমত কর্ণাট নৃপতি বীরেন্দ্র সিংহের প্রতি রিজিয়ার প্রেমবাসনা সম্পর্কিত ঘটনা (১।২, ৩।৫, ৪।৬) ইতিহাস সিদ্ধ নয়। দিল্লীর প্রভাবশালী ইসলামী সমাজ নারীর শাসনকে ইসলাম ধর্ম বিরোধী বলে মনে করে। তাই সেই তুর্কীমহলের মধ্যে অনৈক্যের বীজবপন করার জন্য আবিসিনিয় এক উচ্চপদস্থ কর্মচারির প্রতি রিজিয়ার পক্ষপাতিত্ব মূলক মনোভাব প্রকাশের ঘটনার উল্লেখ ইতিহাসে বর্তমান।[৭৮] কিন্তু তার সঙ্গে রিজিয়ার

প্রেমসম্পর্কিত ঘটনার উল্লেখ ইতিহাসে নেই। দ্বিতীয়ত বৈমাত্রেয় ভাই বাইরামের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত রিজিয়ার উম্মাদিনী অবস্থায় কারাগারে আত্মহত্যার ঘটনাও ইতিহাস স্বীকৃত নয় (৪।৫, ৫।৬, ৫।৭)। ইতিহাস সূত্রে জানা যায় ভাটিণ্ডার রাজ্যপাল রিজিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, বিদ্রোহ দমনের জন্য রিজিয়া ভাটিণ্ডা পৌঁছানো মাত্র চক্রান্তকারীরা রিজিয়ার প্রিয়পাত্র ইয়াবুতকে হত্যা করে এবং রিজিয়াকে বন্দী করে। দিল্লীর সিংহাসনে তারা রিজিয়ার অপর এক ভাই এবং ইলতুৎমিসের তৃতীয় পুত্র মইনুদ্দিন বাইরামকে দিল্লীর সিংহাসনে বসান। কিন্তু বাইরামের শাসন ব্যবস্থায় উপযুক্ত পদাধিকার ও কর্তৃত্ব না পাওয়ার ফলে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য ইখতিয়ারুদ্দিন আলতুনিয়া রিজিয়াকে কারামুক্ত করেন। রিজিয়া আলতুনিয়াকে বিবাহ করে দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধারের জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু তারা বাইরামের সৈন্য দ্বারা পর্যুদস্ত হন। সৈন্যহীন অবস্থায় চলাকালীন কৈথালের সন্নিকটস্থ অঞ্চলে হিন্দু ডাকাতদের হস্তে তাঁরা নিহত হন।[৭৯] সৌরাষ্ট্র রাজকন্যা ইন্দিরাকে কেন্দ্র করে সমন্দ্রে ও বীরেন্দ্রের ত্রিকোন প্রেমের ঘটনা নাট্যকারের কল্পনার ফসল স্বরূপ।

L. Cambell-এর তত্ত্ব অনুযায়ী রিজিয়া নাটকের নাট্যক্রিয়া অধিবৃত্তের (Parabolical) আকারে গঠিত। প্রথম অংকে নাটকের ঘটনা ও চরিত্র সম্বন্ধে প্রাথমিক পরিচয় দেওয়ার মধ্যে নাটকের আরম্ভ পর্ব সূচীত হলেও দ্বিতীয় অংকের পঞ্চম দৃশ্যে বীরেন্দ্রের সঙ্গে ইন্দিরার বিবাহের ঘটনা সম্পর্কে রিজিয়ার জ্ঞাত হওয়ার ঘটনায় নাটকের মধ্যে নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়। তৃতীয় অংকের প্রথম দৃশ্য থেকে চতুর্থ অংকের পঞ্চম দৃশ্য পর্যন্ত নাট্যক্রিয়ার ক্রমোন্নতিই নাটকের Climax। নাটকের চতুর্থ অংকের ষষ্ঠ দৃশ্যে বীরেন্দ্রের কাছে নিবেদিত রিজিয়ার প্রেমের ব্যর্থতার ঘটনার মধ্যে নাটকের চূড়ান্ত শীর্ষ অবস্থা (Acme) নিহিত। পঞ্চম অংকের প্রথম দৃশ্য থেকে পঞ্চম দৃশ্যের মধ্যে নাট্যক্রিয়ার প্রাক্ অবরোহণ মুহূর্ত (Sequel) বিন্যস্ত। পঞ্চম অংকের ষষ্ঠ ও সপ্তম দৃশ্য জুড়ে বাইরামের সঙ্গে যুদ্ধে রিজিয়ার পরাজয় এবং তাঁর আত্মহত্যার ঘটনার মধ্যে নাটকের পরিণতি (conclusion) রচিত হয়েছে।

সৎনাম (গিরিশচন্দ্র ঘোষ):

সংগ্রামশীল দেশনেতার চরিত্রবল না থাকলে তাঁর কাজের ফলে দেশের পরিণাম শোচনীয় হয়ে ওঠে।

এই সিদ্ধান্তবাক্যকে কেন্দ্র করে পাঁচটি অংকে ও পঁচিশটি গর্ভাংকের মধ্য দিয়ে নাট্যবৃত্ত গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে যবন সৈন্যের হস্তে সৎনামী সম্প্রদায়ভুক্ত মোহন্তের হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য মোহান্তকন্যা বৈষ্ণবী ও শিষ্য রণেন্দ্রের যবন কুল ধ্বংসের জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণের ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে সৎনামী সম্প্রদায়ের ধর্ম ও স্বাধীনতার রক্ষার সংগ্রামে রণেন্দ্রের নের্তৃত্ব গ্রহণের কাহিনী উপস্থাপিত করা হয়েছে। তৃতীয় অংকে রণেন্দ্রের নেতৃত্বে সৎনামী সম্প্রদায়ের মোঘল

দুর্গ দখল ও দুর্গাধিপ কারতরফ খাঁকে হত্যার জন্যে তার কন্যা গুলসানার প্রতিশোধস্পৃহা জাগরণের ঘটনা দেখান হয়েছে। চতুর্থ অংকে গুলসানার প্রতি রণেন্দ্রের প্রবল আসক্তি ও চিত্ত বৈকল্যের কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। পঞ্চম অংকে রণেন্দ্রের চরিত্রবলের অভাবে মোঘল সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে সৎনামী সম্প্রদায়ের পরাজয় ও গুলসানার প্রচেষ্টায় বন্দী রণেন্দ্রকে ঔরংজেবের হত্যার কাহিনী সংকলিত হয়েছে।

রণেন্দ্রের নেতৃত্বে সৎনামী সম্প্রদায়ের ধর্ম ও স্বাধীনতার রক্ষার সংগ্রামের মূল কাহিনী ছাড়া নাটকে (ক) 'মহান্ত-বৈষ্ণবী' (খ) 'বৈষ্ণবী-পরশুরাম' (গ) 'গুলসানা-রণেন্দ্র'—এই তিনটি উপঘটনা বিদ্যমান। এর মধ্যে (ক) এবং (গ) উপকাহিনীর সঙ্গে মূলকাহিনীর যোগ থাকলেও উপকাহিনীগুলির অতি বিস্তৃতি নাট্যকাহিনীর ঐক্যকে ব্যাহত করেছে। (খ) এবং (গ) উপকাহিনীর দ্বারা বৈষ্ণবী ও রণেন্দ্র চরিত্রের আত্মসংযমের গুণগত মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বৈপরীত্যের সৃষ্টি করা হয়েছে। নাট্যক্রিয়ার মধ্যে স্থানে স্থানে বহির্দ্বন্দ্ব দেখা দিলেও তা সংকটকে ঘনীভূত করে তুলতে পারে নি। পঞ্চম অংকের দ্বিতীয় গর্ভাংকে রণেন্দ্রের হত্যা, গুলসানার মৃত্যু, করিমের আত্মহত্যা, বৈষ্ণবীর মৃত্যু ও চতুর্থ গর্ভাংকে পরশুরামের মৃত্যু—এ সকল ঘটনা পরম্পরার দ্বারা অযৌক্তিকভাবে নাটকের মধ্যে অতিশয় ভাবাবেগের উন্নত অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। নাট্যগঠনরীতির ত্রুটির জন্য নাট্যক্রিয়া পরিণতিতে বিকেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। নাট্যবৃত্তের বিন্যাসে মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্তিনিষ্ঠ কার্যকারণ সম্পর্ক গড়ে না ওঠায় প্রথম অংকের ২, ৩, ৫, দ্বিতীয় অংকের ২, ৩, তৃতীয় অংকের ১, ২, চতুর্থ অংকের ২ এবং পঞ্চম অংকের ৩, ৪ দৃশ্যগুলি ক্রিয়াকে ভারগ্রস্ত করে তুলেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ঔরংজেবের রাজত্বকালে উত্তরভারতে হিন্দুধর্মের এক অংশ হিসাবে সৎনামী সম্প্রদায়ের সঙ্গে মোঘলশক্তির সশস্ত্র সংঘর্ষের কাহিনী ইতিহাস সম্মত। কিন্তু নাটকে এই কাহিনীর উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ইতিহাস বিরুদ্ধ কিছু কিছু ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়।

ঔরংজেবের সৈন্যদ্বারা সৎনামী সম্প্রদায়ের পুরোধা মোহান্তের হত্যা এবং তার ফলে বৈষ্ণবীর প্রেরণায় ও রণেন্দ্রের নেতৃত্বে সকল সৎনামী সম্প্রদায়ের মোঘলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের ঘটনা (১।১ দৃশ্য) নাট্যকারের কল্পনাপ্রসূত এবং এর দ্বারা ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনার উপস্থাপনা করা হয় নি।[৮০] সৎনামী সম্প্রদায়ের শক্তির উৎস হিসাবে দেবী 'কৌমারী-মাতার' দেব বলকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এ ঘটনা ইতিহাস অনুমোদিত নয়। সৎনামী সম্প্রদায়ের সাংগঠনিক, রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির পিছনে তাদের সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও মনোবলই ছিল তাদের শক্তির উৎস।[৮১] সর্বোপরি নাটকে উপস্থাপিত ঘটনা ও চরিত্রের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত সৎনামী সম্প্রদায় যে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরোধী, এরূপ একটি ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এ ধারণাও ইতিহাস সাপেক্ষ নয়।[৮২]

নাট্যক্রিয়ার গতিরেখা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে গুরুহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রণেন্দ্রের যবনকুল ধ্বংসের প্রতিজ্ঞার ঘটনা

থেকে নাট্যক্রিয়ার আরম্ভপর্ব সূচীত হয়েছে। এরপর থেকে ২।৪ দৃশ্যে রণেন্দ্র কর্তৃক সৎনামী সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ, ৩।৫ দৃশ্যে গুলসানার প্রতি রণেন্দ্রের মমত্ববোধের জাগরণ, ৪।৩ দৃশ্যে গুলসানাকে স্ত্রীরূপে স্বীকৃতি দানের দ্বারা তাকে হিন্দুধর্মে দীক্ষাদান ও সৎনামী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া—এ সকল ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়ার আরোহন পর্ব (climex) গঠিত হয়েছে। পঞ্চম অংকের প্রথম দৃশ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে গুলসানাকে রণেন্দ্রের সম্ভোগ করার ঘটনার মধ্যেই নাটকের চূড়ান্ত সংকট (Acme) মুহূর্ত বিদ্যমান। রণেন্দ্রের এই চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য পঞ্চম অংকের প্রথম দৃশ্যে তার উপর বর্ষিত কৌমারী দেবীর আশীর্বাদ পুষ্ট দৈবশক্তি বিনষ্ট হওয়া এবং মোঘল শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে সৎনামী সম্প্রদায়ের পরাজয়ের ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়ার প্রাক্-ক্রমহ্রাসমুখী অবস্থার (Sequel) সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে বন্দী রণেন্দ্রের গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুতে নাট্যক্রিয়া পরিণতি লাভ (Conclusion) করেছে।

সিরাজদ্দৌলা (গিরিশচন্দ্র ঘোষ):

শাসন কর্তার প্রধান সহায়কগণ বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী হলে দেশের স্বাধীনতা সহ শাসকের জীবনও বিপন্ন হয়।—এই মূল বক্তব্যকে অবলম্বন করে পাঁচটি অংকে ও পঁয়ত্রিশটি দৃশ্যে নাটকের বৃত্ত গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে সিরাজের কলিকাতা আক্রমণ ও কলিকাতা উদ্ধার করে তথায় নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখার ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে ইংরাজদের কলিকাতা পুনরুদ্ধার ও সিরাজের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। তৃতীয় অংকে সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে মীরজাফরের গোপন চুক্তির ঘটনা উপস্থাপিত করা হয়েছে। চতুর্থ অংকে ইংরেজদের সঙ্গে পলাশীর যুদ্ধে সামরিক অধিকর্তাগণের বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজিত ও পলায়িত সিরাজকে বন্দী করার কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। পঞ্চম অংকে সিরাজকে হত্যা করার ঘটনা সংকলিত হয়েছে।

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে সিরাজের সশস্ত্র সংগ্রাম ও পরাজিত অবস্থায় তাঁর হত্যা,—এই মূলে কাহিনী ভিন্ন নাটকে (ক) ঘসেটি বেগম ও আমিনা বেগমের ঘটনা, (খ) লুৎফা-সিরাজ-উম্মৎ ঘটনা, (গ) জহরাকে কেন্দ্র করে একটি ঘটনা,—এ সকল উপঘটনা বিদ্যমান। এ সকল উপঘটনার ভারে নাট্যসংহতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পলাশীর যুদ্ধ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক ঘটনা ও তথ্যকে নাটকে উপস্থাপিত করা হয়েছে বটে তবে সব জড়িয়ে সার্থক ঐতিহাসিক নাটকের বৃত্ত গড়ে উঠেছে একথা বলা যায় না। এতে বহু অবান্তর দৃশ্যের সংযোজন করা হয়েছে। নাটকের মূল বক্তব্য অনুযায়ী (Root Idea) নাটকের সমস্ত দৃশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে নি। সেক্ষেত্রে প্রথম অংকের ৪, ৭, ১১, দ্বিতীয় অংকের ২, ৩, ৫, তৃতীয় অংকের ৩, চতুর্থ অংকের ১, ৫, পঞ্চম অংকের ২, ৪, ৫, ৬ দৃশ্যগুলি অনাবশ্যকভাবে নাট্যক্রিয়াকে ভারবাহী করে তুলে নাট্যগতিকে মন্থর করে তুলেছে। নাট্যদৃশ্যের

আয়তনের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্যও গড়ে ওঠে নি (৪।৫, ৫।১, ৫।৫)। নাট্য-ক্রিয়ার কোন কোন অংশে বহির্দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটেছে কিন্তু সেই দ্বন্দ্বগুলি গভীর রূপ-সমন্বিত হয়ে ওঠে নি।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র একনিষ্ঠ সচেতনতা ও অধ্যবসনার দ্বারা ইতিহাসানুমোদিত ঘটনার সহযোগে আলোচ্য নাটকটির নাট্যবৃত্ত গঠনে খুবই যত্নবান হয়েছিলেন।[৮৩] এক্ষেত্রে ইতিহাসের প্রতিবেদন থেকে বলা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে নাটকের মধ্যে ঘটনার সংযোজনা ইতিহাসের অনুমোদন লাভ করেনি। নাটকের প্রথম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে সিরাজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলবার জন্য সওকতজঙ্গের মুর্শিদাবাদ আক্রমণের পিছনে মীরজাফরের গোপন ষড়যন্ত্রের উল্লেখ বিদ্যমান। প্রকৃত পক্ষে প্রথম থেকেই সিরাজের নবাবী পদের অবলুপ্তির জন্য সওকতজঙ্গকে উদবুদ্ধ করে তার দ্বারা মুর্শিদাবাদ আক্রমণের পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে ঘসেটি বেগম ও মীরজাফর উভয়ের গোপন অভিসন্ধি কার্যকরী হয়েছিল।[৮৪] পঞ্চম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে মৃত্যুর পূর্বে হুসেন কুলি খাঁকে হত্যার জন্য অনুতপ্ত সিরাজকে ঈশ্বরের নিকট অন্তিম প্রার্থনারত অবস্থায় দেখান হয়েছে। এটা ইতিহাস-সিদ্ধ ঘটনা। কিন্তু নাটকের ঘটনা অনুযায়ী মহম্মদী বেগ সিরাজকে হত্যা করতে এলে সিরাজের মধ্যে নিজের প্রাণ বাঁচাবার কোন রকম সচেতন ক্রিয়াশীলতা দেখা যায় না। এ ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের যোগ নেই। ইতিহাসের তথ্য অনুযায়ী মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য সিরাজদ্দৌলা চেষ্টা করেছিলেন। সেজন্য তিনি ঘাতকের কাছে নিজের প্রাণভিক্ষার জন্য করুণ আবেদনও করেন। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়।[৮৫] নাটকে উল্লিখিত লুৎফার অনুরোধে কারারুদ্ধ ওয়াটস্‌কে সিরাজের ক্ষমাদান (১।৪), হুসেন কুলী খাঁর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে তার স্ত্রী জহরার সিরাজের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকারের ষড়যন্ত্র (২।২, ৩, ৫, ৩।৩, ৪, ৪।১ ইত্যাদি), মীরণের হাত থেকে লুৎফার সম্মান রক্ষার জন্য ওয়াটস পত্নীর প্রচেষ্টা (৫।২)—এ সকল ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের যোগ সূত্র নেই। সাধারণ দর্শকের রসোপলব্ধির সুবিধার জন্য নাট্যকার কল্পনার আশ্রয়ে এ সকল ঘটনার অবতারণা করেছিলেন। এ সম্পর্কে নাটকের ভূমিকায় নাট্যকারের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে—

> "সিরাজ চরিত্র লইয়া দুইখণ্ড নাটক লিখিলে প্রকৃত অবস্থা বর্ণিত হইতে পারিত। কিন্তু উপস্থিত দর্শকের তৃপ্তিকর হইত কিনা জানি না।······ ঐতিহাসিক নাটক ঐতিহাসিক পটে চিত্রিত হওয়া উচিত। কিন্তু ইতিহাস ইতিহাসবেত্তা ব্যতীত তাহার প্রকৃত রসাস্বাদ সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা হয় না।"

নাট্যবৃত্তের প্রকৃতিকে ডব্লুই. এইচ. হাডসন (W. H. Hudson) প্রবর্তিত নাট্যক্রিয়ার বিভাগ অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে নবাবের আদেশ অনুযায়ী লালকুঠী ধ্বংসের আদেশ পালনে নবাবের প্রধান প্রধান সামরিক দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণের অসম্মতিজ্ঞাপনের ঘটনার মধ্যে নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ (exposition)। প্রথম অংকের দশম দৃশ্যে ইংরাজ দমন করে নবাবের কলিকাতা

জয়ের প্রাথমিক উত্তেজক ঘটনা (intial incident) নাট্যক্রিয়াকে ক্রমোন্নত করে তুলেছে। এরপর ক্রিয়া বিস্তৃত হতে থাকে। দ্বিতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে ইংরাজের কলিকাতা পুনরুদ্ধার, চতুর্থ দৃশ্যে ইংরাজের সহিত সিরাজের সন্ধি প্রস্তাব নাকচ, ষষ্ঠ দৃশ্যে রাত্রির অন্ধকারে ইংরাজ সৈন্যের নবাব সৈন্যকে আক্রমণ ও নবাবের সন্ধি স্থাপন, তৃতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে ফরাসীদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য সিরাজের নির্দেশ দান, দ্বিতীয় দৃশ্যে সিরাজকে পরাজিত করার জন্য মীরজাফরের সঙ্গে ইংরাজদের গোপন চুক্তি, পঞ্চম দৃশ্যে ভবিষ্যতে নবাব হবার জন্য ইংরাজের সঙ্গে মীরজাফরের চুক্তি ও সিরাজকে পরাজিত করার জন্য পলাশী-যুদ্ধের পটভূমিকা রচনা—এসকল ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া ক্রমোন্নত হয়ে নাট্যসংকটকে ঘনীভূত করে তুলেছে (Growth of the action to the crisis—)। চতুর্থ অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে পলাশীর রণক্ষেত্রে নবাবের প্রধান সামরিক সহায়কগণের সমরবিমুখ মনোভাব প্রদর্শনের ঘটনার মধ্যে নাটকের চূড়ান্ত সংকট-মুহূর্তক (crisis) এবং চতুর্থ অংকের তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ দৃশ্যের মধ্যে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়, পরাজিত সিরাজের মুর্শিদাবাদ ত্যাগ ও পরে ইংরাজদের হস্তে ধরা পড়ে বন্দী হওয়ার ঘটনার মধ্যে নাট্যক্রিয়ার সিদ্ধান্ত পর্ব গঠিত হয়েছে। পরিশেষে পঞ্চম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে সিরাজ হত্যার ঘটনার মধ্যে নাট্যক্রিয়ার নির্বহন (catastrophe) রচিত হয়েছে।

মীরকাশিম (গিরিশচন্দ্র ঘোষ):

দেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রচেষ্টা বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ব্যর্থ হয়ে যায়। এই মূলভাবকে নিয়ে পাঁচটি অংকে এবং পঁয়তাল্লিশটি দৃশ্যের দ্বারা নাট্য-কাহিনী গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য মীরকাশিমের বাংলার নবাবী গ্রহণের ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে দেশের স্বার্থ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য উদযোগী মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরাজদের মতবিরোধ এবং মীরকাশিমের বিরুদ্ধে মীরজাফরের ও ইংরাজদের মধ্যে গোপন চুক্তির কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে।

তৃতীয় অংকে মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ এবং দেশীয় সেনাপতিগণের বিশ্বাসঘাতকতায় মীরকাশিমের সেনাপতি তকী খাঁর মৃত্যুর কাহিনী উপস্থাপিত করা হয়েছে। চতুর্থ অংকে দেশীয় অমাত্যগণ ও প্রধান সহায়কগণের বিশ্বাসহন্তায় মুঙ্গের ও পাটনার যুদ্ধে মীরকাশিমের পরাজয় এবং সাহায্য লাভের আশায় মীরকাশিমের অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লার নিকট গমণের ঘটনা দেখান হয়েছে। পঞ্চম অংকে

ক—দূত—এ সময় যদি সেনাপতি মীরজাফর কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রদান করেন, এক ঘণ্টার মধ্যে রণজয় হয়। রায়দুর্লভ ও ইয়ার লতিফের সেনা দর্শকের ন্যায় যুদ্ধস্থলে দণ্ডায়মান।

সিরাজ—ছিঃ ছিঃ এখনও কপটতা, কোরাণ স্পর্শ করে কপটতা···
একি ঘোর সিংহনাদ শুনি ইংরাজের দলে।
জ্ঞান হয়, হা হা রবে কাঁদে মম সেনা
আজি দেখি ফুরায় সকাল। (চতুর্থ অংক ২য় দৃশ্য। সিরাজদ্দোলা

সুজাউদ্দৌল্লার ষড়যন্ত্রে ও সেনাপতি সমরুর বিশ্বাসঘাতকতায় বক্সার যুদ্ধে মীরকাশিমের চূড়ান্ত পরাজয় এবং শোচনীয় অবস্থায় মীরকাশিমের মৃত্যুর কাহিনী গ্রথিত হয়েছে।

মীরকাশিম কর্তৃক দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইংরাজদের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া ও তাঁর প্রধান সহায়কগণের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁর পরাজয় ও মৃত্যুর কাহিনী ভিন্ন নাটকে (ক) মণিবেগম—কাশিমআলি ঘটনা, (খ) তারাকে কেন্দ্র করে একটি ঘটনা, (গ) বেগম—মীরকাশিম ঘটনা, (ঘ) মীরজাফর—মণিবেগম ঘটনা—এ সকল মোট চারটি উপঘটনা নাটকে বিদ্যমান। ক, খ, গ, উপকাহিনীর সঙ্গে মূল কাহিনীর যুক্তিপূর্ণ সাযুজ্য রচনা করা হয় নি। ঘ-উপকাহিনীর সঙ্গে মূল কাহিনীর আংশিক যোগ থাকলেও এই উপকাহিনীর অত্যাধিক প্রাধান্যের জন্য মূলনাট্য কাহিনীর গতিধারা স্থানে স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পড়েছে। মূলত এ সকল উপকাহিনীর দ্বারা কেন্দ্রীয় কাহিনীর উৎকর্ষ সাধন করা যায়নি। ক্রিয়ার গতিমুখে নাট্যক্রিয়া বহির্দ্বন্দ্বমুখী হয়ে উঠলেও ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে নাট্যদ্বন্দ্বের দ্বারা নাট্যসংকট ঘনীভূত হয়ে ওঠে নি। অনাবশ্যক ঘটনার ভারে নাট্যকাহিনী গ্রন্থনে শিথিলতা দেখা দিয়েছে এবং নাট্যক্রিয়ার গতি মন্থর হয়ে পড়েছে। মূল বিষয়ের সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক গড়ে না ওঠায় প্রথম অংকের ৬, দ্বিতীয় অংকের ১, ২, ৫, তৃতীয় অংকের ১, ৩, ৪, ৮, ১০, চতুর্থ অংকের ৩, ৭, ৮, পঞ্চম অংকের ১, ৩, ৮, ৯, ১০, দৃশ্যগুলি নাটকের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় অংকের চতুর্থ দৃশ্যে মীরকাশিমের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সহিত মীরজাফরের গোপন ষড়যন্ত্রমূলক বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কার্যের জন্য নাট্যকার পঞ্চম অংকের দশম গর্ভাংকে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত মীরজাফরের শোচনীয় পরিণাম-দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। এই ঘটনার দ্বারা মীরজাফর চরিত্রের পরিণতি সম্পর্কে নাট্যকার শিল্পগত আদর্শের বিচার (Poetic justice) প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পঞ্চম অংকের একাদশ দৃশ্যে মীরকাশিমের মৃত্যুর পর মুহূর্তে বেগমের পতন ও মৃত্যুর ঘটনার উপস্থাপনার দ্বারা নাট্যকার [illegible] নাটকের মধ্যে উত্তুঙ্গ ভাবাবেগের সৃষ্টি করেছেন।

মূল ঘটনা ইতিহাসের তথ্যকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। তবে পঞ্চম অংকের একাদশ দৃশ্যে রোগগ্রস্ত ও বিকৃত মস্তিষ্ক অবস্থায় মীরকাশিমের মৃত্যুর ঘটনার উপস্থাপনার সঙ্গে নাট্যকারের কল্পনার যোগ বিদ্যমান।[৮৬] নাট্যক্রিয়ার প্রকৃতির মধ্যে লসন্ প্রবর্তিত নাট্যক্রিয়া পর্বের প্রভাব বিদ্যমান। প্রথম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য মীরকাশিমের নবাবী পদ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঘটনার মধ্যে নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ। প্রথম অংকের তৃতীয় দৃশ্য থেকে নাট্যক্রিয়ার ক্রমোন্নতি (Rising) ঘটতে থাকে। দ্বিতীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্যে অন্তঃবাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের শুল্ক নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে মীরকাশিমের মতবিরোধ ঘটনার মধ্যে ভবিষ্যৎ নাট্যসংকটের কারণ (Cause of the crisis) নিহীত। দ্বিতীয় অংকের ষষ্ঠ দৃশ্যে ইংরেজ সেনাপতি ইলিশের পাটনা আক্রমণ ও অধিগ্রহণের ফলে নাট্যক্রিয়ার

মধ্যে প্রথম সংঘর্ষের সূচনা হয়। তৃতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে আমীয়টের সঙ্গে মীরকাশিমের যুদ্ধ, চতুর্থ অংকের চতুর্থ দৃশ্যে মুঙ্গেরে হেস্টিংসের নেতৃত্বে ইংরাজ সৈন্যের সঙ্গে মীরকাশিমের যুদ্ধ, চতুর্থ অংকের ষষ্ঠ দৃশ্য ও পঞ্চম অংকের নবম দৃশ্যে যথাক্রমে পাটনা ও বক্সারে ইংরেজদের সঙ্গে মীরকাসিমের সশস্ত্র সংঘর্ষ—এ সকল ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া সংঘর্ষমুখী (clash) হয়ে ওঠে। পঞ্চম অংকের একাদশ দৃশ্যে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত নিঃসহায় মীরকাশিমের রোগ জর্জরিত অবস্থায় মৃত্যুর (climax) ঘটনায় নাট্যক্রিয়া গভীর অর্থপূর্ণ শেষাবস্থা (climax) প্রাপ্ত হয়।

ছত্রপতি শিবাজী (গিরিশচন্দ্র ঘোষ):

কূটবুদ্ধিযুক্ত রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে সংগ্রামশীলতার সঙ্গে অতিশয় কৌশলী বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। —এই মূলভাবকে আশ্রয় করে পাঁচটি অংকে ও তেতাল্লিশটি দৃশ্যে নাট্যকাহিনী রচিত হয়েছে।

প্রথম অংকে পরাধীনতার শৃংখল থেকে মাতৃভূমি উদ্ধারের জন্য শিবাজীর প্রতিজ্ঞাগ্রহণ এবং শিবাজী কর্তৃক বিভিন্ন দুর্গ দখলের ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে শিবাজী কর্তৃক সম্মুখ যুদ্ধে আফজল খাঁকে হত্যা করা ও শায়েস্তা খাঁকে দমন করে পুণা শহরে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কে ঔরংজেবের আমন্ত্রণে শিবাজীর দিল্লী যাত্রা এবং কুটবুদ্ধি-সম্পন্ন আওরঙ্গজেবের হস্তে দিল্লীতে নজরবন্দী থাকা অবস্থায় সুকৌশলে সেখান থেকে পুত্রসহ শিবাজীর পলায়ণের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। চতুর্থ অংকে আওরঙ্গজেব কর্তৃক শিবাজীকে স্বাধীন রাজা বলে স্বীকৃতি দান এবং শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের ঘটনা বিধৃত হয়েছে। পঞ্চম অংকে পুত্র শম্ভুজীর উপর রাজ্যের ভার অর্পণ করে শিবাজীর দেহত্যাগের ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে। মোঘলের সঙ্গে যুদ্ধ করে বীর ও কৌশলী শিবাজী কর্তৃক স্বাধীন মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মূল কাহিনী ছাড়া নাটকে (ক) লক্ষ্মীবাঈ—তানাজী, (খ) শিবাজীপুত্র শম্ভুজী ও (গ) শিবাজী—পুতলীবাঈ-সইবাইকে নিয়ে আর একটি ঘটনা সহ মোট তিনটি উপঘটনা বিদ্যমান। —এ সকল উপঘটনাগুলি মূল ঘটনার উৎকর্ষ সাধন করতে পারেনি। বস্তুতপক্ষে নাটকের মূল বিষয়বস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নাট্যকার শিবাজীর জীবনের বহু ঘটনার মধ্য থেকে নাট্যবৃত্ত গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আবশ্যিক ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার নির্বাচনের দ্বারা নাট্যকাহিনীর সুষ্ঠু বিন্যাস রচনা করতে পারেন নি। এর ফলে নাটকে সংযোজিত ঘটনাগুলির মধ্যে আদি—মধ্য-অন্ত্য যোগ না থাকায়, একটি ঘটনা অপর ঘটনার পরিপূরক হয়ে ওঠে নি। নাটকের আয়তন অতি বিস্তৃত হয়ে পড়েছে এবং নাট্যসংহতি ব্যাহত হয়েছে। নাটকের ক্রিয়ার মধ্যে বহির্দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটলেও সেই দ্বন্দ্বের সুষ্ঠু পরিণতির দ্বারা নাট্যসঙ্কট ঘনীভূত হয়ে ওঠে নি। কেন্দ্রীয় ঘটনার সঙ্গে কার্য-কারণ সম্পর্ক না থাকায়—প্রথম অংকের ৩, ৪, ৫, ৭, দ্বিতীয় অংকের

১, ৪, ৭, ৯, তৃতীয় অংকের ৩, ৪, চতুর্থ অংকের ৪, ৫, পঞ্চম অংকের ১, ৪, ৫, দৃশ্য-গুলি নাটককে ভারসর্বস্ব করে তুলে নাট্যক্রিয়ার গতিকে স্থানে স্থানে মন্থর করে তুলেছে। নাটকের প্রয়োগের সময় দৃশ্য সজ্জা ও দৃশ্য পরিবর্তনের সুবিধার জন্য ১।৪, ২।৯, ৩।৮, ৪।৫, ৫।৯ —এ সকল স্বল্পায়তন দৃশ্যগুলি রচনা করা হয়েছে। প্রথম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে ও পঞ্চম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে শিবাজীকে যথাক্রমে ভবানীর পুত্র ও মহাদেবের অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করা, অচেতন অবস্থায় শিবাজীর মুখ হতে 'দেবীবাক্যের' বানী দান (৪ । ৬ দৃশ্য), এ সকল অলৌকিক ঘটনার সংযোজনের মধ্যে ঐতিহাসিক নাট্য রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকারের পৌরাণিক মানসিকতার প্রভাব পড়েছে। পঞ্চম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে মহাদেবের স্বপ্নাদেশ অনুসারে শিবলোকে স্থান পাবার বাসনায় শিবমন্দিরের ভেতর জিজাবাঈ-এর প্রায়োপবেশনের দ্বারা দেহত্যাগ, ঐ অংকের অষ্টম দৃশ্যে দেশের প্রতি আরাধ্য কর্ম্ম সম্পাদনের পর স্বর্গীয় স্বামীর দর্শনে লক্ষ্মীবাঈ-এর দেহত্যাগের বাসনা, ঐ অংকের দশম দৃশ্যে মৃত্যু-পথযাত্রী শিবাজীর সঙ্গে পুতলার সহমরণের উদযোগ, —মূল কাহিনীর সঙ্গে সংযোগ বিহীন এ সকল আবেগ মণ্ডিত ঘটনা পরম্পরার সাহায্যে নাট্যকার যুক্তিহীনভাবে নাটকের মধ্যে ভাবাবেগের উত্তুঙ্গ অবস্থার সৃষ্টি করেছেন।

নাট্যকাহিনী বিন্যাসে নাট্যকার মূলত একনিষ্ঠতার সঙ্গে শিবাজী সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহের দ্বারা ইতিহাসকে অনুসরণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন।[৮৬ক] তথাপি পঞ্চম অংকের সপ্তম দৃশ্য অনুযায়ী মোঘল সেনাপতি দিলীর খাঁর সহায়তায় শম্ভুজীর মোঘল শিবির ত্যাগের ঘটনা ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার সমর্থন করেন নি।[৮৭] নাটকে উল্লিখিত শিবাজীর শোথ্ রোগে মৃত্যুর ঘটনা (৫ । ১০) সম্পর্কেও ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার ভিন্নমত পোষণ করেন।[৮৮]

নাট্যক্রিয়ার গঠন প্রকৃতি L. Cambell রীতি অনুযায়ী অধিবৃত্তাকারের (Parabolical) রূপ লাভ করেছে। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে শিবাজী কর্তৃক মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণের মধ্যে দিয়ে নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ। এরপর থেকে নাট্যক্রিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে থাকে। শিবাজী কর্তৃক আফজলকে হত্যা (২ । ৩), শায়েস্তা খাঁর হাত থেকে শিবাজীর পুণা শহর দখল (২ । ১০), ঔরঙ্গজেবের আমন্ত্রণে শিবাজীর দিল্লী যাবার উদযোগ গ্রহণ (৩ । ১), ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে শিবাজীর নজরবন্দী হওয়া (৩ । ৫), এ সকল ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়ার ক্রমোন্নতি (Climax) ঘটে। ঔরঙ্গজেবের প্রাসাদ থেকে সুকৌশলে পুত্রসহ শিবাজীর পলায়ণ ঘটনায় (৩ । ৮) নাটকের চূড়ান্ত সঙ্কট (Acme) পরিস্ফুট। এরপর তৃতীয় অংকের নবম দৃশ্য থেকে পঞ্চম অংকের সপ্তম দৃশ্য পর্যন্ত নাট্যক্রিয়ার ক্রমহ্রাসমুখী অবস্থার (Sequel) সৃষ্টি হয়েছে। পরে মোঘল সেনাপতি দিলীর খাঁকে পরাজিত করে মোঘলের বিরুদ্ধে শিবাজীর জয়লাভ ও স্বাধীন মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ঘটনায় নাট্যক্রিয়া পরিণতি (Conclu-sion) লাভ করেছে।

অশোক (গিরিশচন্দ্র ঘোষ) ঃ

আত্মসংযম ও রিপুজয়ের দ্বারা পার্থিব জগত সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটলে মানুষ পরম সত্যকে লাভ করতে পারে। এই কেন্দ্রীয় ভাবকে অবলম্বন করে পাঁচটি অংকে ও একচল্লিশটি দৃশ্যের দ্বারা নাট্য কাহিনী রচিত হয়েছে। প্রস্তাবনা দৃশ্যেই বুদ্ধদেবের পরম স্নেহের পাত্ররূপে মহারাজ অশোকের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ ও বৌদ্ধধর্ম প্রচারের মূল কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। নাটকের প্রথম অংকে বিন্দুসারের নির্দেশক্রমে অশোক কর্তৃক তক্ষশীলার বিদ্রোহ দমন করে সেখানকার সিংহাসনে উপবেশন করার ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোকের পাটলীপুত্রের সিংহাসন লাভ ও কলিঙ্গরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার ঘটনা উপস্থাপিত করা হয়েছে। তৃতীয় অংকে কলিঙ্গযুদ্ধে অশোকের জয়লাভ ও বৌদ্ধগুরু উপগুপ্তের সংস্পর্শে এসে কলিঙ্গযুদ্ধের হিংসাত্মক পরিণতি দর্শনে ভারাক্রান্ত ও অনুতপ্ত অশোকের ত্যাগধর্মে ব্রতী হওয়া এবং পরে তাঁর বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদযোগ গ্রহণের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। চতুর্থ অংকে আত্মসংযম ও রিপুসংযমের অভাবে অশোক কর্তৃক জৈনদের হত্যার আদেশ দান এবং জৈনদের রক্ষার্থে বীতশোকের আত্মোৎসর্গের ঘটনায় অশোকের চেতনা লাভের কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। পঞ্চম অংকে সংসারের মোহ-মায়ার বন্ধন থেকে অশোকের মুক্তিলাভ এবং আত্মসংযম ও রিপুজয়ের দ্বারা চিত্তের শুদ্ধতা লাভের ফলে অশোকের বৌদ্ধমূর্তি দরশনের কাহিনী বিধৃত হয়েছে।

অশোকের বৌদ্ধধর্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ ও তাঁর দ্বারা বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের মূলকাহিনী ছাড়া নাটকে (ক) সুসীম—চিত্তহরা-চন্দ্রকলা কাহিনী, (খ) সুভদ্রাঙ্গীসহ রাজা বিন্দুসারের পারিবারিক কাহিনী, (গ) পদ্মাবতী—ন্যগ্রোধ ও চণ্ডাল কাহিনী, (ঘ) অশোক—তিষ্যরক্ষিতা কাহিনী,—এ সকল চারটি উপকাহিনী বিদ্যমান। এ সকল উপকাহিনীর দ্বারা মূল কাহিনীকে ভারগ্রস্ত করে তোলা হয়েছে এবং নাটকের আয়তন অনাবশ্যক ভাবে অতিবিস্তৃত হয়ে পড়ে নাট্যসংহতিকে ক্ষুন্ন করেছে। নাট্যঘটনাগুলি কার্যকারণ সম্ভূত হয়ে সংহত হয়ে না ওঠায় কাহিনী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। নাট্যক্রিয়ার সুষ্ঠুগতি ব্যাহত হয়ে পড়েছে এবং নাট্যক্রিয়ার মধ্যে একমুখী উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্য ক্ষুন্ন হয়েছে। মূলক্রিয়ার সঙ্গে সংযোগ না থাকায় প্রথম অংকের ৩, ৪, ৫, ৬, দ্বিতীয় অংকের ৫, ৬, ৭, তৃতীয় অংকের ২, ৪, ৫, ৬, ৭, চতুর্থ অংকের ৩, ৫, ৬, পঞ্চম অংকের ১, ৬, ৮ দৃশ্যগুলি নাটকের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। নাটকের প্রস্তাবনা দৃশ্যে ভবিষ্যৎ বাণীর কার্যকারিতা, 'মারের' প্রভাবে হঠাৎ মায়াকাননের সৃষ্টি (১।৫ দৃশ্য), হঠাৎ প্রান্তরের হ্রদে পরিণত হওয়া এবং হ্রদ মধ্যে প্রাসাদের সৃষ্টি (২।৮), যোগবলের দ্বারা উপগুপ্তের ভবিষ্যৎ চিত্র দর্শানো (৩।৪), উপগুপ্তের প্রভাবে মৃত আকালের জীবনলাভ করা, অন্ধ কুণালের অন্ধত্ব দূর হওয়া (৫।২), শূন্যমার্গে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব (৫।১৩), নাট্যবস্তুগঠনে এ সকল অলৌকিক ক্রিয়ার সংযোজনার ক্ষেত্রে নাট্যকারের পৌরাণিক মনোভাবের প্রভাব বর্তমান।

মূল নাট্যকাহিনীর গ্রন্থনায় নাট্যকার ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ততা স্থাপন করেছেন। কিন্তু নাটকের মধ্যে উল্লিখিত অনেক ঘটনাই ইতিহাস সাপেক্ষ নয়। নাটকের প্রথম অংকে সিংহাসনে অশোকের অরোহণ করার ক্ষেত্রে ভ্রাতৃবিরোধের ঘটনার উপস্থাপনার সঙ্গে ইতিহাসের যোগ নেই। ইতিহাসের তথ্য অনুযায়ী বিন্দুসারের নির্বাচন ক্রমে অশোক শান্তিপূর্ণভাবেই সিংহাসন লাভ করেন।[৮৯]

সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুসিমের সঙ্গে অশোকের সংঘর্ষ (২।২, ২।৩ দৃশ্য) এবং সুসীমের পুত্র ন্যাগ্রোধের কাছ থেকে অশোকের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ ও তার প্রচারে ব্রতী হওয়ার (৩।৮) ঘটনা সম্পর্কে নাট্যকার সিংহলীয় বৌদ্ধ-লোক কথার সাহায্য গ্রহণ করেছেন।[৯০] উপগুপ্তের পরামর্শে অশোকের বৌদ্ধধর্মের প্রতি আনুগত্যলাভ (৩।৩), কলিঙ্গযুদ্ধের পর চন্দ্রাশোকের ধর্মাশোকে পরিণত হওয়া এবং পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে তার বিবিধ প্রয়াসের ঘটনা ঐতিহাসিক সত্য।[৯১] নাটকে দ্বিতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে মন্ত্রী রাধাগুপ্তের সহায়তায় ও পরামর্শে অশোকের সিংহাসনে আরোহণ, চতুর্থ অংকের চতুর্থ দৃশ্যে তিষ্যরক্ষিতাকে অশোকের স্ত্রীরূপে গ্রহণ এবং তৃষ্যরক্ষিতার ষড়যন্ত্রে কুণালের চক্ষু উৎপাটন, এ সকল ঘটনার সংযোজনার ক্ষেত্রে নাট্যকার এ বিষয়ে প্রচলিত ভারতীয় লোক কথার সাহায্য গ্রহণ করেছেন।[৯২]

নাট্যক্রিয়ার গঠনপ্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে অশোকের পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে রাজ্যের রাজনৈতিক ও মহারাজ বিন্দুসারের পারিবারিক অবস্থা চিত্রণের জন্য নাটকের প্রথম অংকটি ভূমিকাস্বরূপ উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে পিতার মৃত্যুর পর অশোকের রাজ্যভার গ্রহণের ঘটনা থেকে নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ (exposition)। দ্বিতীয় অংকের অষ্টম দৃশ্যে কলিঙ্গের বিরুদ্ধে অশোকের যুদ্ধযাত্রার ঘটনা, নাট্যক্রিয়ার সূচনা ও আরোহণের মধ্যবর্তী একটি উত্তেজক ঘটনা যা নাট্যক্রিয়াকে ক্রমশ উন্নত করে তুলেছে। কিন্তু নাট্যগঠনরীতির ত্রুটির জন্য পরবর্তী স্তরে নাট্যক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। ৩।৩, ৬, ৪।২, ৪।৮ দৃশ্যে সমূহে নাট্যক্রিয়ার মধ্যে একাধিক সংঘর্ষ দেখা দেয়। এই সংঘর্ষময় ঘটনাগুলি যুক্তি সঙ্গতভাবে কার্যকারণের ভিত্তিতে একই সূত্রে গঠিত হয়নি। এর ফলে নাট্যক্রিয়া ঘনদ্বন্দ্ব হয়ে ওঠেনি। অশোকের বুদ্ধজ্যোতি দর্শনের মাধ্যমে পরম সত্যকে উপলব্ধির ঘটনায় (৫।১০) নাট্যক্রিয়া পরিণতি লাভ করেছে।

সাজাহান (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) ঃ

অতিরিক্ত স্নেহের অন্ধত্বে সৃষ্ট রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা পরিণামকে শোচনীয় করে তোলে।—এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে পাঁচটি অংকে ও তিরিশটি দৃশ্যে নাট্য-কাহিনী গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে সাজাহানের অবর্তমানে দারার সিংহাসন লাভের আশঙ্কায় সাজাহানের বিরুদ্ধে ঔরংজেব মোরাদ ও সুজার বিদ্রোহ এবং মোরাদের

সহযোগিতায় ঔরংজেব কর্তৃক দারাকে পরাজিত করা ও সাজাহানের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার সুযোগে আগ্রা দুর্গে সাজাহানকে বন্দী করার ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে সাজাহানের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে ঔরংজেব কর্তৃক মোরাদকে বন্দী করা এবং জাহানারার আনীত রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগ সুকৌশলে খণ্ডন করে দিল্লীর সিংহাসনে ঔরংজেবের নিজের অধিকার শক্তভাবে কায়েম করার কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। তৃতীয় অংকে সাহানাবাজ ও যশোবন্তের সহায়তায় ঔরংজেবকে দমন করার জন্য দারার প্রচেষ্টা ঔরংজেবের কূটবুদ্ধির কৌশলে বিনষ্ট হয়ে যাওয়া, ও বন্দী সাজাহানের অচরিতার্থ বাসনার কাহিনী উপস্থাপিত করা হয়েছে। চতুর্থ অংকে জীহন আলী কর্তৃক ধৃত বন্দী দারার মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকরী হওয়া এবং ঔরংজেব কর্তৃক দারার ছিন্নমুণ্ড বন্দী সাজাহানকে উপহার দেওয়ার কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। পঞ্চম অংকে ঔরংজেব কর্তৃক সুজাকে ভারতবর্ষ হতে বিতাড়িত করে, মোরাদকে হত্যা করে সিংহাসনের অধিকারকে নিষ্কণ্টক করার দ্বারা সাজাহানের অদূরদর্শিতার প্রাপ্য ফল তাকে দান করা এবং অনুতপ্ত হবার ভান দেখিয়ে সাজাহানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করার কাহিনী দেখান হয়েছে।

সাজাহানের দূরদর্শিতার অভাবে পুত্র ঔরঙ্গজেবের হাতে তাঁর বন্দীদশা প্রাপ্ত হওয়া এবং পুত্র হত্যার আঘাত সহ্য করে সিংহাসন হারানোর মূল কাহিনী ছাড়া নাটকে (ক) দারা-নাদিরা-সিপার কাহিনী, (খ) মহামায়া-যশোবন্ত কাহিনী, (গ) সুজা-পিয়ারা কাহিনী, (ঘ) সোলেমান-পৃথ্বীসিংহ-জহরৎউন্নিসা কাহিনী—এ সকল চারটি উপকাহিনী বিদ্যমান। মূল কাহিনীর সমৃদ্ধিতে এ সকল উপকাহিনীর কোন যোগ নেই। এতগুলি উপকাহিনীর চাপে কেন্দ্রীয় কাহিনীর একমুখী গতিধারা মাঝে মাঝে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পড়েছে এবং নাট্যসংহতিও ব্যাহত হয়েছে। নাট্যক্রিয়া মূলতঃ অন্তর্দ্বন্দ্বমুখী হয়ে আকর্ষণীয় ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে এগিয়ে গিয়েছে। মূল নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্ক না থাকায় প্রথম অংকের চতুর্থ, দ্বিতীয় অংকের তৃতীয়, তৃতীয় অংকের চতুর্থ, চতুর্থ অংকের তৃতীয় এবং পঞ্চম অংকের প্রথম, দৃশ্যগুলি নাট্যবস্তুকে ভারসর্বস্ব করে তুলেছে।

নাটকের মূলকাহিনী ইতিহাস সম্মত। কিন্তু কাহিনীর বিন্যাসের ক্ষেত্রে নাট্যকার সর্বত্র ইতিহাসের অনুমোদন লাভ করেননি। প্রথম অংকের সপ্তম দৃশ্য অনুসারে মহম্মদের নেতৃত্বে আগ্রা দুর্গ দখলের ঘটনা ইতিহাস স্বীকৃত নয়। সুকৌশলে অন্যান্য সেনাপতির সাহায্যে আওরঙ্গজেব দুর্গ দখল করার পর সর্বপ্রথম আওরঙ্গজেবের পক্ষ হয়ে মহম্মদ দুর্গে অবস্থিত সাজাহানের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন মাত্র। সে সময় মহম্মদকে সাজাহানের নবাবী পদ দানের প্রস্তাব মূলক যে ঘটনা নাটকে স্থান লাভ করেছে তা প্রচলিত ঘটনা বিশেষ।[৯৩] দ্বিতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে ঔরংজেব কর্তৃক মোরাদকে বন্দী করার ঘটনা ইতিহাস সত্য হলেও, নাটকে বর্ণিত এক সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে জাগ্রত এবং পানোন্মত্ত অবস্থায় নিষ্ক্রিয় মোরাদকে বন্দী করার ঘটনার উপস্থাপনার সঙ্গে ইতিহাসের মিল নেই।[৯৪]

চতুর্থ অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে জীহন আলির কক্ষে নাদিরার মৃত্যুর ঘটনাও অনৈতিহাসিক। দাদার (Dadar) যাবার পথে উদরাময় রোগে আক্রান্ত হয়ে নাদিরার মৃত্যু হয়। নাদিরার মৃত্যুর পর শেষকৃত্য সম্পাদন এবং শোকাহত দিনগুলি অতিবাহিত করার জন্যই পুত্রের নিষেধ সত্বেও দারা জীহন আলির ঘরে আশ্রয় নেয়।[৯৫]

নাটকের পঞ্চম অংকের ষষ্ঠ দৃশ্যে (ক) পিতা সাজাহানের আবেদনে জাহানারা কর্তৃক ঔরংজেবকে ক্ষমা করার ঘটনা এবং (খ) পিতার সম্মুখে উপস্থিত অনুতপ্ত ঔরংজেবের আবেদনে, পুত্র হিসাবে তাকে সাজাহানের ক্ষমা করার ঘটনা দেখান হয়েছে। প্রথম ঘটনা (ক) সংস্থাপনের ক্ষেত্রে নাট্যকার ইতিহাসকে মেনে চলেন নি। কারণ ইতিহাসে এর বিপরীত ঘটনার উল্লেখ বর্তমান।[৯৬] দ্বিতীয় ঘটনার (খ) পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় জাহানারার অনুরোধে সাজাহান জীবনের শেষ অবস্থায় ঔরংজেবকে ক্ষমা প্রদর্শন করলেও সেখানে পিতা পুত্রের মিলনের ঘটনা ইতিহাসের পরিপন্থী।[৯৭]

চতুর্থ অংকের ষষ্ঠ দৃশ্যানুযায়ী প্রাণদণ্ড কার্যকরী করার সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও নিঃশঙ্ক চিত্তে জল্লাদের কাছে দারার আত্মসমর্পণের ঘটনা ইতিহাস সমর্থিত নয়। জীহন আলির নিকট প্রাণ বাঁচাবার সকল আবেদন ব্যর্থ হলে দারা আত্মরক্ষার তাগিদে কারাগারের ভিতর তার বালিশের ভিতর লুকিয়ে রাখা ছুরি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বের করে নিয়ে জীহন আলি সহ জল্লাদ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। কিন্তু সংঘর্ষে দারা কিছুক্ষণ পর পর্যুদস্ত হলে, দারাকে তারা হত্যা করে।[৯৮] দ্বিতীয় অংকের পঞ্চম দৃশ্যানুযায়ী পিতাকে বন্দী করে সিংহাসনে অন্যায় ভাবে আহরণ করার জন্য ঔরংজেবের বিরুদ্ধে দিল্লীর দরবার কক্ষে সভাপদদের সম্মুখে জাহানারা কর্তৃক রাজদ্রোহীতার অভিযোগ আনার ঘটনা সম্পর্কে ইতিহাসের নীরবতা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে সাজাহান বন্দী হবার পর, চারভাই-এর মধ্যে সাম্রাজ্যের সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য জাহানারা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে মাত্র একবারই জাহানারা ঔরংজেবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এ বিষয়ে জাহানারার সঙ্গে একমতাবলম্বী হলেও পরে সন্দেহের বশে এবং শায়েস্তা খাঁর পরামর্শে ঔরংজেব তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন।[৯৯]

নাট্যক্রিয়া ফ্রেতাগ বর্ণিত পিরামিড আকৃতির ন্যায়। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে পুত্রদের বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব সাজাহান কর্তৃক দারাকে দেওয়ার ঘটনার মধ্যে নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ (Introduction)। প্রথম অংশের দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রাথমিক ভাবে দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঔরংজেবের জয়ের ঘটনাটি ক্রিয়ার সূচনা ও ক্রিয়ার আরোহনের (Rising) মধ্যে একটি উত্তেজক ও আকর্ষণীয় ঘটনা যা ক্রিয়াকে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বমুখী (Rision) করে তুলেছে। প্রথম অংকের পঞ্চম দৃশ্যে দারাকে পর্যুদস্ত করে কৌশলে আগ্রা দখলের জন্য ঔরঙ্গজেবের প্রচেষ্টা, সপ্তম দৃশ্যে আগ্রাদুর্গ দখল ও সাজাহানের বন্দী হওয়া, দ্বিতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী

সাজাহানের অন্তর্দাহ, এ সকল ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যদ্বন্দ্ব ক্রমশঃ সংকটময় হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় অংকের পঞ্চম দৃশ্যে ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে জাহানারা কর্তৃক আনীত পিতৃদ্রোহিতা ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ খণ্ডন করে দিয়ে দরবারের সভাসদ্‌দের অনুমতিক্রমে ঔরংজেব কর্তৃক দিল্লীর সিংহাসনে নিজের অধিকার কায়েম করার ঘটনার মধ্যে নাটকের চূড়ান্ত মুহূর্ত (Climax) গঠিত হয়েছে। এরপর থেকে নাট্যক্রিয়া ক্রমহাসমুখী হতে থাকে (Return / Fall)। তৃতীয় অংকের ষষ্ঠ দৃশ্যে সাহানাবাজ ও যশোবন্তের সহায়তায় সংহত শক্তির দ্বারা ঔরংজেবকে পরাজিত করার জন্য দারার পুনঃপ্রচেষ্টার ঘটনা, নাটকের চূড়ান্ত মুহূর্ত ও অবরোহণ মুহূর্তের মধ্যে একটি উত্তেজক ঘটনা। এর দ্বারা নাট্যক্রিয়ার অবরোহণ মুহূর্তেও নাটকের ঔৎসুক্যকে ধরে রাখা হয়েছে। চতুর্থ অংকের ষষ্ঠ দৃশ্যে দারার হত্যার মধ্য দিয়ে সাজাহানের বিষাদময় পরিণতির সূচনা হয় এবং পঞ্চম অংকের চতুর্থ দৃশ্যে মোরাদের হত্যার মধ্য দিয়ে এই বিষাদ করুণ অবস্থা আরও গভীরতর হয়ে ওঠে। পর পর পুত্র হত্যার আঘাতে সাজাহানের উন্মাদ হয়ে যাওয়ার ঘটনার (৫।৬ দৃশ্য) মধ্যে নাট্যক্রিয়ার পরিণতি (Catastrophe) সাধিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে শিল্পগত বিচারের আদর্শ (Poetic justice) বজায় রাখার জন্য পঞ্চম অংকের পঞ্চম দৃশ্যে ঔরংজেবের বিবেকের দংশনের যে ঘটনা দেখান হয়েছে তারই ফলে অনৈতিহাসিক হলেও এই অংকের ষষ্ঠ দৃশ্যে সাজাহানের নিকট অনুতপ্ত ঔরংজেবের ক্ষমা প্রার্থনার ঘটনার সংযোজন করা হয়েছে।

চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়):

রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির সহায়তায় সিংহাসন লাভ ও রাজ্য বিস্তার সম্ভব হয়—এই মূল ভাবকে অবলম্বন করে পাঁচটি অংকে ও ছাব্বিশটি দৃশ্যে নাট্যবস্তু গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের কাছ থেকে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য গ্রীক সেনাপতি সেলুকসের কাছে চন্দ্রগুপ্তের অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ এবং কূটবুদ্ধি সম্পন্ন ব্রাহ্মণ চাণক্যের সাহায্য লাভের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে চাণক্যের সহায়তায় নন্দের সঙ্গে যুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তের জয়লাভ এবং হৃতরাজ্য উদ্ধারের ঘটনা দেখান হয়েছে। তৃতীয় অংকে কূটবুদ্ধির কৌশলে চাণক্য কর্তৃক নন্দবংশ ধ্বংস ও নন্দকে হত্যার মাধ্যমে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করা এবং দিগ্বীজয়ী সেলুকস কর্তৃক চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণের ঘটনা বিধৃত হয়েছে। চতুর্থ অংকে দাক্ষিণাত্য জয়ের দ্বারা চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করা এবং চাণক্যের তীক্ষ্‌বুদ্ধি ও কৌশলের সাহায্যে রাজ্য-মধ্যে বিদ্রোহীদের দমন করে সেলুকসকে পরাজিত করার মাধ্যমে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের সীমানা আরও বিস্তৃত হওয়ার কাহিনী দেখান হয়েছে। পঞ্চম অংকে চন্দ্রগুপ্তের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ফলে চন্দ্রগুপ্ত ও হেলেনের বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা গভীর ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাহিনী গ্রথিত হয়েছে।

চাণক্যের সহায়তায় চন্দ্রগুপ্তের হৃতরাজ্য উদ্ধার ও সাম্রাজ্য বিস্তারের মূল কাহিনী

ভিন্ন নাট্যবৃত্তে আরও তিনটি উপকাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। (ক) হেলেন—এ্যাণ্টিগোনাসকে কেন্দ্র করে একটি উপকাহিনী, (খ) ছায়া ও চন্দ্রগুপ্তকে নিয়ে একটি উপকাহিনী, (গ) চাণক্য—চাণক্যকন্যা আত্রেয়ী ও দস্যুকে নিয়ে আরও একটি উপকাহিনী—এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। W.T. Price এর সূত্র অনুযায়ী এই তিনটি উপকাহিনীরও পৃথক পৃথক সিদ্ধান্ত বাক্য বর্তমান। সেক্ষেত্রে প্রথমটির সিদ্ধান্তবাক্য হচ্ছে মানুষ কর্মের জন্য দায়ী নয়। দ্বিতীয়টির মূলভাব হচ্ছে আত্মদান ও ত্যাগের মধ্যে প্রেমের গরিমা নিহিত। তৃতীয় উপকাহিনীর মূল উপজীব্য বিষয় হচ্ছে হৃদয়বৃত্তিকে দমিত করে বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে জীবনের সার্থকতা লাভ করা যায় না। W.T. Price-এর মতানুযায়ী মূল কাহিনীর সিদ্ধান্তবাক্য অন্যান্য উপকাহিনীর সিদ্ধান্তবাক্যকে নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু আলোচ্য নাটকে প্রতিটি উপকাহিনী নিজস্ব মূল বিষয়বস্তু নিয়ে নিজ নিজ গতিপথ রেখার সৃষ্টি করেছে। এর ফলে মূল কাহিনীর সঙ্গে এ সকল উপকাহিনীর যুক্তিনিষ্ঠ কার্যকারণ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। পরিণতিতে নাটক বৃহৎ আকার ধারণ করে নাট্যসংহতিকে ক্ষুণ্ণ করেছে এবং নাটকের গঠন দুর্বল হয়ে পড়েছে। চরিত্র সৃষ্টি ও ভাবাবেগের প্রাধান্যের দ্বারা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে গড়ে ওঠা প্রথম অংকের ১, ২, ৩ দ্বিতীয় অংকের ৩, ৫, ৬, চতুর্থ অংকের ২—৬ এবং পঞ্চম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যগুলি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু মূলভাবের সঙ্গে যুক্তিনিষ্ঠ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে গড়ে না ওঠায় নাটকের দ্বিতীয় অংকের ১, ৩, তৃতীয় অংকের ১, ২, চতুর্থ অংকের ৪, পঞ্চম অংকের ১, ৩, দৃশ্যগুলি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

মূল নাট্যকাহিনীর বিন্যাসে নাট্যকার ইতিহাসের অনুসরণ করেছেন। কিন্তু নাট্যকাহিনীতে সংযোজিত কয়েকটি ঘটনায় ইতিহাসের অনুমোদন পাওয়া যায় না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, কমনডক-এর (Kamandak) নীতিশাস্ত্র, পুরাণ, মহাবংশ,—অনুসারে কৌটিল্য বা চাণক্যের সহায়তায় চন্দ্রগুপ্তের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার ও নন্দবংশ ধ্বংসের কাহিনীর সত্যতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা একমত পোষণ করেন।[১০০]

নাটকে চন্দ্রগুপ্তকে শূদ্রবংশজাত বলা হলেও (১।১) তাঁর বংশ মর্যাদা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতদ্বৈততা বিদ্যমান। এ সম্পর্কে V. A. Smith এবং Hemchandra Roychoudhury-র মতামত লক্ষণীয়।[১০১] পঞ্চম অংকের পঞ্চম দৃশ্যানুযায়ী কন্যা আত্রেয়ীকে লাভ করার পর চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করে চাণক্যের বিদায় গ্রহণের ঘটনা ইতিহাস অনুমোদিত নয়।[১০২] হিবার্টের রাজপ্রাসাদে বসে সেলুকস কর্তৃক আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু সংবাদ লাভ-এর ঘটনার সঙ্গেও (২।১) ইতিহাসের যোগ নেই।[১০৩] চন্দ্রগুপ্তের মলয়কেতুর সামরিক সাহায্য লাভ, ছায়া—চন্দ্রগুপ্তের প্রেমমূলক ঘটনা ১।৪, ৩।৫, ৪।৬, ৫।১, এ্যাণ্টিগোনাসের জন্মরহস্য বৃত্তান্ত ইত্যাদি ঘটনাও ইতিহাস নির্ভর নয়। এ সকল ঘটনার বিন্যাসে নাট্যকার স্বীয় কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করেছেন।[ক]

ক—"অনন্যোপায় হইয়া কল্পনার উপরেই সমধিক নির্ভর করিয়াছি"—

—ভূমিকা, চন্দ্রগুপ্ত

নাট্যক্রিয়ার গঠন প্রকৃতি Gustav Freytag-এর পিরামিড গঠনাকৃতি লাভ করেছে। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে চন্দ্রগুপ্তের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য সেলুকসের কাছে তাঁর অস্ত্র শিক্ষালাভের ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে (oxposition)। এরপর নাট্যক্রিয়ার বিস্তৃতি ঘটলেও প্রথম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে মহারাজ নন্দ কর্তৃক চাণক্যের অপমান করার ঘটনাটি নাট্যক্রিয়ার সূচনা থেকে ক্রিয়ার ক্রম আরোহণের মধ্যবর্তী একটি উত্তেজক ঘটনা যা নাট্যক্রিয়াকে ক্রমশঃ উর্ধ্বমুখী করে তুলেছে। প্রথম অংকের চতুর্থ দৃশ্যে চন্দ্রগুপ্তের কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ চাণক্যের ও মলয়রাজ চন্দ্রকেতুর সাহায্য লাভের ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া ক্রমশঃ উর্ধ্বমুখী হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় অংকের পঞ্চম দৃশ্যে নন্দের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধের ঘটনার মধ্যে নাট্যক্রিয়ায় চূড়ান্ত সংকট মুহূর্ত climax গড়ে উঠেছে। এরপর নাট্যক্রিয়া ক্রমহ্রাসমুখী (Return or Fall) হয়ে পড়ে। এই পর্যায় তৃতীয় অংকের ষষ্ঠদৃশ্যে নন্দ হত্যার ঘটনাটি নাট্যক্রিয়ার চূড়ান্ত মুহূর্ত ও অবরোহণ মুহূর্তের মধ্যবর্তী আর একটি উত্তেজক ঘটনা। এর দ্বারা নাট্যক্রিয়ার মধ্যে ঔৎসুক্যকে বৃদ্ধি করা হয়েছে। চতুর্থ অংকের তৃতীয় দৃশ্যে কাত্যায়ণের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে চন্দ্রগুপ্তকে পরাজিত করার জন্য সেলুকসের উদযোগ গ্রহণ ও পঞ্চম দৃশ্যে উভয়ের যুদ্ধের ঘটনার দ্বারা নাট্যক্রিয়ার অবরোহণ ও নির্বহণের মধ্যবর্তী আর একটি নূতন উৎকণ্ঠাময় ঘটনার সংযোজনার মাধ্যমে নাট্যক্রিয়ারার কৌতুহলকে ধরে রাখা হয়েছে। চতুর্থ অংকের ষষ্ঠ দৃশ্যে চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধে জয়লাভ ও তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পঞ্চম অংকের পঞ্চম দৃশ্যে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে হেলেনের বিবাহের মাধ্যমে চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক দেশের নিরাপত্তা সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার ঘটনার মধ্যে নাট্যক্রিয়া নির্বহণ catastrophe লাভ করেছে।

রাণাপ্রতাপ সিংহ (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) ঃ

প্রকৃত স্বদেশপ্রেমী দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। —এই মূল ভাবকে অবলম্বন করে পাঁচটি অংকে ও উনচল্লিশটি দৃশ্যের দ্বারা নাট্যকাহিনী বিধৃত। প্রথম অংকে চিতোর উদ্ধারের জন্য রাণাপ্রতাপ সিংহের মরণ-পণ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ ও মোঘলের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে হলদিঘাট যুদ্ধে মোঘলশক্তির কাছে প্রতাপের পরাজয়ের কাহিনী বিন্যস্ত। তৃতীয় অংকে আকবরের কাছে বশ্যতা স্বীকার না করে প্রতাপের সপরিবারে বনান্তরে আশ্রয় গ্রহণের কাহিনী বিন্যস্ত। চতুর্থ অংকে প্রতাপ কন্যার মৃত্যু সত্ত্বেও সংঘবদ্ধ শক্তির সাহায্যে প্রতাপের পুণরায় চিতোর উদ্ধারের প্রচেষ্টার কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। পঞ্চম অংকে আকবরের সঙ্গে প্রতাপের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং চিতোর উদ্ধারের ভার পুত্রের উপর অর্পণ করে প্রতাপের মৃত্যু বরণের ঘটনা দেখান হয়েছে। চিতোর উদ্ধারের জন্য মোঘলশক্তির বিরুদ্ধে

প্রতাপের সংগ্রাম ও মৃত্যুবরণের মূল কাহিনী ছাড়া নাটকে (ক) লক্ষ্মী—ইরা-অমর সিংহকে আশ্রয় করে প্রতাপের পারিবারিক ঘটনা, (খ) শক্তসিংহ—দৌলত-উন্নিসার প্রণয়মূলক ঘটনা, (গ) মেহেরুন্নিসা—আকবর ঘটনা, (ঘ) রেবা—সেলিমের ঘটনা এবং (ঙ) যোশী-পৃথিবর ঘটনা—এ সকল মোট পাঁচটি উপঘটনা বিদ্যমান। নাট্যবৃত্ত গঠনের ত্রুটির জন্য এ সকল উপকাহিনীর সহিত মূলকাহিনীর শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে ঘটনা ঐক্য বজায় রাখা সম্ভবপর হয়নি। নাট্যমধ্যস্থ ঘটনাগুলি মূল ক্রিয়ার অনুসারী না হওয়ায় সামগ্রিক ভাবে ঘটনাগুলির মধ্যে আদি-মধ্য-অন্ত্য যোগ রক্ষিত হয় নি। নাট্য কাহিনী মূল বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রথম অংকের ২, ৩, ৫, ৭, দ্বিতীয় অংকের ১, ২, ৬, তৃতীয় অংকের ৪, ৫, ৬, চতুর্থ অংকের ১, ২, ৩, পঞ্চম অংকের ১, ৪, ৭ দৃশ্যগুলি মূলক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল রূপে উপস্থাপিত না হওয়ায় এ সকল দৃশ্য নাটকের পক্ষে অনাবশ্যক হয়ে পড়ে নাটককে ভারগ্রস্ত করে তুলেছে। প্রথম অংকের দ্বিতীয়, পঞ্চম ও তৃতীয় অংকের সপ্তম দৃশ্যগুলি নাট্যক্রিয়ার উৎকর্ষ সাধন অপেক্ষা নাট্যকারের জীবনদর্শনের বাহক হয়ে উঠেছে। পঞ্চম অংকের চতুর্থ দৃশ্যে অমর সিংহ কর্তৃক মেহেরুন্নিসার সম্মান হানির চেষ্টা, পুত্রকে শাস্তিদানের জন্য প্রতাপ সিংহের নিক্ষিপ্ত গুলিতে প্রতাপের স্ত্রী লক্ষ্মীর মৃত্যু, মনোঃকষ্টে প্রতাপের মূর্চ্ছা, ঐ পঞ্চম দৃশ্যে প্রতাপের নিকট হতে কন্যা মেহেরুন্নিসাকে আকবরের ফিরে পাওয়া—প্রতাপের সহৃদয়তায় মুগ্ধ আকবর কর্তৃক প্রতাপকে পুণরায় আক্রমণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ—এ সকল ঘটনার সংযোজনার দ্বারা কল্পনার আতিশয্যে নাট্যকার নাটকের মধ্যে ভাবাবেগের অতি উত্তুঙ্গ অবস্থার সৃষ্টি করেছেন।

রাণাপ্রতাপ সিংহ নাটকটিকে ইতিহাসাশ্রয়ী করে গড়ে তোলার জন্য নাট্যকার বহুদিন ধরে এই নাটক রচনার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন।[১০৪] তথাপি ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে নাটকের মূল কাহিনী ইতিহাসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও, কাহিনী বিন্যাসের ক্ষেত্রে নাট্যকার সর্বত্র ইতিহাসকে মেনে চলেন নি।

প্রথম অংকের অষ্টম দৃশ্যানুযায়ী শোলপুর থেকে প্রত্যাগত মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের প্রাসাদে মোঘলের পক্ষ হয়ে দৌত্যগিরি করার সময় প্রতাপাদিত্যের আতিথ্যের কার্যপ্রণালীতে অপমানিত বোধ করার জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ উদ্দেশ্যে প্রতাপের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। দ্বিতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে সেই যুদ্ধের অবতারণা। ইতিহাসের সত্য নাট্যঘটনার এই সত্য থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। আলোচনার মাধ্যমে প্রতাপের বশ্যতা লাভের জন্য আকবর ১৫৭২ সালের জুলাই মাসে জালালখানের নেতৃত্বে প্রথমবার, ১৫৭৩ সালের এপ্রিল মাসে মানসিংহের নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার, ১৫৭৩ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবর নাগাদ তৃতীয়বার এবং ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে রাজা টোডরমলের নেতৃত্বে চতুর্থবার দৌত্যগিরি করেন। এ সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে আকবর যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১০৫]

শক্তসিংহের দেশদ্রোহীমূলক কার্যকে ধিক্কার জানিয়ে তাঁর মনে দেশপ্রেমের

বীজবপন করার জন্য প্রতাপ-দুহিতা ইরার প্রচেষ্টা (২।৪), পর্বতে অরণ্যে প্রতাপের দিন যাপনের সময় অনাহারে ইরার মৃত্যু (৪।৪), এই দুইটি ঘটনাও ইতিহাসের আলোক লাভ করে নাই। বস্তুতপক্ষে ইরা নামে প্রতাপ সিংহের কোন কন্যার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সর্বোপরি পর্বত-অরণ্যের মাঝে দারিদ্রময় দিনযাপনের সময় প্রতাপের সন্তানরা শৈশব অবস্থায় ছিল।[১০৬]

হলদিঘাট যুদ্ধে খোরাসান ও মুলতানকে হত্যা করে প্রতাপ সিংহের প্রাণ বাঁচাবার অপরাধে শক্তসিংহকে সেলিমের বন্দী করা (৩।১), মেহেরুন্নিসার প্রচেষ্টায় শক্তসিংহের বন্দী-দশা থেকে মুক্তিলাভ (৩।২), দৌলতউন্নিসার সঙ্গে শক্তসিংহের মোঘলরাজ্য ত্যাগ ও প্রতাপের সঙ্গে মিলিত হওয়া (৩।৪)—এ সকল ঘটনা সম্বন্ধে ইতিহাসের স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। শেখ আবুল ফজলের আকবরি নামায় উক্ত ঘটনাকে সম্পূর্ণ ভাবে অস্বীকার করা হয়েছে।[১০৭] জেমস্ টড-এর পুস্তকে হলদিঘাটের যুদ্ধে প্রতাপের সংকটাপন্ন অবস্থায় প্রতাপকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করার ফলে শক্তসিংহ এবং প্রতাপ সিংহের মধ্যে পুনর্মিলনের কথা থাকলেও এর জন্য সেলিম কর্তৃক শক্তসিংহকে বন্দী করার সমর্থন পাওয়া যায় না।[১০৮]

আকবর কন্যা মেহেরুন্নিসার পিতৃগৃহ ত্যাগ করে রাণাপ্রতাপের আশ্রয়-গ্রহণ (৩।৫, ৩।৭) ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের যোগ নেই। মেহেরুন্নিসা নামে আকবরের কোন মেয়ের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় না।[১০৯] তাছাড়া আকবরের কোন মেয়েই রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেননি।[১১০] প্রতাপের মহত্ত্ব ও উদারতায় মুগ্ধ আকবরের প্রতাপের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তাকে পুণরায় আক্রমণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পূর্ণ ভাবেই অনৈতিহাসিক ঘটনা। বারংবার আক্রমণ করেও প্রতাপকে পরাজিত করতে না পেরেই আকবর প্রতাপের বিরুদ্ধে পুণরায় যুদ্ধযাত্রার পরিকল্পনা ত্যাগে বাধ্য হয়।[১১১] হলদিঘাট যুদ্ধের পর, দারিদ্র্যের জ্বালায় এবং নিজ পরিবারের চরম সংকট মুহূর্তে আকবরের নিকট প্রতাপের বশ্যতা স্বীকার করে পত্র দান (৪।৫, ৬) ঘটনাটিও ইতিহাস স্বীকৃত নয়।[১১২] নাটকে উল্লিখিত চিতোরের জঙ্গলে মানসিক ও দৈহিক দিক থেকে অসুস্থ অবস্থায় প্রতাপের মৃত্যুর ঘটনা (৫।৮) সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতদ্বৈততা বিদ্যমান।[১১৩]

নাট্যবস্তু গঠনের ত্রুটির জন্য নাটকের নাট্যক্রিয়ার প্রকৃতি সুষ্ঠু রূপে গড়ে ওঠেনি। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে চিতোর উদ্ধারের জন্য প্রতাপ সিংহের মরণপন সংগ্রাম করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঘটনার মধ্যে নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ। এরপর থেকে ক্রিয়া লক্ষ্যাভিমুখে এগুবার জন্য ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে থাকে। প্রথম অংকের অষ্টম দৃশ্যে প্রতিপক্ষ মান সিংহের সঙ্গে তথা মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রতাপের উদযোগ, দ্বিতীয় অংকের পঞ্চম দৃশ্যে মোঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাজপুত সৈন্যগণকে প্রতাপের উৎসাহ ও প্রেরণা দান, এ সকল ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়ার ক্রমোন্নতি ঘটতে থাকে (Rising action)। দ্বিতীয় অংকের সপ্তম দৃশ্যে হলদিঘাট সমরক্ষেত্রে আকবরের সঙ্গে প্রতাপের দ্বন্দ্ব, পঞ্চম অংকের প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যে

মোঘলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রতাপের কমলমীর দুর্গ অধিকার, ফিনশার দুর্গ জয়, এ সকল ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়ার মধ্যে সংঘর্ষ (clash) দেখা দেয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে পঞ্চম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে দৌলতউন্নিসাকে বিবাহ করার জন্য প্রতাপ কর্তৃক তার ভাই শক্তসিংহকে ত্যাগ করার ঘটনার মধ্যে অন্তর্মুখী সংঘর্ষের ছায়াপাত ঘটলেও নাট্যবস্তু গঠনের ত্রুটির জন্য তা ঘনীভূত হয়ে ওঠেনি। পঞ্চম অংকের অষ্টম দৃশ্যে চিতোর উদ্ধার করতে না পারার জন্য ক্ষোভে, দুঃখে ও বেদনায় রোগগ্রস্ত অবস্থায় প্রতাপের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া পরিণতি লাভ করেছে।

দুর্গাদাস (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) :

আদর্শ দেশপ্রেমিক যে কোন মূল্যে তাঁর আদর্শের প্রতি অবিচল থাকেন। এই মূল ভাবকে কেন্দ্র করে পাঁচটি অংকে ও বিয়াল্লিশটি দৃশ্যে নাট্যকাহিনী রচিত হয়েছে। প্রথম অংকে বীরত্ব ও কৌশল অবলম্বনের দ্বারা মোঘল বাহিনীকে পরাজিত করে দিল্লীতে অবরুদ্ধ যশোবন্তের পরিবারবর্গকে দুর্গাদাসের উদ্ধার করা এবং এর মাধ্যমে দুর্গাদাসের কর্তব্যবোধের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে মোঘলের আক্রমণ থেকে মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দুর্গাদাসের সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ এবং যুদ্ধে মোঘল বাহিনীর পরাজয়ে দুর্গাদাসের বীরত্ব ও দেশপ্রেমের ঘটনা উপস্থাপিত করা হয়েছে। তৃতীয় অংকে মাড়বারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দুর্গাদাসের নেতৃত্বে মোঘলের সঙ্গে মাড়বারের যুদ্ধে মোঘলের পরাজয় ও মাড়বার সামন্তগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও ঔরঙ্গজেবের বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে দুর্গাদাসের আশ্রয় দানের ঘটনা বিধৃত হয়েছে। চতুর্থ অংকে আকবরকে আশ্রয় দেওয়ায় মাড়বার সামন্তগণ কর্তৃক দুর্গাদাসকে পরিত্যাগ করা, দাক্ষিণাত্যে দুর্গাদাসের শম্ভুজীর নিকট আশ্রয়লাভ এবং শম্ভুজীর চক্রান্তে ঔরঙ্গজেবের হস্তে দুর্গাদাস বন্দী হলে মোঘল সেনাপতি দিলীর খাঁ কর্তৃক তাঁকে মুক্তি দান করার কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। পঞ্চম অংকে দুর্গাদাসের মাড়বারে প্রত্যাগমন ও মাড়বাধিপতি অজিত সিংহের অবৈধ প্রণয় লিপ্সার হাত থেকে রাজিয়াকে উদ্ধার করে ঔরঙ্গজেবের নিকট তাকে সমর্পণের মাধ্যমে দুর্গাদাস কর্তৃক ন্যায়াদর্শের প্রতিষ্ঠা করা এবং এই ঘটনায় ক্রুদ্ধ মাড়বাধিপতি কর্তৃক মাড়বার থেকে দুর্গাদাসকে নির্বাসনদণ্ড দানের ঘটনা গ্রথিত হয়েছে।

নাট্য কাহিনীর বিন্যাসের ক্ষেত্রে নাট্যকার সর্বত্র ইতিহাসের অনুমোদন লাভ করেননি। রাজ্য লাভের পর শম্ভুজী কর্তৃক শিবাজীকে বিষ প্রয়োগে হত্যার ঘটনার (২।৫) সঙ্গে ইতিহাসের সাযুজ্য নেই। অসুস্থ অবস্থাতেই শিবাজীর মৃত্যু হয়। শিবাজীর মৃত্যু সম্পর্কে মারাঠাবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ধারণার প্রচলন থাকলেও তার সঙ্গে নাটকে উল্লিখিত ঘটনার যোগ নেই।[১১৪] আকবর কন্যার নিরাপত্তার জন্য দুর্গাদাস কর্তৃক তাকে যোধপুর রাজপ্রাসাদে রেখে দেওয়ার ঘটনাও

(৪।২) ইতিহাস-সত্য নয়।[১১৫] নারী-লালসাবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য শম্ভুজী তাঁর দুর্গের বাইরে গেলে ঔরঙ্গজেব পুত্র আজম কর্তৃক সেই দুর্গ দখল করে শম্ভুজীকে বন্দী করার ঘটনাও (৫।১) ইতিহাস স্বীকৃত নয়।[১১৬] দিলীর খাঁর উদ্যোগে দুর্গাদাসের নিকট হতে রাজিয়াকে এনে ঔরঙ্গজেবের কাছে তাকে প্রেরণ করার (৫।৪) ঘটনাটিও ইতিহাস স্বীকৃত নয়। বস্তুতপক্ষে রাজিয়া সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ঔরঙ্গজেবের পরামর্শে সুজায়েৎ খানের প্রচেষ্টায় ও পাটনার নগর ব্রাহ্মণ ঈশ্বরীদাসের সক্রিয় সহযোগিতায় দুর্গাদাস শর্তাধীনে রাজিয়াকে ঔরঙ্গজেবের নিকট প্রেরণ করেন।[১১৭] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে আকবরের কন্যার নাম রাজিয়া ছিল না। সফিয়েৎউনিসা নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। রাজিয়ার সঙ্গে অজিত সিংহের প্রেমমূলক ঘটনা, রাজিয়ার সম্মান রক্ষার্থে দুর্গাদাস কর্তৃক রাজিয়াকে অজিত সিংহের কাছ থেকে নিয়ে আসা, পরে তাকে ঔরঙ্গজেবের নিকট প্রেরণ করা, রাজরোষে দুর্গাদাসের নির্বাসন দণ্ড লাভ, এসব ঘটনা (৫।৫) ইতিহাস অনুমোদিত নয়। বস্তুতপক্ষে দুর্গাদাসের বীরত্ব ও ক্ষমতার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে অজিত সিংহ তাঁর প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করেন। তারই পরিণতিতে দুর্গাদাস দেহত্যাগ করতে বাধ্য হন।[১১৮]

রাজদরবারে ঔরঙ্গজেবকে হত্যা করতে উদ্যত তাওয়ারখান-কে ঔরঙ্গজেবের হত্যার ঘটনাও (৩।৯) ইতিহাসানুসারী নয়।[১১৯] নাটকের পঞ্চম অংকের শেষ দৃশ্য অনুযায়ী নির্বাসিত দুর্গাদাস তার পুরানো ভৃত্য কাশিমের ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করে। এটা নাট্যকারের কল্পনার ফসল। ঐতিহাসিকদের মতে তিনি শেষকালে ঔরঙ্গজেবের অধীনে মনসবদারী পদ গ্রহণ করেন।[১২০] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শেষ দৃশ্যে নাটকে উল্লিখিত ঘটনার দ্বারা কাশিম ও দুর্গাদাসের পারস্পরিক প্রীতির মহিমাকে তুলে ধরে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে জাতীয় ঐক্যকে সুদৃঢ় করে তুলতে চেয়েছেন।[১২১ক] এর মধ্য দিয়ে রাজনীতি ও সমাজনীতি সচেতন ডি. এল. রায়ের পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে।

আদর্শ দেশপ্রেমিক হিসাবে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দুর্গাদাসের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের মূল কাহিনী ব্যতীত নাটকে (ক) শিবাজী পুত্র শম্ভুজী—আওরঙ্গজেব ঘটনা (খ) ঔরঙ্গজেব-আকবর ঘটনা, (গ) ঔরঙ্গজেব-গুলনেওয়ার কাহিনী, (ঘ) জয়সিংহ—কমলার কাহিনী, (ঙ) যশোবন্তর স্ত্রী মহামায়ার কাহিনী—এ সকল মোট পাঁচটি উপকাহিনী বিদ্যমান। এ সকল উপকাহিনীর দ্বারা মূল কাহিনী নাট্যানুগভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি। সামগ্রিকভাবে কাহিনীর অতিবিস্তৃতি নাট্য-সংহতিকে গভীরভাবে ব্যাহত করেছে। ঘটনাগুলির মধ্যে কার্যকারণ যোগের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে বিশিষ্ট আদর্শবোধকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নাট্যবৃত্তে ঘটনার আরোপ করা হয়েছে। আরোপিত ঘটনার ভারে নাটকের শিল্পধর্ম ও নাটকীয়ত্ব ক্ষুন্ন হয়ে পড়েছে[১২২] এবং নাট্যকারের বক্তব্যও বিশ্বাসযোগ্যভাবে

প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। নাট্য ঘটনা সংস্থাপনে বাস্তববোধকে অতিক্রম করে নাট্যকারের কল্পনার অতিবিস্তৃতি এবং যুক্তিহীনভাবে ভাবাবেগের অতি উন্নত অবস্থার সৃষ্টির ফলে নাট্যক্রিয়ার মধ্যে সম্ভাব্যতা ও আবশ্যিকতার যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি। নাট্যক্রিয়া এক ঘটনা থেকে আর এক ঘটনার মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে পরিণতি লাভ করেছে (Jumping conclusion)। একথা মনে রাখা দরকার সুষ্ঠু নাট্যক্রিয়া গঠনের মাধ্যমেই নাটকের ভাব ও ভাবনাকে প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়।[১২৩ক]

নূরজাহান (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়):

অতিরিক্ত ক্ষমতা লাভের উচ্চাশা নিজের ও প্রিয়জনের সর্বনাশ ঘটায়। এই মূল ভাবকে কেন্দ্র করে পাঁচটি অংকে ও একচল্লিশটি দৃশ্যে নাট্যকাহিনী রচিত হয়েছে। প্রথম অংকে জাহাঙ্গীরের প্রতি ক্ষমতা-প্রিয় নূরজাহানের উদ্দাম প্রবৃত্তির তাড়না এবং জাহাঙ্গীরের ষড়যন্ত্রে শের খাঁর হত্যার কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে ক্ষমতালাভের উচ্চাশায় ও সম্রাজ্ঞী হবার বাসনায় জাহাঙ্গীরকে নূরজাহানের বিবাহ করার কাহিনী বিধৃত হয়েছে। তৃতীয় অংকে নিষ্কণ্টকভাবে ক্ষমতার একাধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নূরজাহানের চক্রান্তে খসরুকে হত্যা করা এবং বিদ্রোহী সাজাহানকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাকে বন্দী করার নির্দেশ দানের কাহিনী উপস্থাপিত করা হয়েছে। চতুর্থ অংকে ক্ষমতার মোহে সামরিক বিভাগে নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখার প্রচেষ্টায় নূরজাহানের ক্ষমতার অপব্যবহার ও নূরজাহানের অবিবেচক কার্যকলাপে অপমানিত মোঘল সেনাপতি মহবৎ খাঁর বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহী মহাবৎ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে নূরজাহান-জাহাঙ্গীরের পরাজয় কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। পঞ্চম অংকে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাসন ক্ষমতা নিজের নিয়ন্ত্রনাধীনে রাখার জন্য নূরজাহান কর্তৃক তার জামাতা শারিয়ারকে আগ্রার সিংহাসনে বসাবার প্রচেষ্টা এবং সাজাহানের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও ক্ষমতা চ্যুত নূরজাহানের উম্মাদ হয়ে যাওয়ার কাহিনী সংকলিত হয়েছে।

ক্ষমতার উচ্চাশায় বধূসত্তা ও মাতৃসত্তাকে বিনষ্ট করে দিয়ে সম্রাজ্ঞী সত্তার প্রতিষ্ঠা করা ও রাজনৈতিক অদূরদর্শীতার জন্য সেই সম্রাজ্ঞী সত্তাকে ধরে রাখতে না পারায় নূরজাহানের উম্মাদ হয়ে যাওয়ার মূল কাহিনী ভিন্ন (ক) জাহাঙ্গীর—রেবা কাহিনী, (খ) সাজাহান-খাদিজা কাহিনী, (গ) লায়লা—শারিয়ার কাহিনী,—এ সকল মোট তিনটি উপকাহিনী বিদ্যমান। এ সকল উপকাহিনীগুলি মূল কাহিনীর সহিত কার্যকারণ সম্পর্ক যুক্ত হয়ে গড়ে না ওঠায়, এগুলি মূল নাট্যকাহিনীকে ভারগ্রস্ত এবং নাট্যক্রিয়ার গতিকে মন্থর করে তুলেছে। ঘটনার সংস্থাপনার ক্ষেত্রে যুক্তিনিষ্ঠ শৃঙ্খলার অভাবে নাট্যসংহতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং নাট্যবৃত্তের গাঁথুনি শিথিল হয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় অংকের চতুর্থ দৃশ্যে নূরজাহানের প্রতি জাহাঙ্গীরের অন্যায় আসক্তি দূর করে জাহাঙ্গীরকে সুপথে চালিত করার জন্য রেবার প্রচেষ্টা, তৃতীয় অংকের চতুর্থ দৃশ্যে খসরুকে হত্যার জন্য নূরজাহানকে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাঁকে লায়লার তীব্র ভর্ৎসনা, মহাবৎকে নূরজাহান বন্দী করতে এলে নূরজাহানকে লায়লার বাধা

দান (৩।৮), মহাবৎ খাঁর অভিযোগক্রমে জাহাঙ্গীর কর্তৃক নূরজাহানকে প্রাণদণ্ডাদেশ দান ও পরে সেই আদেশ প্রত্যাহার (৪।৮),—এ সকল ঘটনার উপস্থাপনার দ্বারা নাট্যকার নাটকের মধ্যে ভাবাবেগের ঘনীভূত অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে রাজদরবারে খসরুর বিচার সভায় মহাবৎ-এর আচরণ, তৃতীয় অংকের অষ্টম দৃশ্যে জাহাঙ্গীরের উপস্থিতিতে নূরজাহানের প্রতি সাজাহানের অশালীন আচরণ, রাজদরবারে লায়লার আকস্মিক আগমন ও তার মাকে সর্বসমক্ষে ভর্ৎসনা করা—এ সকল ঘটনার সংস্থাপনার ফলে নাটকের মধ্যে ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকার ঔচিত্যবোধের মাত্রাকে অতিক্রম করেছেন। মূল নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্ক না থাকায় প্রথম অংকের ২, ৩, ৭, দ্বিতীয় অংকের ২, চতুর্থ অংকের ৪, পঞ্চম অংকের ২, ৩ দৃশ্যগুলি নাটকের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হয়েছে।

নাট্যকাহিনী রচনার ক্ষেত্রে বাংলার সুবেদার কর্তৃক শের আফগানকে হত্যা (১।৯), স্বামীহারা মেহেরের জাহাঙ্গীরের রাজপ্রাসাদে অবস্থান ও জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করা (২।১, ২।৬), নূরজাহানের অপশাসনের বিরুদ্ধে মহাবৎ খাঁর বিদ্রোহ (৪ । ৫), পরাজিত নূরজাহানকে সাজাহানের পেনসন দান—এসকল ঘটনা ইতিহাসের অনুমোদন লাভ করলেও নাটকে সন্নিবেশিত সব ঘটনাই ইতিহাসের সমর্থন পুষ্ট নয়।

প্রথমত এক নৃত্যানুষ্ঠানে কুমারী মেহেরের প্রতি সেলিমের গভীর আকর্ষণ অনুভব করা (১ । ৪) এবং মেহেরকে লাভ করার জন্য পরবর্তীকালে সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক শের আফগানকে হত্যা করার (১ । ৫) ঘটনা ঐতিহাসিক Chaelos stowart সমর্থন করলেও এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতদ্বৈততা বিদ্যমান।[১২৪] নাটকে উল্লিখিত খসরুকে হত্যার জন্য নূরজাহানের চক্রান্তের ঘটনা (৩।২) ইতিহাস সমর্থিত নয়। সাজাহানের রাজনৈতিক দূরভিসন্ধিই খসরু হত্যার মূলে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল।[১২৫] জাহাঙ্গীরের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত বিদ্রোহী সাজাহানের বিচারের জন্য তাঁকে রাজদরবারে উপস্থিত করার ঘটনার (৩।৮) সঙ্গেও ইতিহাসের যোগ নেই।[১২৬] বিদ্রোহী মহাবৎ খাঁর উদারতায় তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দিনী নূরজাহানের মুক্ত হওয়ার ঘটনাকেও (৫ । ৩) ইতিহাস সমর্থন করে না। মহাবৎ-এর হাতে বন্দিনী অবস্থায় নিজ বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের সাহায্যেই নূরজাহান নিজেকে মুক্ত করে নেন।[১২৭] আগ্রার সিংহাসনের লোভ ত্যাগ করার জন্য লায়লা কর্তৃক তাঁর স্বামী শারিয়ারকে প্রবন্ধ করার ঘটনা (৫ । ৬) ইতিহাস অনুমোদিত নয়। বরঞ্চ আগ্রার সিংহাসন দখলের জন্য লায়লা শারিয়ারকে উদ্দীপ্ত করেছিল।[১২৮] নাটকে সন্নিবেশিত বন্দররাজ কর্তৃক শারিয়ারকে অন্ধ করে দেওয়া এবং এর ফলে সাজাহানের বেদনাহত হওয়ার (৫ । ৭) ঘটনায় ইতিহাসের অনুসরণ নেই। প্রকৃতপক্ষে মোঘল সিংহাসনের দখলের লড়াই-এ পরাজিত শারিয়ারকে সাজাহানের নির্দেশেই হত্যা করা হয়।[১২৯]

নাটকের নাট্যক্রিয়া বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলা যায় যে আগ্রায় আসার আগে নূরজাহানের

পূর্ব জীবনের ভূমিকা স্বরূপ নাটকের প্রথম অংকটি যুক্ত হয়েছে। প্রথম অংকে নূরজাহানের বধূসত্তার পরিচয় থাকলেও নাটকের প্রধান কাহিনী (দ্বিতীয় অংকে) নূরজাহানের আগ্রায় আসার পর থেকে শুরু হয়েছে। নাট্যক্রিয়ার গঠন বৈচিত্র্য W. H. Hudson-অনুসৃত গঠন বৈচিত্র্যের অনুরূপ। প্রথম অংকের অন্টম দৃশ্যে ক্ষমতার উচ্চাশায় নূরজাহানের বধূসত্তা বিনষ্ট হবার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ। দ্বিতীয় অংকের পঞ্চম-ষষ্ঠ দৃশ্য জুড়ে বর্ণিত ক্ষমতার উচ্চাশা পূরণের জন্য নূরজাহানের সম্রাজ্ঞী হওয়ার ঘটনাটি নাট্যক্রিয়ার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তেজনাময় ঘটনা (initial incident) যা নাট্যক্রিয়াকে ক্রমশ উন্নত করে তুলেছে। তৃতীয় অংকে ক্ষমতার একাধিপত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সাজাহানকে রাজধানীর বাইরে রাখার উদ্দেশ্যে তাকে দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করা ও খসরু হত্যার ষড়যন্ত্র করা (৩।১, ২), সাজাহানকে ভ্রাতৃহত্যার দায়ে দায়ী করা (৩।৪), বিদ্রোহী সাজাহানকে পরাজিত করে তার বিচারের ব্যবস্থা করা (৩।৫, ৩।৮), সামরিক বিভাগে নিজের প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য মোঘল সেনাপতি মহাবৎ খাঁকে পদচ্যুত করে তাকে রাজধানীর বাইরে স্থানান্তরিত করা (৪।২), নূরজাহানের অসঙ্গত কার্যের ফলে মহাবৎ খাঁর বিদ্রোহ ঘোষণা ও সশস্ত্র যুদ্ধের আয়োজন (৪।৫)—এ সকল ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া ক্রমশ সংকটমুখী হয়ে ওঠে (Growth of the action to the crisis)। মহাবৎ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে জাহাঙ্গীর সহ নূরজাহানের পরাজয় ও তাঁর বন্দীদশা লাভের ঘটনার মধ্যে নাটকের সংকট (crisis) নিহীত। চতুর্থ অংকের অন্টম দৃশ্য থেকে পঞ্চম অংকের ষষ্ঠ দৃশ্য পর্যন্ত নাট্যক্রিয়া ক্রমহ্রাসমুখী হয়ে পড়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে এই ক্রমহ্রাসমুখী অবস্থায় জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর রাজ্যের ক্ষমতা নিজের নিয়ন্ত্রনাধীনে রাখার উদ্দেশ্যে জামাতা শারিয়ারকে আগ্রার সিংহাসনে বসাবার জন্য নূরজাহানের সর্বশেষ প্রচেষ্টা এবং এরফলে সাজাহানের সঙ্গে শারিয়ার তথা নূরজাহানের যুদ্ধের ঘটনার (৫।৫, ৬) সাহায্যে নাট্যক্রিয়ার অবরোহণ ও নির্বহনের মধ্যে উত্তেজক অবস্থার সৃষ্টির দ্বারা নাট্যকৌতূহল ও ঔৎসুক্যকে ধরে রাখা হয়েছে। নাটকের পঞ্চম অংকের সপ্তম দৃশ্যে সাজাহানের যুদ্ধে জয়লাভ ও তাঁর সিংহাসনে আরোহনের ফলে ক্ষমতাচ্যুত নূরজাহানের উন্মাদ হয়ে যাওয়ার (৫।৮) ঘটনায় নাট্যক্রিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটে।

মেবার পতন (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) :

মনুষ্যত্ববোধ ছাড়া কেবলমাত্র সংগ্রামশীলতার দ্বারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না।—এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে পাঁচটি অংকে এবং চৌত্রিশটি দৃশ্যের দ্বারা নাট্যকাহিনী গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে সত্যবতীর প্রেরণায় ও সামন্তগণের উৎসাহে মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোঘলের আক্রমণের বিরুদ্ধে রাণা অমরসিংহের যুদ্ধযাত্রা ও যুদ্ধে জয়লাভের ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে মোঘল সম্রাট কর্তৃক চিতোরের রাণা রূপে প্রেরিত সগরসিংহের মোঘল পক্ষ ত্যাগ করে নিজের দেশের পক্ষে যোগদানের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। তৃতীয় অংকে আত্মগ্লানিতে সগরসিংহের

আত্মহত্যা ও মহাবৎ খাঁর নেতৃত্বে মোঘলের মেবার আক্রমণের উদযোগ গ্রহণের কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। চতুর্থ অংকে মোঘলের সঙ্গে রাণার যুদ্ধাভিযানের ঘটনা বিধৃত হয়েছে। পঞ্চম অংকে মোঘলের সঙ্গে যুদ্ধে অমর সিংহের পরাজয় ও মনুষ্যত্ববোধের উন্মেষের জন্য মানসীর উদযোগ গ্রহণের ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে।

রাণা অমর সিংহের নেতৃত্বে মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোঘলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও তাঁর পরাজয় বরণের মূল কাহিনী ভিন্ন নাট্যবস্তে (ক) গোবিন্দ-অজয়-কল্যাণীর পারিবারিক জীবনের ঘটনা, (খ) মহাবৎ-কল্যাণীর দাম্পত্য জীবনের ঘটনা, (গ) মানসী—অজয়ের প্রেমমূলক ঘটনা, ও (ঘ) সত্যবতী-সাগর সিংহের ঘটনা—এ সকল চারটি উপকাহিনী বিদ্যমান। কার্য্যকারণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এ সকল উপকাহিনী মূল কাহিনীর উৎকর্ষ সাধন করতে পারেনি। এ সকল উপকাহিনীর চাপে নাট্যকাহিনী মূল বিষয়বস্তু থেকে অসংলগ্ন হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে নাটকের নাটকীয়ত্ব ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং নাট্যসংহতি গভীরভাবে ব্যাহত হয়েছে। দ্বন্দ্বঘন অবস্থার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া পরিণতি লাভ করেনি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিশিষ্ট জীবনদর্শনকে নাট্যকার নাট্যকাহিনীর বিন্যাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।[১৩০] কিন্তু সেক্ষেত্রে নাট্য ঘটনার বিন্যাস ও চরিত্রের বিকাশের মধ্য দিয়ে নাট্যকার তাঁর জীবনদর্শনকে যুক্তিসঙ্গতভাবে ও বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। এর ফলে নাটক প্রচারমুখী হয়ে পড়েছে। এ ধরণের প্রচেষ্টা শিল্পকলার ক্ষেত্রে এক প্রকার অত্যাচার বিশেষ। ললিতকলায় এ জাতীয় রীতি বাঞ্ছনীয় নয়। এর দ্বারা শিল্প ধর্ম ক্ষুণ্ন হয়। শিল্পধর্ম বজায় রেখেই শিল্পের মূল্য বিচার করতে হয়। তাই শিল্পকে উৎকৃষ্ট করে তুলতে হলে এ ধরণের উপদ্রব থেকে তাকে মুক্ত রাখা উচিত।[১৩১] মূল নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে যোগ না থাকায় প্রথম অংকের ২, ৪, ৫, ৮, দ্বিতীয় অংকের ১, ৩, ৪, ৫, তৃতীয় অংকের ২, ৩, ৫, চতুর্থ অংকের ১, ২, ৪, পঞ্চম অংকের ২, ৩, ৫, দৃশ্যগুলি নাটককে ভারসর্বস্ব করে তুলেছে। নাট্যমঞ্চস্থকালীন দৃশ্যের মধ্যে ভাঙা-গড়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সময় দেবার জন্য কখনো কখনো শুধু একটি গানের মধ্য দিয়ে একটি ছোট দৃশ্যের (৪ । ২) অবতারণা করা হয়েছে। উদয়পুরদুর্গের সকল রাজপুত সৈন্যদের সরিয়ে দিয়ে স্বয়ং রাণা অমর সিংহ কর্তৃক মোঘল সৈন্যদের দুর্গের ভিতর প্রবেশের পথ সুগম করে দেওয়া (৫।৬), পরাজিত মেবারকে পুনর্জীবিত ও সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার জন্য চারণী সত্যবতীর প্রেরণামূলক স্বদেশ সংগীতে সাজাহানের অংশ গ্রহণ করা (৫।৬), পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত অমর সিংহ ও মহাবৎ খাঁকে নিরস্ত্র করে মানসী কর্তৃক উভয়কে মনুষ্যত্ববোধে উদ্দীপ্ত করে তোলা (৫।৮),—এ সকল ঘটনায় একদিকে নাটকের মধ্যে সুষ্ঠু ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল রচনার কাজ ব্যাহত হয়েছে, অপরদিকে উপরোক্ত ঘটনার দ্বারা দেশপ্রেম ও মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করে তোলার জন্য নাটকের মধ্যে ভাবাবেগের উন্নত অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে সে সময় জাতীয় আন্দোলনের

পটভূমিকায় দেশব্যাপী হৃদয়াবেগের যে প্রবাহ সর্বস্তরের মানুষকে আন্দোলিত করে তুলেছিল, নাট্যকার নিজেও সে প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি। এরই ছায়াপাত আলোচ্য নাটকে বর্তমান। নাটকের ব্যবসায়িক দিকে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ভাবাবেগমূলক অভিনয় ধারার উৎকর্ষ সাধনের জন্যও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নাটকে এ ধরণের ভাবাবেগমূলক ঘটনাবিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন।[১৩০]

নাট্যঘটনা বিন্যাসের ক্ষেত্রে নাট্যকার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইতিহাসকে সঠিকভাবে অনুসরণ করেছেন। মোঘলের বিরুদ্ধে রাণা অমরসিংহের যুদ্ধবিমুখ মনোভাব এবং মেবারের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সেনাপতি গোবিন্দসিংহ সহ অন্যান্যদের রাণা অমরসিংহকে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করে তোলার ঘটনা ইতিহাস সত্য।[১৩১] নাটকে ইসলামধর্মী মহাবৎ খাঁকে জাতিতে হিন্দু রাজপুত বলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে (২।৬), (৫।৬, ৫।৮)। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতদ্বৈততা বিদ্যমান।[১৩২] মোঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত রাণা অমরসিংহের মধ্যে দেশের দুরবস্থার জন্য তীব্র অন্তর্দাহের সৃষ্টি হয় (৫।১)। এর মাধ্যমে রাণা অমরসিংহের দেশপ্রেমকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে এ ঘটনার মিল নেই। কারণ ভোগসুখে লালিত রাণা অমরসিংহ নিজের ক্ষমতার ভোগকে চরিতার্থ করার জন্য যেভাবে জাহাঙ্গীরের আনুগত্য স্বীকার করেন তার মধ্য দিয়ে তাঁর দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় না।[১৩৩]

নাট্যক্রিয়ার মধ্যে J. H. Lawson-এর অনুসৃত ক্রিয়ার চারটি পর্ব বিদ্যমান। মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোঘলের বিরুদ্ধে রাণা অমরসিংহের যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঘটনায় (১।৩) নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ পর্ব সূচীত। এরপর থেকে ক্রিয়ার ক্রমোন্নতি ঘটতে থাকে। মেবারের রণক্ষেত্রে রাজপুতদের জয় (১।৭), চিতোর দুর্গ দখলের জন্য রাজপুতদের অভিযান (৩।১), পুনরায় মেবারের রণক্ষেত্রে মোঘল-সৈন্যের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রাণা অমরসিংহের প্রস্তুতি গ্রহণ (৪।২), ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া সংঘর্ষময় (numbep of clashos) হয়ে ওঠে। পরিশেষে মেবারের রণক্ষেত্রে অমরসিংহের পরাজয়ের ঘটনায় (৪।৩) নাট্যক্রিয়া শেষাবস্থা (climax) প্রাপ্ত হয়।

বাজীরাও (মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়):

আপোষহীন সংগ্রামশীলতার দ্বারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। এই মূল ভাবকে কেন্দ্র করে পাঁচটি অংকে ও তিরিশটি দৃশ্যে নাট্যকাহিনী গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে নিজামের সন্তুষ্টির জন্য মালবেশ্বরের আদেশক্রমে বন্দী মলহর রাওয়ের বিপন্ন পরিবারকে মহারাষ্ট্র পেশোয়া বাজীরাওয়ের আশ্রয়দানের ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে মালবেশ্বরের কবল থেকে বাজীরাও কর্তৃক মলহররাওকে উদ্ধার করা এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হায়দ্রাবাদের নিজাম ও দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদযোগ

গ্রহণের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। তৃতীয় অংকে বাজীরাও কর্তৃক নিজামকে যুদ্ধে পরাজিত করা ও পরে বন্দী নিজামকে মুক্তিদানের কাহিনী বিধৃত হয়েছে। চতুর্থ অংকে নিজাম ও দেশীয় বিশ্বাসঘাতক ত্র্যম্বক রাওয়ের আক্রমণ থেকে পুণা রক্ষার জন্য বাজীরাওয়ের প্রস্তুতি গ্রহণের কাহিনী উপস্থাপিত করা হয়েছে। পঞ্চম অংকে নিজাম এবং দিল্লীশ্বরসহ অপটশক্তির বিরুদ্ধে জয়লাভ করে বাজীরাও কর্তৃক স্বাধীন মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর দেহাবসানের ঘটনা বিধৃত হয়েছে। নাটকে বাজীরাও কর্তৃক স্বাধীন মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর কঠোর সংগ্রামশীলতার মূল কাহিনী ব্যতীত (ক) মলহররাও—গোতমা, (খ) শংকর-রঙ্গিনী, (গ) বাজীরাও-মাস্তানী, এই তিনটি উপকাহিনী বিদ্যমান। এ সকল উপকাহিনীর অনাবশ্যক বিস্তৃতির ফলে মূল কাহিনী ভারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং নাট্যক্রিয়ার একমুখী গতি ব্যাহত হয়েছে। ঘটনাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক কার্যকারণ সম্পর্ক না থাকায় নাট্যকাহিনী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত যোগ না থাকায় প্রথম অংকের ২, ৪, দ্বিতীয় অংকের ২, ৩, তৃতীয় অংকের ২, ৪, ৫, চতুর্থ অংকের ৪, ৬, ৭ ও পঞ্চম অংকের ৪, ইত্যাদি দৃশ্য নাটককে ভারবাহী করে তুলেছে। নাট্যকাহিনীর বিন্যাসের ক্ষেত্রে একাদিক্রমে মাস্তানীর আত্মহত্যা (৪।৩ দৃশ্য), শঙ্করের মৃত্যু (৪।৬ দৃশ্য), বলদেব রাও এবং রাঘব রাওয়ের হত্যা (৪।৭), ত্র্যম্বক রাওয়ের মৃত্যু, (৫।১), চন্দ্রসেনের মৃত্যু (৫।৫), এ সকল ঘটনার উপস্থাপনার দ্বারা যুক্তিহীনভাবে ভাবাবেগের উন্নত অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে। এরফলে নাটকের নাটকীয়ত্ব গভীরভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। নাটকের বৃত্ত গঠনে স্বপ্নদৃশ্য বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। স্বপ্নদৃশ্যের মাধ্যমে নাট্যক্রিয়ার ভাবী পরিণতির প্রতিও ইঙ্গিত দান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শঙ্করের মৃত্যু সম্পর্কে (৪।৬) তাঁর স্ত্রী রঙ্গিনীর স্বপ্ন-দৃশ্যমূলক ঘটনা (৪।৫) এবং বাজীরাওয়ের দেহাবসান সম্পর্কে ব্রহ্মেন্দ্রস্বামীর স্বপ্ন-দৃশ্য (৫।৫) উল্লেখযোগ্য।

নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমিকা আলোচনা করলে দেখা যায় যে মূল কাহিনী ইতিহাসানুসারী হলেও নাট্যকার নাট্যকাহিনী রচনার ক্ষেত্রে সর্বত্র ইতিহাসকে যথাযথভাবে মেনে চলেননি। তৃতীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্যে গোদাবরী তীরে বাজীরাও ও নিজামের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত নিজামের বন্দীদশা প্রাপ্ত হওয়া এবং বাজীরাওয়ের উদারতায় নিজামের মুক্তি পাওয়ার ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের মিল নেই। ইতিহাস অনুযায়ী বাজীরাওয়ের সঙ্গে যুদ্ধে পর্যুদস্ত নিজাম সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হয়েছিলেন [১৩৩ক]। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে নিজাম কর্তৃক মাস্তানীকে রাজগৃহ হতে বিতাড়িত করা, মাস্তানীর মলহর রাওয়ের আশ্রয় লাভ, মাস্তানীকে আশ্রয় দেওয়ায় নিজামের নির্দেশে মলহররাওকে মালবেশ্বরের বন্দী করা—মাস্তানীকে কেন্দ্র করে নাটকে সন্নিবেশিত এ সকল ঘটনা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতদ্বৈততা বিদ্যমান। কারোর মতে মাস্তানী মুসলিম সরদার সুজায়েৎ খানের দরবারে বাঁদী থাকাকালীন আত্মহত্যা করতে উদযোগী হলে চিম্মনজী আপ্পা তাঁকে উদ্ধার করেন ও পরবর্তীকালে বাজীরাওয়ের স্ত্রী হিসাবে তাকে সম্মানিত

করার প্রতিশ্রুতি দান করেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে নিজামের কন্যা মাস্তানীকে নিজাম নিজেই বন্ধুত্বের প্রসারতার জন্য বাজীরাওকে দান করেন।[১৩২] ঐতিহাসিক M. W. Burway-এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন।[১৩৩] চতুর্থ অংকের তৃতীয় দৃশ্য অনুযায়ী মাস্তানীর মোহে মোহান্ধ বাজীরাওয়ের চেতনা জাগ্রত করার জন্য মাস্তানীর আত্মহত্যার কাহিনী ইতিহাস অনুসৃত নয়। মাস্তানীর প্রতি বাজীরাওয়ের আসক্তি জনিত ঘটনাটি বাজীরাওকে তার পরিবারের প্রিয়জন ও সমাজের গোঁড়া ব্রাহ্মণদের নিকট অপ্রীতিভাজন করে তোলে। পরবর্তীকালে পেশোয়া পুত্র বালাজী ও চিমনজী আপ্পা মাস্তানীকে বন্দী করে রাখে। এর ফলে বিরহকাতর অবস্থায় মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতাবশত বাজীরাওয়ের মৃত্যুই মাস্তানীর মৃত্যুর কারণস্বরূপ। সেক্ষেত্রে অনেক ঐতিহাসিকদের মতে মাস্তানী আত্মহত্যা করেন আবার অনেক ঐতিহাসিকরা মনে করেন বাজীরাওয়ের চিতানলে তিনি দেহ বিসর্জন করেন।[১৩৪]

নাট্যক্রিয়ার গঠনাকৃতি লসন অনুসৃত চারিপর্ব ক্রিয়ার রূপ লাভ করেছে। প্রথম অংকে মহারাষ্ট্রের পেশোয়া পদে বাজীরাওয়ের অভিষিক্ত হওয়ার ঘটনায় নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ। এরপর নাট্যক্রিয়া ক্রমশ উন্নত হতে থাকে। স্বাধীন মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ২।৫ দৃশ্যে মালবেশ্বরের সহিত পেশোয়ার যুদ্ধ, ৩।৬ দৃশ্যে নিজামের সঙ্গে সংগ্রামে নিজাম বাহিনী ও দিল্লীশ্বরসহ অন্তশক্তির পরাজয়—এ সকল ঘটনার মধ্যে নাট্যক্রিয়া ক্রমশ সংঘর্ষময় হয়ে ওঠে। ৫।৫ দৃশ্যে বাজীরাও কর্তৃক স্বাধীন মহারাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ঘটনায় নাট্যক্রিয়া পরিণতি লাভ করে (climax)।

মোঘল পাঠান (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

রাজনৈতিক বুদ্ধির বলেই রাজনৈতিক সফলতা লাভ করা যায়,—এই মূলভাবকে আশ্রয় করে পাঁচটি অংকে ও তিরিশটি দৃশ্যের দ্বারা নাট্যবৃত্ত গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে হিন্দুস্থানের সিংহাসন লাভের জন্য শেরশাহের সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ এবং প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য হুমায়ুনের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর পরাজয়ের ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে দিল্লীর রাজনৈতিক বিশৃংখলার সুযোগে, সুসংহত শক্তির সাহায্যে শেরশাহের দিল্লী আক্রমণ ও দিল্লীর মোঘল শিবির দখলের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। তৃতীয় অংকে জাহ্নবীর তীরে শেরশাহের সঙ্গে চৌসারের যুদ্ধে হুমায়ুনের পরাজয়ের কাহিনী উপস্থাপিত করা হয়েছে। চতুর্থ অংকে শেরশাহের "শাহ" উপাধি ধারণ করে আগ্রার সিংহাসনে আরোহণ এবং পরাজিত ও পলায়িত হুমায়ুণের যোধপুর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণের কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। পঞ্চম অংকে কালেঞ্জর দুর্গাধিপতির সঙ্গে যুদ্ধে শেরশাহের জয়লাভ ও যুদ্ধে দুর্ঘটনায় শেরশাহের মৃত্যুর ঘটনা বিধৃত হয়েছে।

শেরশাহ কর্তৃক রাজনৈতিক বুদ্ধি ও শক্তির বলে হিন্দুস্থানের সিংহাসনে আরোহণের প্রধান কাহিনী ব্যতীত নাটকে (ক) চাঁদ-মুবারিজের ঘটনা, (খ) আদিলসা-তসাফিয়ার কাহিনী (গ) কমলা-কুম্ভের কাহিনী—এই তিনটি উপকাহিনী বিদ্যমান। এ সকল উপঘটনার দ্বারা মূল ঘটনা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি। যুক্তিসঙ্গতভাবে শৃংখলার

সহিত নাট্য ঘটনাগুলি একই সূত্রে যুক্ত না হওয়ায় নাট্য ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং কাহিনী ঘন-ঘন হয়ে না উঠে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মূল ঘটনার সঙ্গে যোগ না থাকায় নাটকের প্রথম অংকের ১, ২, ৪, ৮, তৃতীয় অংকের ১, ২, ৩, ৫, চতুর্থ অংকের ৩, ৪, পঞ্চম অংকের ১, ৩, ৪, ৫, দৃশ্যগুলি অনাবশ্যক হয়ে পড়েছে।

নাট্যকাহিনী রচনার ক্ষেত্রে মূল কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের মিল থাকলেও, কাহিনী বিন্যাসের ক্ষেত্রে নাট্যকার সর্বত্র ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে ওঠেননি। তৃতীয় অংকের ষষ্ঠ দৃশ্যোনুযায়ী জাহ্নবী তীরে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায় উভয়ের পরস্পরকে আক্রমণ না করার পিছনে নাট্যকার উভয়ের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মহানুভবতার যে পশ্চাৎপট রচনা করেছেন তা নাট্যকারের কল্পনাপ্রসূত। মুখোমুখি অবস্থায় পরস্পরের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার মূলে রাজনৈতিক ও সামরিক কারণ বিদ্যমান।[১৩৫] পঞ্চম অংকের সপ্তম দৃশ্যে কালেঞ্জর দুর্গ জয়ের সময় কালেঞ্জর দুর্গাধিপতির কন্যা কমলাবাই-এর বারুদখানায় অগ্নিসংযোগ এবং তার ফলে বিস্ফোরণের আঘাতে শেরশাহের মৃত্যুর ঘটনা, ইতিহাস সত্য নয়। প্রতিপক্ষ শত্রুকে আঘাত করার জন্য শেরশাহের সামরিক বাহিনী থেকে নিক্ষিপ্ত গোলা ফিরে এসে বারুদের স্তূপে পড়ে। এর ফলে যে বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয় তার আঘাতেই শেরশাহের মৃত্যু হয়।[১৩৬]

নাট্যক্রিয়ার গঠন প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে শেরশাহ কর্তৃক হিন্দুস্থানের সিংহাসন লাভের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তার জন্য দিল্লীশ্বরের সঙ্গে সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণের ঘটনা থেকে নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ। এরপর নাট্যক্রিয়া বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং ১।৫, ২।৬, ৩।৪ এবং ৩।৬ দৃশ্যে নাট্যক্রিয়ার মধ্যে একাধিক সংঘর্ষ দেখা দেয়। এই সংঘর্ষের ফলে হুমায়ুনের সঙ্গে সর্বশেষ যুদ্ধে শেরশাহ জয়ী হন। শেরশাহের শাহ উপাধি ধারণ পূর্বক হিন্দুস্থানের সিংহাসনে আরোহণের (৪।১) দৃশ্যেই নাট্যক্রিয়া পরিণতি লাভ করে। এরপরও নাট্যঘটনার অধিক বিস্তৃতি নাটককে ভারসর্বস্ব করে তুলেছে।

দেবলা দেবী (নিশিকান্ত বসুরায়)

অতিরিক্ত নারী লালসা মানুষের হিতাহিত জ্ঞান নষ্ট করে তার শোচনীয় পরিণতি ঘটায়। এইভাবকে কেন্দ্র করে পাঁচটি অংকে এবং একত্রিশটি দৃশ্যের দ্বারা নাট্যবৃত্ত গঠিত হয়েছে। প্রথম অংকে আলাউদ্দীন কর্তৃক গুজরাট দখল করা ও রূপসী দেবলাকে পাবার জন্য দেবগিরি রাজ্যের বিরুদ্ধে খিজিরের নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরণের ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে যুদ্ধে পরাজিত দেবগিরিরাজ বলদেবকে খিজিরের মুক্তিদান এবং বলদেব ও দেবলার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হবার কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। তৃতীয় অংকে রাজদ্রোহীতার অপরাধে আলাউদ্দীন কর্তৃক খিজিরের মৃত্যুর দণ্ডাদেশ দেওয়া ও তাকে দমন করার জন্য কাফুরকে নির্দেশ দানের কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। চতুর্থ অংকে খিজিরের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী কাফুরকে খিজিরের মুক্তি দান এবং স্বেচ্ছায় কাফুরের বন্দীত্ব গ্রহণ করে আত্মসমর্পণের জন্য আলাউদ্দীনের নিকট

খিজিরের যাত্রার কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। পঞ্চম অংকে খিজিরের মৃত্যুর দণ্ডাদেশ কার্যকরী হওয়া এবং খিজিরকে বাঁচাবার জন্য রাজপ্রাসাদে উপস্থিত দেবলার উপর প্রতিহিংসামত্ত আলাউদ্দীনের আক্রমণ প্রতিহত করতে কাফুর কর্তৃক আলাউদ্দীনকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করার ঘটনা দেখান হয়েছে।

আলাউদ্দীন কর্তৃক নারীভোগলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য দেবলাকে পাবার প্রচেষ্টায় তাঁর শোচনীয় মৃত্যুর মূল কাহিনী ভিন্ন নাটকে (ক) করুণা সিংহ-দেবলা ও বেবীসিংহকে অবলম্বন করে একটি ঘটনা, (খ) দেবলা-বলদেবের প্রেম মূলক ঘটনা, (গ) মতিয়া-খিজির খাঁর ঘটনা,—এ সকল মোট তিনটি উপঘটনা নাটকে বিদ্যমান। এ সকল উপঘটনা মূল ঘটনাকে কেন্দ্রচ্যুত করেছে এবং নাট্যঘটনাকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। নাট্য ঘটনার মধ্যে পারস্পরিক যুক্তিসঙ্গত কার্যকারণ সম্পর্ক না থাকায় নাট্যক্রিয়ার একমুখী গতি গভীরভাবে ব্যাহত হয়েছে। নাটকের মূল-ভাবের সঙ্গে যোগ না থাকায় প্রথম অংকের ১, ৩, ৪, দ্বিতীয় অংকের ১, ৬, ৭, তৃতীয় অংকের ২, ৪, ৫, ৬, চতুর্থ অংকের ২, ৩, ৪, পঞ্চম অংকের ১, ৩—এ সকল দৃশ্য নাটকের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে করুণ সিংহের আত্মহত্যা, দ্বিতীয় অংকের সপ্তম দৃশ্যে লক্ষ্মীবাই-এর হত্যা, চতুর্থ অংকের চতুর্থ দৃশ্যে আলীখাঁর শিরশ্ছেদন এবং পঞ্চম অংকে পর্যায়ক্রমে খিজিরের হত্যা (৪র্থ দৃশ্য), কমলাদেবীর আত্মহত্যা ও আলাউদ্দীনের হত্যা (৫ম দৃশ্য)—এ সকল হত্যা ও আত্মহত্যার দৃশ্য রচনার দ্বারা নাট্যকাহিনীর মধ্যে যুক্তিহীনভাবে ভাবাবেগের উত্তুঙ্গ অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে।

নাট্যকাহিনী বিন্যাসের ক্ষেত্রে ইতিহাসের প্রতি নাট্যকারের আনুগত্যের অভাব আছে। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে কমলাদেবী ও দেবলাদেবীকে কেন্দ্র করে আলাউদ্দীনের জীবনে সংঘটিত যে সকল ঘটনার কথা নাটকে উল্লেখ করা হয়েছে তার সত্যতা সম্বন্ধে আধুনিক ইতিহাসকারগণ,-ভিন্নমত ধারণ করেন। ইতিহাস-গবেষক জগমল গুপ্তা তাঁর 'Deval Devi and Khizr Khan' হিন্দী প্রবন্ধে [১৩৯] এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে দেবলাদেবীকে কেন্দ্র করে প্রচলিত ঘটনাটি আমির খসরুর কল্পনাপ্রসূত কাব্য 'Manthuawi' থেকে সংগৃহীত। হিন্দু সংস্কৃতির ধ্বংস সাধনের জন্য মুসলিম সংস্কৃতির ছদ্ম আবরণে এই কাহিনীর প্রবর্তন করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ফিরিস্তা এবং Badu-u-ni-এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। এস. সি. মিশ্র, আর. আর. রামলাল, কে. এম. মুন্সী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এ মতের ধারক।[১৪০] করুণসিংহ কর্তৃক তাঁর কন্যাকে বাঁচাবার ভার দেবীসিংহের হাতে অর্পণ এবং পরে তাঁর আত্মহত্যার ঘটনাটি (১।১) ইতিহাস অনুমোদিত নয়। ইতিহাস অনুসারে দেবগিরির রাজপুত্র শঙ্করের সঙ্গে দেবলা দেবীর বিবাহ দিতে যাবার সময় করুণ সিংহ কন্যাসহ আল্পখানের হাতে ধৃত ও পরাজিত হন।[১৪১] নাটকে সন্নিবেশিত ঘটনা অনুযায়ী দেবগিরির অধীশ্বর রাজা বলদেবের কাছে করুণ সিংহের আশ্রয় নেবার ঘটনাও (১।৫) সত্য নয়। আলাউদ্দীনের

আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে করুণসিংহ দেবগিরির অধীশ্বর রামচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।[১৪২] আলাউদ্দীনপুত্র খিজিরের নেতৃত্বে গুজরাট অভিযানের ঘটনাটিও ইতিহাসকারের দিক থেকে সঠিক নয়। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে মালিক কাফুরই এই অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিল।[১৪৩] সুতরাং নাটকে উল্লিখিত কয়েকটি ঘটনা যথা খিজিরের নেতৃত্বে দেবগিরি অভিযান (২।৫), রাজা বলদেবের সঙ্গে দেবলার বিবাহ, দেবলাকে বন্দী করতে অসমর্থ খিজিরের প্রাণদণ্ডাদেশ (৩।১, ৫।৪), খিজিরের প্রাণরক্ষার্থে দেবলাদেবী ও রাজা বলদেবের আলাউদ্দীনের কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ, ইত্যাদি ঘটনা নাট্যকারের কল্পনার রঙে রঞ্জিত। পঞ্চম অংকে বর্ণিত মালিককাফুর কর্তৃক আলাউদ্দীনকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করার ঘটনাটি (৫।৬) ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন না। তবে আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পিছনে মালিক কাফুরের ষড়যন্ত্র যে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল সে সম্পর্কে তাঁরা একমতাবলম্বী।[১৪৪]

নাট্যক্রিয়ার গঠনপ্রকৃতি আলোচনা করলে দেখা যায় যে প্রথম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে দেবলাকে লাভ করার জন্য আলাউদ্দীন কর্তৃক খিজির খাঁকে যুদ্ধার্থে গুজরাটে প্রেরণের ঘটনা থেকে নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ। এরপর বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া বিস্তৃত ও ক্রমশ সংঘর্ষময় (২।৫, ২।৭, ৪।১) হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে লসনের মতে নাট্যক্রিয়ার মধ্যে যে সকল সংঘর্ষ দেখা দেয় সে সব সংঘর্ষ কার্যকারণ সম্পর্কে সংযুক্ত থাকে এবং মূল ঘটনার সঙ্গে তাদের যোগ থাকে। এ নাটকে নাট্যক্রিয়ার মধ্যে বহু সংঘর্ষ দেখানো হলেও এগুলি মূল ঘটনার সঙ্গে কার্যকারণভাবে সংযুক্ত নয়। এর ফলে নাটকের শেষে আলাউদ্দীনের হত্যার ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়ার পরিণতি ঘটলেও যুক্তি শৃংখলার অভাবে তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে নি।

● সামাজিক নাটকের বৃত্ত গঠনের বিশ্লেষণ :

বলিদান (গিরিশচন্দ্র ঘোষ) :

পণপ্রথার অন্যায় শোষণে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা এবং কন্যার জীবনের শোচনীয় পরিণাম ঘটে। এই মূল বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে পাঁচটি অংকে ও তেত্রিশটি দৃশ্যে নাট্যবৃত্ত গঠিত হয়েছে। প্রথম অংকে কন্যাদায়গ্রস্ত করুণাময়ের বড়মেয়ে কিরণের বিবাহ দেওয়া এবং পণমত যৌতুক দিতে না পারায় শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে কিরণের পিতৃগৃহে চলে আসার ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে অর্থাভাবে করুণাময় কর্তৃক বর্ষীয়ান দোজ-বরের সঙ্গে দ্বিতীয় কন্যা হিরন্ময়ীর বিবাহ দানের ঘটনা উপস্থাপিত করা হয়েছে। তৃতীয় অংকে স্বামীর মৃত্যুতে এবং সতীনের ছেলেদের চক্রান্তে ও অত্যাচারে বাস্তুচ্যুত হিরন্ময়ীর পিতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণের ঘটনা গ্রথিত হয়েছে। চতুর্থ অংকে পিতৃগৃহে অবস্থানরত হিরন্ময়ীর আত্মহত্যা ও করুণাময়ের চাকরী চলে যাওয়ার ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে। পঞ্চম অংকে কন্যাদের

শোচনীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শোকার্ত এবং কনিষ্ঠাকন্যাকে পাত্রস্থ করার দুঃশ্চিন্তায় উদভ্রান্ত করুণাময়ের আত্মহত্যার ঘটনা বিধৃত হয়েছে। পণপ্রথার দাবী মেটাতে গিয়ে মেয়েদের বিয়েতে সর্বস্বান্ত এবং ভগ্নহৃদয় করুণাময়ের আত্মহত্যার শোচনীয় পরিণতির মূল কাহিনী ব্যতীত নাটকে (ক) জোবি-রমানাথের কাহিনী, (খ) কিশোর ঘনশ্যাম-রাজলক্ষ্মী-জ্যোতির্ময়ী কাহিনী—এই মোট দুটি উপকাহিনী বিদ্যমান। মূলকাহিনীর সঙ্গে প্রথম উপকাহিনীর কোন যোগ নেই। দ্বিতীয় উপকাহিনীর দ্বারাও নাটকের মূল কাহিনী উৎকর্ষ লাভ করেনি। নাটকের মাধ্যমে সমাজের পণসর্বস্ব বিবাহ ব্যবস্থার সমস্যাকে নাট্যকার তুলে ধরেছেন।[১৪৭] সেক্ষেত্রে তিনটি কন্যার সম্প্রদানকে কেন্দ্র করে যে সকল ঘটনা নাটকে উপস্থাপিত করা হয়েছে, সেগুলি শৃঙ্খলার সহিত কার্যকারণযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠেনি। অনাবশ্যক ঘটনার ভারে নাট্যক্রিয়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। নাট্যক্রিয়ার মধ্যে স্থানে স্থানে বহির্দ্বন্দ্ব দেখা দিলেও নাট্যগঠনরীতির ত্রুটির জন্য নাট্যক্রিয়ার মধ্যে ঔৎসুক্য ও কৌতুহল সৃষ্টি সম্ভব হয় নি। নাট্যক্রিয়ার গতি এতে মন্থর হয়েও পড়েছে। একই ধরনের ঘটনার উপস্থাপনার ফলে নাট্যঘটনা একঘেঁয়েমি দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছে। মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্তিনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে না ওঠায় প্রথম অংকের ৩, ৪, দ্বিতীয় অংকের ১, ৩, ৫, তৃতীয় অংকের ১, ৪, ৬, চতুর্থ অংকের ২, ৩, ৬, পঞ্চম অংকের ২, ৫, ৬, ৭ দৃশ্যগুলি নাটকের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। প্রথম অংকের নবম দৃশ্যে করুণাময়ের আত্মহত্যা এবং তারপরই সরস্বতীর মৃত্যুর ঘটনা বিন্যস্ত করা হয়েছে। এইভাবে নাট্যকার নাটকের মধ্যে যুক্তিহীনভাবে ভাব-ঘন অবস্থার সৃষ্টি করেছেন।

নাট্যক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে কিরণকে পাত্রস্থ করার জন্য করুণাময় কর্তৃক অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। এরপরে নাট্যক্রিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত ও উন্নত হয়ে ওঠে। ক্রিয়ার এই ক্রমোন্নত অবস্থায় স্বামীগৃহে অত্যাচারিতা কিরণের পিতৃগৃহে ফিরে আসা (১।৫, ৬), সতীন পুত্রের অত্যাচারে বাস্তুচ্যুত হয়ে দ্বিতীয়া কন্যা হিরন্ময়ীর পিতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করা (৩।৫), করুণাময়ের চাকরী চলে যাওয়া (৪।২), হিরন্ময়ীর আত্মহত্যা (৪।৫), এ সকল ঘটনার আঘাতে নাট্যক্রিয়া ক্রমশঃ সংকটমুখী হয়ে ওঠে। পরপর দুটি বিবাহত্তোর কন্যার শোচনীয় পরিণতিতে ব্যথিত ও শোকার্ত করুণাময়ের মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা এবং তাঁর আত্মহত্যার ঘটনায় নাট্যক্রিয়া পরিণতি লাভ করে। লসন অনুসৃত ক্রিয়ার ক্রমোন্নত চারি পর্ব বিভাগের সঙ্গে আলোচ্য নাট্যক্রিয়ার কিছু কিছু সাদৃশ্য থাকলেও নাট্যক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে লসনের নাট্যগঠন রীতির রূপ লাভ করতে পারেনি। লসনের নাট্যক্রিয়ার চারিটি পর্বই কার্যকারণের শৃঙ্খলে গ্রথিত। বর্তমান নাটকের নাট্যক্রিয়ায় এর অভাব বিদ্যমান।

শাস্তি কি শান্তি (গিরিশচন্দ্র ঘোষ) ঃ

বৈধব্য জীবন যাপনে সমাজের অনুশাসন না মানলে পরিণাম শোচনীয় হয়—এই মূলবিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে পাঁচটি অংকে ও তিরিশটি দৃশ্যে নাট্যবৃত্ত গঠিত হয়েছে। প্রথম অংকে প্রসন্নকুমারের বিধবা পুত্রবধূ নির্মলার শ্বশুরবাড়ীর সাংসারিক দায়িত্ব ভার গ্রহণের দ্বারা বৈধব্য জীবনযাপনে সমাজের অনুশাসন মেনে চলা এবং জেষ্ঠ্যাকন্যা ভুবনমোহিনীর স্বামীর মৃত্যুতে প্রসন্নকুমারের শোকাহত হওয়ার কাহিনী উপস্থাপিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে সমাজের রীতি নীতি না মেনে প্রকাশের সঙ্গে বিধবা ভুবনমোহিনীর স্বেচ্ছাচারময় জীবনযাপন করা এবং জেষ্ঠ্যা কন্যার স্বেচ্ছাচারিতায় শংকিত প্রসন্নকুমার কর্তৃক সমাজের প্রচলিত প্রথাকে ভঙ্গ করে বিধবা কনিষ্ঠা কন্যা প্রমদার পুণরায় বিয়ে দেবার উদযোগ গ্রহণের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। তৃতীয় অংকে দুশ্চরিত্র স্বামীর অত্যাচারে প্রমদার স্বামীগৃহ ত্যাগে বাধ্য হওয়া এবং প্রকাশের নোট জাল করার ব্যবসার কথা প্রকাশ হয়ে পড়ার কাহিনী বিধৃত হয়েছে। চতুর্থ অংকে গর্ভবতী ভুবনমোহিনীর প্রতি প্রকাশ স্বীয় দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃত হওয়ায় আত্মগ্লানিতে ভুবনমোহিনীর আত্মহত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়া এবং লাঞ্ছিতা প্রমদার পিতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করার কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। পঞ্চম অংকে কন্যাদের শোচনীয় পরিণতিতে বেদনাহতা পার্বতীর মৃত্যু এবং সমাজের অনুশাসন না মানার ফলে পরিবারের সদস্যদের এ হেন মর্মান্তিক পরিণতি দর্শণে মানসিক ভারসাম্য হীন অবস্থায় প্রসন্নকুমারের ভুবনমোহিনীকে হত্যা করা ও তাঁর আত্মঘাতী হওয়ার কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে।

সমাজের অনুশাসন না মেনে জেষ্ঠ্যা বিধবা কন্যার স্বেচ্ছাচারিনী হওয়ার এবং কনিষ্ঠা বিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহের ফলে প্রসন্নকুমায়ের পরিবারের মর্মান্তিক পরিণতি লাভের মূল ঘটনা ছাড়া নাটকে (ক) প্রকাশ-ভুবনমোহিনী, (খ) ঘেঁচু-প্রমদা, (গ) হরমনি-পাগোল—এই তিনটি উপকাহিনী বিদ্যমান। (গ) উপকাহিনীটি মূলকাহিনীর সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত হয়ে গড়ে ওঠেনি। এই কাহিনীটি নাট্যকারের আধ্যাত্মিক জীবনদর্শন প্রচারের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। মূল কাহিনীর বিন্যাসের ক্ষেত্রে পুত্রবধূ নির্মলা, কন্যা ভুবনমোহিনী, ও কন্যা প্রমোদা—এই তিনটি চরিত্রকে অবলম্বন করে বৈধব্য জীবনযাপনের তিনটি স্বতন্ত্র কাহিনী গঠনের দ্বারা চরিত্রগত, ভাবগত ও ঘটনাগত বৈপরীত্যের সৃষ্টি করা হয়েছে। কার্যকারণের দ্বারা যুক্তি শৃংখলের সাহায্যে এ সকল কাহিনী একই সূত্রে দানা বেঁধে ওঠেনি। এতে নাট্য সংহতি ব্যাহত হয়েছে এবং কাহিনী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মূল ক্রিয়ার সঙ্গে যোগ না থাকায় প্রথম অংকের ৩, ৪, দ্বিতীয় অংকের ৩, ৪, ৭, তৃতীয় অংকের ৩, ৫, ৭, চতুর্থ অংকের ৩, ৪, পঞ্চম অংকের ৩, ৫,—এ সকল অপ্রয়োজনীয় দৃশ্যগুলি নাট্যক্রিয়ার গতিকে স্থানে স্থানে মন্থর করে তুলেছে। পঞ্চম অংকে একাদিক্রমে পার্বতীর মৃত্যু

(৫ । ২), চিন্তেশ্বরীকে হত্যার প্রচেষ্টা (৫।৫), ভুবনমোহিনীর হত্যা, প্রকাশের আত্মহত্যা, প্রসন্নকুমারের মৃত্যু —এ সকল ঘটনার দ্বারা নাট্যকার যুক্তিহীনভাবে নাটকের মধ্যে ভাবাবেগের উত্তুঙ্গ অবস্থার সৃষ্টি করেছেন।

প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যেই নাট্যক্রিয়ার মুখপর্ব রচিত। প্রথম অংকের পঞ্চম দৃশ্যে ভুবনমোহিনীর বৈধব্য দশা লাভ করার ঘটনার মাধ্যমে নাট্যক্রিয়ার গতির সঞ্চার হয়। এরপর বৈধব্য জীবনের শাস্ত্রোচিত ব্যবস্থা না মেনে ভুবনমোহিনীর স্বেচ্ছাচারিণী হওয়া (২।১), প্রসন্নকুমার কর্তৃক বিধবা কনিষ্ঠা কন্যা প্রমোদার পুনরায় বিবাহ দেওয়া (২।৭), —ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া বিস্তৃত হতে থাকে। চতুর্থ অংকের প্রথম দৃশ্যে স্বেচ্ছাচারিনী ভুবনমোহিনীর অবৈধভাবে গর্ভবতী হয়ে পড়া, দুশ্চরিত্র স্বামীর দ্বারা বিতাড়িত হয়ে প্রমদার পিতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণ (৪।২), ভুবনমোহিনীর আত্মহত্যার প্রচেষ্টা (৪।৫), কন্যাদের দুরবস্থায় বেদনাহতা পার্বতীর মৃত্যু (৫ । ২)—এ সকল ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া ক্রমশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। পরিশেষে প্রসন্নকুমার ভুবনমোহিনীকে হত্যা করে নিজে আত্মঘাতী হয়। এইভাবে তার পরিবারের সকলের শোচনীয় পরিণতিতে নাট্যক্রিয়া নির্বহণ লাভ করে।

গৃহলক্ষ্মী (গিরিশচন্দ্র ঘোষ) ঃ

শৃংখলা ভেঙ্গে যৌথ সম্পত্তি একলা আত্মসাৎ করতে চাইলে যৌথপরিবার ভেঙ্গে যায়। এটাই নাটকের মূল ভাব।

প্রথম অংকে উচ্ছৃংখল শৈলেন্দ্র ঘরের মধ্যে বারাঙ্গনা কুমুদিনীকে নিয়ে এসে পারিবারিক নিয়মানুবর্তিতা ভঙ্গ করলে, বড় বৌ বিরজা ও মেজভাই উপেন্দ্র কর্তৃক শৈলেন্দ্রকে ভর্ৎসনা করা এবং প্রত্যুত্তরে শৈলেন্দ্র কর্ত্তৃক তাদেরকে অপমান করার ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে অধিক সুখভোগের আশায় যৌথ পরিবারের থেকে আলাদা হবার জন্য উপেন্দ্রকে ক্রমান্বয়ে উত্যক্ত করে তোলা এবং সংসারের ক্রমবর্ধমান অশান্তি নিবারণের জন্য বড়বৌ বিরজার এতে সম্মতি দানের ফলে মানসিক আঘাতে উপেন্দ্রের মূর্চ্ছা যাওয়ার ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে। তৃতীয় অংকে অসৎ সংসর্গ থেকে শৈলেন্দ্রকে বাঁচানোর জন্য উপেন্দ্রের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়া এবং নীরোদ ও শরৎ-এর চক্রান্তে কুমুদিনীকে খুন করতে যাওয়ার মিথ্যা অভিযোগে শৈলেন্দ্রের পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ঘটনা গ্রথিত হয়েছে। চতুর্থ অংকে শৈলেন্দ্রকে যৌথ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে সকল সম্পত্তি ভোগের জন্য নীরোদের চক্রান্তে শৈলেন্দ্রের মিথ্যা দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়া এবং নীরোদের কার্যাবলীকে উপেন্দ্র সমর্থন না করায় পুত্র নীরোদ ও স্ত্রী তরঙ্গিনীর কাছ থেকে তার লাঞ্ছনা লাভের কাহিনী বিধৃত হয়েছে। পঞ্চম অংকে নীরোদের চক্রান্তে পাওনাদারদের হাতে নির্যাতিত শৈলেন্দ্রকে বড়বৌ বিরজার উদ্ধার করা এবং দলিল জাল করা ও ফুলীকে হত্যার অপরাধে অপরাধী নীরোদকে পুলিশ ধরতে এলে—বেদনাহত অবস্থায় উপেন্দ্রের মৃত্যুর কাহিনী গ্রথিত হয়েছে।

উচ্ছৃংখল জীবনযাপন ও যৌথ সম্পত্তি একলা ভোগের জন্য পরিবারের সদস্যদের নৈতিক অবনতি ও শোচনীয় অবস্থা দেখে বেদনাহত অবস্থায় পরিবারের প্রাণপুরুষ উপেন্দ্রের মৃত্যুর ফলে যৌথ পরিবার ধ্বংসের মূল কাহিনী ভিন্ন নাটকে (ক) মণি—ফুলি-মন্মথ এবং (খ) শরৎ-কুমুদিনী—এই দুটি উপকাহিনী বিদ্যমান। এ সকল উপকাহিনীর দ্বারা নাটকের উৎকর্ষ সাধন করা যায় নি। নাট্য কাহিনী বিন্যাসের ক্ষেত্রে ঘটনাগুলি আদি-মধ্য-অন্ত যুক্ত হয়ে ওঠেনি। যুক্তির দ্বারা ক্রিয়ার কার্য ও কারণের মধ্যে সামঞ্জস্য গড়ে ওঠেনি। নাট্যক্রিয়া দ্বন্দ্বহীন-ভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং নাটকের পরিণতিও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। অসংলগ্ন ঘটনার ভারে নাটক বহুধা বিস্তৃত হয়ে পড়ে নাট্য সংহতিকে নষ্ট করেছে। মূল কাহিনীর সঙ্গে কোন যোগ না থাকায় প্রথম অংকের ২, ৫, দ্বিতীয় অংকের ২, ৩, ৬ তৃতীয় অংকের ২, ৩, ৬, চতুর্থ অংকের ১, ৩, ৭, পঞ্চম অংকের ৩, ৪, দৃশ্যগুলি নাটককে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।

সৎসঙ্গ (ভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) :

সৎসঙ্গের অভাবে মানুষের পরিণতি শোচনীয় হয়ে ওঠে। এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে পাঁচটি অংকে ও বত্রিশটি দৃশ্যে নাট্যকাহিনী রচিত হয়েছে। প্রথম অংকে অসৎসঙ্গে মেলামেশার ফলে বিদ্যাশিক্ষা ত্যাগ করে প্রবোধের নিষিদ্ধ পল্লীতে গমনের ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে কেশবের সংসর্গে প্রবোধের মদ ও মেয়েমানুষের আসক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া এবং সাংসারিক ও বিষয়-সম্পত্তি তদারকী কার্যে মনোনিবেশ না করায় ধরনী ধরের চক্রান্তে তার বিষয়-সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ঘটনা উপস্থাপিত করা হয়েছে। তৃতীয় অংকে প্রবোধের অধঃপতনে ব্যথিত তার মায়ের কঠিন অসুখে জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠা এবং প্রবোধকে ভালো করে তোলার জন্য সুকুমারের প্রচেষ্টার ঘটনা বিধৃত হয়েছে। চতুর্থ অংকে প্রবোধের ব্যবসার অর্থ আত্মসাৎ করে কেশবের পলায়ন ও প্রবোধের মায়ের মৃত্যুর কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। পঞ্চম অংকে সুকুমারের প্রচেষ্টায় প্রবোধের হৃত সম্পত্তি পুনরায় লাভ করা ও তার চৈতন্যলাভের ঘটনা গ্রথিত হয়েছে।

অসৎসঙ্গে প্রবোধের বিষসম্পত্তি নাশ ও পারিবারিক জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠার মূল কাহিনী ছাড়া নাটকে (ক) কনক-গুলজার-হেমাঙ্গিনী (খ) মৃণালিনী-প্রিয়নাথ-সুরেশ (গ) রমানাথ-নির্মলা—এই তিনটি উপকাহিনী বিদ্যমান। (ক) উপকাহিনীর দ্বারা নাটকের মূলভাবকে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু যুক্তিসঙ্গতভাবে মূল কাহিনীর সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে উপকাহিনীর বিন্যাস না হওয়ায় তা সার্থক রূপ লাভ করেনি। মূল কাহিনীর সঙ্গে (খ) (গ) উপকাহিনীর যোগ নেই। নাটকের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাগুলি কার্যকারণসম্ভুত হয়ে ওঠেনি। অসংলগ্ন ঘটনার দ্বারা নাট্য কলেবর অধিক বিস্তৃত হয়ে পড়ে নাট্যসংহতি ক্ষুন্ন করেছে। মূল ক্রিয়ার সঙ্গে যোগ না থাকায় প্রথম অংকের ২, ৩, দ্বিতীয় অংকের

১, ৩, ৫, ৬, তৃতীয় অংকের ২, ৪, চতুর্থ অংকের ৩, ৪, ৭, পঞ্চম অংকের ১, ২—এসকল ঘটনা নাটককে ভারসর্বস্ব করে তুলেছে। নাট্যকাহিনী স্পন্দহীনভাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

পরপারে (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) :

প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষের অসংযমী কার্যকলাপ জীবনের পরিণামকে শোচনীয় করে তোলে। এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে পাঁচটি অংকে ও ছাব্বিশটি দৃশ্যে নাট্যকাহিনী গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে বিয়ের পর মায়ের প্রতি মহিমের অসংযত ব্যবহার করা এবং মহিমের স্ত্রী সরযূ কর্তৃক স্বামীর তরফে মায়ের নিকট হতে ক্ষমা প্রার্থনা করার ঘটনা বিধৃত হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে মাকে ত্যাগ করে মহিম চলে গেলে পুত্রবিচ্ছেদে কাতর মহিমের মায়ের অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুর কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় অংকে বেশ্যাসক্ত মহিম কর্তৃক সরযূকে লাঞ্ছিত করা ও এই ঘটনায় শান্তা ক্ষুব্ধ হয়ে মহিমকে ভর্ৎসনা করলে ক্রোধান্ধ মহিম কর্তৃক তাকে গুলি করার কাহিনী বিধৃত হয়েছে। চতুর্থ অংকে মহিমকে বাঁচাবার জন্য আদালতে শান্তার হত্যাকারীরূপে সরযূর নিজেকে দায়ী করা, বিচারপতি কর্তৃক সরযূর ফাঁসীর আদেশ দান এবং ফাঁসীর প্রাক্‌মুহূর্তে শান্তার উপস্থিতির ফলে সত্য ঘটনা প্রকাশিত হওয়ায় সরযূর মুক্তি লাভের কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। পঞ্চম অংকে সরযূর মৃত্যুতে অনাথ মহিমের নিঃসঙ্গ জীবন যন্ত্রনা লাভের মধ্য দিয়ে তার চৈতন্য লাভের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। প্রবৃত্তির উন্মাদনায় অসংযত কার্যকলাপের ফলে প্রথমে মায়ের মৃত্যু ও পরে সরযূর মৃত্যুতে মহিমের পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠায় মহিমের জীবনের পরিণাম শোচনীয় হয়ে ওঠে। এই মূল কাহিনী ব্যতীত (ক) সরযূ—বিশ্বেশ্বর, (খ) পার্বতী—হিরন্ময়ী, (গ) শান্তা—ভবানী—এই তিনটি উপকাহিনী বিদ্যমান। মূল কাহিনীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রতিটি উপকাহিনী পৃথক পৃথক ধারায় প্রবাহিত হবার ফলে নাট্য কাহিনীর অতিশয় বিস্তৃতি নাট্য সংহতিকে ব্যাহত করেছে। নাট্য ঘটনার মধ্যে পারস্পরিক যুক্তিসঙ্গত কার্যকারণ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। ফলে নাট্যক্রিয়া এক ঘটনা থেকে আর এক ঘটনার মধ্য দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেছে এবং নাট্যক্রিয়ার পরিণতিও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। মূল ঘটনার সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্ক না থাকায় প্রথম অংকের ৩, ৪ দ্বিতীয় অংকের ২, ৪, ৫, তৃতীয় অংকের ১, ৩, ৪, চতুর্থ অংকের ২, ৪, পঞ্চম অংকের ২, ৩, ৬—এসকল দৃশ্যে নাটকের পক্ষে ভারসর্বস্ব হয়ে পড়েছে। নাটকের পঞ্চম অংকের ষষ্ঠ দৃশ্যে মা কালীর চরণতলে মহিমের মা করুণাময়ী, স্ত্রী সরযূ ও দাদাশ্বশুর বিশ্বেশ্বরের আশ্রয়লাভের ঘটনার উপস্থাপনার দ্বারা নাট্যকার পৌরাণিক নাট্যরচনার আদলে নাটকের শেষে একটি মেল বন্ধন দৃশ্যের সংযোজন করেছেন।

প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে নাট্যক্রিয়ার আরম্ভ। প্রথম অংকের পঞ্চম দৃশ্যে স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করে মহিম মায়ের প্রতি অসদাচরণ করে। এই ঘটনাটি (১।৫) নাট্যক্রিয়ার

মধ্যে প্রথম উত্তেজক ঘটনা যা নাট্যক্রিয়াকে ক্রম-ঊর্ধ্বমুখী করে তুলেছে। এরপর করুণাময়ীর মৃত্যু (১।৩), মহিমের বেশ্যাসক্তি (৩।২), মহিম কর্তৃক শান্তাকে গুলি করে মারা (৩।৫), মহিমকে বাঁচানোর জন্য আদালতে নিজেকে হত্যাকারী রূপে সরযূর স্বীকারোক্তি (৪।৩)—এসকল ঘটনার মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সরযূর মৃত্যুতে কৃতকর্মের জন্য মহিমের অনুশোচনা ও তার একাকীত্ববোধের যন্ত্রণালাভের মধ্যে নাট্যক্রিয়া পরিণতি লাভ করেছে।

বঙ্গনারী (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) ঃ

অর্থনৈতিক সংকটে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই মূল ভাবকে কেন্দ্র করে পাঁচটি অংকে ও বাইশটি দৃশ্যে নাট্যকাহিনী রচিত হয়েছে। প্রথম অংকে কন্যাদায় এবং পিতৃঋণের জন্য দেবেন্দ্রের অর্থনৈতিক অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে ওঠা এবং আর্থিক সঙ্গতির অভাবের কারণে প্রৌঢ় যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে কন্যা সুশীলাকে সম্প্রদান করার উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রের প্রচেষ্টা এবং বন্ধুবর কেদার কর্তৃক দেবেন্দ্রের এই প্রচেষ্টা ব্যাহত হওয়ার ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় দেবেন্দ্রের তৃতীয়া কন্যার মৃত্যু এবং দেবেন্দ্রের পুত্রের অসৎ সংসর্গে উচ্ছন্নে যাওয়ার ঘটনা উপস্থাপিত করা হয়েছে। তৃতীয় অংকে পিতৃঋণ শোধের জন্য বাড়ির বিক্রয়জাত অর্থ খুঁজে না পাওয়ায় দেবেন্দ্র কর্তৃক তার স্ত্রী মানদাকে চোর বলে সন্দেহ করে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া এবং অসহায় মানদার কেদারের গৃহে আশ্রয় লাভ করার ঘটনা বিধৃত হয়েছে। চতুর্থ অংকে দেবেন্দ্রের এ হেন অমানবিক কার্যের প্রতিবাদে তার কন্যা সুশীলার পিতৃগৃহ ত্যাগ করা এবং পথিমধ্যে দস্যুদের হাতে পতিত সুশীলাকে বিনয়ের উদ্ধার করার ঘটনা গ্রথিত হয়েছে। পঞ্চম অংকে বন্ধুবর কেদারের প্রচেষ্টায় দেবেন্দ্রের আসল উইলসহ আলমারিতে রাখা বাড়ির বিক্রয়ের অর্থ খুঁজে পাওয়া, পিতৃঋণ ও অর্থনৈতিক সংকট থেকে দেবেন্দ্রের মুক্তি পাওয়া ও উইল জালের অপরাধে দেবেন্দ্রের দাদা উপেন্দ্রের কারাবাসের ঘটনা বিধৃত হয়েছে।

অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে দেবেন্দ্রের কন্যার মৃত্যু, পুত্রের অসৎ সংসর্গে জীবন বিপন্ন হওয়া এবং মিথ্যা অপবাদে স্ত্রীকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ায় দেবেন্দ্রের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার মূল কাহিনী ছাড়া নাটকে (ক) বিনয়—সুশীলা, (খ) যজ্ঞেশ্বর—উপেন্দ্র—বিনোদ—এই দুটি উপকাহিনী বিদ্যমান। এই দুটি উপকাহিনীর দ্বারা নাটকের মূল কাহিনী সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি। উপকাহিনীর চাপে মূল নাট্যক্রিয়ার একমুখী গতি ব্যাহত হয়ে পড়েছে। নাট্যক্রিয়ার দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়ে ওঠেনি। অভিনয়ের প্রয়োজনে খুকীর মৃত্যু (২।৪), সুশীলার গৃহত্যাগ (৪।১), বিনয় কর্তৃক দস্যুদের হাত থেকে সুশীলাকে উদ্ধার (৪।৩)—এই সকল দৃশ্যের আকর্ষণ থাকলেও, এর দ্বারা নাটকের মধ্যে [illegible] ভাবাবেগের উন্নত অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে। উইল জাল করার অপরাধে

উপেন্দ্রের অনুশোচনা ও তার কারাবাসের (৫।৩) ঘটনায় সংস্থাপনার দ্বারা নাট্যকার তাঁর শিল্পাদর্শের বিচার-বোধকে (Poetic Justice) প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মূল কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় প্রথম অংকের চতুর্থ, দ্বিতীয় অংকের পঞ্চম, তৃতীয় অংকের তৃতীয় ও পঞ্চম, চতুর্থ অংকের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম, এবং পঞ্চম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্য নাটককে ভারবাহী করে তুলেছে। নাট্যবস্তু রচনায় ত্রুটির জন্য নাট্যক্রিয়া সুষ্ঠুরূপ লাভ করতে না পারায় এর পরিণতিও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

● হাস্যরসাত্মক নাটকের স্বরূপ

গ্রীক শব্দ "কোমাস" থেকে কমেডি কথার উৎপত্তি।[১৪৬] এর মাধ্যমে হাস্যরসের অবতারণা করা হয়। মননশীলতার গভীরতা এবং গভীর জীবন-বোধের পরিচয় এর মধ্যে সাধারণত পাওয়া যায় না। এতে সহজ সরল হাস্য-রসাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির সহযোগে নাট্যকাহিনী উপস্থাপিত করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হল মানুষের জীবনের ত্রুটি বিচ্যুতি, অসংগতি প্রভৃতি দেখান ও তার সংশোধন করা। হাস্যরসাত্মক নাটকের চরিত্রের কর্মাবলী অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও স্বাভাবিক স্তর থেকে একটু নিম্নমানের হয় বলেই এই সব চরিত্র ও ঘটনা নিয়ে হাস্যরসের অবতারণা করা সম্ভব হয়। এভাবে হাস্যরস সৃষ্টির দ্বারা কাউকে আঘাত করার বাসনা নাট্যকারের থাকে না।[১৪৭] নাটকের কাহিনী বিন্যাসে, ঘটনার সংযোজনায় ও চরিত্রের গঠনভঙ্গীমার মধ্যে ট্রাজেডীর গভীরতম জীবন সংবেদ এবং গভীর ব্যথা বেদনার পরিচয় পাওয়া যায় না। তাহলেও কমেডির ঘটনার সঙ্গে দুঃখবোধের কিঞ্চিৎ সম্পর্ক থাকে। সে দুঃখবোধের মাত্রা এতই কম যে তাতে বেদনাবোধ গৌণ হয়ে হাস্যরসই মুখ্য হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় "কমেডিতে যতটুকু নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হয় তাহাতে আমাদের হাসি পায়"।[১৪৮]

কিন্তু ট্র্যাজেডিতে জীবনের গভীর অর্থবহ ঘটনাকেই বহন করা হয়। কমেডির কাহিনীর মত সে কাহিনী ও চরিত্র হাল্কা নয়।[১৪৯] কমেডির চরিত্রের মধ্যে যে অসঙ্গতি দেখা দেয় তা চরিত্রের অপ্রকৃতিস্থতা (abnormality) জনিত নয়। চরিত্রের মধ্যেও সঙ্গতিমূলক আচার আচরণ করার ক্ষমতা থাকে। কিন্তু নিজের নৈতিক, ব্যবহারিক ও প্রকৃতিগত আচার বিচার সম্বন্ধে চরিত্রের এক ধরণের অজ্ঞতার ফলে চরিত্র স্বাভাবিক ক্রিয়া কর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। এই বিচ্যুতির ফলে নাট্যকার চরিত্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হন এবং পরিশুদ্ধ হাস্যরস সৃষ্টির দ্বারা চরিত্রকে ত্রুটি মুক্ত করতে সাহায্য করেন। কমেডির মাধ্যমে চরিত্রের এই ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসঙ্গতি শুধুমাত্র কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা শ্রেণীর স্তরে আবদ্ধ থাকে না, উপস্থাপনার কৌশলে তা সার্বিকভাবে সমাজের বৃহৎ অসঙ্গতির প্রতীক হয়ে ওঠে। এর ফলে এ সকল অসঙ্গতি সম্পর্কে ব্যক্তি তথা সমাজের

সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং এর সংশোধনের দ্বারা সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনের অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠতে থাকে। কমেডির সঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধের এই সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[১৫০] "সমাজ প্রচলিত কোন দোষের সবিস্তার বর্ণন, সেই দোষের জন্য অনিষ্ট ও তৎপরে তদ্দোষাক্রান্ত ব্যক্তির অনুতাপ ও চরিত্র শোধন"[১৫১]—এ সবের দিকে লক্ষ্য রেখে নাট্যকারের সহানুভূতির যোগ-সাযুজ্যে হাস্যরসাত্মক নাটক উন্নতমানের হয়ে ওঠে।

একদিকে চরিত্রের অসঙ্গতির প্রতি চরিত্রকে ওয়াকিবহাল করে তোলা এবং অপর দিকে সেই অসঙ্গতির সংশোধনের ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা—কমেডি রচনার এই দুটি ধারার যুগপৎ কার্যকারিতা শেকস্‌পীয়রের কমেডি নাটকে সার্থক রূপ লাভ করেছে।[১৫২]

হাস্যরসাত্মক নাট্যবৃত্ত রচনার ক্ষেত্রেও জীবনে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার মধ্য থেকে নাট্য রচনার জন্য প্রয়োজনীয় ঘটনাকে বেছে নিতে হয়। নাট্যবৃত্তে কাহিনী ঐক্য, ক্রিয়া ঐক্য ও সময় ঐক্য বজায় রাখা দরকার। এর দ্বারা নাট্য সংহতি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। নাট্যকাহিনী গ্রন্থনায় উপকাহিনীর বিন্যাসও থাকে।

হাস্যরসাত্মক নাটকের ক্রিয়া ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে পর্যায়ক্রমে লক্ষ্য পূরণের দিকে অগ্রসর হয় এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির মুখে চরম উন্নতি সাধন করার পর (Hilarious excitement) নাট্যক্রিয়া পরিণতি লাভ করে। কমেডি নাটক উপসংহারে সাধারণতঃ সুখজনক ও মিলনান্তক হয়ে ওঠে। নাটকের "চরম আনন্দকে উচ্ছলিত করিবার জন্য" [১৫৩]—ই নাট্যক্রিয়ার মধ্যে অনেক সময় ঘটনার পর্যায়ক্রমে সাময়িক দুঃখ-বোধের প্রকাশ ঘটে থাকে। মিলনান্তক পরিণতি রচনা কমেডি নাটকের অন্যতম বিশেষত্ব হলেও একমাত্র এর দ্বারাই নাটক সফল হয়ে ওঠে না। নাটকের মূল কাহিনী ও ঘটনার পর্যায়ক্রমকে কার্যকারণ যুক্ত করে নাট্যক্রিয়াকে গতিশীল করে তোলা, ক্রিয়ানুসারী সংলাপ সংযোজনা এবং নাট্যকাহিনীর সহিত সুসংগত উদ্দীপনাময় নাট্য-পরিস্থিতি ও নাট্য-দৃশ্য রচনার উপর কমেডি নাটকের সার্থকতা নির্ভর করে। নাটকের মিলনান্তক পরিণতির সঙ্গে সার্বিকভাবে শাশ্বতবোধের যোগসূত্র রচিত হলে নাটক কালোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে।[১৫৪]

নাট্যশাস্ত্রে হাস্যরসাত্মক নাট্যরচনাকে প্রহসন বলা হয়েছে। উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিনশ্রেণীর শ্রোতার জন্য নাটকে হাস্যরস সৃষ্টির ব্যবস্থার বিধান ছিল।[১৫৫] অঙ্গবিকৃতি, বিপরীত বেষ, বিকৃত বাক্য, প্রভৃতি এবং আরো অন্যান্য উপায়ে উত্তম, মধ্যম ও অধম দর্শকদের জন্য উপযুক্ত রূপ-উপায়ের দ্বারা হাস্যরস প্রয়োগ করা হোত। নানাবিধ কারণের মাধ্যমে এই হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়। মানুষের জীবনের প্রতিটি কার্য, ঘটনা ও চিন্তার মধ্যে একটা প্রত্যাশিত শৃঙ্খলাবোধ থাকে। কোন কারণে সেই শৃঙ্খলাবোধের অভাব ঘটলে মানুষ তার ব্যবহারিক জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এই ভারসাম্যহীনতা থেকে হাস্যরসের উদ্রেক হয়। এই ভারসাম্যহীনতার কারণ চরিত্রের কার্যকারণের অসংগতি। কখনো চরিত্রের

বাসনার সঙ্গে বাসনা-পূরণ-জনিত অবস্থার মধ্যে, আবার কখনো বা চরিত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় খুঁজে বার করার সঙ্গে চরিত্রের চিন্তা ও কার্যের মধ্যে এই অসংগতি থাকে। এই অসঙ্গতি দর্শনে চরিত্রের কর্মপ্রবাহের মধ্যে যে বেমানান অবস্থার সৃষ্টি হয় তার ফলে হাস্যরস স্ফূর্ত হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে অপরের অজ্ঞতা, দুর্বলতা, বোকামিকে দেখিয়ে তুলনামূলকভাবে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভের একটা মানসিকতা হাস্যরস সৃষ্টিতে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। আবার চরিত্রের বিবিধ ত্রুটি বিচ্যুতি ও অসংগতি দর্শনের মধ্যে মানুষ তার চরিত্রের বিভিন্ন দুর্বলতাকেও দর্শন করে থাকে। এর ফলে নাট্যচরিত্রের সঙ্গে মানুষ সময় বিশেষে একাত্মতা অনুভব করে থাকে। এই হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক সময় চরিত্র বিশিষ্ট কোন উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত না হয়ে তার কাজের ভুল, বুদ্ধির ভুল, ব্যবহারের ভুল—এসকলের দ্বারা হাস্যরসের যোগান দেয়। এ ধরণের হাস্যরসকে Ridiculous বলা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে চরিত্রের একটি নির্দিষ্ট অসৎ উদ্দেশ্য (evil motive) থাকে এবং নিজেকে অতিচালাক বলে জাহির করতে গিয়ে চরিত্র নানাপ্রকার অসঙ্গতিপূর্ণ কর্মের অবতারণা করে। পরিশেষে তার চালাকি ধরা পড়ে যায় ও উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয় এবং চরিত্রটি হাসির বস্তুতে পরিণত হয়। এই ধরণের হাস্যরসকে Ludicrous বলা হয়।[১৫৬] অসম্ভব ধারণাকে (absurd ideas) বিধিবদ্ধ করতে যাওয়ার প্রচেষ্টা, চরিত্রের অতি তুচ্ছ ভ্রান্তি (Triffling Fault), কোন বিষয়, ঘটনা এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিকৃত অনুকরণ, উৎকেন্দ্রিক ঘটনার আকস্মিক সংযোজন—এসকলের মাধ্যমেও হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়। এতদ্‌ব্যতীত সংলাপের চাতুর্যময় বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের দ্বারা, নির্দিষ্ট শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারের সাহায্যেও হাস্যরসের উৎকর্ষ সাধন করা হয়। যে কোন ভাবেই হাস্যরস সৃষ্টি করা হোক না কেন চরিত্র, সংলাপ ও ঘটনা হাস্যরস সৃষ্টির উপযুক্ত হলে, নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের উপস্থাপনায় নাট্যকারের কায়দা কৌশল ও চমক সৃষ্টির বৈচিত্র্য থাকলে এবং দর্শকদের হাস্যরস গ্রহণের উপযুক্ত মানসিকতা থাকলে হাস্যরসাত্মক নাটক সার্থক হয়ে ওঠে।

এই হাস্যরসের চারটি প্রধান বিভাগ বিদ্যমান।

(ক) কৌতুক হাস্য (Humour)

কৌতুক হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রে নাট্যকার মানুষের আচার-আচরণ, ব্যবহার, চিন্তা ও চেতনার মধ্যেকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসঙ্গতির দিকগুলো নাটকে দেখিয়ে নির্দোষ হাস্যরসের অবতারণা করেন। ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসঙ্গতি নিয়ে যে চরিত্র নাটকে চিত্রিত হয় তার প্রতি নাট্যকারের সহানুভূতি থাকে।[১৫৬ক] চরিত্রের প্রতি সমবেদনা না থাকলে কোন চরিত্রকেই সুষ্ঠুরূপ দেওয়া যায় না।[১৫৭]

(খ) বাগ্‌বৈদগ্ধপূর্ণ হাস্য (Wit)

এ জাতীয় হাস্যরস সৃষ্টিতে সংলাপের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সংলাপের শব্দ চয়ন, উপমা অলঙ্কারাদিসহ শব্দের চাতুর্যময় বিন্যাস-কৌশল এতে প্রাধান্য পায়। তাই একে বাক্‌কেলীও বলা যেতে পারে। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রে এই বাগ্‌বৈদগ্ধপূর্ণ হাস্যরসকে 'লেশ' বলা হয়েছে।[১৫৮] অনেক সময় ঘটনা ও চরিত্রের ত্রুটিবিচ্যুতি ও অসঙ্গতিকে এর দ্বারা বুদ্ধিদীপ্তভাবে মার্জিত ও পরিশীলিত উপায়ে প্রকাশিত করা হয়। Dr. Sigmund Freud-এ সম্পর্কে বলেন—"Every conscious and clever evotation of the comic is wit."[১৫৯] তাই wit-এর আবেদন হৃদয়ের কাছে নয়, রসবোধ ও সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির কাছে। এই wit-এর সার্থক প্রয়োগের জন্য বাক্‌সংযম ও বাক্‌ সংহতিরও প্রয়োজন।

(গ) ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক হাস্য (Satire)

ল্যাটিন শব্দ Satura থেকে Satire কথার উৎপত্তি।[১৬০] চরিত্রের সংগতি-বিহীন কার্যকলাপ, দুর্বলতা, ভণ্ডামিকে নিয়ে এক্ষেত্রে নাট্যকার আন্তরিক ভাবে মজা উপলব্ধি করেন। সেক্ষেত্রে অনেক আশাবাদী স্যাটিয়ারিস্ট নাট্যকার চরিত্রের নিছক বোকামি, ও মূর্খতাকে চরিত্রের একটি রোগ হিসাবে দেখেন এবং মৃদু বিদ্রুপের মাধ্যমে চরিত্রের এহেন ত্রুটিজনিত স্খলনকে সংশোধিত করতে প্রয়াসী হন। আবার অনেক নৈরাশ্যবাদী স্যাটিয়ারিস্ট নাট্যকার চরিত্রের দুর্বলতা, অজ্ঞতা, শঠতা ও ভণ্ডামিকে চরিত্রের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির মাধ্যম বলে মনে করেন। এই শঠতা ও ভণ্ডামী সার্বিকভাবে জীবন ও জগৎকে কলুষিত করতে থাকে। তাই এ সকল চরিত্রের প্রতি নাট্যকার নিদারুণ ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে থাকেন। আবার অনেক স্যাটিয়ারিস্ট নাট্যকার অন্যের বুদ্ধি, শক্তি ও অবস্থার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে তুলনামূলকভাবে নিজেকে উন্নত বলে মনে করেন এবং তাঁর জীবন দর্শনকেই সমাজের মধ্যে একমাত্র আদর্শনিষ্ঠ পথ বলে মনে করেন। এর ফলে তাঁর পথ ও মতের বিপরীতগামী ঘটনা ও চরিত্রের প্রতি নাট্যকারের সহমর্মিতার বোধ থাকে না। ঘটনা ও চরিত্র সম্পর্কে নাট্যকারের এইরূপ বিচিত্র মনোভঙ্গীর জন্য ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক নাটকের মাধ্যমে ঘটনা ও চরিত্রের উপস্থাপনায় (Treatment) কখনো মৃদু মৃদু উপহাস আবার কখনো কখনো ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের তীব্র কশাঘাতের দ্বারা নাট্যকারের অনমনীয় নির্মমতা প্রকাশ পায়।[১৬১] নাট্যকারের রুচিশীলতার মাত্রাবোধের অভাব ঘটলে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়তে পারে। সে রকম ক্ষেত্রে নাটকের শিল্পগত উৎকর্ষ ক্ষুণ্ণ হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বিদ্রুপাত্মক নাটকের মধ্যে শাশ্বত চিন্তাধারার ছোঁয়া থাকে না। আঞ্চলিক ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা নাট্যকার অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবান্বিত হন। এরূপ স্থলে নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে মানুষের দুর্বলতাকে নিয়ে নাট্যকার নাট্য-পর্যায় (sequence) ও নাট্য-পরিবেশকে রুচিহীন ও অমার্জিত করে তোলেন। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের জ্বালাময় অবস্থার মধ্যে নন্দনতত্ত্বের বিমল আনন্দের ধারা বিনষ্ট হয়। মনপ্রাণ তিক্ততায় ভরে ওঠে।

(ঘ) প্রহসন (Farce)

মধ্যযুগে বিভিন্ন আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্যে অবসর বিনোদনের জন্য একপ্রকার স্থূল হাস্যরসাত্মক নাটকের প্রচলন ঘটেছিল। এ ধরনের হাস্যরস পরিবেশনায় চরিত্র ও ঘটনার অসঙ্গতিজনিত স্খলনের বিচার বিশ্লেষণ মুখ্য হয়ে ওঠে না। নাটকের গল্প গড়ে ওঠা, চরিত্রের বিকাশ হওয়া ও নাট্যকারের বক্তব্য প্রতিষ্ঠার চেয়ে নাটকে কল্পনার আতিশয্যে যুক্তিহীনভাবে অতিরঞ্জনের দ্বারা পর্যায়ক্রমে চিরাচরিত স্থূল হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়।[১৬২] নাটকের মধ্যে ঘটনা ও তার পর্যায়ক্রমের মধ্যে সম্ভাব্যতা ও সংগতির অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। চমকপ্রদ ও আকস্মিক ঘটনার সাহায্যে নাট্য-কাহিনীর মধ্যে বিভ্রান্তি ও হট্টগোলের বাতাবরণ তৈরীর দ্বারা নিছক উদ্ভট অবস্থার সৃষ্টি করা হয়। কাহিনীর মধ্যে সুসংগত বৈচিত্র্য, অভিনবত্ব এবং একই সূত্রে গঠিত ধারাবাহিক বিশিষ্টতা না থাকায় নাটক রচনার দিক থেকে বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ হয়ে ওঠে। একই ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তিসহ বিকৃত ও উদ্ভট, অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা অনেক সময় এ ধরণের হাস্যরসের উদ্রেক করার চেষ্টা করা হয়। এরফলে হাস্যরসের সহজ স্বাভাবিক স্ফূর্তি গড়ে ওঠে না। ক্লান্তিদায়ক একঘেয়েমিতায় মন অবসন্ন হয়ে ওঠে।

● হাস্যরসাত্মক নাটকের গঠন রীতির পরিচয় ঃ

অবতার ঃ (অমৃতলাল বসু ঃ ২৫-১২-১৯০১ ঃ স্টার থিয়েটার)

মানুষের স্বাভাবিক ধর্মবিশ্বাসকে আশ্রয় করে ধর্মীয় অবতারগণ নিজেদের ভণ্ডামির দ্বারা সমাজের ধর্মীয় পরিবেশকে কলুষিত করেন। এই বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে দুটি অংকে ও আটটি দৃশ্যে নাট্যকাহিনী গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে বৈষ্ণব অবতাররূপে আবির্ভূত গয়ারামের অসংযমী রসনার প্রকাশ ও পরস্ত্রী হিন্দোলার সঙ্গে শাক্ত অবতার হলহলানন্দের অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হবার ঘটনা উপস্থাপিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে অর্থের বিনিময়ে গয়ারাম কর্তৃক অবৈধ প্রণয়জাত হিন্দোলার কলংক মোচন এবং হিন্দোলা ও প্রমথের পুনর্মিলনের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। এই হাস্যরসাত্মক নাটকের মাধ্যমে বৈষ্ণব ও শাক্ত অবতার যথাক্রমে গয়ারাম ও হল-হলানন্দের চরিত্রগত অসংগতির সাহায্যে নাট্যকার হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। বৈষ্ণব হয়েও গয়ারামের অনিয়ন্ত্রিত রসনার তাড়নায় আমিষ আহারের প্রবৃত্তি, অর্থকৌলিন্য বৃদ্ধির দ্বারা পার্থিব ভোগ বাসনার প্রতি তীব্র আসক্তি (১।১) এবং সেইজন্য 'নামের বদলে দামের' মাহাত্ম্য কীর্তনে রত হওয়া (২।২), অপরদিকে শাক্ত অবতার হলহলানন্দ কর্তৃক অসংযমী ষড়রিপুর চরিতার্থতার জন্য পরস্ত্রীর সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হওয়া (১।৪), ব্যাভিচারী প্রবৃত্তিকে ধর্মের অনুসৃত নীতি বলে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা,—এসকল অসংগতিই চরিত্রদ্বয়কে হাস্যাস্পদ করে তুলেছে। চরিত্রের এসকল অসংগতি চিত্রণের ক্ষেত্রে নাট্যকার তীব্র ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আশ্রয় গ্রহণ

করেছেন।[ক] মূর্খ হলহলানন্দের ভুল সংস্কৃত ও ইংরাজী উচ্চারণ,[খ] ঘটনার অস্বাভাবিকতা,[গ] গয়ারামের কৌতুক-পূর্ণ অঙ্গভঙ্গী ও বিশিষ্ট শব্দ-চয়ন-যোগে এবং অনুপ্রাস অলঙ্কারের সহায়তায় বাকরীতির মাধ্যমে নাটকে হাস্যরসের যোগান দেওয়া হয়েছে।[ঘ] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে জ্ঞানহীন ব্যক্তির মুখে অশুদ্ধ সংস্কৃত বাক্য-প্রয়োগের দ্বারা হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' প্রহসনের ন্যায়রত্ন ও বেদান্তবাগীশ চরিত্রের প্রভাব বিদ্যমান।[১৬৩] এই প্রহসনে ছাব্বিশটি সংগীত বিদ্যমান। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও কৌতুক সৃষ্টিতে এ সকল সংগীতগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কোথাও কোথাও সংগীত অনেক দীর্ঘ রূপ লাভ করেছে। সেক্ষেত্রে 'বাবু করো না আমার পৃষ্ঠে মুষ্ঠাঘাত' (১।২ দৃশ্যে বাবুর গান), 'তবে দুনিয়া হত কত মজাদার' (২।৩ দৃশ্যে ছকড়ির গান), 'তুমি কে বট হে' (২।৩ নলিনীর গান), ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গানের সুর সংযোজনায় বৈষ্ণবীয় সঙ্গীতের ভাবধারার প্রভাব বিদ্যমান।

বাহবা বাতিক ঃ (অমৃতলাল বসু ঃ ২৫-১২-১৯০৪ স্টার)

দেশ গঠনের জন্য প্রকৃত নেতৃত্বের অভাবে দেশ পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে ও তার স্বাধীনতা বিপন্ন হয়।

এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে দুটি অংকে ও এগারটি দৃশ্যে নাট্য কাহিনী গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে অক্‌কা-ফক্‌কা দ্বীপের অধিকার গ্রহণের জন্য নটবরের নেতৃত্বে

ক. দর্প—এবার আমাদের আবির্ভাব নামের জন্য নয় দামের মহিমা প্রচার কর্ত্তে, নাম এখন খুব সস্তা—ভক্তি প্রেমের প্রয়োজন নাই, নগদ দিলেই পাওয়া যায়। শ্রীগয়ারাম এই দাম নিতেই ধরাধামে এসেছেন। (দ্বিতীয় অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য—অবতার।)

হলহলানন্দ—আমি সব ভালবাসি। ভালবাসিতেই আমার জন্ম। ভালবাসাতেই স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ। এই ভালোবাসার জন্যই বুড়ো মাকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে অন্ধ করে দিয়েছি। আমি সব ভালবাসি। কথাটা হচ্ছে আমার ভিতরকার সূক্ষ্ম আত্মা যখন যা চাবেন আমাকে তখনই তা দিতে হবে? (প্রথম অংক, চতুর্থ দৃশ্য—অবতার।)

খ. হলহলানন্দ—নাস্তি মম নাম ন ব্যপি গোত্রজ্ঞানং ন তথা উপাধেঃ পরিচয়ঃ। সংসার নির্লিপ্তোহহং সন্ন্যাসী, মানবস্তু সমাহয়েস্তি মাং পরিব্রাজক পরমহংস হলহলানন্দ স্বামী—এলে ফেল ইতি আখ্যায়া ॥ (প্রথম অংক, তৃতীয় দৃশ্য—অবতার।)

গ. হলহলানন্দ—লম্ফ প্রদানে ফটক উল্লঙ্ঘন চেষ্টা ও ভূমিতে পতন।

(প্রথম অংক, তৃতীয় দৃশ্য—অবতার।)

ঘ. প্রমথ—নির্দয়ে নিষ্ঠুরে কঠোরে ব্যাটরা বামিনী,
মটরমুখী রাঠোরকালে। এই বুঝি তুমি প্রেয়সী—
দেখনহাসি, এলোকেশী-বারাণসী? এই বুঝি বিরহিনী
পাগলিনী, খগেজিনী—জাগুলে বাঘিনী?—

(প্রথম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য—অবতার।)

সকলের তথায় যাবার ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে অক্কা ফক্কা দ্বীপের অধিকার গ্রহণের পর গঠনমূলক নেতৃত্বের অভাবে দ্বীপের কর্তৃত্ব বিদেশী সাহেবদের হাতে অর্পণ করে তাদের নির্দেশানুসারে সকল কর্ম করতে সকলের সম্মতি দানের ঘটনা দেখান হয়েছে।

এই প্রহসনের মাধ্যমে মূলতঃ বাক্সর্বস্ব বাঙালি চরিত্রের বিভিন্ন দিকের ত্রুটি-বিচ্যুতি, এবং তথাকথিত বিপ্লববাদীদের অন্তঃসারশূন্যতা, প্রগলভতা ও ভণ্ডামির বিভিন্ন দিকগুলোকে তুলে ধরে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করা হয়েছে।

বাক্যবাগীশ সীতাহরণের নিজের কর্মদক্ষতার প্রতি উচ্চধারণা পোষণের মধ্যে তাঁর মূর্খতার প্রকাশ,[ক] কর্মবিমুখ গোপাল চরিত্রের মধ্যে চিন্তা ও কার্যের অসঙ্গতি,[খ] শুধুমাত্র চাঁদা আদায়ের দ্বারা দেশের সংকট মোচনের জন্য হুজুগপ্রিয় দেশসেবকদের যুক্তিহীন উদ্ভট প্রক্রিয়া (১।৩), ভাবেন্দ্রের মত দেশনেতাদের কথায় কথায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করার বাতিকগ্রস্ততা,[গ] প্রগলভ প্রাণবন্ধুর আত্মপ্রচারের মধ্যে তাঁর অজ্ঞতা ও অসৎ মনোবৃত্তির প্রকাশ (১।৩), এ সকল ভাবে চরিত্রের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি, অজ্ঞতা ও বোকামিকে তুলে ধরে নাট্যকার স্থূল হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন।

সংলাপ গ্রন্থনায় অনুপ্রাস অলংকারের প্রয়োগ এবং সন্ধি সমাসকে ভেঙে একপ্রকার শব্দধ্বনির সৃষ্টির দ্বারা,[ঘ] কখনো কখনো ইংরাজী শব্দের ভুল বাংলা

ক. সীতাহরণ—আমার মতন এত বড় একটা মস্ত মাথা ক্র্যামড উইথ গ্রামার এ্যাণ্ড রেটরিক ফিলজফি এণ্ড লজিক, যে মাথার উপর সলি, বেন, হ্যামিলটন, হ্যাজসলে, বাসা বেঁধে আছেন, সেই মাথা কি আমি তুচ্ছ আলু পটল, হিসেব রাখতে খরচ করব— (প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য—বাহবা বাতিক।)

খ. গোপাল—কাজ? কাজ আবার কি? কাজ তো ইতর ছোটলোক করে। কাজ করতে হয় স্কুল মাষ্টারেরা করুক, কেরানীরা করুক···দোকানী, মহাজন, ছুতোর, কামার মিস্ত্রী—এরা সব কাজ করুক। আমরা রাজা হব, আমরা কাজ করব কি? (প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য—বাহবা বাতিক।)

গ. ভাবেন্দ্র—রাজ্য পাই পাবো—সে তো রাজা হবেই। তাবলে কি এ্যাজিটেশন ছাড়ব কখনই নয়। এ্যাজিটেশন এ্যাজিটেশন এ্যাজিটেশন। আমার শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে রক্তে রক্তে এ্যাজিটেশন। আমি রাত্রে নিদ্রা যাই Nightmare and Agitation. আমার বুকের ভেতর Cogitation করতে থাকে—

(প্রথম অংক, চতুর্থ দৃশ্য—বাহবা বাতিক।)

ঘ. ফেনিলা—হে রাজবংশ, অবতংস, অস্থি মাংস দগ্ধকারি কাংস্যবণিক না জেনে না শুনে না চিনে তোমার হৃদয় সরসবাসী ফেনিল। কলহংসী না জানি কতই উপহংস দূর ছাই উপহাস করেছে। মহারাজ এক্ষণে কোটালকে ডেকে হুকুম দিন, অভাগিনী, অপরাধিনী, চিরবিরহিনী, বিনোদিনীকে দক্ষিণ মশানে নিয়ে গিয়ে হেঁটে কাটা উপরে কাঁটা দিয়া পুঁতে ফেলুক।

তর্জমাঙ ইত্যাদির সাহায্যে, সাধারণ কৌতুক ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সৃষ্টির দ্বারা হাস্যরসের যোগান দেওয়া হয়েছে।চ

খাসদখল : (অমৃতলাল বসু : ৩০-৩-১৯১২ স্টার থিয়েটার)

সমাজপতিদের চারিত্রিক দুর্বলতা ও অন্তঃসার শূন্যতার দ্বারা সমাজ সংস্কার করা যায় না। এই মূলভাবকে অবলম্বন করে তিনটি অংকে ও তেরটি দৃশ্যে নাট্যকাহিনীটি রচিত হয়েছে। প্রথম অংকে মোক্ষদাকে অসুস্থ দেখে সমাজসেবী লোকেনের অসুস্থ হওয়ার ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে স্বাস্থ্যোদ্ধার জন্য লোকেনের বাইরে গমন ও তথায় বাঘের কবলে তার মৃত্যুর সংবাদে মোক্ষদার মূর্চ্ছা যাবার কাহিনী বিন্যস্ত। তৃতীয় অংকে সমাজসেবী ও বিধবা বিবাহের উদ্যোক্তা মোহিত কর্তৃক লোকেনের বিধবা স্ত্রী মোক্ষদার দেহ সান্নিধ্য পাবার বাসনায় তাকে বিয়ে করার জন্য উদযোগ গ্রহণ ও লোকেনের আবির্ভাবে সে উদযোগ ব্যর্থ হওয়া এবং মোহিতের পূর্বের পরিত্যক্ত স্ত্রী গিরিবালার সঙ্গে মোহিতের পুনর্মিলনের ঘটনা দেখান হয়েছে।

নাটকের পূর্ব রঙ্গে মহাদেব কর্তৃক রতির লাঞ্ছনার ঘটনা বিধৃত হয়েছে। কলিযুগে নানাবিধ বিষয়ে সমাজ সংস্কারের নামে ভোগসর্বস্ব সমাজপতিরা কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করার বিষয়ে যত্নবান হবেন এবং তার দ্বারা সমাজকে আরও কলুষিত করে তুলবেন। এই বিষয়ের প্রতি নাট্যকার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করার উদ্দেশ্য নাটকের পূর্বরঙ্গে উল্লিখিত ঘটনার অবতারণা করেছেন।

খাসদখল নাটকে সমাজ সংস্কারক রামকমলবাবু ও লোকেনের মধ্যে দুই বিপরীত মানসিকতা ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। এর ফলে তাঁদের দুইজনার কার্যাবলীর মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দেওয়ায় নাটকে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। বিধবা বিবাহ, বালিকা বিবাহ নিবারণ, ইত্যাদির দ্বারা তাঁরা সমাজের সংস্কার করতে

ঙ. ভাবেন্দ্র—সাধে বলি সীতাহরণবাবু You are perfectly correct. সম্পূর্ণতা রূপে ভুলহীন— (দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য—বাহবা বাতিক।)

চ. নটবর—হুইস্কির ডিউটি উঠে যাবে।

ভাবেন্দ্র—শুধু হুইস্কি কেন। এক স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ডিউটি ভিন্ন বঙ্গদেশে আর কোন ডিউটি থাকবে না। (দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য—বাহবা বাতিক।)

সীতাহরণ—America মটো আছে United we stand, divide we fall. আমাদের মটো হবে

ভাবেন্দ্র—Subscribed we sustain, unsubscribed we starve.

(দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য—বাহবা বাতিক।)

প্রাণবন্ধু—এ দ্যাশে দেখছি আমাগোর পইক্ষে সুলভের মধ্যে মাথার উপর ভাস্কর আশে পাশে তস্কর আর ধনীমানীর কাছে বেলাইতি বুটের তক্কর।

(দ্বিতীয় অংক, ষষ্ঠ দৃশ্য—বাহবা বাতিক।)

চান। কিন্তু নিজেদের পারিবারিক ও ব্যবহারিক জীবনে এ সকল সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে তারা পুরাতন সংস্কারকেই ধরে রাখেন। শ্লেষ বাক্যের প্রয়োগের দ্বারা নাট্যকার এদের প্রতি তীব্র কশাঘাত করেছেনক। মোহিতের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের পিছনে বিধবা রমনীদের ভোগের অসৎ প্রবৃত্তি বিদ্যমান। এ ধরণের Ludicrous চরিত্রের অসৎ প্রবৃত্তির প্রকাশের মাধ্যমে নাটকে হাস্যরসের যোগান দেওয়া হয়েছেখ। মোক্ষদা চরিত্রের মধ্যে বাতিকগ্রস্ততা, ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে সামাজিক অবস্থানের দিক দিয়ে নিজেকে সকল ক্ষেত্রে উচ্চমানের বলে ভাবা (Superior complex),গ স্বামীকে জীবনসর্বস্ব বলে জাহির করলেও অসুখের সময় মৃত্যু ভয়ে ভীত মোক্ষদার স্বামীর চেয়ে নিজের গহনার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করা,ঘ স্বামীর মৃত্যু সংবাদে শোকাকুলা মোক্ষদার কবিতা পাঠের দ্বারা শোক প্রকাশ,ঙ—এ সব ঘটনার দ্বারা প্রকাশিত চরিত্রের বিভিন্ন কার্যের মধ্যে অসঙ্গতিই নাটকের হাস্যরসকে দীপ্ত করে তুলেছে।

ইংরাজী ভাষা সম্পর্কে কিছু না জেনেই সে বিষয়ে নিতাই এর পাণ্ডিত্য জাহির করার চেষ্টার মধ্যে তার মূর্খতার প্রকাশ, চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে কোন জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও ডাক্তার হিসাবে যাদুধনের নিজেকে শ্রেষ্ঠ ডাক্তার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে

ক. 'রামকমলবাবুরও সমাজ সংস্কারটা…কাছারির পোষাক। যেমন রমেশ কাছারির পোশাক পরে ভাতও খায় না। তেমনি রামকমলবাবুও আপনার বাড়ীর ভিতর সমাজ সংস্কার করেন না'— (প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য—খাসদখল।)

খ. মোহিত—মোক্ষদারূপ বরফ জলের গেলাস এখন আমার হাতে। তাই-ই আর তার জন্য তত তেষ্টা নেই…কিন্তু গিরিবালার রূপ আমার চোখে এখন যেন উছলিতা যমুনা। তাইতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবে থাকতে ইচ্ছে কচ্ছে। আচ্ছা সমাজ সংস্কারের প্রোগ্রামের ভিতর বিধবা বিবাহের সঙ্গে বহু বিবাহ, অন্ততঃ দুই বিবাহ, মিশ খাইয়ে দেওয়া যায় না… (তৃতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য—ঐ।)

গ. মোক্ষদা—আমার টেমপারেচার নিরেনব্বই বই নয়…আমি কি এতই ছোটলোক—বিধু পরিচারিকা, সে আমার চুল বেঁধে দেয়…তারও সামান্য জ্বর হলে একশো দুই হয় আর আমার কিনা নাইনটিনাইন। (প্রথম অংক, তৃতীয় দৃশ্য—ঐ।)

ঘ. মোক্ষদা—কেবল একটি অনুরোধ, আমার হীরের ব্রেসলেট জোড়াটি তুমি আবার যাকে বিবাহ কর্বে তাকে দিও না— (প্রথম অংক, তৃতীয় দৃশ্য—ঐ।)

ঙ. মোক্ষদা—একি ঃ কি হলো ঃ My husband ! My love, My darling.

দুখিনী জীনদীপ নিভাবার তরে
দীপ কি সৃজিলে বিধি ভারত ভিতরে
না হতে পঁচিশ পূর্ণ বিধবা হইনু তূর্ণ
মর্ম্ম হর্ম্ম্য হল চুর্ণ হৃদয় বিদরে ।। (দ্বিতীয় অংক পঞ্চম দৃশ্য—ঐ।)

সে সম্পর্কে তার অজ্ঞতার প্রকাশ,[চ] তপস্বীরাম ও মুচিরামের ইংরাজী শব্দের ভুল বাংলা তর্জমা,[ছ]—এ সকলের দ্বারা নাটকে সামগ্রিকভাবে হাস্যরসের জোয়ারের সৃষ্টি করা হয়েছে।

সংলাপের মধ্যে কৌতুক ও বাক্‌বৈদগ্ধ্যের দ্বারা যেমন হাস্যরসকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে তেমনি সমাজ সংস্কারকদের চরিত্রগত ত্রুটি-বিচ্যুতিকে তুলে ধরার জন্য তীব্র শ্লেষের ব্যবহারও করা হয়েছে[জ]। নাটকে মোট ষোলটি গান আছে। লোকেনের মৃত্যু সংবাদ শুনে তার স্ত্রী মোক্ষদা পুনর্বার বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়। এই উদ্দেশ্যে লোকেনের আত্মার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে মোক্ষদা একটি গান ("দেহ অনুমতি দেহ অনুমতি ওহে পরলোকগত মম প্রিয়তম পতি")—গায়। এই গানের দ্বারা তার কার্যকারণের মধ্যে অসঙ্গতিজনিত কৌতুক রস সৃষ্টি করা হয়েছে (তৃতীয় অংক চতুর্থ দৃশ্য)। "ওগো কেউ বলো না ভাতার কেমন মিষ্টি" (দ্বিতীয় অংক চতুর্থ দৃশ্য) এই গানের দ্বারা সরসভাবে আদিরসের পরিবেশনার মাধ্যমে হাস্যরসের প্রবাহকে উত্তুঙ্গমুখী করে তোলা হয়েছে।

নবযৌবন : (অমৃতলাল বসু : ২০-২১-১৯১৩ মিনার্ভা)

মিলনের মাধ্যমেই প্রেম সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করে। নাটকের এই মূলভাবকে আশ্রয় করে চারটি অংকে ও ষোলটি দৃশ্যে নাট্যকাহিনী গঠিত হয়েছে। প্রথম অংকে সুকুমার ও তিলকচাঁদ এবং অলকা ও বসন্তকুমারের পারস্পরিক হৃদয়াকর্ষণের

চ. খাদুধন—আজ এক জায়গায় ডাক্তার ব্রাউনের সঙ্গে একটা কেসের প্রগনসিস্‌ নিয়ে ভয়ানক তর্ক হচ্ছিলো। সে বলে বাঁচবে আমি বলি মরবে। সেও statistic কোট করে দেখায় বাঁচবে, আমিও statistic কোট করি। শেষে সেও রেগে চলে গেল, আমিও চলে এলুম। রুগীকে আর ঔষধ দেওয়া হল না।

(দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য—খাসদখল।)

ছ. তপস্বী—Is your highness coming from Delhi.

মুচিরাম—ইয়েস ইয়েস আপকো উচ্চতা কি ডিল্লী থেকেমে সে আগমন করতা হ্যায়— (প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য—ঐ।)

জ. মোহিত—গিরিবালা।

গিরিবালা—মশাই।

মোহিত—বিধবা বিবাহ কি মন্দ।

গিরিবালা—আকাশ পিদিম কি চাঁদ— (তৃতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য—ঐ।)

ঠাকুরদা—বলি ডাক্তার মশাই, এঁরা তো বিবিধ ঔষধ বলছেন, আপনি লিখে যাচ্ছেন…একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বলি রুগির পেটটা কি পোস্ট অফিস? যত চিঠি এক বাক্‌সে ফেল্লে, তারপর ঢাকার খানা ঢাকায় গেল, রেঙ্গুনের খানা রেঙ্গুনে গেল, কাশ্মীরের খানা কাশ্মীরে গেল—তেমনি মাথার ঔষুধটা মাথায় যাবে, পায়েরটা পায়ে আসবে? (প্রথম অংক, তৃতীয় দৃশ্য—ঐ।)

ঘটনা উপস্থাপিত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে অলকা ও বসন্তকুমারের প্রণয়ানুভূতির ক্রমবিস্তার ও সুকুমারকে বিয়ে করার জন্য তিলকচাঁদের উদযোগ গ্রহণের কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। তৃতীয় অংকে দাদামশাই দর্পনারায়ণ কর্তৃক নাতনি সুকুমারকে গুলজার বাহাদুরের সঙ্গে বিবাহ দেওয়ার বন্দোবস্ত করা ও বসন্তকুমারের পিতা তেজবাহাদুরের দর্পনারায়ণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণের কাহিনী দেখান হয়েছে। চতুর্থ অংকে তেজবাহাদুরের নিরুদ্দিষ্ট পুত্র বসন্তকুমারের সঙ্গে অলকার এবং গুলজার বাহাদুররূপী তিলকচাঁদের সঙ্গে সুকুমারের শুভপরিণয়ের দ্বারা তাদের প্রেমের সুষ্ঠু পরিণতি লাভের কাহিনী বিধৃত হয়েছে। নাট্য-কাহিনী গঠনে নাট্যক্রিয়ার মধ্যে কার্যকারণের অভাব বিদ্যমান। এবং যুক্তিহীন-ভাবে কাহিনীর অতি বিস্তৃতি নাট্য সংহতিকে ব্যাহত করেছে। এ প্রসঙ্গে নাটকের ভূমিকায় নাট্যকারের মন্তব্য স্মরণযোগ্য। "নাটক পাঠকালে লেখকের বাক্য-বাহুল্যের যতটা অত্যাচার সহৃদয় পাঠক সহ্য করিতে প্রস্তুত অভিনয়ের ক্রমবিকাশ দর্শনে কৌতূহলী দর্শক ততটা ধৈর্যধারণে সচরাচর সমর্থ নহেন—"।

নাটকে বৃদ্ধ দর্পনারায়ণের বোকামি সুলভ অংগতার প্রকাশ করে, তার কার্য-কলাপের অসঙ্গতির মধ্য দিয়ে অস্বাভাবিক ঘটনার উপস্থাপনার দ্বারা হাস্যরস পরিবেশিত হয়েছে[ক]। সংলাপের মধ্যে কোথাও কোথাও বাক্‌বৈদগ্ধ্যের প্রয়োগ দ্বারা[খ] কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ কৌতুক সৃষ্টির মাধ্যমে হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়েছে।[গ]

সংলাপ গ্রন্থনায় চলিত শব্দের সঙ্গে অনুপ্রাস অলঙ্কার যোগে, তৎসম ও সংস্কৃত শব্দের মিলনে বিশিষ্ট ধ্বনি সৃষ্টির দ্বারা এবং স্বাভাবিক ধর্মী সংলাপের

ক. আর কেউ আমার উপদেশ দিতে এলে এই লাঠির ঘায়ে তার শির দু-ফাঁক করে দিতাম। (লাঠি উত্তোলন করিয়া মারিতে উদ্যত ও ফুলচাঁদের একলম্ফে দূরে গমন এবং পশ্চাৎধাবন চেষ্টায় দর্পনারায়ণের পতন)।

(দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য—'নবযৌবন'।)

খ. দর্পনারায়ণ—পশুপক্ষী দাঁড়িয়ে শুনত বুঝলি তুলসি—আমার গান পশুপক্ষী দাঁড়িয়ে শুনত।

তুলসি—আর কোন পশু ভাবত 'আমার গলা মানুষ পেলে কি করে'—

(প্রথম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য—'নবযৌবন'।)

গ. দর্পনারায়ণ—স্ত্রীলোক অবলা? কথায় বলে স্ত্রীলোক। কই পুরুষকে কেউ পুরুষলোক বলে কি? যেমন ভূলোক, গোলক।

ভজনলাল—ঢোলক—নোলক।

দর্পনারায়ণ—হ্যাঁ তেমনি স্ত্রীলোক…একটা স্ত্রীলোক বত্রিশটা পুরুষের, একশোটি পুরুষের।

ভজনলাল—পরলোক॥ (দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য—'নবযৌবন'।)

মধ্যে বিন্যাসগত অসঙ্গতি সৃষ্টির দ্বারা কৌতুকবোধকে আরও বাড়িয়ে তোলা হয়েছে।ঘ নাটকে মোট উনত্রিশটি গান আছে। বিশিষ্ট শব্দ চয়ন ও উপমার সাহায্যে গঠিত কোন কোন গান এই হাস্যরসের প্রবাহকে আরও ছড়িয়ে দিয়েছে।ঙ

প্রায়শ্চিত্ত : (দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : ১৯-১-১৯০১ ক্লাসিক থিয়েটার)

স্বদেশীয়ানাকে ত্যাগ করে অন্ধ বিদেশীয়ানার অনুকরণের পরিণতি বিষময় হয়ে ওঠে। —এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে দুটি অংকে ও ষোলটি দৃশ্যে নাট্যকাহিনী গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সুরেশ, উমেশ, রমেশ কর্তৃক তাদের স্ত্রীদের ইংরাজী শিক্ষা ও রীতি-নীতিতে শিক্ষিত করে তোলার প্রচেষ্টার ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে ইংরাজীয়ানার অন্ধ অনুকরণের ফলে সুরেশ, উমেশ, রমেশের গার্হস্থ্য জীবন বিপন্ন হলে নিজেদের ভুল সম্পর্কে তাদের ওয়াকিবহাল হওয়া এবং পুনরায় দেশীয় রীতি-নীতি ও শিক্ষাগ্রহণ করার কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। নাটকে একটি প্রস্তাবনা দৃশ্যও বর্তমান। প্রস্তাবনা দৃশ্যে হুজুগ-প্রিয় বাঙালীর অবিবেচনাপ্রসূত কর্মপদ্ধতির বিভিন্ন অসঙ্গতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

চরিত্র, ঘটনা ও সংলাপ-এর সাহায্যে নাট্যকার তাঁর হাস্যরসের পরিমণ্ডলকে গড়ে তুলেছেন। স্বামীদের প্রচেষ্টায় ইংরাজী শিক্ষালাভ করার পর সুকেশিনী, সুবেশিনী ও সুহাসিনীর পরিবর্তিত আচার ব্যবহার এর সঙ্গে তাদের স্বামী যথাক্রমে উমেশ, রমেশ ও পরেশের সামঞ্জস্য বিধান করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলির চিন্তা ও কার্যের অসঙ্গতির মধ্যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। নিজেদের অধিক বিজ্ঞ ও চালাক ভাবার পিছনে উমেশ, রমেশ ও পরেশের চূড়ান্ত বোকামি ও অজ্ঞতা ঘটনার মধ্য দিয়ে (২।৩ দৃশ্য) প্রকাশিত হয়ে পড়ায় এই হাস্যরসের ব্যাপ্তি আরও ছড়িয়ে পড়েছে। বিলাত ফেরতা ব্যারিস্টার চম্পটি সাহেবের অসংলগ্ন আচার-আচরণ প্রকাশ করে ও তার কথার মধ্যে চরিত্রের মূর্খতার পরিচয় (১।৩ দৃশ্য) দান করে নাট্যকার এই হাস্যরসের ধারাকে যেমন অব্যাহত রেখেছেন তেমনি বিধবা বিবাহের নামে চম্পটি সাহেবের বিধবাদের সম্পত্তি হরণের অসৎ প্রবৃত্তিকে (২।৬) নাট্যকার হাস্যচ্ছলে তীব্র শ্লেষাঘাত করেছেন।[১৬৪] ইংরাজী

ঘ. অলকা—তদন্তর শুভসংবাদ শ্রবণে দাদামহাশয় তেলেবেগুনে জ্বল-জ্বলায়মান, পিসিমাকে বিধবা বাক্যবান, পিসিমার সুদ সমেত প্রতিদান, ক্রমে গর্জনান্তে বর্ষণ, উভয় অমর্ষনের নির্জনে অশ্রু বিসর্জন শ্রবণে দম্পতির ভাবোচ্ছাস, বেগে প্রবেশ ও চরণতলে পতন। (প্রথম অংশ, প্রথম দৃশ্য—'নবযৌবন'।)

ঙ. মেয়েটি কিছু মন্দ মন্দ
যেন ফুলের মধ্যে রাধাপদ্ম।
রংটা কিছু চড়া চড়া, গন্ধ কিছু চড়া চড়া
পাপড়ী কিছু ছাড়া ছাড়া, যেন ফুটতে ফুটতে বন্ধ।
(দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য—'নবযৌবন'।)

শিক্ষায় শিক্ষিত স্ত্রীর আজ্ঞাবহ ব্যক্তিহিসাবে উমেশ কর্তৃক তার পৌরুষ ব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দেওয়া (২।৩), বল্লভবাবুর প্রতি রমেশের স্ত্রী সুবেশিনীর বিশেষ আসক্তি প্রদর্শনের ফলে রমেশের বিহ্বল অবস্থা (২।৩), স্বামীদের নিষেধ না মেনে স্ত্রীদের পার্টিতে যোগদানের প্রচেষ্টা, কর্মক্লান্ত ও ক্ষুধাতুর উমেশের ক্ষুধা নিবৃত্তির আয়োজন না করে সুকেশিনীর হ্যামলেটের স্বগতোক্তি পাঠে ব্যস্ত থাকা (১।৪)—এ সকল ঘটনার উপস্থাপনায় দ্বারাও নাট্যকার হাস্যরসের যোগান দিয়েছেন।

কখনো কখনো সংলাপের মধ্যে কৌতুক সৃষ্টি করে,[ক] চরিত্রের মানসিক অবস্থা বর্ণনার সময় বিশিষ্ট শব্দ চয়ণ ও উপমার ব্যবহার করে[খ] সংলাপের পদান্তে মিল করে কাব্যিকভাবের দ্যোতনার সাহায্যে,[গ] এবং অনুপ্রাস অলঙ্কারের মাধ্যমে (১'৫) নাটকের হাস্যরসকে দীপ্ত করে তোলা হয়েছে।

নাটকে প্রস্তাবনার গান সহ মোট এগারোটি গান বর্তমান। গানের দ্বারা স্বদেশী রীতি-নীতি বর্জনকারী নব্য হিন্দুদের চরিত্রের ত্রুটি ও অসংগতির প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হয়েছে। এর মধ্যে "আমরা বিলেত ফেরতা কভাই" (১।৩), কটি নবফুল কামিনী (১।৪), 'চপট চপট চপটির দল আমরা সবে' (১।৬)—এ সকল গান উল্লেখযোগ্য। মনুষ্যত্ববোধে উদ্দীপ্ত পৌরুষ ব্যঞ্জক জীবনের আদর্শই ছিল নাট্যকারের বীজমন্ত্র-

ক. উমেশ—আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছো কি, চাবি কি আমার মুখে আছে ?

সুকেশিনী—আগে চাবি আঁচলে বাঁধা থাকত, এখন ত আর আঁচল নেই বাঁধি কোথায় ?

…রোস, এবার শাড়ির একটা পকেট করে নিচ্ছি।—প্রথম অংক, চতুর্থ দৃশ্য, প্রায়শ্চিত্ত।

খ. ইন্দুমতি—আমি যেন কি রকম হয়েছি—

সরোজিনী—কি রকম হয়েছ ?

ইন্দুমতি—কি রকম হইছি জানো ? যেমন শীতকালে আমড়া গাছের পাতা থাকে না, গ্রীষ্মকালে বেহার অঞ্চলের মাঠে ঘাস থাকে না, কলকাতার রাস্তায় রাস্তা থাকে না—অনেকটা সেইরকম… প্রথম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, প্রায়শ্চিত্ত।

গ. ইন্দুমতি—সখি ধর ধর—

সরোজিনী—কেন কেন সখি এ ভাব নিরখি, কেন কেন তুমি এমন কর ?

ইন্দুমতি—বসন্ত আসিল শীত অন্ত করি।

সরোজিনী—সে যে ছিল ভালো এবে ঘেমে মরি।

—প্রথম অংক, পঞ্চম দৃশ্য, প্রায়শ্চিত্ত।

স্বরূপ। এর বিচ্যুতি নাট্যকারের বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়াত। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অর্থমুখী মানুষের মনুষ্যত্বহীনতা ও হৃদয়বৃত্তির শূন্যতা নাট্যকারকে বেদনাহত করে তুলেছে। নাটকের মাধ্যমে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের আড়ালে ও নাট্য-সংগীতের মধ্যে (ইন্দুমতীর সংগীত—'কেন খুঁজতে যাসরে বিমল প্রেম এ জগতে ভাই'-২।৬) নাট্যকারের এই বেদনাবোধ মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।[১৬৫]

আনন্দ বিদায়ঃ (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ঃ ১৬-১১-১৯১২ ক্লাসিক)

নৃত্য গীত ও কাব্যবিশারদ নেপাল কর্তৃক সনাতন হিন্দুধর্মের পরিবর্তে নব্যহিন্দু ধর্মের প্রবর্তন ও বর্ষীয়ান মল্লিকার সঙ্গে নেপালের শুভ পরিণয় উদ্‌যাপন—এই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে "আনন্দ বিদায়ের" কাহিনী বিন্যস্ত। এতে দুটি অংক ও আটটি দৃশ্য বিদ্যমান। প্রথম অংকে বঙ্গমাতার আহ্বানে সাহিত্যের মাধ্যমে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের জন্য কবি নেপালের চট্টগ্রাম থেকে বঙ্গদেশে আগমনের ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে বঙ্গদেশে কবিরূপে নেপালের খ্যাতি অর্জন ও নব্যহিন্দু ধর্মের প্রতিষ্ঠার পর মল্লিকার সঙ্গে তার মিলনের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে।

প্রস্তাবনা দৃশ্যে নাট্যকার প্যারডি ও প্রহসনের সংমিশ্রণে গঠিত "আনন্দ বিদায়"-কে অভিনব নাটিকা রূপে চিহ্নিত করেছেন এবং এর মাধ্যমে কাব্যের মধ্যে প্রবিষ্ট কু-নীতিকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপের সাহায্যে কশাঘাত করার মনোবাসনা ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের মাধ্যমে নেপাল চরিত্রের ত্রুটি বিচ্যুতি ও অসঙ্গতিকে তুলে ধরতে গিয়ে নাট্যকারের অসংযমী মাত্রাজ্ঞান 'আনন্দ বিদায়' রূপ 'অভিনব নাটিকা'কে ব্যক্তিগত আক্রমণের মুখপাত্র করে তুলেছে। নাটকের ভূমিকায় নাট্যকার বলেছেন একশ্রেণী কবির রুচিহীন কাব্যকে আক্রমণ করা ন্যায়সঙ্গত[ক]। 'আনন্দ বিদায়ের' মাধ্যমে সর্বৈবভাবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভা এবং তাঁর জীবন-দর্শনকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপের দ্বারা জর্জরিত করা হয়েছে।[খ] এটা আদৌ ন্যায়সঙ্গত হয়ে ওঠেনি। স্থানে স্থানে কবিগুরুর

ক. একজন কবি অপর কোন কবির কোন কাব্যকে বা কাব্যশ্রেণীকে আক্রমণ করিলে যে তাহা অন্যায় বা অশোভন হয় তাহা আমি স্বীকার করি না। বিশেষতঃ যদি কোন কবি কোনরূপ কাব্যকে সাহিত্যের পক্ষে অশোভন মনে করেন তাহা হইলে সেরূপ কাব্যকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য ॥

—ভূমিকা। 'আনন্দ বিদায়'।

খ. সকলি সম্ভবে কলিকালে
ভূমিশূন্য রাজা, বিদ্যাবিহীন হাকিম,
নিরক্ষর কাব্যবিশারদ
বিষয়ী মহর্ষি। —প্রথম অংক, তৃতীয় দৃশ্য। 'আনন্দ বিদায়'।

দেহাকৃতি ও বাচনভঙ্গীমার প্রতি কটূক্তি করে নাট্যকার তাঁর রুচিহীনতার পরিচয় দিয়েছেন।[গ]

স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের 'গীতোচ্ছ্বাস' কবিতা ও 'হৃদয়াসন' কবিতার দুই একটি চরণ ব্যবহার করা হয়েছে।[ঘ] এ সকলের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার প্রতি তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং তাঁর কবিতার অন্তর্নিহিত ভাববস্তুর ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তীব্র কটাক্ষপাত করা হয়েছে।[ঙ] আবার রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতানের' মূলত 'প্রেমপর্ব' ও 'বিচিত্র পর্ব'-তে সংকলিত গানের অনুকরণে ব্যঙ্গগীতি রচনার মাধ্যমে[চ] কখনো বা 'নাট্যগীতি পর্ব' এবং প্রেম পর্বের

গ. দুঃখের কথা বলব কত
ছেলেটা বিগড়েছে কাকা
আছে নাকি সুরে কথা,
আর লম্বা চুল রাখা··· —প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, 'আনন্দ বিদায়'।

ঘ. (১) 'চুম্বন এসেছে তার কোথা সে অধর'
—প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, 'আনন্দ বিদায়'।
(কড়ি ও কোমলের গীতোচ্ছ্বাস কবিতার অংশ, পৃষ্ঠা-৪৮, সঞ্চয়িতা ১৯৬১, কলিকাতা)

(২) কোমল দুখানি বাহু শরমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়
—প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, 'আনন্দ বিদায়'।
(কড়ি ও কোমলের হৃদয়াসন কবিতার অংশ। পৃষ্ঠা-৫১, সঞ্চয়িতা, ১৯৬১, কলিকতা)

ঙ. মল্লিকা—এর মানে এই রকম কিছু একটা হবে যে ভিতরে সসীম, বাহিরে অসীম। কিম্বা ভিতরে শান্তি, বাহিরে কর্মফল, কিম্বা ভিতরে আত্মা, বাহিরে পরমাত্মা, কিম্বা, কিম্বা, কিম্বা···
—প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, 'আনন্দ বিদায়'।

চ. গীতবিতানের গান	নাটকে বিন্যস্ত ব্যঙ্গগীতি
১. এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি (প্রেমপর্ব, ৩৬৭ নং পৃষ্ঠা ৪১৫)	এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু কাব্য পড়েছি। (প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য)
২. সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে (প্রেম পর্ব, ১৪০ নং, পৃষ্ঠা ৩২৬)	সে আসে ধেয়ে, এন. ডি, ঘোষের মেয়ে (প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য)
৩. আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি তুমি অবসর মত বাসিয়ো (প্রেমপর্ব, ১৪৩ নং, পৃষ্ঠা ৩২৭)	আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি, তুমি Leisure মাফিক বাসিও (প্রথম অংক, তৃতীয় দৃশ্য)

গানের দুই এক পঙ্‌ক্তির ব্যবহারের দ্বারাই কবির গীতি-সত্তার প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করা হয়েছে (২।১ দৃশ্য)। নাটকে সনাতন হিন্দু ধর্মের ভণ্ডামির প্রতি নাট্যকারের শ্লেষাঘাত থাকলেও (১।২ দৃশ্য) মূলত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুশীলিত ব্রাহ্মধর্ম ও নব্য হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে (২।৩)। অপ্রয়োজনীয় ও অসংলগ্ন ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে নাট্যকার ব্যক্তিগত আক্রমণের লক্ষ্যপূরণে অধিক যত্নবান হয়েছেন। এর ফলে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও উপহাসের মাধ্যমে যে হাস্যরসের অবতারণা করা হয়েছে তা রসহীন হয়ে পড়েছে।[১৬৬] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে প্রহসনের মধ্যে অশ্লীলতা ও কুরুচির প্রাধান্য দেখে ব্যথিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রহসন রচনায় অগ্রসর হন।[১৬৭] সেক্ষেত্রে এ ধরণের হাস্য-রসাত্মক 'অভিনব নাটিকা'-টি তাঁর উদ্দেশ্য ও কার্যের মধ্যে বৈপরীত্যের সৃষ্টি করেছে।

দাদা ও দিদি ॥ (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)

দেশনেতার দেশপ্রেম না থাকলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে দশটি দৃশ্যে নাট্য কাহিনী রচিত হয়েছে।

প্রথম থেকে পঞ্চম দৃশ্যের মধ্যে চন্দ্রদ্বীপের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য তক্ষকের নেতৃত্বে চন্দ্রদ্বীপবাসীদের শস্যশ্যামল হট্টমালার দেশে আগমনের ঘটনা দেখান হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে দশম দৃশ্যের মধ্যে হট্টমালার দেশের নেতার দেশপ্রেমহীনতার সুযোগে কূটকৌশলে তক্ষক কর্তৃক হট্টমালা দেশের স্বাধীনতা হরণের ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে। নাটকে একটি প্রস্তাবনা দৃশ্যও আছে। এর

---

৪. কেন যামিনী না যেতে জাগালে না বেলা হল মরি লাজে শরমে জড়িত চরণে কেমনে চলিব পথের মাঝে।	কেন যামিনী না যেতে জাগালে না বেলা হল মরি লাজে আলু থালু কবরী আবরি এই আলু থালু সাজে
(প্রেম পর্ব, ১২৪ নং, পৃষ্ঠা ৩২০)	(প্রথম অংক, তৃতীয় দৃশ্য)
৫. হারে রে রে রে রে আমায় ছেড়ে দেরে দেরে যেমন ছাড়া বনের পাখী মনের আনন্দরে।	ওরে রে রে নেপাল আমার কলিকাতায় যাবি রে গিয়ে দেখছি নিশ্চয়ই তুই পক্ষি মাংস খাবি রে ॥
(বিচিত্রপর্ব, ৪৮ নং) পৃষ্ঠা ৫৬৫,	(প্রথম অংক, চতুর্থ দৃশ্য)
ছ. বধু তোমায় করব রাজা তরু তলে	প্রেমপর্ব, (৩৬৮ নং, পৃঃ, ৪১৫,) ১ম অংক, ৩য় দৃশ্য।
ওগো তুমি কোন কাননের ফুল	(ঐ ৩৬৩ নং, পৃ, ৪১৩,) ঐ
ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে	(নাট্যগীতি, ৩৩ নং, পৃ, ৭৮০,) ঐ

মাধ্যমে প্রেমযোগ ও কর্মযোগের সমন্বয়ে দেশের শ্রীবৃদ্ধি করার জন্য নাট্যকার দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত কাহিনীর আড়ালে ব্যবসা বাণিজ্যের নামে ইংরেজদের ভারতবর্ষে আসা এবং ভারতীয় নেতৃত্বের পরশ্রীকাতরতা, কর্ম-বিমুখতা ও দেশপ্রেমহীনতার সুযোগে ইংরেজদের হাতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার ঘটনার প্রতি নাট্যকার দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। নাট্য-ঘটনার সুষ্ঠুবিন্যাসের অভাবে নাট্যকারের বক্তব্য যুক্তি সঙ্গত ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। তবে নাট্যকার একদিকে শ্লেষ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেশের শাসন কর্তার আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দেশবাসীকে ওয়াকিবহাল করে তুলেছেন,[ক] অন্যদিকে দেশপ্রেমহীনতার জন্য দেশীয় রীতিনীতিকে বিসর্জন দিয়ে বিদেশীয় ভাবধারার প্রতি দেশবাসীর উম্মাদনার মানসিকতাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন।[খ] এতে মোট ষোলটি গানের অবতারণা করা হয়েছে। এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপের অন্তরালে দেশের সর্বনাশা অবক্ষয়ের জন্য নাট্যকারের সুগভীর বেদনাবোধের পরিচয় গানের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে।[গ]

ভূতের বেগার : (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)

কৃষিকার্যের দ্বারাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব। এই বিষয়বস্তুকে নিয়ে দুটি অংকে ও বারোটি দৃশ্যে নাট্যকাহিনী গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে গ্রামের জমিতে কৃষিকার্য না করে শহরে এসে সাহেবের অধীনে আনন্দের চাকরি গ্রহণ ও

ক. তক্ষক—"জিজ্ঝাংষা, জুগোপিষা, চিকিৎসা, বিজিগিষা,…এই আমাদের মূলমন্ত্র। জিজ্ঝাংষা অর্থাৎ কিনা জিগাংষা অর্থাৎ মূলমন্ত্র হচ্ছে সংহার, সব খেতে হবে। এখানকার মাটি থেকে আরম্ভ করে মানুষ, পশু, পক্ষী, ঘরবাড়ী… নীচে চতুষ্পদের মধ্যে তক্তপোষ পর্যন্ত উদরগত করে হট্টমালার নাম সুধা দিয়ে গণ্ডূষ করতে হবে। জুগুপিষা অর্থাৎ মূলমন্ত্র গোপন করতে হবে। চিকিমিষা অর্থাৎ চিকিৎসা, বোঝাতে হবে তোমাদের বিষম রোগ, তোমরা অসুখ না খেলে আর বাঁচবে না। আর যেমন অসুখ ধরা অমনি বিজিগিষা অর্থাৎ সমস্ত দেশটা বুঝেছ :"

—চতুর্থ দৃশ্য, দাদা ও দিদি।

খ. স্ত্রীগণ—আমরা সাজবো—অমনি করে সাজবো—আর আঁধারে থাকবোনা, হাতে গোবর মাখব না। হাঁড়িতে হাত দেব না, আকাশে দোল খাবো। বোতলে বাণ্ ডাকবো আর তেষ্টা পেলে ঢেউ খাবো। —ষষ্ঠ দৃশ্য, দাদা ও দিদি।

গ. যাই যাই চলে যাই আর হেথা ঠাঁই নাই
এরা আমায় ফেলে নেশার ঘোরে মেতেছে সবাই ।।
আমার সাধের যাঁতা, সাধের চাকা, সাধের চরকাখানি
আমার সাধের মাকু, সাধের হাল, সাধের নেই ছোঁনি
আমার সাধের সাথী তারা, আমার প্রাণের বোন ভাই—
তারাও চলে আমার সনে তাই—শোকের সীমা নাই।

—কমলার গান, তৃতীয় দৃশ্য, দাদা ও দিদি।

'মানিনী' গীতাভিনয় খুবই উল্লেখযোগ্য। এ সকল গীতাভিনয়ে যাত্রার চিরাচরিত রুচিহীন সংলাপ সংযোজনা এবং বিকৃত অঙ্গ-ভঙ্গীর স্থান ছিল না। ফলে সমাজের সকল স্তরের দর্শক দ্বারা এটা সমাদৃত হতে থাকে। ১৮৬৫ সনে বৌবাজারের বিশ্বনাথ মতিলালের বাড়িতে 'সাবিত্রী সত্যবানের' গীতাভিনয় ও এ বিষয়ে প্রশংসার দাবী রাখে। ঐ সময়ে গীতাভিনয়ের ক্ষেত্রে মনোমোহন বসুর নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি 'রামাভিষেক' প্রভৃতি অনেক গীতাভিনয় রচনা করেন। সে সব গীতাভিনয়ে গীত এবং সংলাপ অভিনয়ের ব্যবস্থা থাকত। সেগুলি ঠিক পাশ্চাত্য অপেরা জাতীয় নয়। "ঐ বৎসর বহুবাজারের রাজেন্দ্র দত্তের গৃহে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'পদ্মাবতী'র গীতাভিনয়ের দ্বারা 'নট-নটী', বিদূষক ও নায়ক নায়িকাগণ দর্শকবৃন্দের সর্ব বিষয়ে মনোরঞ্জন করিয়াছেন।"[১৭১] এ সকল গীতাভিনয়কে অনেকে গীতিনাট্যরূপে প্রকাশ করতে থাকেন ও গীতিনাট্যরূপে অভিনয়ও চলতে থাকে। কিন্তু নাটকের গঠনগত ও প্রকাশগত বৈশিষ্ট্যগুলি গীতাভিনয়ের মধ্যে থাকে না। গীতাভিনয়ে কোন বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে একটি কাহিনী রচনা করা হয় এবং সীমিত সংলাপ ও অধিক সংখ্যক সংগীতের দ্বারা এই কাহিনী বিন্যস্ত হয়। গীতাভিনয়ে হৃদয় বৃত্তির উচ্ছ্বাস ও ভাবাবেগ মুখ্য হয়ে ওঠে।[১৭২]

সংগীতে সুরের অখণ্ড প্রবাহকে বজায় রাখার জন্য দোহারের সাহায্য নেওয়া হয়। গীতি-নাট্যাভিনয়ের বিষয়বস্তুকে সকলের বোধগম্য করে তোলার জন্য চরিত্রের সংলাপের মাঝে মাঝে উক্ত বিষয় সম্পর্কে অধিকারীর ব্যাখ্যা, মন্তব্য ও বক্তৃতার উপস্থাপনাও করা হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক কাহিনীকে অবলম্বন করে গীতাভিনয়ের নাট্য বস্তু গড়ে ওঠে এবং এর মাধ্যমে ভক্তি ও করুণ রসের প্রাধান্যকে বজায় রাখা হয়। তবে সময় ও যুগের পরিবর্তনে মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন, যাত্রা এবং নাট্য দলের সাংগঠনিক বিষয়ে নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব,—এ সবের ফলে গীতাভিনয়ের রচনা ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও পুরাতন ধারার সংশোধিত রূপ লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। বিশ শতকের প্রথম থেকেই গীতাভিনয়ের মধ্যে প্রচলিত অধিকারীর বক্তৃতা পর্ব বন্ধ হয়ে যায় এবং গীতাভিনয়ে সংলাপের প্রাধান্য বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে প্রাচ্য গীতাভিনয় এবং পাশ্চাত্য অপেরা সমগোত্রীয় নয়। হরিমোহন রায় তাঁর 'মানিনী' গীতাভিনয়ের ভূমিকায় এ প্রসঙ্গে বলেন 'অপেরা অর্থাৎ বিশুদ্ধ গীতিকা এ পর্যন্ত কেহ প্রণয়ন করেন নাই। ...আমি 'জানকী বিলাপ' নামে একখানি গীতিকা রচনা করি। স্বর্গীয় বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক মহাশয়...উৎসাহের সহিত উক্ত গীতিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। ফলতঃ তৎকালে 'জানকী বিলাপ' খানি কথঞ্চিৎ অপেরার আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল। রচনা কৌশল ও প্রয়োগ ব্যবস্থার দিক থেকে অপেরা ও গীতাভিনয় ভিন্ন প্রকৃতির। গীতাভিনয়ে সংগীতের উপর জোর দেওয়া হয় এবং অভিনয়ের সুযোগের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়। অভিনয়কালে চরিত্র ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন সনাতন ধারণা, পরবর্তী সম্ভাব্য ঘটনা ও ঘটনার পরিণতির ইঙ্গিত গানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। উন্মুক্ত আসরেই এই গীতাভিনয়ের ব্যবস্থা করা

হোত। পাশ্চাত্য নাটকে Interlude Play-র মধ্যে গীতাভিনয়ের মত এমন সহজ সরল প্রযোজনার পরিচয় পাওয়া যায়।[১৭৩] অপেরা শুধুমাত্র সংগীত ও অভিনয় সর্বস্ব নয়। এতে এককগীতি, দ্বৈতগীতি ও সমবেত গীতি যেমন থাকে তেমনি অভিনয় ও নাটকের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য এতে একই সঙ্গে আলংকারিক সংলাপের সাহায্যে অভিনয়ের ব্যাপ্তিকে বৃদ্ধি করা হয়, সূক্ষ্ম অভিব্যক্তির সুষ্ঠু প্রকাশের জন্য মূকাভিনয়ের উপস্থাপনা করা হয়, নৃত্যের মাধ্যমে অভিনেতার শারীরিক গতিভঙ্গীমাকে সমৃদ্ধ করে তোলা হয়। এতদ্ব্যতীত উন্নত আলোক ব্যবস্থা, দৃশ্য সজ্জা ও অঙ্গসজ্জার সহায়তায় প্রয়োগগত নৈপুণ্যকে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। অপেরার এই বিশিষ্ট দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে George Mortin—এ প্রসঙ্গে বলেছেন—"Opera set out merely to tell a dramatic story about persons in terms of music."[১৭৪]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে নাট্যক্রিয়াকে ছন্দোময় ও গতিময় করে তোলার জন্য, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন প্রকার ইঙ্গিতবাহী সঞ্চালনের সাহায্যে অপেরায় বিষয়বস্তুকে দৃশ্যময় ও দীপ্তময় করার উদ্দেশ্যে এতে বিভিন্ন প্রকার ব্যালে নৃত্যেরও প্রয়োগ করা হয়। [১৭৫] প্রাথমিক অবস্থায় গ্রীসদেশের সংগীত মুখ্য নাট্যরচনা ও পরিবেশনার প্রভাবেই পরবর্তী কালে ইটালী, ফরাসী ও ইংলণ্ডে বিভিন্ন প্রকার অপেরাদল বৃহৎ আকারে সংগঠিত হয়ে ওঠে।

বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে যে সকল গীতাভিনয় ও গীতিনাট্য রচিত ও প্রযোজিত হতে থাকে তার মধ্যে আদর্শায়িত গীতিনাট্য ও গীতাভিনয়ের রূপ পাওয়া যায় না। সে সময় একই দিনে তিনটি বা চারিটি করে নাটক মঞ্চে উপস্থিত করা হোত। তখন বড় বড় নাটকের মাঝে সময়ের ফাঁককে পূর্ণ করার জন্য বা একটা নাটক শেষ হলে পরবর্তী নাটক মঞ্চায়িত করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় সময় গ্রহণের অবসরে এ সকল গীতাভিনয় ও গীতিনাট্যের প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হোত। এরদ্বারা দর্শক-মনের একঘেয়েমিতাকে যেমন দূর করা হোত তেমনি সামগ্রিকভাবে সেদিনের প্রযোজনার মধ্যে বিচিত্র রসের সঞ্চার করে নাট্যশালা ও প্রযোজনার প্রতি দর্শকদের আকর্ষণ বাড়ানো হোত। একটি বা দুইটি নাটক একদিনে দেখতে এসে গীতিনাট্যের রস আস্বাদন করা দর্শকদের নিকট উপরি পাওনার মত ছিল। আবার সময় বিশেষে দুটি বা তিনটি বিভিন্ন রসের গীতিনাট্যের প্রয়োগের ব্যবস্থাও করা হত।

● গীতিনাট্যের গঠন রীতির পরিচয় :

বৃন্দাবন বিলাপ : (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : ২৫-১২-১৯০৩ : স্টার)

বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের মিলন—এই মূল ভাবকে অবলম্বন করে চারটি অংকে এবং মোট চৌদ্দটি দৃশ্যের দ্বারা গীতিনাট্যটি রচিত হয়েছে। প্রথম অংকে কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের আশায় রাধার যমুনায় স্নান করতে যাওয়ার ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে কদম্বতলে কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা রাধার তন্ময়তার কাহিনী বিন্যস্ত।

তৃতীয় অংকে কৃষ্ণের পাদপদ্মে রাধার সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নিবেদনের কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। চতুর্থ অংকে রাধাকৃষ্ণের মিলনের ঘটনা সহ কালিভক্ত আয়ান কর্তৃক কৃষ্ণের মধ্যে কালিরূপ দর্শনের ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যেই নারদ ও বৃন্দার পারস্পরিক সংগীত ও সংলাপের মাধ্যমে নাটকের মূল উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়েছে। মোট চুয়ান্নটি গানের মাধ্যমে নাটকে শৃঙ্গার, ভক্তি ও বাৎসল্য রসের বিস্তৃতি ঘটেছে। এর মধ্যে একক গীতি ছাড়া, দ্বৈতগীতি (৪।১, ৪।৫ দৃশ্য), কোরাস গান (৩।২, ৪।৫ দৃশ্য) বিদ্যমান। মূলত গানের মাধ্যমেই রাধা ও কৃষ্ণপ্রেমের পূর্বরাগ-অনুরাগ-বিরহ-যন্ত্রণার অবস্থা, চরিত্রের মনোভাব ও আবেগ (১।৩, ২।৪, ৩।১, ৪।২ দৃশ্য) প্রকাশিত হয়েছে। রাধা ও কৃষ্ণের একাত্ম ভাবময় অবস্থার রূপারোপ পারস্পরিক সংগীতে মধ্য দিয়ে (৪।৫ দৃশ্য) রস ঘন হয়ে উঠেছে।[ক]

অনেক সময় প্রথমে গদ্য সংলাপের দ্বারা চরিত্রের মানসিক অবস্থা প্রকাশের পরে গানের মাধ্যমে সংলাপ কথিত সেই ভাবের বিস্তার করা হয়েছে। যেমন—

রাধা—কই আর ত দেখতে পাচ্ছি না…অভাগিনী
রাধার প্রতি বিধাতা কি এতই সুপ্রসন্ন ?

গীত

দাঁড়াইয়া তরুমূলে আকুল করিল মোরে,
ঈষৎ বঙ্কিম দিকে চেয়ে।
ঘরে যেতে না লয় মন, যাক জাতি কুলধন
চিক্কণ শ্যামের বালাই লয়ে ॥

—তৃতীয় অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য।

এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অংকের চতুর্থ দৃশ্যের সংগীতের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে।[খ]

ক. রাধা—শ্যামসুন্দর শরণ আমার,
শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণ ধন
শ্যাম যে গলার হার ॥
শ্যাম ঃ তুমি ভিন্ন গতি নাই—

কৃষ্ণ—আমারই বা কই রাই ;
উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী হইল সারা
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন
কিশোরী নয়নতারা ॥

—চতুর্থ অংক, পঞ্চম দৃশ্য।

খ. বৃন্দা—যাই একবার দেখে আসি। মদনমোহনের মূরতির আভাসে বৃন্দাবনেশ্বরীর কি রূপশ্রী হয়েছে একবার দেখে আসি…কৃষ্ণ দর্শনে আত্মহারা মদালসা প্রেমময়ী ব্রজেশ্বরী আমার চোখের ওপরে জ্বল জ্বল করছেন।

মদন লালস বিভোরা
দেখ দেখ রাধা রূপ অপারা
অপরূপ কো বিধি আনি মিলায়ল
ভূমিতলে লাবণি সারা…

—দ্বিতীয় অংক, চতুর্থ দৃশ্য।

চরিত্রের পারস্পরিক প্রশ্ন ও উত্তর গানের মাধ্যমেই সংকলিত হয়েছে।[গ]

স্থানে স্থানে চরিত্রের মানসিক অবস্থার গতিপ্রকৃতি প্রকাশের ক্ষেত্রে গদ্য সংলাপই সুরে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সংলাপের বিন্যাস সেখানে সংগীতের মতন ছন্দোবদ্ধ হয়ে ওঠে নি, কিন্তু সুরের আলাপনে তা সংগীতের রস মাধুর্য্য লাভ করেছে।[ঘ] গীতিনাট্যের মধ্যে কোথাও কোথাও সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশিত মনোভাবকে পুনরায় গদ্যসংলাপের সাহায্যে ব্যক্ত করার ফলে নাট্যকাহিনীর বিন্যাসে একঘেয়েমিতার সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর ফলে গীতিনাট্যের ভাব গভীরতাও ক্ষুণ্ণ হয়েছে (১।১ নারদের গান)। সংগীত রচনার ক্ষেত্রে গোবিন্দ দাসের বৈষ্ণব পদাবলী সংগীতের মূল রচনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।[ঙ] রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনার জন্য রচিত সংগীতের সুর লালিত্যে যেমন কীর্ত্তনাঙ্গ সুরের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় তেমনি

গ. সুবল—তাহলে এিক দেখলুম সখা ?
কৃষ্ণ—কি দেখলে ?
সুবল—নীরদ নয়নে নবঘন সিঞ্চনে
আকুলি বিকুলি কেন হও হে।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
কি নব ভাবে ডুবে রও হে ॥···
কৃষ্ণ—তবে আমি কি দেখলুম
সুবল—কি দেখলে
কৃষ্ণ—অপরূপ পেখনু রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল
হরিনী হীন ক্ষীণ ধামা ॥··· —দ্বিতীয় অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য

ঘ. সুবল—ওকি ভাই কানাই।···দেখ বিন্দা দেখ···রাই বিরহে কি হয়েছে কানাই দেখ।···

কৃষ্ণ—কোথা রাই ঃ কোথা রাই ঃ (সুরে কথা)
—চতুর্থ অংক, প্রথম দৃশ্য।

ঙ. চাঁচর চিকুর, চূড়োপরি চন্দ্রক,
গুঞ্জা মঞ্জল মাল।
পরিমল-মিলিত ভ্রমরী কুল আকুল
সুন্দর বকুল গুলাল ॥
বিম্বাধর পরি মোহন মুরলী ধর,
পঞ্চম রমই রসাল।
গোবিন্দ দাস পহু নটবর শেখর
শ্যামল তরুণ তমাল ॥ —প্রথম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য।

কালিভক্ত আয়ানের সংগীতের মধ্যে রামপ্রসাদী সুরের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়।চ এই গীতিনাটকের কোন কোন সংগীত অবস্থাবিশেষে দীর্ঘকায় রূপ ধারণ করেছে। এ প্রসঙ্গে ১।১ দৃশ্যে 'রতিরণরঙ্গভূমি বৃন্দাবন', ১।২ দৃশ্যে 'চলতি রামসুন্দর শ্যাম', 'যাদুমোর নয়ণের তারা', আমার শপথ লাগে, না ছুটো ধেনুর আগে—৩।১ দৃশ্যে 'গুন গুন রবে কত কি যে বলে গো কানের নিকটে এসে বলে', ৪।৫ দৃশ্যে রাধাকৃষ্ণের দ্বৈতগীতি—ইত্যাদি গান খুবই উল্লেখযোগ্য।

বরুণা: (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ: ১১-৭-১৯০৮ কোহিনুর)

মিলনের মাধ্যমে একনিষ্ঠ প্রেম সার্থক হয়ে ওঠে। এই মূল ভাবকে আশ্রয় করে তিনটি অংকে ও আঠারটি দৃশ্যের দ্বারা গীতিনাট্যটি গঠিত হয়েছে। প্রথম অংকে বনমধ্যে কিরাতের ঘরে পালিতা বরুণার সঙ্গে কঙ্কণ রাজপুত্র পুণ্ডরিক্ষের প্রেমের পূর্বরাগের ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে কঙ্কণ রাজগৃহে বরুণার আগমন এবং কঙ্কনরাজের কাছে পুণ্ডরীক্ষ কর্তৃক বরুণাকে বাগদত্তা হিসাবে গ্রহণ করার স্বীকারোক্তির ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় অংকে পুণ্ডরীক্ষ কর্তৃক কেরল রাজকুমারীরূপে বরুণার আসল পরিচয় লাভ এবং পুণ্ডরীক্ষের সঙ্গে তার বিবাহের ঘটনা গ্রথিত হয়েছে।

মিলনের মাধ্যমে পুণ্ডরীক্ষ ও বরুণার প্রেমের সার্থকতা লাভের মূল কাহিনী ভিন্ন নাটকে অভিরাম-মাধবীর প্রণয়মূলক একটি উপঘটনা বিদ্যমান। মূলতঃ এ নাটকও সংলাপ প্রধান। তথাপি নাটকে মোট বাইশটি গান আছে। মিলন ও বিরহ তথা আনন্দ ও বেদনার মধ্য দিয়েই প্রেম সার্থক হয়ে ওঠে—নাটকের প্রস্তাবনা গীতির মাধ্যমে এই সত্যের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। সংলাপ প্রধান হলেও স্থান বিশেষে চরিত্রের মনোগত ভাব প্রকাশের জন্য এ নাটকেও সংগীত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে 'শত প্রেমিকার প্রাণের গরিমা আমি পূর্ণিমার শশী' (১।৪ দৃশ্য), 'প্রাণ নেবো একথা প্রাণ কয়ো না' (১।৪ দৃশ্য), (বধূ) নাগাল আর পেলেম রে তোর কই' (২।৬), পথে কেঁদে ওকে চলেছে' (৩।৪ দৃশ্য) এ সকল

চ. আয়ান—কাজ কি আমার কোশাকুশী, আয় মন বিরলে বসি,
ভাব শ্যামা এলোকেশী, বারাণসী পাবিরে।
ভস্ম মাখা ত্রিলোচন, শিবের কোন পুরুষে ছিল ধন।
শ্যামা নির্ধনের ধন, তাই সদা জপরে।।
—দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য, বৃন্দাবন বিলাপ।

আমি কি আটাশে ছেলে
মায়ে পোয়ে ডিক্রী লব এক মওয়ালে।।
আমি ক্ষান্ত হব, যখন আমায়—
শান্ত করে লবে কোলে।। ঐ।

গান উল্লেখযোগ্য। কোথাও কোথাও সংগীতের সাহায্যে বিষয়বস্তুর ভাব বিস্তারের পর, পরবর্তী সংলাপে সেই একই বিষয়বস্তুর অবতারণার ফলে গীতিনাট্যটি পৌণঃপুনিকতা দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছে এবং সেক্ষেত্রে গানের ব্যবহারিক গুরুত্বও ক্ষুণ্ন হয়েছে।ক

বেদৌরা : (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : ২৫-১২-১৯০৮ স্টার)

বেদৌরা ও কমরলজানের প্রণয়ঘটিত কাহিনী অবলম্বনে পাঁচটি অংকে ও চব্বিশটি দৃশ্যে গীতিনাট্যটি রচিত হয়েছে। প্রথম অংকে বেদৌরা ও কমরলজানের পারস্পরিক প্রণয়াসক্তির ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে বেদৌরার প্রকৃত সামাজিক পরিচয় সম্পর্কে কমরলজানের অবহিত হওয়ার ঘটনা উপস্থাপিত করা হয়েছে। তৃতীয় অংকে বেদৌরাকে লাভ করার জন্য কমরলজানের চৈনিক রাজ্যে গমন ও তথায় উভয়ের পরিণয়ের ঘটনা গ্রথিত হয়েছে। চতুর্থ অংকে বেদৌরাকে নিয়ে রাজ্যে প্রত্যাগমনের সময় দানহাসের কৌশলপূর্ণ প্রতারণার ফলে উভয়ের পারস্পরিক ছাড়াছাড়ি হওয়ার ঘটনা বিধৃত হয়েছে। পঞ্চম অংকে বেদৌরা ও কমরলজানের পুনর্মিলনের ঘটনা গ্রথিত হয়েছে।

এই গীতিনাট্যটিও সংলাপ প্রধান। তথাপি গীতিনাট্যের বিন্যাসে দুটি দ্বৈতগীতিসহ মোট উনিশটি গান বিদ্যমান। হায়তন ও বেদৌরার দ্বৈতগীতি (৫।৩ দৃশ্য) এবং দানচাস ও মৌসুমির দ্বৈতগীতি, উক্তি প্রত্যুক্তি সহযোগে গঠিত। নাট্য-কাহিনী বিন্যাসে নাট্যকার অতিচারী কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

কিন্নরী : (ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : ১৭-৪-১৯১২ মিনার্ভা)

বাসনার সঙ্গে কর্ম্মপ্রচেষ্টা যুক্ত হলে অভিষ্ট ফল লাভ হয়। এই মূল ভাবকে কেন্দ্র করে তিনটি অংকে ও আঠারোটি দৃশ্যে গীতিনাট্যটি গঠিত হয়েছে। প্রথম অংকে কিন্নর কন্যা ভদ্রার পতি রূপে মানব সন্তানকে পাবার বাসনার প্রকাশ এবং কিন্নর-বংশদ্ভূত দেবকুমারকে বিয়ে করতে রাজী না হওয়ায় ভদ্রার নরলোকে নির্বাসন লাভের ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে বিন্ধ্য রাজকুমার সুধনকে ভদ্রার পতিত্বে বরণের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। তৃতীয় অংকে ভদ্রার সতীত্বে ও সুধনের পৌরুষ ব্যঞ্জক একনিষ্ঠ প্রেমে মুগ্ধ ব্রহ্মদত্ত কর্তৃক সুধনকে জামাইরূপে স্বীকৃতি দানের ঘটনা উপস্থাপিত করা হয়েছে। নাটকের বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিতবাহী একটি প্রস্তাবনা

ক. বরুণা—প্রাণ বলে আজ খেলবো খেলা
কার সঙ্গে কেমন রঙ্গে করবো কত মেলা ॥

খেলাতো খেলবো। প্রাণত খেলতে চায় কিন্তু কোথায় খেলি, আর কাকে নিয়ে বা খেলি।
—প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য, বরুণা।

দৃশ্যেও নাটকে বর্তমান। এ নাটকেও কাহিনী বিন্যাসে, চরিত্র চিত্রণে ও পরিবেশ রচনায় সংলাপের প্রাধান্য আছে। তথাপি প্রাবেশনাগীতিসহ মোট উনিশটি গান রচনার দ্বারা নাটকের মধ্যে গীতিনাট্যের পরিবেশকে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। নাটকে এককগীতি ছাড়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংকে মোট চারটি দ্বৈতগীতি, এবং প্রথম ও তৃতীয় অংকে সন্নিবেশিত মোট তিনটি সমবেত গীতি বিদ্যমান। প্রথম অংকের চতুর্থ দৃশ্যে নরলোকে নির্বাসন প্রাপ্ত ভদ্রার এককগীতির (সখীরে সজল চোখে চেয়ো না) দ্বারা বিদায়ের মুহূর্তকে রসঘন করে তোলা হয়েছে। আবার দ্বিতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে গীত ('ওই যে কুঞ্জের মাঝে আমার সেটি লুকিয়ে আছে')—এককগীতির দ্বারা ভদ্রা চরিত্রের মনোভাবের বিশিষ্ট দিকটি প্রকাশিত হয়ে উঠেছে। দ্বৈতগীতি-উক্তি প্রত্যুক্তি যোগে গঠিত। এই গীতিনাট্যে ভবিষ্যৎবাণীর ক্রিয়াশীলতা (১।১, ১।৯) ও বিভিন্ন প্রকার অলৌকিক ঘটনার সংযোজনায় (১।৪) গীতিনাট্য রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকারের পৌরাণিক মানসিকতার প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

মানকুঞ্জ : (অমরেন্দ্রনাথ দত্ত : ১০-৭-১৯০৪ ক্লাসিক থিয়েটার)

শ্রীকৃষ্ণকে অপর নারীর প্রতি আসক্ত ভেবে তাঁর প্রতি শ্রীরাধার মানাভিমানজনিত বিরহ যন্ত্রণা ভোগ ও পরে ললিতা, বৃন্দা ও পৌর্ণমাসীর সহায়তায় উভয়ের পুনর্মিলনের কাহিনী অবলম্বনে দুটি অংকে ও চারটি দৃশ্যে গীতিনাট্যটি রচিত হয়েছে। মূল কাহিনীর সঙ্গে কৃষ্ণ-চন্দ্রাবলীর প্রেম ভক্তির ঘটনাও স্থান লাভ করেছে। নাটকে মোট চব্বিশটি গান আছে। এর মধ্যে একক গীতি ছাড়া দ্বৈতগীতি (২।২ দৃশ্যে ললিতা ও কৃষ্ণ), সখীগণের গীতি (দ্বিতীয় অংকের ১ম, ২য়, ও ৪র্থ গান) বর্তমান। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে গানের মাধ্যমে রাধা-কৃষ্ণের পারস্পরিক মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।[ক] মনের ভাবকে আরও বিস্তৃত ও গভীর করে তোলার জন্য স্থানে স্থানে প্রথমে সংলাপের সাহায্যে মনোভাবকে প্রকাশিত করে পরে তা

ক. শ্রীকৃষ্ণ—রঞ্জিত চরণ চারু পড়েছে যমুনা জলে
পরম পুলকে তাই, বুঝিয়ে লহরী চলে
আধ চাঁদ নীলাকাশে
আধ অনুরাগে হাসে,
যমুনারি বুকে ভেসে সাথে লয়ে তারাদলে
পেয়ে পদছায়া তোর
প্রকৃতি আমোদে ভোর
কুসুমে মিশায়ে কয়ে (হায় :) লুটিছে চরণ তলে—
রাধা—তোমারি সুষমা লয়ে
আছি গরবিনী হয়ে
রবি ছবি হৃদে ধরে, বিভোরে চন্দ্রমা চলে ॥ (১ম অংক, ১ম দৃশ্য)

সংগীতের মাধ্যমে পুনরায় ব্যক্ত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমে অংকের চতুর্থ ও সপ্তম গানের প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য।খ

হরগৌরী : (গিরিশচন্দ্র ঘোষ : ৪-৩-১৯০৫ মিনার্ভা থিয়েটার)

দেশের অন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য কৃষিকার্যের উন্নতি ও এর ব্যাপক প্রয়োগ প্রয়োজন। এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে দুটি অংকে ষোলটি দৃশ্যে নাট্যকাহিনী রচিত হয়েছে। প্রথম অংকে পৃথিবীর অন্নাভাব দূর করার জন্য গৌরীর প্রেরণায় নন্দীভৃঙ্গিসহ মহাদেবের মর্তলোকে এসে কৃষিকার্যে আত্মনিয়োগের ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে কৃষিকার্যে মহাদেব অংশ গ্রহণ করায় পৃথিবীর অন্নাভাব দূর হওয়া এবং বহুদিনের বিরহ যন্ত্রণাভোগের পর হর-গৌরীর মিলনের কাহিনী গ্রথিত হয়েছে। গীতিনাট্যটি সংলাপ প্রধান। এতে মোট উনত্রিশটি সংগীত বিদ্যমান। তন্মধ্যে সমবেত গানের সংখ্যা ষোলটি এবং একক ও দ্বৈতগানের সংখ্যা যথাক্রমে নয়টি ও চারটি। গানের মাধ্যমে হরের বিচ্ছেদে গৌরীর বিরহ-বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে প্রথম অংকের তৃতীয় দৃশ্যের ও অষ্টম দৃশ্যের সংগীতের কথা উল্লেখযোগ্য।ক আবার উক্তি প্রত্যুক্তি সহযোগে গান রচনার দ্বারা চরিত্রের মনোভাবকে ব্যক্ত করা হয়েছে।খ কাহিনীর মধ্যে নাটকীয়ত্ব আনার জন্য (১৮ দৃশ্যে) এবং নাট্যবস্থার চিত্রণের জন্য (১৭ দৃশ্যের ১ম, ১।৯ দৃশ্যের ১ম ও দ্বিতীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্যের ১ম) গানের সংযোজনা করা হয়েছে।

খ, রাধা — চলে গেল…সে আমার, সে আমার। সে কি আর কারও হয় ?
আমার চোখের ভ্রম। আমি কি দেখতে কি দেখেছিলাম—
বুঝি সে আর আসবে না।
গীত। সে ত সই আমার ছাড়া নয়
যেচে জ্বালি মনের আগুণ
আমার সে যে পর কি হয় ?
বুঝিনাত কেমন খেলা, হাতে পেয়ে পায়ে ঠেলা
ছি ছি ছি সাধের প্রেমে কে আনে ছলা : —১ম অংক, ৭ম দৃশ্য, মানকুঞ্জ।

ক. গৌরী—চলতারে সেধে আনি চলে গেছে অভিমানে
কাজ কি আমার মিছা মানে
মানী আমি তারই মানে —প্রথম অঙ্ক, অষ্টম দৃশ্য, হরগৌরী।
হর— কে তুমি সুলোচনা, চাঁদের কণা
কও না কথা, চাও না ফিরে ?
কোথায় থাকো ? কথা রাখো
বদন তোল মাথার কিরে।
খ. গৌর— আ গেল ছারকপালে বুড়ো হল
তোর সনে মোর কিসের কথা ?
হর— বেধেঁছ রূপের ডোরে, এস ঘরে
কেন প্রাণে দাও লো ব্যথা —প্রথম অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য, হরগৌরী।

লুলিয়া ঃ (অতুলকৃষ্ণ মিত্র ঃ ১৮-৫-১৯০৭ মিনার্ভা)

হঠকারিমূলক কার্যের দ্বারা মানুষ নিজের পরিণামকে শোচনীয় করে তোলে। এই মূলভাবকে আশ্রয় করে তিনটি অংকে ও ষোলটি দৃশ্যে আলোচ্য গীতিনাট্যটি রচিত হয়েছে। প্রথম অংকে শিকার করার সময় দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কাশ্মীরের অমাত্য পুত্র দিব্যকান্তের মৃতপ্রায় হয়ে যাওয়া এবং তাকে মৃত ভেবে কাশ্মীরে এসে কালাশোকের নিজেকে দিব্যকান্তরূপে পরিচয় দেবার ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে বনমধ্যে মানসীর সেবায় সুস্থ দিব্যকান্তকে তার নিজের রাজ্যে নিয়ে যাবার জন্য মানসীর উদযোগ গ্রহণের ঘটনা উপস্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় অংকে কাশ্মীরে দিব্যকান্তের পুনরাগমন এবং কালাশোকের নির্বাসন দণ্ড লাভের ঘটনা গ্রথিত হয়েছে।

এ নাটকটি আদর্শ গীতিনাট্য নয়। নাটকটির কাহিনী বিন্যাসে গদ্যময় সংলাপই প্রধান। তথাপি এ নাটকে এককগীতি, সখীগণের গীত, দ্বৈতগীত—বিভিন্ন ধরনের মোট আঠাশটি গান বিদ্যমান। নাটকে গানের মাধ্যমে উক্তি প্রত্যুক্তির দ্বারা চরিত্রের মানসিক অবস্থা ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে অঞ্জন—লুলিয়ার গান, ঐ অংকের পঞ্চম দৃশ্যে লুলিয়া—কালার গান, দ্বিতীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্যে লুলিয়া—অঞ্জনের গান, তৃতীয় অংকের চতুর্থ দৃশ্যে কালাশোক লুলিয়ার গান—এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সংলাপের সাহায্যে কোথাও কোথাও চরিত্রের ভাবাবেগের অবস্থা বর্ণনা করা হোলেও পরবর্তী সংগীতের দ্বারা সেই ভাবাবেগের বিস্তৃতিকে ঘনীভূত করা হয়েছে।ক

আয়েষা ঃ (অতুলকৃষ্ণ মিত্র ঃ ৫-৬-১৯০৯ মিনার্ভা)

রাজনৈতিক কর্ম-পালনের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি দুর্বলতার প্রকাশ ঘটলে জীবনের পরিণাম শোচনীয় হয়ে ওঠে। এই ভাবকে কেন্দ্র করে তিনটি অংকে ও সতেরটি দৃশ্যের মাধ্যমে নাট্যকাহিনী গড়ে উঠেছে। প্রথম অংকে ঔরংজেবের নির্দেশে সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রায় মহম্মদের দায়িত্বভার গ্রহণ এবং যুদ্ধের প্রাক্ মুহূর্তে আয়েষার অনুরোধে সুজার বিরুদ্ধে মহম্মদের অস্ত্র ধারণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে সুজার কন্যা আয়েষার সঙ্গে মহম্মদের বিবাহ ও ঔরংজেবের সহিত

ক. দিব্যকান্ত—তবে ভিক্ষা দাও।
সরমা—কিসে নেবে ?
দিব্য—এই হৃদয় পেতে দিচ্ছি, এই আমার ভিক্ষা পাত্র।
সরমা—ভাল তবে নাও অনেকদিন থেকে যা দেবো দেবো কচ্ছি আজ তাই নাও।
গীত ॥ ধর যা আছে আমার
এ বিনে এ অবলার কিছু নাহি আর ॥
লুকায়ে এ হৃদি হতে
আপনি এসেছ লোতে
লহদান, প্রতিদান চাহিনা তোমার। প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, লুলিয়া।

যুদ্ধে পরাজিত সুজার সঙ্গে মহম্মদের ঢাকায় আশ্রয় গ্রহণের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে। তৃতীয় অংকে কূটকৌশলে সুজা ও মহম্মদের মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করে ঔরংজেব কর্তৃক মহম্মদকে বন্দী করা ও বন্দী অবস্থায় মহম্মদের মৃত্যুর কাহিনী উপস্থাপিত করা হয়েছে।

নাটকে আয়েষার প্রতি প্রণয়াসক্তির জন্য মহম্মদের রাজনৈতিক কর্তব্যচ্যুতির ফলে ঔরংজেবের হাতে বন্দী হয়ে কারাগারে তার মৃত্যুর শোচনীয় পরিণতির মূল কাহিনী ছাড়া—(ক) মহম্মদ—রিজিয়া, (খ) আমীরণ—শিকদার—এই দুটি উপঘটনা বিদ্যমান। কাহিনী বিন্যাসে অনাবশ্যক দৃশ্য ও ঘটনার সংযোজনার ফলে গীতিনাট্যের সংহতি ব্যাহত হয়েছে। মূলভাবের সঙ্গে যোগ না থাকায় প্রথম অংকের ৪, ৫, ৬—দ্বিতীয় অংকের ২, ৩, তৃতীয় অংকের ২, ৪ দৃশ্যগুলি নাট্যক্রিয়ার গতিকে মন্থর করে তুলেছে। নাটকের তৃতীয় অংকের শেষ দৃশ্যে যুক্তিহীনভাবে উপর্যুপরি মহম্মদ, আয়েষা ও রিজিয়ার মৃত্যুর ঘটনার বিন্যাসের দ্বারা ভাবাবেগ সর্বস্ব অতি নাটকীয়তার সৃষ্টি করা হয়েছে। তদুপরি এই দৃশ্যে স্বর্গের হুরীগণের আবির্ভাব ও মৃত ব্যক্তিগণের আত্মা গ্রহণ—এ জাতীয় অলৌকিক ঘটনার সংযোজনার দ্বারা নাট্যকার গীতি-নাট্য রচনার ক্ষেত্রে পৌরাণিক মানসিকতার প্রভাবে প্রভাবান্বীত হয়েছেন। নাটকের কাহিনী বিন্যাস, চরিত্র চিত্রণ ও নাটকের ভাব বস্তুর ব্যাখ্যা দানের ক্ষেত্রে নাটকটি আদর্শান্বিত গীতিনাট্যরূপে গড়ে ওঠেনি। নাটকের মধ্যে গীতিনাট্যের আমেজ আনার জন্য চৌদ্দটি সমবেত গান, দুটি দ্বৈত গান ও সাতটি একক গীতি সহ মোট তেইশটি গানের সংযোজনা করা হয়েছে। প্রথম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে 'কেন এত নিরদয়', প্রথম অংকের সপ্তম দৃশ্যে 'আমি কি কব তোমায় তুমি যে আমার একটি রতন', তৃতীয় অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যে 'আমায় কি হবে রাখিয়ে আর',—এ সকল একক গানের দ্বারা মহম্মদের প্রতি আয়েষার প্রেমানুরাগজনিত ব্যথা বেদনা, আশা আকাঙ্খা ও বিরহ—যন্ত্রণার বিভিন্ন হৃদয়াবেগকে মূর্ত করে তোলা হয়েছে। প্রথম অংকের চতুর্থ দৃশ্যে আমীরণের গানটি নাট্যক্রিয়ার ভবিষ্যৎ পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত দান করেছে। এতদ্ব্যতীত কোথাও কোথাও নাটকের মধ্যে স্থূলহাস্যরসের যোগান দেওয়ার জন্য গানের সংযোজনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্যে 'মেহেরা—শিকদারের' গান, তৃতীয় অংকের প্রথম দৃশ্যে 'তাতার রমণী ও খোজার' গানের কথা উল্লেখযোগ্য। সমবেত গানের দ্বারা ঘটনার সম্ভাব্য পরিণতি, চরিত্রের মানসিক অবস্থা বিকাশলাভ করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সমবেত গানের সাহায্যে নাট্যকার সার্বিকভাবে সূক্ষ্ম জীবন দর্শণের তত্ত্বকে তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে 'ভেবনা ভেবনা ভাবিনী' (১।৫), 'যার যত সুখ, তার তত দুঃখ ওজনে ঠিক সমান (৩।২)', আমরা সুখের বাসর সাজায়ে রেখেছি দুঃখের আধার ঘরে' (৩।৪)—এ সকল গানের কথা স্মরণযোগ্য।

হিন্দা-হাফেজ : (অতুলকৃষ্ণ মিত্র : ১৮-৭-১৯০৮ মিনার্ভা)

আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রেম গৌরবান্বীত হয়ে ওঠে। এই মূল বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে তিনটি অংকে ও চৌদ্দটি দৃশ্যের দ্বারা নাট্যবস্তু গঠিত হয়েছে। প্রথম

অংকে ইরাণের অগ্নি মন্দিরের রক্ষক হাফেজের সঙ্গে ইরাণ বিজেতা আরবের আমির আলি হাসানের কন্যা হিন্দার প্রণয়াসক্তির ঘটনা দেখান হয়েছে। দ্বিতীয় অংকে হাফেজের সঙ্গে প্রেম করার জন্য আরবশাহীর নির্দেশে হিন্দাকে জিজিরা দুর্গে বন্দী করা ও বন্দী হিন্দাকে হাফেজের উদ্ধারের ঘটনা উপস্থাপিত করা হয়েছে। তৃতীয় অংকে আরবের বাদশাহীর সঙ্গে ইরাণের যুদ্ধ এবং ইরাণের স্বাধীনতা রক্ষার্থে যুদ্ধে হিন্দা-হাফেজের মৃত্যুর ঘটনা বিধৃত হয়েছে। নাটকের ক্রোড়াঙ্ক দৃশ্যে শূন্যমার্গে হিন্দা—হাফেজের মিলন দেখিয়ে নাটকের মধ্যে মেলবন্ধনের সৃষ্টি করা হয়েছে। কাহিনীর গঠন ভঙ্গিমায় প্রকৃত গীতিনাট্যের রূপ গড়ে ওঠেনি। সংলাপ প্রধান এই গীতিনাট্যে এককগীতি, দ্বৈতগীতি ও সমবেত গীতি নিয়ে মোট উনিশটি সংগীত বর্তমান। নাট্য সংলাপের সাহায্যে চরিত্রের মনোভাব প্রকাশ করার পরে সংগীতের সাহায্যেও সেই মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে হিন্দার গান (আমি স্বরূপের প্রেম অমৃত পিয়িব গো, ভালবাসা নাইক দুনিয়ায়) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। নাটকে ভাবাবেগের গতিময় রূপ সৃষ্টির জন্য প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্যে বাঁদীগণের গান, দ্বিতীয় অংকের ৩য় দৃশ্যে হিন্দাসহ বাঁদীগণের গান, দ্বিতীয় অংকের চতুর্থ দৃশ্যে বাজীকরের গান—প্রভৃতি গানের সংযোজনা করা হয়েছে।

স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আরবশাহীর সঙ্গে ইংরাজের যুদ্ধের ঘটনার উপস্থাপনার ক্ষেত্রে নাট্যকার কৌশলে তৎকালীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে উদ্দীপ্ত করেছেন। সংগীত রচনার দ্বারা সেই ভাবকে আরও ঘনীভূত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তৃতীয় অংকের পঞ্চম দৃশ্যের নিম্নোক্ত সংগীতটি উল্লেখযোগ্য—

"ভীষ্ম ভ্রূকুটি ভঙ্গে চলি চল রণরঙ্গে
মাতিগে আয়তি সঙ্গে, সাঙ্গো পাঙ্গো মিলিয়া
ভীষণ ভল্লাল মল্লে, শেল মুষল শল্যে
মুদগর গদা মল্লে উল্লাসে লহ তুলিয়া ॥

সূত্র পরিচিতি

১. দুঃখার্ত্তশোকনির্ব্বেদখেদবিচ্ছেদকারণম্
অপি ব্রহ্মপরানন্দাদিদমভ্যধিকং মতম্ ।।
সূত্র-৯, পৃষ্ঠা-৯, অভিনয়দর্পণ (নন্দীকেশ্বর), সম্পাদনা—
হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১৩৭১, কলিকাতা।

২. শ্লোক-১১১, ১ম অধ্যায়, নাট্যশাস্ত্র, ভরত।

৩. "Tragedy, Comedy…are all in their general conception modes of imitation." —P. 7, Aristotles Theory of Poetry and Fine Art—S. H. Butcher, 1957, New York.

৪. "Drama is the art of expressing ideas about life." —P. 35, Theatre and Dramatic Theory : A. Nicoll, London, 1962.

৫. "The root idea is the begining of the process…"—Page-182, The Theory and Technique of playwriting and Screen writing—J. H. Lawson, New York, 1936.

৬. "Theme may mean either of two things—either the subject of a play, or its story. The former is perhaps its proper or more convinient sense…the theme may sometimes be not an idea, an abstraction or a principle, but rather an environment, a social phenomenon of one sort of another." —P. 15, Playmaking—a manual craftmanship—William Archer, London, 1926.

৭. "It is…an idea so compact that it can be summed up in a few words." —Page-206, Elements of Drama, J. L. Styan, Cambridge University Press,

৮. "A good premise is a thumbnail synopsis of your play." —P. 8, The Art of Dramatic-writing : Lajos Egri, Newyork, 1946.

৯. "A proposition must be susceptible of being work out." —P. 37, The Analysis of play constructions and Dramatic Principles. —W. T. price, New York, 1912.

১০. "Art is in a microscopic form, the perfection not only of

mankind but of the Universe." —Page-255, The Art of Dramatic Writing—Lajos Egri, New York, 1946.

১১. "All art and hence all great drama is in its nature both universal and personal, both general and selective. —Page. 1, The Drama and its law and its technique. —E. Woodbridge, 1898, Boston.

১২. "A plot is always aimed at some definite effect."—P. 34. —Tragedy and Theory of Drama. Elder Olson, 1961, Wayne State University Press.

১৩. Page-346-347, Aristotles Theory of Poetry and Fine Art. —S.H. Butcher. 1957, New York.

১৪. ইদং পুনর্বস্তুবুধৈর্দ্বিবিধং পরিকল্পতে।
আধিকারিকভেদং স্যাৎ প্রাসঙ্গিকমথাপরম্ ।।
—সূত্র-৪২, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃ ৩৪৮, সাহিত্যদর্পণঃ। বিশ্বনাথ কবিরাজ।
দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা।

১৫. "The complex or non simple fable is the one that through some change of fortune or through recognition or through both alike, proceeds to its conclusion". —Page-36, On Plot in Tragedy—D. H. Sius, California,

১৬. "When lines of action are such as to have an independent interest and constitute a story in their own right—they are called sub-plots, by plots or under plots". —Page-43, Tragedy and Theory of Drama—Elder Olson, Wayne State University Press, 1961.

১৭. "...It reflected upon it, either as a criticism or a contrast or a parallel illustration of the same moral worked out in another manner, a kind of echo or metaphor of the tragedy." Page-46. Themes and Convention of Elizabethan Tragedy. M. C. Bradbook, 1957. Cambridge University.

১৮. "...Sub-plots were related to the main action in a variety of significant ways and were infact integral parts of a coherent over all structure possessing a kind of unity." Page-3, The Multiple plot in English Renaissance Drama, R. Levin, 1971, Chicago.

১৯. পৃষ্ঠা-২১৬, "নাটকত্ব"। দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী। ২য় খণ্ড, সম্পাদনা—অজিতকুমার ঘোষ ও আবদুল আজিজ আল্ আমান্। ১৯৭৬, কলিকাতা।

২০. "Thus theme and plot are inseperable and their combination amounts to something like a 'master Plot' or that which the various intrigues have in common."—Page-8, Form of Drama —J. L. Calderwood and H. E. Toliver, 1909, New Jersey.

২১. "A begining is that which does not itself follow anything by casual necessity, but after which something naturally is or comes to be. An end on the contrary is that which itself naturally follows some other thing, either by necessity or as a rule, but has nothing following it."—Page-279-280, Aristotles Theory of Poetry and Fine Art, S. H. Butcher, 1974, Ludhiana.

২২. "Each play presents itself as an Dramatic poem, the component parts of which all contribute to the general impression and total effect." —Page-45, Shakespeare, Henry Flucher, London, 1953.

২৩. Page-30-31, Playwright at work—John Van Druten, London, 1953.

২৪. বীজং বিন্দুঃ পতাকা চ প্রকরী কার্যমেব চ।
অর্থপ্রকৃতয়ঃ পঞ্চ জ্ঞাত্বা যোজ্যা যথাবিধি ॥
—শ্লোক ২১, ২১শ অধ্যায়, নাট্যশাস্ত্র। ভরত।

২৫. অবান্তরার্থবিচ্ছেদে বিন্দুরচ্ছেদকারণম্।
সূত্র-৬৬, ষষ্ঠ অধ্যায়। সাহিত্যদর্পণঃ। বিশ্বনাথ কবিরাজ।
দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা।

২৬. যদ্বৃত্তং হি পরার্থং স্যাৎ প্রধানস্যোপকারকম্।
প্রধানবচ্চ কল্প্যতে সা পতাকেতি কীর্তিতা ॥
শ্লোক-২৪, ২১শ অধ্যায়, নাট্যশাস্ত্র। ভরত।

২৭. Sutra 21, Book-I, The Dasarupa Dhananjaya by G. C. Hass, Delhi, 1962.

২৮. "Action is the executed will"—Page-5, Hegel on Tragedy —Anne And H. Paolucci, London,

২৯. "Unity of action for single end is necessary"—Page-170, The

Theory and technique of play writting and Screen writting—J. H. Lawson, New York, 1936.

৩০. "The action is developed not through ingenious invention, but through the natural effect of incident and situation in bringing about the central movement." —Page-36, Tragic Drama in Aeschylus, Sophocles and Shakespeare—L. Campbell, London, 1904.

৩১. "Action is a constant changing of the molecule until a new form is reached."—Page-118, The Analysis of play constructions and Dramatic principles—W. T. Price, New York, 1912.

৩২. "...The object of...play is...to create a dramatic action, which in its total effect will communicate an active experience, that is convincing and real."—Page-116, Drama in performence—Ramond william, London, 1954.

৩৩. অবস্থাঃ পঞ্চ কার্য্যস্য প্রারব্ধস্য ফলার্থিভিঃ।
আরম্ভযত্নপ্রত্যাশানিয়তাপ্তিফলাগমাঃ ।।
—সূত্র-৭০, পৃষ্ঠা-৩৬২। ষষ্ঠ অধ্যায়, সাহিত্যদর্পণঃ।
বিশ্বনাথ কবিরাজ। দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা।

৩৪. মুখং প্রতিমুখং গর্ভো বিমর্শশ্চ তথৈব হি।
তথা নির্বহণং চৈব সন্ধয়ো নাটকে স্মৃতা ।।
শ্লোক ৩৬, অধ্যায় ২১, নাট্যশাস্ত্র-ভরত।

৩৫. উদ্ভেদস্তস্য বীজস্য প্রাপ্তিরপ্রাপ্তিরেব বা।
পুনশ্চান্বেষণং যত্র স গর্ভ ইতি সংজ্ঞিতঃ।
শ্লোক ৪০, ২১শ অধ্যায়। নাট্যশাস্ত্র-ভরত।

৩৬. গোপুচ্ছাগ্রসমাগ্রং তু বন্ধনং তস্য কীর্ত্তিতম্।
—সূত্র-১১, ষষ্ঠ অধ্যায়, পৃষ্ঠা-৩৩২। সাহিত্যদর্পণঃ।
বিশ্বনাথ কবিরাজ। কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ।

৩৭. "First came the Prologue introducing the theme, indicating the locality, sometimes even the time of the day, this was followed by the entrance song of the chorus, known as the parodos." —Page-43, World Drama—A. Nicoll, London, 1968.

৩৮. "The drama···possesses a pyramidal structure. It rises from the introduction with the entrance of the exciting forces to the climax and falls from here to the catastrophe. Between these three parts lie (the part of) the rise and the fall." Page-114-115, The technique of Drama, Gustav Freytag, New York, Fifth edition.

৩৯. "It was doubtless based directly upon the normal (though by no means uniform) division of a Greek Tragedy into prologue, three Episodes and Exodus—five parts in all." Page-200, An Introduction to the study of Literature—W. H. Husdson, Delhi, 1955.

৪০. "Climax is meaning···a ladder···an assent···that is the rise of the action from the opening situation towards the principle crisis or turning point". —Page-77, Tragic Drama in Aeschylus, Sophocles and Shakespeare—Lewis Campbell, London, 1904.

৪১. "···rise and fall of tragic intensity to a parabola the natural path of a projectable is rapid motion of which the acme lie somewhere beyond the central point."—Page-79-80, Tragic Drama in Aeschylus, Sophocles and Shakespeare, Lewis Campbell, London, 1904.

৪২. The climax is "the moment of maximum effort and realisation". —Page-245, The Theory and technique of Playwritting and screenwritting—J. H. Lawson, New York, 1936.

৪৩. 'Form of Diagram'—Page-201, An Introduction to the study of literature—W. H. Hudson, Calcutta 1955.

৪৪. "The main business of the exposition which we will consider first is to introduce us into a little world of persons to show us their position in life, their circumstances, their relation to one another and perhaps something of their character and to leave us keenly interested in the question what will come out of this condition of things we are left." Page-130, —Shakespearean Tragedy—A. C. Bradley; London,

৪৫. "...Clearly the exposition must itself be dramatic, or it will

both be a bore and seem an excrescence. To be dramatic it must be charged with emotion.: for a resume of the bare-facts can hardly be thrilling in itself." —Page-104, Tragedy—F. L. Lucas, London, 1927.

৪৬. "...that the first short introductory chord is followed by a well executed sceen which by a quick transition is connected with the following sceen containing the exciting force." P-120, The technique of Drama, Gustav Freytag, New York, Fifth Edition.

৪৭. "exposition not only arrouse interest but transmits a complete tonal effect and while we are subtly being told what the author wishes us to know and feel, he persuades us to accept substaintiality of the make-believe." —Page-20, Elements of Drama,—J. L. Styan, Cambridge University Press, 1960.

৪৮. "...it is almost always the crowning point." —P-128, The technique of Drama, Gustav Fretag, New York, Fifth Edition.

৪৯. "Every dramatic story sooner or later reach as a stage in its development at which the balance begins to incline decisively to one side or other side." —P-209, An introduction to the study of literature—W. H. Hudson, Delhi, 1955.

৫০. Brutus—Why coms't thou ?
Ghost—To tell thee thou shalt see me at Philippi..." Act IV, Sceen-III, JULIUS CAESAR, W. Shakespeare.

৫১. Romeo—"Thou detestable maw, thou womb of death, Gorg'd with the dearest morsel of the earth, thus I enforcc they rotten Jaw's to open"
—Act-v, Sceen-III, Romeo and Juliet, W. Shakespeare.

৫২. "Catastrophe of a tragedy should properly signify the case of the action which is compared the turning down of the end of thread in weaving." —Page-77, Tragic Drama in Aeschylus, Sophocles and Shekespeare, Lewis Campbell, London, 1984.

৫৩. "...The division into Acts is primarily a division of the plot or plot action into periods of Progression."—Page-58, The analysis of the play constructions and Dramatic Principles —W. T. Price, New York,

৫৪. "The dimensions of every sceen hermonise the necessity of action." —Page-322, Reading a play—L. W. Cor, New York, 1963.

৫৫. "Greatest significance of actions in drama must come from their relations to one another and to the parts and whole of the play." —Page-69, Dramatic structure—Jackson. G. Barry, London, 1970.

৫৬. "For although each sceen is discernible and distinguishable as a seperate entity, neverthless no sceen is really seperate from the whole which is its subtantial ground."—Page-16, A structural Approach to the Analysis of Drama, Paul M. Levitt, Paris, 1977.

৫৭. পৃষ্ঠা-৫৯৯। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১ম ভাগ)—আশুতোষ ভট্টাচার্য, চতুর্থ সংস্করণ। ১৯৭৫, কলিকাতা।

৫৮. "পুরাণের চরিত্র...একান্তই ভক্তিবাদী, বিশ্বাসপ্রবণ...কোন চরিত্রই শেষ পর্যন্ত জীবন যন্ত্রণায় কাতর নয়।" —পৃ. ২৫০।

বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক—ডঃ রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা।

৫৯. ড্রাইডেন ও ডি. এল. রায়—মুনীর চৌধুরী—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,

৬০. "It immitates not men as men, but men in so for as they act." —Page-20, On plot in Tragedy, Daniel Hein Sius—California,

৬১. "We should not look for perfect versimilitude to life but rather see each play as an expanded metaphor by means of which the original vision has been projected into forms roughly correspondent with actuality, conforming thereto with greater or less exactitude according to the demands of its nature." —Page-128, Shakespeare, Henri Flucher, Lo ndon, 1953.

৬২. "নাট্যকার এই গাম্ভীর্যপূর্ণ নাটকখানিকে তুম্বরু-মালিনীর লঘু রসালাপ পূর্ণ সংলাপের দ্বারা রস বৈচিত্র্য দেখাইতে যাইয়া প্রাচীন নাটকের গতানুগতিকতায় গা ঢালিয়া দিয়াছেন"—পৃ. ৪২৮। দৃশ্যকাব্য পরিচয়, সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৩৫৭

৬৩. "নাট্যগ্রন্থনায় সাবেকী রীতি প্রবল"—পৃ. ৫৬৯। বাংলা নাটকের বিবর্তন —সুরেশচন্দ্র মৈত্র। দ্বিতীয় প্রকাশ, কলিকাতা।

৬৪. এই আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস ক্ষীরোদপ্রসাদের জন্মগত ছিল। তিনি এক তান্ত্রিক সাধকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন···তিনি থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সদস্য ও 'অলৌকিক রহস্য' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ফলে অদৃশ্য দৈব শক্তিতে তাঁহার বিশ্বাস খুবই দৃঢ় ছিল। —পৃ. ১৩৬। বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—মন্মথমোহন বসু। কলিকাতা, ১৯৫৯।

৬৫. "A false provincial patriotism has led Modern Bengali writer to glorify the Barabhuiya of Bengal as the champions of national independence against foreign invaders···The high absurdity is reached when our dramatists call Pratapaditya of Jessore as the counterpart of Maharana Pratap Singh of Mewar···Pratapaditya never once defeated any Moghal army in pitched battle···" —Page-225, The History of Bengal (Vol. 2), J. N. Sarker, Dacca, 1948.

৬৬. Ibid, Page-269.

৬৭. "Mirkassim spent the rest of his days as wanderer"
Page-36, India since 1526,—V. D. Mahajan, 1958.

৬৮. "Scholars like Gaurishanker Ojha, Dr. K. S. Lal and others have rejected the story of Padmini as a more poetic fancy··· The opinion of ojha is that the whole story of Padmini was probably borrowed from Malik Muhammad Jayasi who wrote the romantic story in the sixteenth century in his book named Padmavat. Farista and later Muslims historian must have borrowed the story from Padmavat." —Page-77, The Sultanate of Delhi, V. D. Mahajan and S. Mahajan, Delhi, 1962.

৬৯. Page-425, Akbar the great—A. L. Srivastav, (Vol. 1) Agra, 1962.

৭০. "The Mughals were suffering from great scarcity of food and fodder and their horses had become vary week and sick. Therefore when Chand Sultana whose situation too was precarious on account of internal conflict and scarcity of provisions made overtures of peace. ...The terms proposed by Chand Sultana were that Bahadur be recognised as a feudatory ruller of Ahmednagar and that she would cede Beror to the empire and send suitable present to the empire. These terms were accepted."—Page-431, Akbar the great (Vol. I)—A. L. Srivastav, Agra,

৭১. Page-389, The History of Muslim Rulles, Iswari Prasad, Allahabad, 1930.

৭২. "...no body...credited him with having sacrificed his life for his country.... He had conspired with the English aganist his master Siraj-ud-Daula, then with Mirjafar aganist the English and lastly he conspired with Mirkasim against Mirjafar. It would therefore not be unreasonable to hold that he was by nature a man who was always after serving his own iterest."—Page-131, History of Mediaeval Bengal, Ramesh Chandra Majumder, Calcutta,

৭৩. "The Supreme Court found Nanda Kumar guilt of forgery and he was sentenced to be hanged and was actually hanged." —Page-56, India since 1526,—V. D. Mahajan, Delhi, 1958.

৭৪. "নাট্যকার প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের পটভূমিতে একখানি পৌরাণিক নাটক দাঁড় করিয়েছেন।" —পৃ. ১৪৬। দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক, প্রভাতকুমার গোস্বামী, কলিকাতা,

৭৫. "...but no credence can be given to the tales which relate that Asoka had a hundred brothers, ninety nine of whom he slew and so forth. These idle stories seem to have been invented chiefly in order to place a dark background of early wickedness behind the bright picture of his mature piety...the probability is that he succeeded peaceably in accordance with his predecessor's nomination." —Page-132,

History of India (Vol. II), Vincent A. Smith, 1906, London.

৭৬. Page-178-180, Asoka the Buddhist emperor of India, V. A. Smith, Oxford, 1901.

৭৭. Page-114-115, Ancient India,—R. C. Majumder, Banaras, 1952.

৭৮. "The only allegation made against Raziya by Ferishta is that a very great degree of familirity was observed to exist between the Abyssinian and the queen, so much so, that when she rode he always lifted her on horse by raising her up under the arms"—Page-58, The Sultanate of Delhi,—V. D. Mahajan and S. Mahajan, Delhi, 1062.

৭৯. Page-84, History of Muslim Rulles in India—Iswari Prasad, Ahmedabad, 1930.

৮০. "One of their body having been mobbed and beaten by the Comrades of a soldier of the police with whom he had quarrelled, collected some of his brethern to retaliate on the police. Lives were lost and the affray increased till several thousand satnamies were assembled and the chief authority of the place having taken part against them, they defeated a band of troops…and finally took possession of the town of Narol…The quarrel soon took a religious colour and assumed the form of war for the liberation of Hindu by an attack of Aurangzib."—Page-635, History of India—Elphinstone, Third edition, Allahabad.

৮১. Page-339, History of Aurangzib, Jadunath Sarkar (Vol. 3), Calcutta, 1916.

৮২. "In their rules they make no distinction between Hindus and Musslmans and eat pigs and other unclean animals…In sins and immorality they see no blame." —Page-337, Ibid.

৮৩. "গিরিশচন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য ছিলেন। তিনি লিখিবার উদ্দেশ্যে তথায় এবং অন্যস্থান হইতে ইতিহাস আনাইয়া সিরাজ চরিত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন"—পৃ. ৩৬৭। গিরিশচন্দ্র, অবিনাশ-গঙ্গোপাধ্যায়। কলিকাতা ১৯৭৭।

৮৪. "On Alibardi's death Ghasti Begam and Mirjafar both incited Saukat Jong to attack Murshidabad by assurance of their support in the venture." —Page-113, History of Mediaeval Bengal—R. C. Majumder, Calcutta,

৮৫. Page-496, History of Bengal—J. N. Sarkar (Vol. 2), Dacca, 1948.

৮৬. "Mirkassim lived in Rohilkhand for some time and some years later, probably in 1777, he died a poorman in a dilapidated hut at Delhi." —Page-148, History of Mediaeval Bengal—R. C. Majumder, Calcutta,]

৮৬(ক) শিবাজী সম্বন্ধে যতকিছু মুদ্রিত গ্রন্থ তখন ছিল ও তৎসংক্রান্ত যতকিছু কাগজপত্র ও দলিল দস্তাবেজ ভারতের নানাদেশে ও বিলাতে 'ইণ্ডিয়া হাউসে' পাওয়া গিয়েছিল, তৎসমুদয়ই পঠিত ও আলোচিত হইয়া 'ছত্রপতি' বিরচিত হইয়াছিল।" —পৃ. ৭৫। গিরিশচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। ১৩২৬। কলিকাতা।

৮৭. "Athni a considerable mart was burnt down and Dilir proposed to sell the inhabitants who were all Hindus. Shambhuji objected to it, but was overrulled and began to grow sick of his associates···In the night of 20th November he slipped out of the camp with his wife—Yesu Bai, disguised in male attire and only ten troopers for escort, rode hard to Bijapur in the course of the next day and was warmly received by Masaud. Dilir···sent an agent···to bribe the regent to capture the Maratha prince···Shambhuji getting scent of the matter issued in secret from Bijapur, met a body of cavalry sent by his father to escort him and galloped away to Pauhala."—Page-334, Shivaji and his times. —J. N. Sarkar, Calcutla, 1929.

৮৮. "On 23rd March 1680 Rajah was seized with fever and blood dysentery···and then fell into a trance which imperceptibly passed into death···."—Page-339, Shivaji and his times—J. N. Sarkar, Calcutta, 1929.

৮৯. "He was one of several sons and was no doubt selected by his father in accordence with the usual practice, as Yuvaraja,

or crown prince, on account of his ability and fitness for the imperial succession." —Page-30, History of India (Vol. II), Vincent. A. Smith, London, 1906.

১০. Page-161-162, 177. "The ceylonese legend"—Asoka—The Buddhist Emperor of India—V. A. Smith, Oxford at the Clarendon Press, 1901.

১১. "At this spot his guide and preceptor Upagupta addressed Asoka and said 'Here great king was the venerable one born…' —Page-167, Early History of India, Vincent. A. Smith, 4th edition, Oxford, 1924.

The sight of all this misery and the knowledge that he alone had caused it smote the conscience of Asoka and awakened in his breast feelings of 'remorse profound sorrow and regret' …about this time he came under the influence of Buddhist teaching, his devotion to which increased more and more as the years rolled on…" —Page-134, History of India (Vol. II), Vincent. A. Smith, London, 1906.

১২. Page-177, 188-189, 'The Indian legend of Asoka'—Asoka The Buddhist Emperor of India, Vol-I, V. A. Smith, Oxford, 1901.

১৩. Page:80, History of Aurangzib—J. N. Sarkar, Vol-III, 1972 (Orient longman Publication).

১৪. Murad grow's jealous of Aurangzib…began to act in opposite to Aurangzib…Nuruddin…induced the helpless prince…to enter his brothers camp…lovely slave girl…threw him into a deep slumber…left the room taking away Murad's weapons…Shaikh Mir with a dozen of the most trustly servants of Aurangzib entered the chamber…he first tried to seize his weapons but they were gone…he understood…he had been caged," —Page-432, History of Aurangzib—Jadunath Sarkar, Vol-2, Calcutta, 1925.

১৫. Page-537-538, History of Aurangzib—Jadunath Sarkar Vol-II, Calcutta 1925.

৯৬. "In those long years of gloomy restraint thrice had she entreated Shajahan to forgive Aurangzib, twice had the justly incensed father refused, in the end love had conquered hate and shortly before his death he had signed a formal pardon to Aurangzib for all that he had done to his king and father..."—P. 36, History of Aurangzib—Jadunath Sarkar, Vol-III, Calcutta,

৯৭. The two became partly reconciled and the father bestowed his blessings and forgiveness on the son, 'but they never met... "—P-118, History of India—Stanley Lane Poole—Vol-IV, London, 1906,

৯৮. P. 549, History of Aurangzib—J. N. Sarkar, Vol. II, 1925, Cal.

৯৯. P. 424, History of Aurangzib—Jadunath Sarkar, Vol-2, Calcutta, 1925.

১০০. P. 124, Early History of India—V. A. Smith, 4th Edition, 1924.

১০১. "...his mother was of lowly origin and in accordance with Hindu Law he belonged to her caste and to bear the reproach of inferior social rank."—P. 105, History of India, V. A. Smith (Vol. II), London, 1906.

"It is therefore practically certain that Chandragupta belonged to a Kshatriya Community viz the Moriya Clan" P. 165, Political History of Ancient India—Hemchandra Roychoudhury, Calcutta, 1927.

১০২. "If Hemchandra and Taranath are to be believed, Kautilya or, Chanakya continued serve as minister for some time after the accession of Bindusara. "Chanak" says Taranath "one of his (Bindusara's) great lords procured the destruction of the nobles and kings of sixteen towns and as king he made himself master of all the territory between eastern and western seas."—P. 184, ibid.

১০৩. ১০ই জুন ৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডারের প্রিয় সেনাপতি সেলুকস

ব্যাবিলন নগরের সেরাপিসের মন্দিরে গমন করিয়াছিলেন এবং পরদিন ১১ই জুন আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুকালে সেলুকসের হিরাটে অবস্থান একেবারে অসম্ভব। —"রঙ্গমঞ্চ" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিত্র শিশির, ৫ই মাঘ, ১৩৩০।

'অনন্যোপায় হইয়া কল্পনার উপরেই সমধিক নির্ভর করিয়াছি।' ভূমিকা চন্দ্রগুপ্ত।

১০৪. 'দ্বিজেন্দ্রলাল অন্যূন পাঁচমাস ধরিয়া তাঁহার রাণাপ্রতাপ বা প্রতাপসিংহ নামক মনোজ্ঞ নাটকখানি কলিকাতায় থাকিতে রচনা করেন। এবং প্রায় ছয় সাত মাস যাবৎ উহা পরিবর্তনাদির জন্য নিজের কাছে ফেলিয়া রাখিয়া ঠিক একটি বৎসর পরে মুদ্রিত ও প্রচারিত করে।

—পৃষ্ঠা-২৫৬, দ্বিজেন্দ্রলাল। দেবকুমার রায়চৌধুরী, কলিকাতা ১৩৭১।

১০৫. "When the negotiation broke down in December 1573, Akbar decided on war···Akbar commissioned Man Singh of Amber to perform this task···" P.-201-202, Akbar the Great—A. L. Srivastav. Vol-I, Agra,

১০৬. "The wife of his bosom was insecure, even in the rock or the cave and his infants, heirs to every luxury, were weeping around him for food···He had beheld his sons and his kindred fall around him on the field without emotion—'For this the Rajput was born' but the lamentation of his children for food 'unmanned him'···P. 398, Annals and antiquities of Rajasthan—James Tod (Vol-I), 3rd edition, 1920.

১০৭. The bardic account that Sakat Singh cut down two Mughal pursuers of the Rana and lent him his own horse as Chetak had fall dead, that there was in consequence a reconciliation between the brothers, sound like opium eater's tale. Sakat Singh continued to be in Akbar's service. He is mentioned as one of the generals in the Kabul Campaign of 1581"—P-353, Akbar Nama of Sheikh Abul Fazal Allami (Vol-III), Translated in the Persian by H. Beveridge, 1939, Calcutta (Asiatic society).

১০৮. "Sakta who was attached to Salim's personal force···he quitted Partap with the assurence of reunion the first safe

opportunity···Prince Salim pledged his word to pardon him if he related the truth, when Sakta replied 'The burthen of a kingdom is on my brother's shoulders, nor could I witness his danger without defending him from it." Salim kept his word but dismissed the future head of Saktawats."—P. 395, Annals and antiquities of Rajasthan—James Tod, Volume I, 3rd edition, 1920.

১০৯. "Of daughters, I find three mentioned—(a) Shahrada khanum, born three months after Salim in 977 (b) Shukru'n —Nisa Begum who in 1001 was married to Mirza Shahrukh and (c) Aram Banu Begum, both after Sultan Danyal"—Page 321, A-In-I Akbari by Abul Fazl Allami—Translated by H. Blochmann, Second edition, edited by D. C. Phillott, Calcutta, 1927.

১১০. "The daughters apparently took no part in affairs of State and are rarely mentioned"—P. 103, Akbar the Great Moghul —V. A. Smith, oxford, 1919.

১১১. "After the failure of Jagannath expedition Akbor seemed to have realised the futility of attempting to capture the Rana. Moreover the emperor's attention was absorbed in pressing problem of the defence of the north western frontier of India and he had no leisure to think of pursuing the Rana"—Page-163-174, Virvinod, Vol-II.

১১২. "The story that having been tormented by the misery and want of his children in the inhospitable ravines for once at least did he swerve from his idealism and wrote out a letter of submission to Akbar and that he revoked it immediately on having been reminded of the noble mission of his life by Prithi Raj Rathor, the poet warrior of Bikaner —is a myth and finds no confirmation in sober history." Page-222, Akbar the Great—A. L. Srivastav, Agra, 1962.

"During 1572-76 the Rana was willing to submit on the condition that he should not be called upon to appear at the Moghal court, but after the battle of Haldighat in June

1576 his stand was that he would not recognise Mughal suzerainty at any cost. Modern writers have failed to appreciate Mewar's two different stands at different periods of Rana Pratap's relationship with Akbar." —Page-222, Rise and Fall of Moghal Empire (Vol-I), R. R. Tripathi, 1956, Allahabad.

১১৩. "Rana was poisoned by his son Amar singh". —Page-717, Akbar Nama of Sheikh Abul Tazab Allani (Vol-III), Translated in the Persion by H, Beveridge, Asiatic Society (Calcutta) 1939.

"It was heard that on January 19, 1597, he died peacefully of an injury he had received in bending a stiff bow." Page-221, Akbar the great—A. L. Srivastav, Agra, 1962.

১১৪. "On 23rd March 1680, the Rajah was seized with fever and blood dysentery and then fell into a trance, which imperceptibly passed into death"—Page-339, Shivaji and his times, —J. N. Sarkar, Calcutta, 1229,

"In Maharastrya there were some whispers of his wife Soyra Bai—the mother of Rajaram, having administered poison to him to prevent his giving the throne to shambhuji"—ibid —Page-340.

১১৫. "Durgadas placed them incharge of Giridhar Joshi in an obscure place difficult to access". —Page-281, History of Aurangzib (Vol-V),—J. N. Sarkar, Calcutta, 1925.

১১৬. "Shambhuji took up his abode at sangameshwara, where he thought he would be safe. But he was soon disillusioned and the imperial general Muqarrab made a suprise attack and captured Shambhu and his friend Kavi Kulesh and others" Page-706, History of Muslim Rules in India—Iswari Prasad, Allahabad, 1930.

১১৭. "On the arrival of his reply, the author under instructions from Shujat Khan visited Durgadas…and induced him by wise counsels to agree finally to the restoration of the princess. Then returning to the khan, he took proper escort and

conveyance with him and going back to Durgadas brought the princes away with hlm"—Page.282, History of Aurangzib, Vol-V,—J. N. Sarkar, Calcutta, 1925.

১১৮. "To aggravate the evil, disagreement now broke out between Ajit and Durgadas of which the Emperor was not slow to take advantage···He was impatient of advice, imperious in temper and jealous of Durgadas's well merited influence in the royal council and popularity among his clansmen··· Ajit at last drove him out to seek Mughal service or take refuge in Udaipur territory." —Page-289-290, ibid.

১১৯. "···the crowd of royal attendants attracted to the spot by the noise, rained down blows on him with their maces···some one cut his throat and silenced his uproar." —Page-413, History of Aurangzib (Vol-3),—J. N. Sarker, Calcutta, 1916.

১২০. In November 1705, Durgadas too unable to maintain himself in barren independence, made his submission to the emperor through Prince Azam and was restored to his old mansab and port in Gujrat." —Page-291, History of Aurangzib (Vol-V),—J. N. Sarkar, Calcutta, 1925.

"জাতীয় চরিত্র প্রভাবিত করিতে না পারিলে সাহিত্য সাহিত্যই নয়। ···গিরিশচন্দ্রের নাটকে···জাতীয় ঐক্য বন্ধনের সমধিক পরিচয় পাই বলিয়াই তিনি শ্রেষ্ঠ জাতীয় নাট্যকার"—পৃঃ-৬৪, গিরিশচন্দ্র—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ১৯৩৮, কলিকাতা।

১২১. "Preaching is not creative art, it leaves us cold" —Page-XV, Shakespeare's Men and women —Laxmikant Mohan, Hyderabad, 1960.

"The best Drama is that which incorporates its idea in action". —Page-11, Theatre—D. Maccarthy, London, 1954.

১২২. "She sung···she danced. Her timid eyes by stealth fell upon the prince and kindled all his soul into love. He was silent for the remaining part of the evening". —Page-196, History of Bengal—Charles Stewart, Delhi,

"Sher, suspecting that treachery was designed, refused to move from Burdwan and the Viceroy having represented this contumacious conduct to the Emperor, received orders to send Shere Afgan a prisoner to court and if this measure should be found inpracticable, to put him to death, either by open force or by stratagem". —Page-192-193, ibid.

"The received version that Jahangir fell in love with her during the lifetime of Akbar, that the later refused to gratify his wishes and induced Mirza Ghiyas to marry her to Sher Afgan, that the disappointed lover immediately on his accession to power, basely contrived the death of his more successful rival, that the high souled Miherunnisa indigantly rejected the overtures of her husband's murderer for four years, but that she yielded at last—all this finds absolutely no support in the contemporary authorities." —Page-163, History of Jahangir—Beniprasad, 5th edition, Allahabad, 1962.

১২৩. "As Khusrau was still popular Shajahan thought it prudent to remove him form his path. At Burhanpur, the prince was murdered by Shajahan's order early in 1622 and the Emperor was informed that he died of colic pain". —Page-510, History of Muslim Rules in India, Iswariprasad, Allahabad 1930.

১২৪. "In 1625 a sort of peace was patched up between the prince and his father. ·· Shajahan sent his two elder sons Dara Shikoh and Aurangzib to court as hostages. But he never appeared there in person, remaining absent in Rajputana or the Decan" ···Page-386, India in Muhamadan Period (Part-II) of the Oxford History of India—V. A. Smith, Oxford, 1929.

১২৫. "Though a prisoner in the hands of Mahabat, Nurjahan busied herself in devising means of escape from the clutches of her captors and finally succeeded in the attempt." —Page-518, History of Muslim Rulles in India—Iswariprasad, Allahabad, 1930.

১২৬. Page-520, History of Muslim Rule in India —Iswariprasad, Allahabad, 1930.

১২৭. "The battle ended in his defeat, he (shehriar) fled into the citadel, was given up by his adherents and he was afterwards put to death with the sons of Danial, by orders from Shajahan". —Page-503, The History of India—M. Elphinstone, Allahabad,

১২৮. "পাশ্চাত্ত্য দেশের সাহিত্যিক ঋষি টলস্টয়ের উপর দ্বিজেন্দ্রের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। টলস্টয় যে বিশ্বপ্রেমের প্রচার করিয়া গিয়াছেন দ্বিজেন্দ্র এই নাটকে সেই বিশ্বপ্রেমের নীতির সহিত তাঁহার হৃদয়ের সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন।"
—পৃষ্ঠা-১৬২, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। নবকৃষ্ণ ঘোষ। কলিকাতা—দ্বিতীয় সংস্করণ।

১২৯. Art "...to be given an opportunity to win prominence by real artistic merits." —Page-287. On literature and Art—V. I. Lenin, Moscow,

১৩০. "A dramatist writes for the theatre···the dramatist keeps in mind not the printer but a company of actors. He is as closely tied to the theatre". —Page-3, The Art of the Dramatist, J. B. Priestlly.

১৩১. Page-209, History of Jahangir—Beniprasad, Allahabad, 1962.

১৩২. "Mahabat Khan, a Rajput of the Rana's House converted to the faith". —Page-973. Annals and Antiquities of Rajasthan (Vol. 2), James Tod, 1920.

"Mohabat Khan was the son of Ghor Beg, a native of Cabul". —Page-495, The Hisiory of India—M. Elphinstone, Allahabad,

১৩৩. "Rana paid his respects to my fortunate son with the politeness and ritual that servants pay their respects." —Page-221, History of Jahangir—Beniprasad, Allahabad, 1962.

১৩৪. Page-39, Baji Rao-I, the great Peshwa,—C. K. Srinivasan, Bombay, 1961.

১৩৪ক. Page-80, ibid.

১৩৫. "Another account relates that Mastani was the daughter of Pathan Sirdar and that her mother equally famous as a beauty, was taken into the zanana by the Nizam-ul-mulk. The second tale is that the Nizam gave her as a present to the great Minister." —Page-264, Life of Subhadar Malhar Rao, M. W. Burway, Indore, 1930.

১৩৬. "As soon as the news of Baji Rao's death reached to Mastani, she died in the place of Poona whether by suicide or shock it is difficult to say". —Page-181, New History of Maratha (vol. 2), Govind Sakhram Sardesai, Bombay, 1958.

"The other version is that she came to attend the funeral ceremonies of the Peshwa. As a token of her abiding love for the Peshwa, she fearlessly entered the funeral pyre to the wonder and amazement of all who had gathered on that day". —Page-128, Baji Rao-I, The Great Peshwa, C. K. Srinivasan, Bombay,

"When the news (the death of Baji Rao) reached to Mastani she died in the palace at poona. It is difficult to say whether her end was caused by suicide or was due to shock." —Page-462, The Mughul Empire—A. L. Srivastav, 2nd edition, Agra.

১৩৭. "The delay gave Sherkhan time to fortify his camp and give his men the much needed rest.··· In fact Sherkhan purposely delayed the contest as his strategy was to wait till the advent of the rainy season when he would compell the Mughuls to fight at a disadvantage. ···On the contrary Humayun received no help from his brothers. ···Many of his troops deserted him on account of disease, hardship and fear of the enemy···" —Page-388, History of India (Vol. I), A. L. Srivastav,

১৩৮. "One of the rockets when fired against the gate of the town, rebounded and fell into a heap of amunition lying near the place where Sher Shah standing. There was a huge explosion and Sher Shah was most severely burnt. ...Soon after this he expired." —Page-402, ibid.

১৩৯. Page-407-439, Nagari Pracharini Patrika, Vol. XI, 188/1937 Banaras.

১৪০. "...A myth therefore came into existence on untruth which was repeated by later writers like Firishtah and Bada-u-ni". —Page-72, The Rise and Fall of Muslim Power in Gujrat, —S. C. Mishra, Bombay,

"Was Karna Vaghela evilly disposed ?"—R. R. Ramlal, Published in 'Gujrati Dipotsavi Number Patrika', 15.10.1933. Page-15-7,

Page-225-6, Glory that was Gurjaradesh, Bombay, K. M. Munshi (Part-III) ।

১৪১. "Karan...had made arrangements for marrying Deval-Devi to prince Shankar the eldest son of Ramchandra of Devagiri, while she was being escorted towards Devagiri, she fell into the hands of Alap Khan...who was proceeding to join Malik Kafur in order to co-operate with him in the Devagiri expedition. Deval Devi was sent to Delhi and married to Khizr Khan." —Page-124, History of India, A. L. Srivastav, Agra,

১৪২. "But Raja Karan escaped with his daughter Deval Devi and took shelter of Ramchandra of Devagiri".
—Page-119, ibid.

১৪৩. "Mean while kafur had occupied Illichpur and appointed a Turkish Government to take charge of it. Then he marched upon Devagiri itself. Ramchandra Deva submitted." —Page-124, ibid.

১৪৪. "...Kafur perceiving that the Sultan's end was near, hatched a conspiracy of putting away his rivals from his path of ambition and to seize the throne for himself. He made Ala-ud-din believe that Khizr Khan, the queen and Alap Khan had entered into a plot to take his life. Khizr Khan, therefore was sent to the prison fortress of Gwalior and the queen was imprisoned in old Delhi. Alap Khan was put to death. ...Alap Khan's troop's rose in rebellion in Gujrat. The Rana of Chittor drove away the Muslim garrison and occupied his capital... . The news of these rebellions aggravated Ala-ud-din's disorder and he died on 2nd January 1316." —Page-129, History of India, A. L. Srivastav.

"Towards the close of his reign the Sultan's health was impaired and he became the prey of unjust suspicious of others, while placing implicit confidence in the eunuch Kafur, who is suspected of having hastened his end." —Page-113, The Oxford Student's History of India, V. A. Smith, Calcutta,

১৪৫. 'তখন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বরপণ প্রথা এমন ভীষণ আকার ধারণ করে যে কন্যাদায়ে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ একেবারে সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িত। বিচারপতি স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় গিরিশচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়া এই নাটকখানি রচনা করান।' —পৃ-১৭৭, ভারতীয় নাট্যমঞ্চ।

—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কলিকাতা, ১৯৪৭।

১৪৬. "Its foundation was the Attic Comus, a popular ritual where in a group of revellers organized processions and sang songs of doubtful propriety in honour of Dionysus." —Page-90, World Drama—A Nicoll, London,

১৪৭. "The ludicrous or comic is the unexpected loosening or relaxing this stress below its usual pitch of intensity, by such an abrupt transposition of the order or our ideas, as lacking the mind unawares, throws it off its guard, startles it into a lively sense of pleasure and leaves no time nor inclination

for painful reflections." —Page-7, The Collected works of William Hazlitt—Vol. VIII, A. R. walter and Arnold Glover, London, 1903.

১৪৮. পৃ. ১৩১। পঞ্চভূত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কলিকাতা, ১৩৭৩।

১৪৯. "Comedy is the art of the lesser orders of men. It tends to dramatise those material circumstances and bodily functions which are banished from the tragic stage." —Page-247, The death of Tragedy, George Steiner, 1961, London.

১৫০. "Laughter must be something of this kind, a sort of social jesture." —Page-20, Laughter—H. Bergson, London, 1913.

১৫১. পৃ. ২৭২, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন, ১৩৪২, কলিকাতা।

১৫২. "What Shakespeare does…is to merge both traditions thereby formulating a unique theory of comedy." —Page-20, Shakespeare's Comlc Theory—A. T. Nelson.

১৫৩. পৃ. ৬, বাংলা সাহিত্যে লঘুনাট্যের ধারা—বৈদ্যনাথ শীল, কলিকাতা, ১৩৭৮।

১৫৪. "Comedy lending its action to a happy ending, leaving its characters at the end in harmony with the world is bound to put its highest values on qualities which make for world happiness and success." —Page-122, Shakespearian Comedy—H. B. Charlton, London,

১৫৫. 'হাস্যস্থানানি যানি স্যুঃ কার্যোৎপন্নানি নাটকে।
উত্তমাধমমধ্যানামেবং তানি প্রযোজয়েৎ'

—শ্লোক ৬০, ষষ্ঠ অধ্যায়, নাট্যশাস্ত্র, ভরত।

বঙ্গানুবাদ ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ ছন্দা চক্রবর্তী।

১৫৬, "The ridiculous being that in which the mistake flows from some fault in the character of the agent, the ludicrous that in which it does not, but stems from ignorance of particular circumstances or from chance." —Page-91, The Theory of Comedy—Elder Olson,

"হিউমারের মধ্যে অনুভূতিগুলি সজাগ ও সক্রিয়রূপে অবস্থান করিতেছে। হাস্যের বুদ্ধির দ্বারা মার্জিত হইলেও ইহার অধিষ্ঠান অনুভূতি সজল অন্তরে"। —পৃ. ৩৬, বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা—ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, ১৯৪৮।

১৫৭. "প্রকৃত হাস্যরসের উপাদান···দরদ, ভালোবাসা। প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অসংগতিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ।" পৃ. ৮, বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস—অজিত দত্ত। কলিকাতা, ১৯৬৩।

১৫৮. যদ্বাক্যং বাদকুশলৈরুপায়েনাভিধীয়তে।
সদৃশার্থাভিনিষ্পন্নং স লেশ ইতি কীর্তিতঃ॥
—৩৭নং শ্লোক, সপ্তদশ অধ্যায়, নাট্যশাস্ত্র, ভরত।

১৫৯. Page-4, Wit and its relation to the unconscious—Sigmund Freud, New York, 1917.

১৬০. "The name 'Satire' comes from the Latin word 'Satura', which means primarily 'full' and then comes to mean a mixture full of different things.' It seeme to have been part of the vocabulary of food···The essence of the original name therefore was variety plus a certain down to earth naturalness or coarseness or unsophisticated heartiness···" Page-231, The Anatomy of Satire—Gilbert Highet, London, 1962.

১৬১. "The satirist lashes vice largely because of its folly ; and he lashes, besides vice, objects which are not necessarily in the least immoral.···" —Page-191, The theory of drama—A. Nicoll, Delhi, 1974.

১৬২. "In fact all forces are by its own nature one dimensional. It exploits situations." —Page-138, Understanding Drama—C. Brooks and R. B. Heilman, New York,

"মানুষের স্বাভাবিক স্ফূর্তি প্রবণতা বা আমোদপ্রিয়তা কোন সূক্ষ্মতর কলাকৌশলের বা গভীর জীবনানুভূতির নিয়ন্ত্রনাধীণ না হইয়া উদ্ভট অবস্থা ও অতিরঞ্জিত চরিত্র কল্পনার সহায়তায় আমাদের হাসির উপলক্ষ সৃষ্টি করে।" —পৃ. ৪৫-৪৬, বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা। ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, ১৯৬৮,

১৬৩. "প্রহসনে অমৃতলাল যেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্য"—পৃ. ৩৫৪, বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন, ২য় খণ্ড, ৫ম সংস্করণ, কলিকাতা।

১৬৪. "চিনির মোড়কে যেমন কুইনিনের বড়ি খাওয়ানো হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল তেমনি হাসির মোড়কে মেকি পেট্রিয়টিজম, ঝুটো ধর্ম ও সামাজিক মিথ্যাচারের উপর তাঁর তীক্ষ্ন বিদ্রূপবান বর্ষণ করেছেন" —পৃ. ১১। আত্মকথা, প্রমথ চৌধুরী।

১৬৫. 'তাঁর বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গীর আড়ালে একটি কঠিন ও অবিচল আদর্শনিষ্ঠা ছিল। সমাজ সংস্কারের মনোভাব থেকে তাঁর এ ধরণের হাস্যরস উদ্ভূত হয়নি। আতিশয্য দোষ থেকে মুক্ত করে তিনি জীবনকে একটি ভারসাম্যে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।' —পৃ. ২০০, দ্বিজেন্দ্রলাল—কবি ও নাট্যকার—রথীন্দ্রনাথ রায়, কলিকাতা, ১৩৭৮।

১৬৬. "উপহাস জিনিসটার প্রাণই হচ্ছে হাসি। হাসি বাদ দিলে তার উপটুকু থাকে, কিন্তু তার রূপটুকু থাকে না।..." সাহিত্যে চাবুক—প্রমথ চৌধুরী, সাহিত্য ১৩১৯, মাঘ।

১৬৭. "প্রথমতঃ প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয় সেগুলির স্বাভাবিকতা ও সৌন্দর্যে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই···সে কারণে আমি প্রহসন লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম"—আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭।

১৬৮. পৃ. ৭০। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৬৮, কলিকাতা।

১৬৯. **"This is the first Opera in Bengalee. It has been written in a simple and elegant style and the interest is well sustained throughout. The songs are appropriate and exquisite···. We must say that it did credit to those who were engaged in it." —The Hindu Patriot, May 22, 1865.**

১৭০. পৃষ্ঠা ১৯১, বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা—ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, কলিকাতা।

১৭১. সংবাদ প্রভাকর, ১৪ই নভেম্বর, ১৮৬৫।

১৭২. 'নাটক ও গীতাভিনয় উভয় এক সামগ্রী নহে। উহারা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ।' —নবপ্রবন্ধ, ফাল্গুন, ১২৭৪।

১৭৩. "This simplification can be seen in its extremest form in the indoor presentation of some of the early interludes when the players perform at one end of a hall, sometimes entering by whatever door or doors may be available, sometimes pressing their way through the little crowded of spectators watching their display." —Page-68, The Development of the Theatre—A. Nicoll, London,

১৭৪. Page-111, Opera Companion—George Martin, London,

১৭৫. "What ballet does is to take movements we're all familiar with—running and jumping, turning and balancing, lifting and holding—and mold attitudes that underlie these actions into a spectacle that entertains." —Complete Stories of the Great Ballets—George Balanchine—New York,

---

তৃতীয় অধ্যায়

● **নাট্যচরিত্রের স্বরূপ ঃ**

নাট্যচরিত্র বলতে চিন্তা, কথা ও কর্মের (**Thought, speech and action**) বাহককে বোঝায়। চরিত্রের একটি নির্দিস্ট বাসনা থাকে। প্রথমে এই বাসনা নিস্ক্রিয় (**Passive**) অবস্থায় থাকে। বাসনা সম্পর্কে চরিত্রের চিন্তা ও ভাবনা চরিত্রকে বাসনা পূরণের জন্য উৎসাহিত করে তোলে। সেক্ষেত্রে চরিত্রের সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বলে বাসনা সক্রিয় (**Active**) হয়ে লক্ষ্যপূরণের দিকে এগিয়ে যায়। এইভাবে চরিত্রের বাসনাকে ইচ্ছাশক্তির দ্বারা কার্যকরী করে তোলার মধ্য দিয়ে চরিত্রের উদ্দেশ্য (**Motive**) ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। নাটকের চরিত্রকে তার আকাঙ্ক্ষিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হওয়া (**knowing**), তা অনুভব করা (**Feeling**) এবং কার্যের মাধ্যমে তাকে বাস্তবায়িত (**Materialising Through Acts**) করার ক্ষেত্রে যত্নশীল হতে হয়। এই জন্য চরিত্রের বলিষ্ঠ ইচ্ছাশক্তি থাকা দরকার। এই ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ঘটনার বিস্তার ঘটে। এই ইচ্ছাশক্তিই চরিত্রের ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে থাকে।[১] এইভাবে চিন্তা, কথা ও কার্যের সমন্বয় সাধনের দ্বারা চরিত্র নাটকের সমৃদ্ধি আনয়ণ করে। সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির দ্বারা চালিত হয়ে লক্ষ্যপূরণে সক্রিয় হয়ে উঠলেই চরিত্র তার আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করে না। এক্ষেত্রে চরিত্র তার লক্ষ্যপথে বিভিন্ন শক্তির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। চরিত্রও বাধাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে। এর ফলে চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বস্তুগত বাহ্যিক প্রকাশ হল ঘটনা। চরিত্র ঘটনা সৃষ্টি করে, আবার চরিত্রই ঘটনার নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। এইভাবে সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত ঘটনা নিয়ে নাটক রচিত হয়। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের মতে চরিত্র ঘটনার নিয়ন্ত্রক নয়, ঘটনাই চরিত্রের নিয়ন্ত্রক। নাটকে ঘটনা মুখ্য, চরিত্র গৌণ।[২] কিন্তু নাটকে বৃত্ত (plot) এবং চরিত্রের মধ্যে কোনটিরই গুরুত্ব কম নয়।[৩] আকর্ষণীয় ঘটনা ছাড়া যেমন নাটক জমে না তেমনি আকর্ষণীয় চরিত্র ছাড়াও নাটক জমে না। অনেক সময় এমন হতে পারে যে নাটকে ঘটনার আকর্ষণ আছে কিন্তু চরিত্র চিত্রণ তেমন ভালো হল না। আবার নাটকে চরিত্র চিত্রণ তেমন ভালো হলেও ঘটনা আকর্ষণীয় হয়ে উঠল না। এরকম ক্ষেত্রে নাটক ঠিক জমে ওঠে না। তাই নাটকে আকর্ষণীয় ঘটনা ও আকর্ষণীয় চরিত্র দুয়েরই প্রয়োজন আছে। চরিত্রই তার মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঘটনার সৃষ্টি করে এবং এটা আমরা নাটকে দেখতে চাই। কারণ এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আসল কথা এটাও নাট্যকারের পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে নাটকে ঘটে থাকে। নাটকে এমনভাবে তা ঘটে যা সহজে পাঠক বা দর্শকের কাছে ধরা পড়ে না।

এইখানেই নাট্যকারের মুন্সিয়ানার পরিচয়। চরিত্রের সঙ্গে বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দুইভাবে সংঘটিত হয়। কখনো চরিত্রের মধ্যে দুটি ভাব নিয়ে এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া গড়ে ওঠে। অর্থাৎ চরিত্রের এক প্রবৃত্তির সঙ্গে আর এক প্রবৃত্তির বা চরিত্রের প্রবৃত্তির সঙ্গে নিবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। একে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব (Internal conflict) বলা হয়। আবার সময় বিশেষে প্রতিকূল সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে বা কোন ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গেও চরিত্রের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। একে চরিত্রের বহির্দ্বন্দ্ব (external conflict) বলা হয়। নাটকের উৎকর্ষ চরিত্রের এই দ্বন্দ্বময় অবস্থা সৃষ্টির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।[৪] অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে চরিত্রের প্রকাশ চরিত্রকে আকর্ষণীয় করে তোলে। এই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে চরিত্রের বিভিন্ন দিকগুলি মূর্ত হয়ে ওঠে। চরিত্রের দ্বন্দ্বই চরিত্রকে গতিশীল করে তোলে। কারণ গতির মূলেই আছে দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব যত তীব্র হয় নাটকের সমস্যাও তত বেশী সংকটমুখী হয়ে নাটকের মধ্যে ঔৎসুক্য ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে থাকে। তাই নাটকে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষময় চরিত্রই প্রয়োজন। যে চরিত্রের মধ্যে বলিষ্ঠ-ইচ্ছাশক্তির অভাবে দ্বন্দ্বকে ধরে রাখার ক্ষমতা থাকে না, তা দুর্বল চরিত্র বিশেষ। উত্থান পতনহীন এ ধরণের ফ্ল্যাট চরিত্র নাটকের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

নাটকের মধ্যে চরিত্রের এই দ্বন্দ্ব নানান রূপে প্রকাশ লাভ করে। দ্বন্দ্ব অনেক সময় একটা স্তর থেকে আর একটা স্তরে যুক্তিগত ও কার্যকারণ সম্মতভাবে ক্রম-পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। এ ধরণের দ্বন্দ্বকে **Rising conflict** বলা হয়। নাটক ও নাট্য চরিত্রের সমৃদ্ধি সাধনের জন্য নাটকের মধ্যে ধীরে ধীরে ক্রম-প্রসারিত দ্বন্দ্ব একান্তভাবে কাম্য। অনেক সময় দ্বন্দ্ব এক স্তর থেকে আর এক স্তরে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে থাকে। এ ধরণের দ্বন্দ্বকে **Jumping conflict** বলা হয়। চরিত্রের চিন্তা-ভাবনা ও কার্যের মধ্যে যুক্তির অভাব ঘটলে, কিংবা কার্যকারণের মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দিলে নাটকে এ ধরণের দ্বন্দ্বের আধিপত্য ঘটে। চরিত্রের ইচ্ছাশক্তি এবং কর্ম প্রচেষ্টার অভাবে নাট্যদ্বন্দ্ব অনেক সময় গতিহীন হয়ে পড়ে। একে **Static conflict** বলা হয়। এক্ষেত্রে আবর্ত সংকুল ঘটনার মধ্য দিয়ে চরিত্রের বিকাশ দেখান সম্ভবপর হয় না। চরিত্রের উপস্থাপনা নিছক বিবৃতিমূলক হয়ে পড়ে। সুগঠিত চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে নাট্যকার অনেক সময়েই চরিত্রের কার্যাবলীর মাধ্যমে কিছু আগে থেকে সম্ভাব্য দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত বা ভাবী দ্বন্দ্বের প্রকৃতি সম্পর্কে রেখাপাত করে থাকেন। এই দ্বন্দ্বকে **Foreshadowing conflict** বলা হয়।

নাটকের মধ্যে উপস্থাপিত চরিত্রের প্রকৃতি অনুযায়ী নাট্য চরিত্র মূলতঃ চার প্রকার হয়ে থাকে।

(১) প্রধান চরিত্র (Protagonist) :

যে চরিত্রকে অবলম্বন করে নাটকের মূল ঘটনার সূচনা, বিস্তৃতি ও সমাপ্তি ঘটে সেই চরিত্রই নাটকের মূল চরিত্র। এ চরিত্রকে অবলম্বন করেই নাটকের প্রধান রসের নিষ্পত্তি হয়। তাই একে কেন্দ্রীয় চরিত্রও বলা হয়।

(২) **প্রধান চরিত্রের বিরোধী চরিত্র** (**Antagonist**) ঃ

প্রধান চরিত্রের উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে যে চরিত্র বাধার সৃষ্টি করে, সেই চরিত্রকে প্রধান চরিত্রের বিরোধী চরিত্র বলা হয়। এই চরিত্র প্রধান চরিত্রের লক্ষ্যপূরণের অন্তরায় হয়ে ওঠে।

(৩) **সহযোগী চরিত্র** (**Allied Agents**) ঃ

সহযোগী চরিত্র দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগ প্রধান চরিত্রের সহযোগী (**Allied Agents of Protagonist**)। আর এক ভাগ বিরোধী চরিত্রের সহযোগী (**Allied Agents of Antagonist**)। এদের সহযোগিতা ছাড়া প্রধান চরিত্র ও বিরোধী চরিত্র তাদের লক্ষ্যের দিকে পেঁছাতে পারে না।

(৪) **নাট্যঘটনায় গতি-সঞ্চারকারী চরিত্র** (**Pivotal character**) ঃ

এই চরিত্র নাট্য ঘটনায় গতিদান করে এবং ঘটনার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই চরিত্র নাটকের প্রধান চরিত্র হতে পারে, বিরোধী চরিত্র হতে পারে, আবার পৃথক চরিত্রও হতে পারে। যোগেশ চৌধুরীর 'দিগ্বিজয়ী' নাটকের প্রধান চরিত্র নাদির শাহ। আবার এই 'নাদির শাহ' চরিত্রটি নাটকের গতিসঞ্চারকারী চরিত্রও বটে। শেক্সপীয়রের 'ওথেলো'-নাটকের প্রধান চরিত্র 'ওথেলো' এবং বিরোধী চরিত্র 'ইয়াগো'। 'ইয়াগো' চরিত্রই নাটকের গতি সঞ্চারকারী চরিত্র। ইবসেনের 'গোষ্ট' (**Ghosts**) নাটকের প্রধান চরিত্র **'Mrs. Alvin'** কিন্তু পাদ্রী চরিত্র (**Mr. Manders**) এই নাটকের গতি সঞ্চারকারী চরিত্র।

যে চরিত্রের পরিবর্তন হয় না তা ভালো নাট্যচরিত্র নয়। এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে চরিত্রের মানসিক তথা চারিত্রিক পরিবর্তন অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। চরিত্রের এই পরিবর্তন হঠাৎ হয় না। যুক্তি ও কার্য্যকারণের মধ্য দিয়ে চরিত্র ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়। চরিত্রের এই ক্রমপরিবর্তনই চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। চরিত্রের হঠাৎ পরিবর্তন চরিত্র গঠন কৌশলকে দুর্বল করে তোলে। এতে নাটকের নাটকীয়ত্বও ক্ষুণ্ণ হয়।[৪ক] কার্য্যকারণের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত অবস্থার শেষ স্তরে চরিত্রের অবস্থানই চরিত্রের পূর্ণ পরিবর্তনের (**Growth**) পরিচয় বহন করে। এই পূর্ণ পরিবর্তনের মধ্যে যে ক্রমিক পর্য্যায়গুলি থাকে সেগুলি চরিত্রের ক্রমপরিবর্তনের (**Development**) এক একটি স্তর বিশেষ। পর্য্যায়ক্রমে এই স্তরকে অতিক্রম করেই চরিত্র পরিবর্তনের শেষ স্তরে পেঁছায়। চরিত্রের এই ক্রমপরিবর্তন যোগ্যতার উপর নাটকের সার্থকতা নির্ভরশীল।[৫]

নাট্য গঠন রীতির দিক থেকে নাট্য-চরিত্র **Tragic** ও **Comic** এই দুই প্রকারের হয়ে থাকে। **Tragic** চরিত্র তার মনোভাবের গভীরতা, সততা, কর্মময়তা, দ্বন্দ্বসংঘাত ও চারিত্রিক শক্তির গুণে সাধারণের চেয়ে অসাধারণ হয়ে ওঠে। **Tragic** চরিত্রের ভাগ্য বিপর্য্যয়ের মূলে থাকে তার ভ্রান্তি বা কোন একটি দুর্বলতা। গ্রীক ক্লাসিক নাটকে চরিত্রের ভ্রান্তি তার নিয়তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়তিই চরিত্রের গতিধারাকে নির্দিষ্ট করে থাকে।

তথাপি দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বলে নিয়তির বিরুদ্ধে Tragic চরিত্র গভীর ও ব্যাপক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চরম পরিণতি লাভ করে থাকে। পরবর্তীকালে এলিজাবেথীয় যুগে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামরত Tragic চরিত্রের ভ্রান্তিই তাকে শেষ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে ঘটনা বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে চরিত্রের অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে চরিত্রের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটির সৃষ্টি হয়। এই ত্রুটিই চরিত্রকে নৈতিক দিক থেকে দুর্বল করে তোলে।[৬] Tragic চরিত্রের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ খুব বেশী থাকে। এই মূল্যবোধকে চরিত্র জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়। জীবন সংগ্রামের পাদপীঠে দাঁড়িয়ে যে কোন মূল্যে এই মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে Tragic চরিত্র অনুভব করে যে ন্যায়বোধকে বিসর্জন দিলে তার শাস্তি তাকেই বহন করতেই হবে। এই শাস্তি হচ্ছে মানসিক অশান্তি বা যন্ত্রণা। অন্যায় কাজের ফলে চরিত্রের মনে যে গভীর আবেগ (Passion) সৃষ্ট হয় তাই তার অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই অভিজ্ঞতারূপ জীবন দর্শনই Tragic চরিত্রের অন্যতম উপজীব্য।[৭] নিজের দুর্বলতার জন্য Tragic চরিত্রের দুই সত্তার মধ্যে যে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তা চরিত্রের বেদনাকে তীব্রতর করে তোলে এবং চরিত্র তার কৃতকর্মের ফলভোগ করতে থাকে। এই ফলভোগের মধ্য দিয়েই চরিত্রের মহত্ত্ব, পবিত্রতা, প্রকাশিত হয় এবং চরিত্র আদর্শায়িত হয়ে ওঠে। এই ফল ভোগ করার সময় তার সক্রিয়তা যেমন কাজ করে তেমনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় দারুণ যন্ত্রণার মধ্যে নীরবে তিলে তিলে শোচনীয় পরিণতিকে বরণ করে নেওয়ার মধ্যেই চরিত্র Tragic হয়ে ওঠে। চরিত্রের ক্রিয়া বলতে শুধুমাত্র প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে চরিত্রের বাহ্যিক আচার আচরণকেই বোঝায় না, প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামের সময় চরিত্রের গভীর অনুভূতি, চিন্তা, চেতনা ও মানসিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়াকেও বোঝায়। অর্থাৎ ক্রিয়া বলতে চরিত্রের দেহের ও মনের—এই উভয় প্রকার ক্রিয়াকেই বোঝায়। দেহের ক্রিয়া অপেক্ষা মনের ক্রিয়া অধিক হলেই আত্মনিপীড়ন মূলক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে চরিত্র Tragic হয়ে ওঠে। বন্দী প্রমিথিউসের মর্মান্তিক যন্ত্রণা, 'ইডিপাস এ্যাটকলোনাস'' নাটকে অন্ধ রাজা ইডিপাসের সকরুণ বিলাপময় আর্তনাদ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই চরিত্র দুটি Tragic জগতের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। শাশ্বত মূল্যবোধকে জাগ্রত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য Tragic চরিত্রকে জীবনে চরম মূল্য দিতে হয়। পরিণতিতে Tragic চরিত্র পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তারমধ্যে আপাত-জয়ের রেশ থাকে। সে জয় তার নৈতিকতার জয়, সে জয় তার শাশ্বত জীবনবোধকে তুলে ধরতে পারার জয়।[৮]

তাই Tragic চরিত্রের বেদনার মধ্যে একটা বিশ্বজনীন আবেদন থাকে। চরিত্রটি তখন শুধুমাত্র ব্যক্তি বিশেষের দুঃখ দুর্দশা, বিপর্যয় বা বেদনার আধার হয়ে ওঠে না। মহত্ত্ব, পবিত্রতা ও নৈতিকতার গুণে Tragic চরিত্রটি সাধারণ হয়েও অসাধারণ হয়ে ওঠে। আনন্দবেদনা ও দুঃখ যন্ত্রনায় মথিত Tragic চরিত্রটি তখন

সার্বিকভাবে মানবজাতির আনন্দ-বেদনা ও দুঃখ-যন্ত্রনা'র প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। বহুবিধ গুণের আধার হওয়া সত্ত্বেও একটি মাত্র ত্রুটির জন্য **Tragic** চরিত্রের চরম পরিণতি আমাদের মনে শোচনার উদ্রেক করে। ট্র্যাজিক চরিত্র আমাদের মত একজন মানুষ। তাই যে কারণে তার পতন হয়েছে সেই কারণটি আমাদের মধ্যে থাকলে আমাদেরও ঐরকম শোচনীয় পরিণতিঘটতে পারে। এই ভেবেআমরা ভীতও হয়ে পড়ি।

Comedy'র চরিত্রের মধ্যে জীবনবোধের এই গভীরতা থাকে না ; চরিত্র হাল্কা ধরণের হয়। চরিত্রের নানান প্রকার উৎকেন্দ্রিক কার্য্যকলাপ, বোকামী, দুর্বলতা, অসঙ্গতি ও বিকৃতিকে কেন্দ্র করে হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়।[৯] আনন্দ ভোগই মূলত এর উদ্দেশ্য। তাই **Comedy'**র চরিত্র মিলনাত্মক হয়ে ওঠে।

যে ধরণের চরিত্রই হোক না কেন, নাটকের মধ্যে বিভিন্ন মনোভাবযুক্ত চরিত্রের সমন্বয়ে ঐকতান (**orchestration**) সৃষ্টি করা অত্যাবশ্যক। বিভিন্ন রকমের ফুল নিয়ে যেমন একটি ফুলের তোড়া তৈরী হয় তেমনি বিভিন্ন মনোভাব সম্পন্ন চরিত্রের সমন্বয়ে এই ঐক-ভাব গড়ে তুলতে হয়। এই ঐক-ভাব নাটককে আকর্ষণীয় করে তোলে। কারণ নাটকে একাধিক চরিত্রের মনোভাবের সমন্বয় ঘটাতে হয়। ঘটনার সঙ্গে সংযোগহীন চরিত্রের আকস্মিক উপস্থাপনা, পার্শ্ব ও সহায়ক চরিত্রের চাপে মূল চরিত্রের গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যাওয়া, মূল চরিত্রের মধ্যে অযৌক্তিকভাবে ভাবাবেগের প্রাবল্য দেখা দেওয়া, চরিত্রের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে পারস্পরিক সঙ্গতির অভাব, চরিত্র বিন্যাসে ঔচিত্যবোধসহ বাস্তবতা ও সম্ভাব্যতার অভাব—এ সকল কারণে নাটকের মধ্যে চরিত্রের ঐকতান ব্যাহত হয় এবং নাটক দুর্বল হয়ে পড়ে।

নাটকের মধ্যে নানাপ্রকারের চিন্তাভাবনার পরিচয় ও বিভিন্ন প্রকার জীবন সমস্যার আলোচনা থাকা প্রয়োজন। চরিত্র অবলম্বনেই এ সব সম্পন্ন করতে হয়। দোষে-গুণে মানব জীবনের পরিচয় তুলে ধরতে হয়। এইরকম মানব চরিত্রই নাটকে প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত এবং প্রতিটি চরিত্রই আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হওয়া প্রয়োজন। মানবিক গুণসম্পন্ন চরিত্রের সুষ্ঠু বিন্যাসের মধ্য দিয়ে কোন শাশ্বত-বোধকে মূর্ত্ত করে তুললে চরিত্রের আবেদন বিশ্বমুখী হয়ে ওঠে। নাট্যচরিত্রের এ এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে **"All great poetry and art fulfil this law of universality."**[১০]

নাটকের চরিত্রকে অবশ্যই ত্রৈমাণিক হতে হবে। এর ব্যতিরেকে চরিত্রের সামঞ্জস্যপূর্ণ, যুক্তিপূর্ণ ও সম্ভাব্যতাপূর্ণ পরিণতি দেখান সম্ভব হয় না। এই ত্রৈমাণিক অবস্থা বলতে চরিত্রের (ক) শারীরিক দিক (**Physiology**), (খ) সামাজিক দিক (**Sociology**), এবং এই দুইবৃত্তের সমন্বয়ে গঠিত চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিককে (**Psychology**) বোঝায়। এখন এ বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

(ক) শারীরিক দিক (**Physiology**)

চরিত্রের শারীরগত অবস্থান বলতে চরিত্রের লিঙ্গ বিভাগ, তার বয়স, স্বাস্থ্য, দেহের আভ্যন্তরীণ গঠনক্রিয়া, দেহগত সৌন্দর্য এবং বংশধারাকে বোঝায়। চরিত্র

জন্মলগ্নেই কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তির অধিকারী হয়। বংশগত ধারা অনুসারে এ সকল প্রবৃত্তি প্রসার লাভ করে। পিতৃবীজ ও মাতৃকোষের মিলনে যে গর্ভের সৃষ্টি হয় তার মধ্যে মোট ছেচল্লিশটি ক্রোমসোম থাকে। প্রত্যেকটি ক্রোমসোমের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার মত অসংখ্য গুটিকা বা দানা থাকে। এই দানাগুলি হোল জটিল গঠনসম্মত রাসায়নিক পদার্থ। এই পদার্থটিকে উৎপাদক অণু বা জিন বলা হয়। এই জিনগুলির দ্বারাই চরিত্রের বংশগত ধারা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।[১১] জিনগুলির পারস্পরিক মিলনের বিশিষ্টতা চরিত্রের দৈহিক গঠন নির্ধারণ করে দেয়। চরিত্রের স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন এদের উপরই নির্ভরশীল। এ ছাড়া শারীরিক প্রকৃতিই চরিত্রের বিভিন্ন প্রক্ষোভ (**Emotion**), তার বুদ্ধি (**Intellect**), মেজাজ (**Temparament**), ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ (**Traits of Personality**) এবং তার চিন্তাশক্তি (**Thought**), কল্পনাশক্তি (**Imagination**) ও ইচ্ছাশক্তিকে (**Volition**) অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

(খ) সামাজিক দিক (**Sociology**)

সামাজিক দিক বলতে মানুষের পারিপার্শ্বিকতাকে (**Physical environment**) বুঝায়। এই পারিপার্শ্বিকতা প্রসঙ্গে চরিত্রের পারিবারিক পরিবেশের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। পরিবারের সদস্যদের অর্থাৎ মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগ্নী ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়ের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি এবং জীবন দর্শন—চরিত্রের ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে।[১২] চরিত্রের প্রতি পিতামাতার অতিরিক্ত আশৈশব যত্নশীলতা এবং সাবধানতা অবলম্বনের ফলে চরিত্রের মধ্যে ভবিষ্যতে কোন বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করা বা কোন বিষয়ে স্বাধীনভাবে কার্য্য করার ক্ষমতা ও প্রবণতা নষ্ট হয়। আবার পিতামাতার প্রয়োজনীয় শাসনের অভাবে চরিত্রের মধ্যে দায়িত্ব জ্ঞানের অভাব, স্বেচ্ছাচারিতা, লাম্পট্য দেখা দেয়। উপরন্তু পিতামাতার ঔদাসীন্য ও অবহেলার ফলে চরিত্রের মধ্যে সন্দেহ প্রবণতা, বিষণ্ণতা, মানসিক ভারসাম্যহীনতা গড়ে ওঠে। পিতামাতার অতিরিক্ত শাসনের ফলে চরিত্রের মধ্যে বিদ্রোহী মনোভাবের প্রকাশ ঘটে। শিক্ষা দীক্ষার মান এবং শিক্ষায়তনের পরিবেশের প্রভাবে চরিত্রের মধ্যে সংস্কৃতি চেতনা, বিচার বোধ ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতা গড়ে ওঠে। এছাড়া সমাজস্থ ধর্মীয় পরিবেশ, চরিত্রের কর্মক্ষেত্রের বিশিষ্টতা, রাজনৈতিক পটভূমিকা, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের বিশেষত্ব, লোকাচার ইত্যাদির প্রভাবেও চরিত্র নানারকম বিশিষ্টতা অর্জন করে। সামাজিক জীব হিসাবে ব্যক্তির সংগে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির এবং সমষ্টির সঙ্গে সমষ্টির কার্য্যকলাপ, আচার-আচরণ, ভাব ও সংস্কৃতির বিনিময়ের দ্বারাই ব্যক্তি চরিত্র জীবন ও জগত সম্পর্কে নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করে থাকে। সমাজের সংগে চরিত্রের এই অভিযোজন ব্যতিরেকে ব্যক্তি চরিত্র গড়ে উঠতে পারে না। সুতরাং শুধুমাত্র বংশধারার উপর চরিত্রের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না। আবার বংশধারা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র পরিবেশের দ্বারা চরিত্রের ব্যক্তিসত্তা সৃষ্ট হয় না। বংশগতভাবে

চরিত্র যে সকল মৌলিক উপাদান লাভ করে থাকে পরিবেশের প্রভাবে তা ক্রমশঃ পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিত্বের নতুন নতুন প্রলক্ষণের (Traits) সৃষ্টি করে। এইভাবে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে চরিত্র নতুন দৃষ্টিশক্তি লাভ করে থাকে।[১৩]

(গ) মনস্তাত্ত্বিক দিক (Psychology)

মনস্তাত্ত্বিক দিক বলতে চরিত্রের মানসিক প্রকৃতিকে বোঝায়। চরিত্রের শারীরিক দিক এবং সামাজিক দিকের সমন্বয়ে এই মনস্তাত্ত্বিক বৃত্ত গড়ে ওড়ে। মনস্তাত্ত্বিকতার দিক থেকে চরিত্র তিনপ্রকার হয়ে থাকে। (১) বহির্বৃত্ত (Extrovert), (২) অন্তর্বৃত্ত (Introvert) এবং (৩) উভয়বৃত্ত (Ambivert)।

(১) বহির্বৃত্ত (Extrovert)

এ ধরণের চরিত্র কথা ও কাজের মাধ্যমে নিজের মনোগত ভাব, অভিপ্রায় ইত্যাদিকে অধিক ভাবে প্রকাশ করে থাকে। আত্মচিন্তায় মগ্ন না থেকে এরা বহির্বিশ্বের কর্ম কোলাহলে নিজেদের সম্পৃক্ত রাখে। অর্থাৎ বাহ্যবস্তু এবং বহির্জগতের প্রতিই এদের আকর্ষণ সমধিক। চরিত্র স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবেশের সঙ্গে খুব সহজেই সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে। যে কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও এদের থাকে। চরিত্রের কার্যধারা বাধাপ্রাপ্ত হলে চরিত্র প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠে। বাহ্যিক কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে এ ধরণের চরিত্র আনন্দ লাভ করে।

(২) অন্তর্বৃত্ত (Introvert)

এ ধরণের চরিত্রের প্রক্ষোভগুলির বাহ্যিক প্রকাশ খুব কম। চরিত্র সাধারণত স্বল্পবাক্, সংযত ও গাম্ভীর্যময় হয়। চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্দর্শনমূলক ও আত্মমুখী হয়। চিন্তাশীলতা চরিত্রের সহজাত বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। বাইরের প্রকাশ কম থাকায় চরিত্রের প্রক্ষোভগুলি অন্তর্মুখী হয়। এর ফলে চরিত্রের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া খুব বেশী হয়। পরিবেশের দ্বারা পিষ্ট হলে অন্তর্দ্বন্দ্বে চরিত্র ক্ষতবিক্ষত হয়ে থাকে। নতুন পরিবেশের সঙ্গে চরিত্রটি সহজে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে না।

(৩) উভয়বৃত্ত (Ambivert)

বস্তুতপক্ষে খুব অল্পসংখ্যক চরিত্রই সম্পূর্ণভাবে অন্তর্বৃত্ত বা বহির্বৃত্ত হয়ে থাকে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই চরিত্রের মধ্যে অন্তর্বৃত্ত এবং বহির্বৃত্ত এই উভয় প্রকৃতির সমন্বয় দেখা যায়। চরিত্রের মানসিকতায় একাধারে আত্মকেন্দ্রিকতা ও সমাজকেন্দ্রিকতা উভয়ই যুগপৎ ক্রিয়াশীল থাকে। এই প্রকৃতির চরিত্রই উভয়বৃত্তের আওতায় পড়ে।[১৪]

চরিত্র ব্যাখ্যার প্রয়োজনে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে চরিত্রের বিভিন্ন প্রকার মানসিক স্তরের বিশ্লেষণও প্রয়োজন। মানসিক চেতনার বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে চরিত্রের মানস-প্রকৃতির নিবিড় যোগসূত্র বিদ্যমান। চরিত্রের চেতনা তার মনের একটি মৌলিক অবস্থা। এর সঙ্গে চরিত্রের চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা ও মানসিক প্রক্রিয়া পারস্পরিক ঐক্য-সমন্বিত হয়ে অবস্থান করে। চরিত্রের চেতনার স্তর তিনটি ভাগে বিভক্ত। এই তিনটি ভাগ হল (১) চেতন (conscious), (২) অবচেতন (subconscious), (৩) অচেতন (unconscious)।

(১) **চেতন** (conscious)

মনের চেতন স্তরের সঙ্গে বাস্তব জগতের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে।

(২) **অবচেতন** (subconscious)

মনের এই স্তরের সঙ্গে বাহ্যিক জগতের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু ইচ্ছাশক্তির দ্বারা এই স্তরের সঙ্গে চেতন স্তরের সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।

মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড এই অবচেতন স্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। তাঁর মতে চেতন ও অবচেতন এই দুই স্তরের মধ্যে প্রাক্‌চেতন (Preconscious) বলে একটি স্তর থাকে। প্রাক্‌চেতনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্ব থেকে অবহিত থাকার ফলে প্রয়োজন অনুসারে চিন্তার দ্বারা তা সহজেই চেতনস্তরে পৌঁছায়।[১৫]

(৩) **অচেতন** (unconscious)

উপরিউক্ত দুটি স্তর ছাড়াও চেতনার আরও একটি গভীর স্তর আছে। এই স্তর সম্পর্কে চরিত্র কোনরূপ সচেতন না থাকলেও মনের সঙ্গে এর গভীর ও ব্যাপক সম্পর্ক বিদ্যমান। চেতনার ক্ষেত্রের বাইরে এর অবস্থান। চরিত্রের চেতন মনের অনেক কামনা বাসনা পূর্ণ হতে না পেরে বা পরিবেশের চাপে পড়ে এই কামনা-বাসনা অবদমিত হয়ে এই অচেতন মনে স্থান লাভ করে। এ ছাড়া জন্মলব্ধ কিছু অসংস্কৃত কামনা বাসনাও এই অচেতন স্তরে শুরু থেকেই থেকে যায়। চরিত্রের বিচার-ক্ষমতা ও বুদ্ধির অভাব ঘটলে চরিত্রের অচেতন স্তরের এসব অসংস্কৃত আদিম প্রবৃত্তি তার কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। সময় বিশেষে অচেতন মনের এ সকল অবদমিত বাসনা অব্যক্ত রূপে (Latent Content) ছদ্মবেশে চেতনস্তরেও চলে আসতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে চরিত্রের চেতন, প্রাক্‌চেতন ও অবচেতনের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে কোন বিভাজন করা যায় না। কারণ চেতনার স্থায়িত্ব খুবই স্বল্প। যা বর্তমানে চেতনস্তরে আছে তা কিছুক্ষণ পরেই প্রাক্‌চেতন বা অচেতন স্তরে চলে যায়। আবার অবচেতন স্তর থেকে বিষয়বস্তু প্রাক্‌চেতন ও চেতনস্তরেও চলে আসে।

চরিত্রের মনের আরও তিনটি পৃথক ভাব বর্তমান। এ সকল ভাব চরিত্রের চিন্তা ও কার্যধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। এই তিনটি ভাব হোল ইদম্ (Id), অহম্ (Ego) এবং অধিসত্তা (Super or Ideal ego).

(১) **ইদম্** (ID)

বিবর্তনশীল মনের আদিমতম অবস্থা হচ্ছে এই ইদম্। চরিত্রের মধ্যে এই ইদম্ জন্মগতভাবে লব্ধ বন্যপ্রবৃত্তির পরিচয় বহন করে। অর্থাৎ ইদম্ হোল লিবিডোর (Libido) আদিমতম আধার। এর দ্বারা চরিত্র শুধুমাত্র আত্মসুখ-ভোগ-সর্বস্ব হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে চরিত্র সকল প্রকার শিক্ষা-দীক্ষা যুক্তি ও ন্যায়নীতির বাধকে অবদমিত করে রাখে। ইদমের সঙ্গে মনের অচেতন স্তরের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।

(২) **অহম্** (Ego)

বহির্জগতের সংস্পর্শে এসে ইদমের সংশোধিত ও পরিমার্জিত রূপই হচ্ছে চরিত্রের অহম্।[১৬] 'ইদম' কামনা বাসনার দ্যোতক হলেও এই 'অহমের' সাহায্যেই 'ইদম' তার ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করে থাকে। সেজন্য অহমের মধ্যে চেতন ও অচেতন এই দুই স্তরের সম্পর্ক বিদ্যমান। চেতন অংশটি বাস্তবের সঙ্গে সংযুক্ত আর অচেতন অংশটি ইদমের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বাস্তববোধ, লাভ-অলাভ, স্বার্থপরতা, প্রভৃতির দ্বারা অহম চালিত হয়। সামাজিক বিধিনিষেধের অভাব ঘটলে অহমের সঙ্গে যুক্ত ইদম এর বন্য প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার চেষ্টা চরিত্রের মধ্যে খুব প্রবল হয়ে ওঠে। অহমের সাহায্যে চরিত্র তার পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করে আত্মপ্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হয়। অহমের মূলেও থাকে চরিত্রের সুখভোগের অদম্য স্পৃহা (**Pleasurable Principle**).

(৩) **অধিসত্তা** (**Super or Ideal Ego**)

চরিত্রের নৈতিকবোধের পরিচায়ক হচ্ছে চরিত্রের অধিসত্তা। পরিবার ও সমাজের কাছ থেকে নৈতিক শিক্ষা এবং নিজের ভালো মন্দের ধ্যান-ধারণা—এই দুয়ের দ্বারা চরিত্রের মধ্যে এই অধিসত্তা গড়ে উঠে।[১৭] মনের এই সত্তার সাহায্যে চরিত্র একদিকে ইদম প্রসূত কামনা বাসনাগুলিকে দমন করে থাকে এবং অপরদিকে অহমজাত অযৌক্তিক কার্য্যাবলীকে সমালোচনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। অহম হচ্ছে চরিত্রের বহির্জগতের প্রতীক আর অধিসত্তা হচ্ছে চরিত্রের অন্তর্জগতের প্রতীক। অহম এবং অধিসত্তার দ্বন্দ্বেই চরিত্র অধিক আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

এইভাবে নাট্যচরিত্রের বংশগত ধারা ও তার সামাজিক বিন্যাস এবং চরিত্রের মানসিক জগতের ইদম, অহম, ও অধিসত্তার প্রভাবের ফলে চরিত্রের আচার আচরণ গড়ে ওঠে। এর প্রভাবেই সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে তার অভিযোজন নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ব্যক্তির সার্বিক রূপ ও ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে।

নাট্যচরিত্রের এই ব্যক্তিত্বকে সংঘাতময় ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হয়। নাটকের প্রথমে চরিত্র যে অবস্থায় থাকে ঘটনাবলীর ঘাত প্রতিঘাতে চরিত্রের সেই অবস্থা নাটকের শেষে পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। এটাই একান্তভাবে কাম্য।

ঘটনার মধ্য দিয়ে পরিশীলিত হয়ে পরিবর্তনের শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে চরিত্র তার অভিজ্ঞতা লব্ধ জীবন-সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক এবং অন্যান্য নাটকের বিভিন্ন প্রকার চরিত্রের বিশ্লেষণ করা যাক।

● (ক/১) পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের প্রধান চরিত্র (protagonist) :

সাবিত্রী (সাবিত্রী—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)।

এই নাটকের প্রধান চরিত্র সাবিত্রী। ধার্মিক রাজা অশ্বপতির কন্যা 'সাবিত্রী' চরিত্রটি শারীরগত-সামাজিকগত ও মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী ত্রৈমাণিক হয়ে উঠেছে। দেব-দ্বিজে ভক্তি ও শ্রদ্ধা, ধর্মনিষ্ঠা, শাস্ত্রজ্ঞান, কর্ত্তব্য পরায়ণতা, ওজস্বিতা এবং বিনয়-নম্রভাব ইত্যাদি চারিত্রিক গুণের মধ্য দিয়ে চরিত্রটি বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। পাতিব্রত্যের আদর্শের প্রতিষ্ঠা সাবিত্রী চরিত্রের লক্ষ্য। সেক্ষেত্রে মৃত স্বামীকে পুনরায় জীবিত করার জন্য বলিষ্ঠ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা চালিত হয়ে দৈব বিধানের সঙ্গে সাবিত্রী সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কর্মের মধ্য দিয়েই নিয়তির অমোঘ বিধানের বিরুদ্ধে সাবিত্রী রুখে দাঁড়িয়েছেন। অদৃষ্টবাদকে খণ্ডন করতে নিজেই নিজের ভাগ্য-গড়ার লড়াই-এ অবতীর্ণ হয়েছেন। এক্ষেত্রে সাবিত্রীর পতি-প্রেম-নিষ্ঠা, আত্মসংযম প্রবৃত্তি, চিত্তের শুদ্ধতা ও সতী-শক্তির দৃঢ়তা তাঁকে অসাধারণ মানসিক বলের অধিকারী করেছে। এই মানসিক বলের সঙ্গে তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ধীশক্তি, বাক্‌চাতুর্য্য, এবং গভীর শাস্ত্রজ্ঞান তাঁকে নিয়তির বিরুদ্ধে লড়াই এ জয়ী করেছে। সতীত্ব শক্তির জোরে যমের কাছ থেকে পতির প্রাণলাভের দুঃসাধ্য কাজকে সাবিত্রী সম্ভব করে তুলেছেন। তবে প্রথম থেকেই মানবী সাবিত্রীর উপর 'দেবীত্ব' আরোপ করা হয়েছে। চরিত্রের কার্য্যাবলীর সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে আগের থেকেই একটা সিদ্ধ ধারণা সৃষ্টি করে নাট্যপরিমণ্ডল গঠন করা হয়েছে। এর ফলে সাবিত্রী চরিত্রের ক্রমোন্নতি ও পরিণতির বিভিন্ন স্তরের নাট্য-ঔৎসুক্য দুর্বল হয়ে পড়েছে।

উলুপী (উলুপী—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)।

উলুপী একাধারে নাটকের প্রধান চরিত্র ও নাট্যঘটনার গতিসঞ্চারকারী চরিত্র। উলুপী রাজা 'অনন্তনাগের' কন্যা। শারীরিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে চরিত্রটি ত্রৈমাণিক রূপে চিত্রিত হয়েছে। পতিপরায়ণা উলুপীর পাতিব্রত্যের পরীক্ষার উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে নাট্য-ঘটনার শুরু। নারদ উলুপীকে একটি মণি দান করেন। এই মণির সাহায্যে উলুপী যে কোন একজন মাত্র মৃত ব্যক্তিকে পুনরায় বাঁচিয়ে তুলতে পারবে বলে নারদ উলুপীকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। এইভাবে নারদ এই গুণ-সম্পন্ন মণিটি উলুপীকে দিয়ে উলুপীর পাতিব্রত্যের পরীক্ষার

হোমানল জ্বালিয়ে দিয়ে যান।ক নারদের মুখে ভবিষ্যতে পুত্রশোক ও স্বামী-ঘাতিনীর দুর্ভাগ্য তাঁকে বহন করতে হবে জেনে উলুপী সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। পুত্রের মঙ্গলের আশায় উলুপী প্রাণপ্রদায়ী মণিটি অনন্তনাগকে দিয়ে দেন। মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্ত হবার জন্য উলুপী গঙ্গায় আত্মবিসর্জনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সেই সময় উলুপী জানতে পারেন যে গঙ্গার অভিশাপে পতিত তাঁর স্বামী ভবিষ্যতে রৌরব-নরকে বাস করবেন। এই ঘটনা তাঁকে বিচলিত করে। নিজের মরণ অপেক্ষা স্বামীর নরক গমণের যন্ত্রণা মোচনই উলুপীর জীবনের মূল উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে।খ স্বামীর অভিশাপ মুক্তির জন্য গঙ্গার-বিধান অনুযায়ী উলুপীর পুত্র হস্তে অর্জুনের মৃত্যুর হৃদয় বিদারক ঘটনাকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব বহন করে নেবার জন্য উলুপী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এখান থেকেই উলুপীর জীবনের নাটকীয়ত্বের শুরু। প্রবল ইচ্ছাশক্তি চরিত্রের মনে নতুন শক্তির সঞ্চার করে। স্বীয় পুত্র ইলাবন্তকে অর্জুনের বিরুদ্ধাচারী করতে না পেরে উলুপী অর্জুনের ঔরসে চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত পুত্র 'বভ্রুবাহনকে' অর্জুনের অশ্বমেধের ঘোড়া আটকাবার পরামর্শ দেন। বভ্রুবাহন অশ্বমেধের ঘোড়া আটকায়। অর্জুন কর্তৃক বভ্রুবাহন লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। এই পটভূমিকায় অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উলুপী বভ্রুবাহনকে প্ররোচিত করেন। কুরুক্ষেত্র রণে অর্জুনের সঙ্গে বভ্রুবাহনের যুদ্ধ উলুপীর হৃদয়েও এক ভীষণ যুদ্ধের সূচনা করে। একদিকে অর্জুন ও ইলাবন্ত, অপরদিকে উলুপীর সাহচর্যে ও উলুপীর প্রেরণায় উদ্দীপ্ত বভ্রুবাহন। এই ঘোরযুদ্ধে ইলাবন্তকে নিধন না করলে বভ্রুবাহনের পক্ষে অর্জুনকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রাণপ্রদায়ী মণির গুণে ইলাবন্ত অমিত শক্তির অধিকারী। উলুপীর চরিত্রে সংকট ঘনীভূত হতে থাকে। অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা বাড়তে থাকে। এ দ্বন্দ্ব তাঁর মাতৃসত্তার সঙ্গে স্ত্রী সত্তার দ্বন্দ্ব। মাতৃসত্তার জন্য ইলাবন্তর মৃত্যু তাঁর পক্ষে হৃদয়-বিদারক ঘটনা। আবার স্ত্রী সত্তার জন্য স্বামীকে অভিশাপ-মুক্ত করার নৈতিক দায়িত্বও তাঁর বর্তমান। পুত্রের মৃত্যুও যেমন তাঁর কাছে অভিপ্রেয় নয় তেমনি স্বামীর নরকবাসও তাঁর কাছে শ্রেয় নয়। একদিকে পুত্রহস্তে অর্জুনের মৃত্যুতে স্বামীর অভিশাপ মুক্ত হওয়ার নিশ্চিত বিধান, অপরদিকে এই একই ঘটনায় ইলাবন্তের মৃত্যুতে উলুপীর পুত্রশোকের দুঃসহ যন্ত্রণা-প্রাপ্ত হওয়ার আবশ্যিক ঘটনা। একদিকে স্ত্রী-সত্তার জাগরণ এবং অপরদিকে মাতৃসত্তার

ক, নারদ—'মণি দিয়ে মণির পরীক্ষা, সৌন্দর্যময়ী যেন হতাশ না হই'। প্রথম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য। উলুপী।

খ. "উলুপী—মরণ মঙ্গল না নরক মঙ্গল ?…এইমাত্র জানি একদিন না একদিন মৃত্যু আছে।…তার সঙ্গে নরক আসবে কেন? যার প্রতিকার আছে, আমার দেবতার কাছে তাকে আসতে দেব কেন? নারায়ণ আমাকে স্বামী ঘাতিনীর বল দাও'।" —প্রথম অঙ্ক, সপ্তম দৃশ্য। উলুপী।

নিপীড়ন। মনস্তাত্ত্বিকের ভাষায় এ দ্বন্দ্বকে 'Approach-Aviodance'-দ্বন্দ্ব বলা হয়।[১৮] এই দ্বন্দ্বই চরিত্রকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এই দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত উলূপীর স্ত্রী-সত্তাই বড় হয়ে ওঠে। তাই তাঁর স্বামীর নরক থেকে মুক্তিলাভের পথকে নিশ্চিত করার জন্য ক্ষাত্রবীর্য্য-দীপ্ত ইলাবন্তের কাছে সংরক্ষিত প্রাণপ্রদায়ী মণিটি উলূপী কৌশলে সংগ্রহ করেন। ইলাবন্তকে 'মণি'-হারা করে উলূপী ইলাবন্তের কপালে মৃত্যুর কালোটীকা পরিয়ে দেন। বভ্রুবাহনের সঙ্গে যুদ্ধে 'মণি'-হারা ইলাবন্তের মৃত্যু হয়। ইলাবন্তের মৃত্যুর পর বভ্রুবাহনের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুন পরাজিত হন। স্ত্রী সত্তার অধিক জাগরণের ফলে প্রাণপ্রদায়ী মণির সাহায্যে উলূপী মৃত অর্জুনের প্রাণ রক্ষা করলেও ইলাবন্তের মৃত্যুতে তাঁর মাতৃসত্তা আহত হওয়ায় উলূপী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন।

উলূপীর এই অবস্থা কারুণ্যের সৃষ্টি করলেও তা ট্র্যাজিক হয়ে ওঠেনি। কারণ এই পরিণতি মনে শোচনা বা ভয়ের উদ্রেক করে না। স্বামীর অভিশাপ মুক্তির আনন্দ পুত্রবিয়োগের বেদনাকে ম্লান করে দিয়েছে।

ভীষ্ম (ভীষ্ম—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)।

'ভীষ্ম' নাটকের প্রধান ও গতিসঞ্চারকারী চরিত্র ভীষ্ম। চরিত্রটি ত্রৈমানিক। চরিত্রটির তিনটি পর্ব বিদ্যমান। প্রথম পর্বটি চরিত্রের পূর্ব-পটভূমিকা স্বরূপ নাটকে উপস্থাপিত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে চিরকুমার রূপে ভীষ্মের ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রতিজ্ঞা এবং তৃতীয় পর্বে তাঁর নরনারায়ণের সাক্ষাৎলাভ এবং ইচ্ছা-মৃত্যু বরণের কাহিনী বিন্যস্ত হয়েছে।

প্রথম পর্বে ঋষি 'আপবের' আশ্রম থেকে কামধেনু অপহরণের অপরাধে ঋষির শাপে অষ্টবসুর ইচ্ছামৃত্যুর শক্তি নিয়ে নরলোক প্রাপ্তি, স্ত্রীর প্ররোচনায় কামধেনুর অপহরণ কার্য্যে লিপ্ত হওয়ায় অষ্টবসু কর্তৃক তাঁর স্ত্রীকে মর্তলোকে সঙ্গে না নেওয়া এবং ধরাধামে কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গ গ্রহণ করবে না বলে অষ্টবসুর সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে।[ক] এসব ঘটনা ভীষ্মের পূর্ব জীবনের ইতিহাস স্বরূপ নাটকে স্থান লাভ করেছে। দ্বিতীয় পর্বে পিতা শান্তনুর সম্মান রক্ষার্থে ও সত্যবতীর গর্ভজাত সন্তানের সিংহাসন লাভের পথ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভীষ্মের ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণের ঘটনাই এই চরিত্রের ভবিষ্যৎ সংকটের কারণ রূপে গড়ে উঠেছে। দ্বিতীয় অংকের চতুর্থ দৃশ্যে বীর্য্যশুল্কে গ্রহণ করা অম্বাকে ভীষ্ম কর্তৃক বিচিত্রবীর্য্যের সঙ্গে বিবাহ দানের উদ্যোগ গ্রহণের ঘটনা থেকেই এই সংকট দানা বাঁধে। গুরু পরশুরামের আদেশ উপেক্ষা করে ভীষ্ম অম্বাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হওয়ায় পরশুরামের সঙ্গে

ক. ভীষ্ম—"যতদিন ধরা মাঝে করিব বিহার
নারীরে লব না সঙ্গী
জীবনের পথে।" প্রস্তাবনা দৃশ্য, ভীষ্ম

ভীষ্মের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের শুরু হয়। এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ ভীষ্ম-চরিত্রের সংকটকে বিস্তৃত করে তোলে। প্রবল ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ভীষ্মের মধ্যে এই সংকট কিন্তু পরবর্তীকালে দ্বন্দ্ব-ঘন হয়ে ওঠেনি। সত্য ধর্মে অবিচল ভীষ্মের মধ্যে অম্বার নারীত্ব ও তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর রূপ-যৌবনের আকর্ষণ যে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির গভীর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারত, ভীষ্মের চরিত্রে তা সংগঠিত হয়ে ওঠে নি। অম্বাকে কেন্দ্র করে চরিত্রের বিভিন্ন সত্তার মধ্যে একাধিক প্রবণতা গড়ে ওঠেনি। এর ফলে মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার অভাবে চরিত্রটি দ্বন্দ্বহীন হয়ে পড়েছে। রিপুজয়ী ভীষ্ম সর্বদা দেব-মাহাত্ম্যেই আসীন। চরিত্রের মধ্যে কামনা-বাসনা, চাওয়া-পাওয়া, শ্রেয় ও প্রেয়র সংঘাত সৃষ্টি করা যায়নি। এর ফলে চরিত্রটি গতিহীন হয়েও পড়েছে। নরনারায়ণের সাক্ষাৎ লাভের বাসনা পূরণই ভীষ্মের ব্রহ্মচর্য্য ধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য রূপে নাটকে চিত্রিত হয়েছে।[খ] চরিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী ঘটনার সঙ্গে চরিত্র বিন্যাসের এই ঘটনার কার্য্যকারণ সঙ্গতি নেই। এখান থেকেই নাট্য ঘটনার বিন্যাসের মাধ্যমে চরিত্রের মধ্যে পৃথক একটি স্তর তথা তৃতীয় পর্বের সূচনা হয়েছে। এই তৃতীয় পর্বে চরিত্রের অচেতন মনের অবদমিত বাসনা স্বপ্নের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে একদিকে ভীষ্মকে তাঁর পূর্ব-জীবনের পত্নীর প্রতি ভাবাবেগে উদ্বেলিত করে তুলেছে,[১৯] অপরদিকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবপক্ষীয়দের অনাচার, অক্ষত্রিয় সুলভ কার্য্যবলী, আত্মীয় স্বজনের বিয়োগ ব্যথা, তাঁকে জীবন সম্পর্কে বীতস্পৃহ করে তুলেছে। রণক্ষেত্রে শিখণ্ডীরূপী অম্বার দর্শণ লাভ তাই ভীষ্মের কাছে জীবন-মুক্তির আনন্দ বহন করে এনেছে। শিখণ্ডী তাঁর কাছে আতঙ্কের কারণ নয়। মুক্তির দূত। পরিশেষে কুরুক্ষেত্র রণে নররূপী-নারায়ণের শরাঘাতে তাঁর শরশয্যা গ্রহণ এবং এই শরশয্যায় তাঁর ইচ্ছামৃত্যুর মধ্য দিয়ে ভীষ্মের জীবনের অন্তিম পর্ব সংঘটিত হয়।

আলোচ্য চরিত্রের উপরি উল্লিখিত তিনটি পর্ব শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে গড়ে না ওঠায় ভীষ্ম-চরিত্রের কার্য্যাবলী অধিক বিস্তৃত হয়ে পড়েছে এবং সাধারণ মানবীয় চরিত্র রূপে ভীষ্ম চরিত্রটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। বিশেষ পৌরাণিক চরিত্র বলেই ভীষ্ম এভাবে চিত্রিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে ভীষ্মের জীবনের এত বড় কাহিনী নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করতে গিয়ে নাট্যকার নাট্যঘটনাকে সংহত রূপ দিতে পারেননি এবং তার ফলে চরিত্রের ক্রিয়া চারিদিকে অবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

খ. "আমি নরনারায়ণের আগমণ প্রতীক্ষায় এই সুদীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করে বসে আছি। আমি সেই উভয়মূর্তিকে এক রথে দেখব এবং আমার একমাত্র পূজোপোকরণ শস্ত্রপুষ্প তাঁদের চরণে অঞ্জলী দেব—"

দ্বিতীয় অংক, ষষ্ঠ দৃশ্য, ভীষ্ম।

গ. শিখণ্ডীর মূর্তি হেরি পুলকিত আমি—

—চতুর্থ অংক, ষষ্ঠ দৃশ, ভীষ্ম।

শঙ্করাচার্য্য (শঙ্করাচার্য—গিরিশচন্দ্র ঘোষ).।

জ্ঞানতত্ত্বমূলক এই নাটকের প্রধান চরিত্র 'শঙ্করাচার্য্য'। অদ্বৈতবাদের সাহায্যে মানুষের মুক্তির উপায়ের সন্ধান দেওয়াই চরিত্রের উদ্দেশ্য।[ক] চরিত্রের বলিষ্ঠ ইচ্ছাশক্তি চরিত্রের উদ্দেশ্যপূরণের ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই ইচ্ছাশক্তির দ্বারা চালিত হয়ে শঙ্করাচার্য্য প্রথমে গুরু গোবিন্দের কাছ থেকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর একে একে তিনি ভ্রষ্ট বৌদ্ধ কাপালিককে দমন করেন। কর্মকাণ্ডবিদ্ মণ্ডন মিশ্রকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন। শাস্ত্রালোচনায় উভয়ভারতীকে পরাজিত করেন। কাপালিক উগ্রভৈরবকে দমন করেন। পরিশেষে তিনি কাশ্মীরের সারদাপীঠের পণ্ডিতগণকে অদ্বৈতভাষ্য দান করেন। এইভাবে সমগ্র ভারতে অদ্বৈতবাদকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে শঙ্করাচার্য্য চরিত্রটি উভয়মুখী। নাট্য-ঘটনাবিন্যাসের ত্রুটির জন্য শঙ্করাচার্যের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষ দ্বন্দ্ব-ঘন-রূপ লাভ করেনি। চরিত্রের কার্য্যাবলীর উপর অলৌকিক শক্তির অসামান্য প্রভাব বিদ্যমান। চরিত্রটিকে সর্বদা অবতাররূপে নাট্যকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এর ফলে চরিত্রটি দোষে গুণে মানবধর্মী হয়ে ওঠেনি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মহাপুরুষদের জীবনী নিয়ে রচিত নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের প্রায় সব কটি নাটকেই এই বিশিষ্টতা ক্রিয়াশীল।[১৯ক]

বিশ্বামিত্র ('তপোবল'—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)।

'তপোবল' নাটকের প্রধান ও গতিসঞ্চারকারী চরিত্র বিশ্বামিত্র। শারীরগত, সমাজগত ও মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে চরিত্রটি ত্রৈমানিক হয়ে উঠেছে। 'শবলাকে' কেন্দ্র করে সম্মুখ সমরে বশিষ্ঠের কাছে বিশ্বামিত্রের পরাজয় তথা ব্রহ্মবলের কাছে ক্ষাত্রবলের পরাজয়ের ফলে তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মবল লাভই বিশ্বামিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে।[ক] এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চরিত্রের অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠেছে। এই ইচ্ছাশক্তির বলে রাজা বিশ্বামিত্র রাজ-ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে কঠোর সাধনায় ব্রতী হন। সাধনার দ্বারা প্রথমেই তিনি রাজর্ষিত্ব লাভ করেন। এই স্তরে চরিত্রের মধ্যে অহম (Ego) প্রাধান্য বিস্তার করেছে। 'ত্রিশঙ্কুর' স্বর্গারোহণেরর ক্ষেত্রে তাঁর আমিত্বই বড় হয়ে উঠেছে।[খ] ইন্দ্রের দর্প হরণ করতে গিয়ে বিশ্বামিত্র নিজেই ক্ষমতার দর্পে দর্পী হয়েছেন। আধ্যাত্মিক শক্তি লাভের

ক. "শুদ্ধ তত্ত্ব করিতে প্রচার, জীবের উদ্ধার
স্বেচ্ছায় সে মহাভার করেছি গ্রহণ"
—দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য, শঙ্করাচার্য্য।

ক. 'তপঃপ্রভাবে আমিও বশিষ্ঠ হব'—প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, তপোবল।

খ. "ত্রিশঙ্কু ত্রিদিবে স্থান পাইবে নিশ্চয়—
মম কার্য্যে বিঘ্ন করে হেন শক্তি কার"—দ্বিতীয় অংক, পঞ্চম দৃশ্য, তপোবল।

সাধনা ছেড়ে দিয়ে তিনি জড়শক্তির উপাসক হয়ে নবস্বর্গ রচনা করেছেন। প্রবৃত্তির দাস হয়ে বশিষ্ঠের উপর প্রতিহিংসামুখী ও মেনকার প্রতি কাম-পরায়ণ হয়েছেন। এ সকল ঘটনা চরিত্রের উদ্দেশ্যপূরণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছে। তথাপি লৌহদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বলে শক্তিমান বিশ্বামিত্র সাধনার দ্বারা মহর্ষিত্ব লাভ করেছেন এবং ব্রহ্মার কাছ থেকে 'ব্রহ্মর্ষি' আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন। কিন্তু বশিষ্ঠের স্বীকৃতির অভাবে তাঁর ব্রহ্মর্ষিত্ব তখনও সার্থকতা লাভ করেনি। বিশ্বামিত্র তখনও প্রবৃত্তির দাস। এই প্রবৃত্তির তাড়নায় প্রতিহিংসামুখী বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের মারণযজ্ঞের আয়োজন করেন। সেই মারণ যজ্ঞে বশিষ্ঠের পৌরহিত্য গ্রহণ বিশ্বামিত্রকে নতুন জীবন চেতনায় উদ্দীপ্ত করে তোলে। এ চেতনা হল হিংসার বদলে অহিংসা, ঈর্ষার বদলে প্রেম, ভোগের বদলে ত্যাগ, ক্রোধের বদলে তিতিক্ষা আর ক্ষমা। বিশ্বামিত্রের মধ্যে তখন অহম (ego) বোধ দূর হয়ে অধিসত্তার (super ego) জাগরণ ঘটতে থাকে। পূর্বকৃত রিপু-তাড়িত কর্মের জন্য তাঁর অন্তরে অনুশোচনা দেখা দেয়। রিপুতাড়িত বিশ্বামিত্রের রিপুজয়ী বিশ্বামিত্রে, ক্ষাত্রবলে বলী বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মবলে বলী বিশ্বামিত্রে, ক্ষমাহীন বিশ্বামিত্রের ক্ষমাশীল বিশ্বামিত্রে উত্তরণ ঘটে। এ হেন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠেরও প্রনম্য হয়ে ওঠেন।[গ] ক্ষাত্রবলের সঙ্গে ব্রহ্মবলের এই দ্বন্দ্বই ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভের সাধনার উত্তরণ ঘটায়। ধীরে ধীরে চরিত্রের এই ক্রমোন্নতি সাধনই গিরিশচন্দ্রের নাট্যচরিত্র চিত্রণের দক্ষতার পরিচয় বহন করে।[২০]

বৃত্রাসুর ('ঐন্দ্রিলা'—মনোমোহন রায়)।

'ঐন্দ্রিলা' নাটকের প্রধান চরিত্র বৃত্রাসুর। দনুজ অধিপতী বৃত্রাসুর চরিত্রটির শারীরগত ও সামাজিকগত অবস্থান অনুসারে তাঁর মনস্তত্ত্বও গড়ে উঠেছে। অন্ধ পত্নী-প্রেম চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পত্নীই তাঁর সকল শক্তির মূলাধার। হৃদয়-বল ও বাহুবলের একমাত্র উৎস।[ক] শক্তিদায়িনী দনুজ অধিশ্বরীর সন্তোষ উৎপাদনই বৃত্রাসুরের প্রধান লক্ষ্য। চরিত্রের এই বিশিষ্ট ভাবধারাই চরিত্রের সকল কার্য্যাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।[২১] এ হেন পত্নীপ্রেম তাঁর জীবনশক্তিকে (Eros) খর্ব করেছে। তাঁর মরণশক্তিকে (Thanatos) বলদৃপ্ত করে তুলেছে। তাঁর পত্নীপ্রেম তাঁকে বিপথে চালিত করে তাঁর দানবীয় শক্তিকে বাড়িয়ে তুলেছে। চরিত্রের অহমের ভেতর ইদমের যে বৃত্তিগুলি দমিত অবস্থায় ছিল তাকে জাগ্রত করে তুলেছে।

গ. 'হে ব্রহ্মর্ষি, আমার নমস্কার গ্রহণ করুন'।
—পঞ্চম অংক, ষষ্ঠ দৃশ্য। তপোবল।

ক. "তুমি যে গো দৈত্যরাজ হৃদয়ের শক্তি
স্বরূপিনী…তুমি
মম শান্তি বিধায়িনী, তুমি দনুজের
বিজয় দায়িনী।।" —প্রথম অংক, পঞ্চম দৃশ্য, ঐন্দ্রিলা।

এর ফলে চরিত্রের বিচার ক্ষমতা পঙ্গু হয়ে গেছে। ন্যায় নীতি বোধ অবলুপ্ত হয়েছে। প্রজাপালক বৃত্রাসুর প্রজা নিপীড়ক বৃত্রাসুরে পরিণত হয়ে রাজধর্মকে ক্ষুন্ন করেছে। তাঁর আমিত্ববোধ তাঁর দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছতাকে বিনষ্ট করেছে।[খ] এই অহমবোধের দ্বারা চালিত হয়ে বৃত্রাসুর সতী ইন্দ্রানীকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। ঐন্দ্রিলার দাসীরূপে ইন্দ্রানীকে বৃত্রাসুর নিযুক্ত করেন। এই কাজের মধ্য দিয়ে বৃত্রাসুর পত্নীপ্রেমের গৌরব অনুভব করলেও সতীত্বের এই লাঞ্ছনাই তাঁর পতনের কারণ হয়ে ওঠে। যে সতী-শক্তিকে বুকে ধারণ করে 'শিব' শক্তিমান, সেই সতীশক্তির অপমানে বৃত্রাসুরের কাছ থেকে 'শিব' তাঁর সংহার ত্রিশূল-শক্তি হরণ করেন। বৃত্রাসুর শক্তিহীন হয়ে পড়েন। অবচেতন মনে পাপবোধের প্রতিক্রিয়া স্বপ্নের মধ্যমে তাঁর মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করে। তথাপি জীবনের এই সংকট মুহূর্তে তাঁর রাজসত্তা ও পিতৃসত্তা অপেক্ষা তাঁর স্বামীসত্তা বড় হয়ে উঠেছে। রাজপ্রেম ও পুত্রপ্রেম অপেক্ষা পত্নীপ্রেম প্রধান হয়ে উঠেছে। এই পত্নীপ্রেমই দেবাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে বৃত্রাসুরকে শুধুমাত্র পুত্রহারা এবং রাজ্যহারা করেনি, শিবভক্ত বৃত্রাসুরকে সমরক্ষেত্রে শিবের বিদ্রোহী করেও তুলেছে।[গ] ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে দধীচির অস্থি নির্মিত বজ্রের আঘাতে বৃত্রাসরের মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুই বৃত্রাসুরের অন্ধ প্রেম ও তাঁর শক্তিদর্পের শেষ পরিণতির স্বাক্ষর বহন করে আনে।

জয়দেব (জয়দেব—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়)।

ভক্তিমূলক 'জয়দেব' নাটকের প্রধান ও গতিসঞ্চারকারী চরিত্র জয়দেব। গীতগোবিন্দ রচনার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের গুনকীর্তন ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারই এই চরিত্রের উদ্দেশ্য। প্রেম-ভক্তি, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, বৈরাগ্য ও বিশিষ্ট জীবন দর্শন জয়দেব চরিত্রকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। জীবনের প্রথম পাদ থেকেই পার্থিব বিষয়বস্তু সম্পর্কে চরিত্রের ঔদাসিন্য, সংসার থেকে মুক্তির আকুলতা, কৃষ্ণপ্রেমে তাঁর আত্মহারা অবস্থা, চরিত্রের আধ্যাত্মিকভাবকে ক্রমশ পরিস্ফুট করে তুলেছে। ভক্ত জয়দেবের আহ্বানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক জয়দেবের সেবাকার্য্যে রত হওয়া, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক জয়দেবের অসম্পূর্ণ গীতগোবিন্দের ভাষ্য রচনা করা,—ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে

খ. "জেন দৈবশক্তি, উন্নতি মার্গের পন্থা
মাত্র শুধু…
উঠিয়াছি উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে
এবে বাম পদাঘাতে নিক্ষেপিতে পারি
দূরে অনায়াসে অতি তুচ্ছ অতি জীর্ণ
নিমিত্ত স্বরূপ এই নগণ্য সোপান।" —৫ম অংক, ষষ্ঠ দৃশ্য, ঐন্দ্রিলা।

গ. "……হে শূলিন, নাম
তব নাহি আর মুখে উচ্চারিব, আজ সম্মুখ সমরে
তব বল পরীক্ষীব।" —৫ম অংক, ষষ্ঠ দৃশ্য, ঐন্দ্রিলা।

জয়দেবের আধ্যাত্মিক জীবন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। পরিশেষে জয়দেবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলনের মধ্য দিয়ে চরিত্রের উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করে। ইহলোকের জয়দেব এইভাবে অধ্যাত্মলোকের ভক্ত-ভগবান জয়দেব রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে চরিত্রের উপর অলৌকিক শক্তির গভীর প্রভাব বিদ্যমান। এতে ভক্ত সাধারণের কাছে চরিত্রটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এর দ্বারা জয়দেব চরিত্রটি সাধারণ মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি।

অভিমন্যু (ক্ষত্রবীর—ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

'ক্ষত্রবীর' নাটকের প্রধান চরিত্র অভিমন্যু। অমিত ক্ষাত্রবীর্য্য, বীরত্ব, তেজ-দীপ্ততা এবং উদারতায় চরিত্রটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। অর্জ্জুন যখন সংসপ্তক রণে যুদ্ধে-রত, চক্রব্যূহ যুদ্ধে পাণ্ডব-পক্ষ যখন মরণপণ সংগ্রামে রত, তখন পাণ্ডবপক্ষের এই সংকটমুহূর্তে ভীমের নির্দেশে অভিমন্যু যুদ্ধে সেনাপতির ভার গ্রহণ করে তাঁর ক্ষত্রিয়সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। যুদ্ধযাত্রার প্রাক্-মুহূর্তে প্রিয়ার প্রেমানুরাগ, প্রিয়ার অশ্রুসজল আঁখির আবেদন এবং দাম্পত্য-জীবনের আকর্ষণ তাঁর কাছে বড় হয়ে ওঠেনি। স্বামীসত্তা ও ক্ষত্রিয়সত্তার দ্বন্দ্বে ক্ষত্রিয়সত্তার আহ্বান তাঁর কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় অভিমন্যু রণক্ষেত্রে বীরের মৃত্যুকেই শ্রেয় বলে মনে করেছেন।ক নাট্যগঠনের দক্ষতার অভাবে নাটকে চরিত্রের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব দানা বেধে ওঠেনি। চক্রব্যূহযুদ্ধে অভিমন্যুর দেহাবসানের করুণ পরিণতি অপেক্ষা অভিমন্যু চরিত্রের আড়ালে শাপগ্রস্ত চন্দ্রদেবের অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভের আনন্দই নাটকে প্রাধান্য লাভ করেছে।

রামানুজ (রামানুজ—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)।

নাটকের প্রধান ও গতিসঞ্চারকারী চরিত্র রূপে 'রামানুজ' চরিত্রটি চিত্রিত। দ্বৈতবাদ তথা বৈষ্ণব ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ ও তার প্রতিষ্ঠাই চরিত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। চরিত্রটির মধ্যে ভক্তি-ভাব প্রবল। আজন্ম ধর্মানুরাগ, পরহিতব্রত, শুদ্ধভক্তি ও প্রেম. বুদ্ধিমত্তা, সহিষ্ণুতা ও সততা রামানুজ চরিত্রের অনন্য সম্পদ। প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও মানসিক দৃঢ়তা-চরিত্রের লক্ষ্যপূরণেই সহায়ক হয়েছে। শৈশব অবস্থা থেকেই তিনি ধর্মজ্ঞানী ছিলেন। সে সময় অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত যাদবপ্রকাশ রামানুজের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে আসেন। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের প্রশ্নে তিনি রামানুজের কাছে পরাজিত হন। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে রামানুজ চরিত্রের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়। এরপর বিভিন্ন ঘটনার আবর্তনে চরিত্রের বিন্যাস গড়ে ওঠে। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবপ্রধান যামুনাচার্য্যের দেহাবসানের পর সেখানে বৈষ্ণব কর্ণধাররূপে তাঁর স্বীকৃতিলাভ, গোষ্ঠীপূর্ণ কর্তৃক তাঁকে কৃষ্ণমন্ত্র দান, তাঁর রামানুজ নাম গ্রহণ, ধর্মশাস্ত্র বিষয়ে তর্কালোচনায় তাঁর কাছে অদ্বৈতবাদী অজগর পণ্ডিত ও দিগ্বিজয়ী যজ্ঞমূর্তির পরাজয়—ইত্যাদি নাট্যঘটনা চরিত্রটিকে

ক.—"ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন
শিখিয়াছি এ-জীবনে কর্তব্য প্রধান
তাই প্রাণ দিতে চলেছি সমরে"। তৃতীয় অংক, চতুর্থ দৃশ্য—'ক্ষত্রবীর'

ক্রমশঃ পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। শৈবধর্মী চোলরাজ রামানুজের প্রবল বিরোধিতা করলেও পরে চোলরাজ রামানুজের কৃপায় দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন এবং রামানুজের বিরোধিতা ত্যাগ করেন। এইভাবে দাক্ষিণাত্যের ভক্ত-সাধারণের উপর রামানুজের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তৃত হতে থাকে এবং রামানুজ সমগ্র দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব-ধর্ম'-প্রতিষ্ঠার কর্মযজ্ঞকে সম্পূর্ণ করে তোলেন। রামানুজ চরিত্রের এই ক্রম-পরিবর্তনের প্রতিটি স্তরে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োগ বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। এই অলৌকিক শক্তির মাহাত্ম্যে রামানুজে চরিত্রটি আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চ-কোটির সাধক হিসাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

● (ক/২) **পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের প্রধান চরিত্রের বিরোধী (Antagonist) চরিত্র ঃ—**

ইলাবন্ত (উলূপী—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)।

'উলূপী' নাটকের প্রধান চরিত্রের বিরোধী চরিত্র "ইলাবন্ত"। অর্জ্জুনের ঔরসে উলূপীর গর্ভজাত 'ইলাবন্ত' চরিত্রটিও বংশগত, সমাজগত ও মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে ত্রৈমানিক হয়ে উঠেছে। সম্ভাব্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে পিতার সাহায্যার্থে পিতার পাশে দাঁড়িয়েছে ইলাবন্ত। ইতিমধ্যে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘটনা নিয়ে অর্জ্জুনের সঙ্গে বভ্রুবাহনের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। এই যুদ্ধে অর্জ্জুনের বিরোধী পক্ষে যোগ দিয়ে অর্জুনকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁকে হত্যা করার জন্য উলূপী তাঁর পুত্র ইলাবন্তকে পরামর্শ দেন। ইলাবন্ত তাঁর মার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। পিতার সহযোগী হিসাবে ইলাবন্ত তাঁর মায়ের বিরোধী শিবিরে যোগ দেন। এই ঘটনায় ইলাবন্তের আত্মাও দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে। একদিকে উলূপীর অন্যায় প্রবৃত্তিকে বাধা দেবার জন্য ও যুদ্ধে অর্জ্জুনের সাহায্যের জন্য ইলাবন্তের ধর্মবোধ তাঁকে পিতার অনুরাগী করে তোলে। অপরদিকে শৈশব হতে মাতৃ-সমীপে লালিত এবং মাতৃজ্ঞানে দীক্ষিত ইলাবন্তের মাতৃ-বিরোধিতা তাঁর মর্ম্মকে পীড়িত করে। ধর্মবোধ আর মর্ম্মবোধের এই সংঘাতে অর্থাৎ ধর্মবোধের জন্য পিতৃ-অনুরাগ আর মর্ম্মবোধের জন্য মাতৃ-অনুরাগ—এই বিপরীত-মুখী দ্বৈতশক্তির টানাপোড়নে ইলাবন্তের অন্তর্দাহ তীব্র হয়ে ওঠে। পিতাকে হত্যা করার জন্য মাতা উলূপীর প্ররোচনামূলক কার্য্যাবলীর মধ্যে মায়ের পিশাচীরূপ সন্দর্শনে ইলাবন্তের অন্তরের দাবানল আরও বিস্তৃত হয়ে পড়ে।ক শুভবোধ ও মনুষ্যত্ব বড় হয়ে ওঠায় ইলাবন্ত তাঁর মায়ের ডাকে সাড়া

ক. উলূপী—ইলাবন্ত

ইলাবন্ত—কে ও মা ? বেঁচে আছিস,

উলূপী—চুপ এই নে (অস্ত্রদান), ওই যায়, মেরে ফেল,

ইলাবন্ত—কাকে ?

উলূপী—ওই যে পথ হাতড়ে হাতড়ে যাচ্ছে

ইলাবন্ত—ওযে আমার বাপ।

উলূপী—ওই ওই ওকেই মেরে ফেল।

ইলাবন্ত—কে তুই ? তুই কি আমার মা ?

না কোন পিশাচী ?— দ্বিতীয় অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, উলূপী ॥

দিতে পারেন নি। কিন্তু মাতা উলূপীর বিরোধী শিবিরে যোগ দেবার জন্য তাঁর মর্ম্মবেদনা তাঁকে তিলে তিলে দহন করতে থাকে। এই দ্বিখণ্ডিত আত্মার যন্ত্রণা 'ইলাবন্ত' চরিত্রের অন্যতম আকর্ষণ। যুদ্ধের পূর্বে ইলাবন্ত মায়ের শ্রীচরণ দর্শনের আশায় মায়ের কাছে ছুটে এসেছেন। 'স্বর্গাদপী গরিয়সী'র বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরার আগে ইলাবন্ত তাঁর মৃত্যুকেই শ্রেয় জ্ঞান করেছেন। যুদ্ধে জয়ী হবার চেয়ে পরাজিত হবার বাসনা তাঁর মন-প্রাণকে অবৃত করে রেখেছে। এটা তাঁর মর্ম্মবোধের পরিচয়। পক্ষান্তরে ধর্মবোধের প্রেরণায় যুদ্ধক্ষেত্রে পিতার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ইলাবন্ত সক্রিয় হয়েছেন। একদিকে পিতার প্রতি তাঁর আনুগত্য যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকে বীরত্বের মর্যাদা দান করেছে। অপরদিকে মাতৃ-আবেদনে সাড়া দিতে না পারার অক্ষমতায়—সেই বীরত্ব তাঁর কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। তাই যুদ্ধে জয়ের চেয়ে পরাজয় তাঁর কাছে শ্রেয় হয়ে উঠেছে। বিভক্ত আত্মার যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য যে প্রাণপ্রদায়ী মণির উপর ইলাবন্তের জীবন ও মরণ নির্ভর করছে, ইলাবন্ত সেই মণিকে মায়ের হাতে তুলে দিয়েছেন। রণক্ষেত্রে যাবার আগে এইভাবে মাতৃচরণ বন্দনা করে ইলাবন্ত মনে প্রাণে মৃত্যুকেই স্মরণ ও বরণ করে নিয়েছেন।খ আপাত মাতৃ-বিরোধিতার মধ্যে মাতৃভক্তির এই ফল্গুধারাই ইলাবন্ত চরিত্রটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

অম্বা (ভীষ্ম—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)।

'ভীষ্ম' নাটকে অম্বা চরিত্রটি ভীষ্মের বিরোধী চরিত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত। চরিত্র গঠনের দিক দিয়ে নাট্যকার চরিত্রের শারীরিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক—এই তিনটি মানই বজায় রেখেছেন। আত্মসম্মানবোধ, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, চারিত্রিক দৃঢ়তা, অসীম ধৈর্য্য, লক্ষ্যপূরণের একাগ্রতা এবং অসীম মানসিক শক্তির গুণে চরিত্রের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে। চরিত্রের ক্রমোন্নতি ও বিকাশ পর্বটি দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে বীর্য্য শুল্কে গৃহীত হবার আগে "অম্বা" চিরন্তন নারী—প্রেম ও মমতার প্রতিমূর্তি। আচারে-ব্যবহারে, হৃদয়ের কোমল বৃত্তিতে অম্বা শোভনময়ী।

খ. ইলাবন্ত—"এলুম কেন জানিস।
হারি তো তুই দেখতে পাবিনি।
জিতি-তো তোকে দেখতে পাবো না।
তাই দেখতে বড় সাধ হলো। দেখ মা
এমন যুদ্ধে জয়লাভ করেছি যে তাতে
জয়ের চেয়ে পরাজয়ে সুখ আছে।
আচ্ছা মা আশীর্বাদ করনা যেন এ—
যুদ্ধ দেখবার আগে আমার মৃত্যু হয়।"
—তৃতীয় অংক, পঞ্চম দৃশ্য, উলূপী।

শাল্বরাজের সঙ্গে তাঁর প্রেম নারী জীবনের চির-আকাঙ্ক্ষিত ঘর বাঁধার স্বপ্নে রঙীন। সে প্রেম দুটি হৃদয়ের সামাজিক স্বীকৃতিলাভের জন্য উন্মুখ। সে প্রেম সৃষ্টি ও সুন্দরের ধ্যানে ধ্যান-গম্ভীর (২/১)। দ্বিতীয়ভাগে ভীষ্ম অম্বাকে বীর্যশুল্কে গ্রহণ করলেও ভীষ্ম তাঁর পূর্ব প্রতিজ্ঞামত অম্বাকে বিবাহ করতে অসম্মত হন (২/৩, ৪)। ভীষ্মের ব্যবহারে বিক্ষুব্ধ অম্বা তাঁর প্রেমের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শাল্বরাজের কাছে ফিরে যান। কিন্তু শাল্বরাজ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন (২/৫)। ভীষ্মের কাছে তাঁর বধূ-সত্তার অবমাননায় এবং শাল্বরাজের কাছে তাঁর প্রেম-সত্তার লাঞ্ছনায় প্রেমময়ী অম্বার মধ্যে প্রতিশোধের বাসনা জেগে ওঠে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রের মানসিক পরিবর্তন ঘটে। নারী-জীবনের চিরায়ত প্রেম-প্রীতি-কল্পনাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে কুলিশ-কঠোর অম্বার চরিত্রায়ণ নাট্য ঘটনায় উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। মানসিক দিক দিয়ে পরিবর্তিত এই অম্বার ধ্যানে গভীর প্রতিহিংসা। জ্ঞানে তীব্র প্রতিহিংসা। প্রাণে অতলান্তিক প্রতিহিংসা।[ক] প্রতিহিংসাপরায়ণা অম্বার একমাত্র লক্ষ্য ভীষ্মের নিধন।[খ] এই লক্ষ্যপূরণের জন্য চরিত্রটি ধীরে ধীরে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্যে ভীষ্মের অস্ত্রগুরু পরশুরামের সাহায্য প্রার্থনা করেন অম্বা। ভীষ্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পরশুরামকে অম্বা প্ররোচিত করেন (২/৬, ৩/২)। কিন্তু এতেও তাঁর প্রতিহিংসার মনোবৃত্তি চরিতার্থ হয় না। পরশুরাম ও ভীষ্মের মধ্যেকার যুদ্ধ তাঁর মনে ক্ষণিকের প্রশান্তি এনে দেয় কিন্তু মনের প্রতিহিংসার দাবানলকে নেভাতে পারে না। তাই অম্বা তপস্যার দ্বারা শিবকে পরিতুষ্ট করেন। শিবের বরে অম্বা মহারাজ দ্রুপদের ঘরে শিখণ্ডী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভীষ্মের সংহারই তাঁর ব্রত।[গ] কুরুক্ষেত্ররণে শিখণ্ডীর সঙ্গে যুদ্ধে ভীষ্মের অস্ত্রত্যাগ, বাণ-বিধ্বস্ত অবস্থায় ভীষ্মের শরশয্যা গ্রহণ এবং ভীষ্মের মৃত্যুর ঘটনার মধ্য দিয়ে শিখণ্ডীরূপী অম্বার প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয় (৫/৭)। নাট্যকারের চরিত্র-চিত্রণের কুশলতায় চরিত্রের এই ক্রমোন্নতি ও পরিণতি নাটকে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে।

ক. "প্রতিহিংসা মাত্র মোর ধ্যান
প্রতিহিংসা একমাত্র জ্ঞান
মান—অপমান
সমস্তই প্রতিহিংসা করেছে আশ্রয়।।"
—তৃতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য। ভীষ্ম।।

খ. "ভীষ্মের সংহার একমাত্র উদ্দেশ্য আমার"
—তৃতীয় অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য। ভীষ্ম।।

গ. "মুক্তি আমি নাহি চাই অখিলের স্বামী
বর দাও ভীষ্মে আমি করিব সংহার।।"
—তৃতীয় অংক—পঞ্চম দৃশ্য। ভীষ্ম।।

কাপালিক, মণ্ডন মিশ্র, উভয়ভারতী ও উগ্রভৈরব

(শঙ্করাচার্য—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)।

শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ সকল চরিত্র তাঁদের কার্য্যাবলী ও তাঁদের ধর্মীয় মতবাদের দ্বারা শঙ্করাচার্য্যের বিরোধিতা করেছেন (২/৪, ৩/২, ৩/৫, ৬, ৪/৫, ৫/২)। কিন্তু এঁদের বিরোধী মনোভাব শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়নি। ভ্রষ্ট বৌদ্ধ কাপালিক ও উগ্রভৈরকে শঙ্করাচার্য্য দমন করেন (২/৫, ৫/৫ /)। মণ্ডন মিশ্র ও উভয় ভারতী শঙ্করাচার্যের সঙ্গে ধর্মীয় শাস্ত্র নিয়ে আলোচনায় পরাজিত হন ও শঙ্করাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন (৩/৮, ৪/৭)।

দেবরাজ ইন্দ্র (ঐন্দ্রিলা—মনোমোহন রায়)।

'ঐন্দ্রিলা' নাটকের বিরোধী চরিত্র দেবরাজ 'ইন্দ্র'। বৃত্রাসুরের কাছ থেকে তাঁর হৃত স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করা এবং নিজের রাজ-সত্তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করাই চরিত্রের উদ্দেশ্য। বৃত্রাসুর তাঁর-স্ত্রী শচীকে লাঞ্ছিত করেন। বৃত্রাসুরের অত্যাচারে দেবতাদের জীবন বিপন্ন হয়। এই ঘটনা দেবরাজ ইন্দ্রের পুরুষকারকে আঘাত করে। এই পটভূমিকায় চরিত্রের সংগ্রাম-প্রবৃত্তি তীব্র হয়ে ওঠে। কঠোর তপস্যার দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্র 'শিবের' আনুকূল্য লাভ করেন। ব্রহ্মার নির্দেশে দধিচীর অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরী করে দেবরাজ ইন্দ্র সেই বজ্রের দ্বারা বৃত্রাসুরকে নিধন করেন। দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসত্তা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় (৫/৭)।

রাজগুরু ঃ (জয়দেব—হরিপদ চট্টোপাধ্যায়)।

বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার প্রতিহত করার জন্য 'রাজগুরু' চরিত্রটি জয়দেবের বিরোধিতা করেন। বাঙ্গলা দেশ থেকে বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিপত্তি বিনষ্ট করার জন্য 'রাজগুরু' রাজা লক্ষ্মণকে প্ররোচিত করেন। শাক্ত ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য রাজগুরু তাঁর অলৌকিক শক্তির প্রভাব দেখিয়ে রাজা লক্ষ্মণসেনকে বিস্মিত করেন। কিন্তু পরে জয়দেবের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের গুণে অধিকতর বিস্মিত হয়ে রাজগুরু জয়দেবের বিরোধিতা ত্যাগ করেন। কৃষ্ণ-প্রাণ জয়দেবের কৃপায় শাক্তধর্মী রাজগুরু উপলব্ধি করেন যে 'শ্যামা' ও 'শ্যাম' একই শক্তির দুই প্রকাশ। এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে রাজগুরুর চৈতন্যদোয় হয়।

কর্ণ (ক্ষত্রবীর—ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

'ক্ষত্রবীর' নাটকের অভিমন্যুর বিরোধী চরিত্ররূপে কর্ণ চরিত্রটি উল্লেখ্যযোগ্য। কুরুক্ষেত্রের চক্রব্যূহ-যুদ্ধের অন্যায় রণে অভিমন্যুকে পরাজিত ও বধ করার দায়িত্ব পালনের সময় কর্ণের মনে শুভবোধ ও অশুভবোধের সংঘাত ঘনীভূত হতে থাকে। সে সময় চরিত্রের মধ্যে পিতৃসত্তা ও ক্ষাত্রসত্তার দ্বন্দ্ব চরিত্রটিকে গতিশীল করে তোলে। চক্রব্যূহে সপ্তরথী মিলে অভিমন্যুকে বধ করার পরিকল্পনাটি তাঁর শুভবোধকে

নাড়া দেয়। এ ধরনের পরিকল্পনায় তাঁর পিতৃসত্তা আহত হয়। তাই এই পরিকল্পনামত চক্রব্যূহ-রণক্ষেত্রে তিনি অভিমন্যুকে বধ করতে রাজী হননি। চরিত্রের মধ্যে পিতৃসত্তার জাগরণ ঘটায় কর্ণের কাছে তাঁর পুত্র বৃষকেতু ও অর্জুনের পুত্র-অভিমন্যু এক ও অভিন্ন হয়ে পিতৃহৃদয়ে স্থান লাভ করে।[ক] পিতৃসত্তার নীচে কর্ণের ক্ষাত্রসত্তা চাপা পড়ে যায়। সেই মুহূর্তে ভবিষ্যতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের হাতে অসহায় অবস্থায় কর্ণের মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে রোহিনী কর্ণকে ওয়াকিবহাল করেন। অলৌকিক শক্তি-বলে রোহিনী ঘটনাটি কর্ণের সামনে ছবির মত তুলে ধরেন। এর মানসিক প্রতিক্রিয়ায় ক্ষাত্রবীর্যে দীপ্ত কর্ণের মধ্যে ক্ষাত্রসত্তার জাগরণ প্রবল হয়ে ওঠে। কুরুক্ষেত্র-রণে অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু তখন তাঁর পুত্র বৃষকেতুর থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। শত্রুর আত্মজকে কর্ণ শত্রু হিসাবেই চিহ্নিত করেন। রণক্ষেত্রে শত্রু অভিমন্যুকে পরাজিত ও নিহত করাই তাঁর প্রধান কর্তব্য হয়ে ওঠে। অভিমন্যুর সংহারের চিন্তাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য হয়।[খ]

নাট্যঘটনার সুষ্ঠু বিন্যাসের অভাবে কর্ণ-চরিত্রের এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে চূড়ান্ত সঙ্কট মুহূর্ত গড়ে ওঠেনি। অন্তর্দ্বন্দ্বের সংহত ও গভীর রূপ-চিত্রণের মাধ্যমে চরিত্রের যে সম্ভাবনাপূর্ণ বিকাশ ক্রিয়াশীল হতে পারত, নাট্যকারের নাট্য-রচনার দক্ষতার অভাবে তা ব্যহত হয়েছে।

যাদবপ্রকাশ (রামানুজ—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)।

দ্বৈতবাদের পরিবর্তে অদ্বৈতবাদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যাদবপ্রকাশ দ্বৈতবাদের প্রচারক লক্ষ্মণকে হত্যার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। লক্ষ্মণ তাঁর শিষ্য। তাই তাকে হত্যা করার চিন্তাকে কার্যকর করার সময় তাঁর মনে 'অহম' (ego) এবং অধিসত্তার (Superego) সংঘাতে নাট্যচরিত্রটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। চরিত্রের দ্বন্দ্ব নাটকের মধ্যে চরিত্র সম্পর্কে ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছে। যাদবপ্রকাশ লক্ষ্মণকে হত্যা করার জন্য যাকে নিয়োগ করেছিল সে লক্ষ্মণকে হত্যা করেনি। পরে যাদব প্রকাশ বিষয়টি জানতে পারেন। শিষ্য লক্ষ্মণকে হত্যার চক্রান্তে লিপ্ত থাকার জন্য তাঁর

ক.—"ভ্রাতুষ্পুত্র মম অভিমন্যু শিশু
প্রাণাধিক বৃষকেতু সম
পিতৃসনে বিরোধ কারণে
পুত্র কেন হবে অপরাধী…?"

(ক্ষত্রবীর—চতুর্থ অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য)।

খ.—"অর্জুন নন্দন মহাশত্রু গণি তারে
শার্দুলের মৃগশিশু ভক্ষ চিরদিন
অবশ্য বধিব রণে পার্থের কুমারে।"

(ক্ষত্রবীর—চতুর্থ অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য)।

মনে অনুতাপের সৃষ্টি হয় (৩/৪)। এই অনুতাপের যন্ত্রণার ভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে তিনি রামানুজরূপী লক্ষ্মণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই ঘটনা যাদবপ্রকাশের আগের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটায় (৪/২)। যাদব-প্রকাশের মানসিকতার পরিবর্তনের এই দিকটি নাটকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ লাভ করেছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে অদ্বৈতবাদী যাদবপ্রকাশ ছাড়াও চোলাধিপতি কাঞ্চীরাজ ও অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত যজ্ঞমূর্তি রামানুজের বিরোধিতা করেছিলেন। তবে চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে এঁরা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব লাভ করেন নি।

(ক/৩) পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের প্রধান ও বিরোধী চরিত্রের সহযোগী চরিত্র (Allied Agent of Protagonist and Antagonist)।

ঋষি মাণ্ডব্য ও অলিক্ষরা (সাবিত্রী—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)।

'সাবিত্রী' নাটকের প্রধান চরিত্র 'সাবিত্রীর' সহযোগী চরিত্ররূপে 'ঋষি মাণ্ডব্য' ও 'অলিক্ষরা' প্রতিষ্ঠিত। রাজকুলগুরু ঋষি মাণ্ডব্য তপস্যার দ্বারা বুঝতে পারেন যে দেবী সাবিত্রীই সতী ধর্ম রক্ষার জন্য অশ্বপতির কন্যারূপে রাজার গৃহে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি সাবিত্রীকে নিজের স্বামী নিজেকেই ঠিক করার জন্য সৎ পরামর্শ দেন। সাবিত্রীর পতী নির্বাচনের জন্য তাঁর সকল প্রচেষ্টায় তিনি উৎসাহ দিয়ে তাঁর মনোবল বৃদ্ধি করেন (১/৩)। সাবিত্রীর ধর্মভাবকে তিনি সমৃদ্ধ করতে গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করেন (২/৩)। সাত্ত্বিকভাব, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান, হৃদয়ের আনুগত্য, উদারচিত্ততা, দূরদৃষ্টি—ইত্যাদি গুণে চরিত্রটি উজ্জ্বল।

নির্মল সখ্যত্ব, সহধর্মিতা, ধর্মনিষ্ঠা এবং মানসিক দৃঢ়তা অলিক্ষরা চরিত্রের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব নিয়ে অলিক্ষরা সাবিত্রীর সুখে-দুঃখের অংশীদার হয়েছেন। ব্যক্তিত্বের এই গুণেই অলিক্ষরা সতী-শক্তির জয়গান করেছেন। সতী-শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণনার মাধ্যমে সতীত্বের ধর্ম পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার জন্য সাবিত্রীকে উদবুদ্ধ করেছেন। এইভাবে কর্মযোগের দ্বারা অদৃষ্ট যোগকে খণ্ডন করার জন্য সাবিত্রীর মধ্যে সংগ্রামী চেতনাকে অলিক্ষরা উন্নত করে তুলেছেন।[ক]

বভ্রুবাহন (উলূপী—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)।

'উলূপী' নাটকের প্রধান চরিত্র উলূপীর সহযোগী চরিত্ররূপে 'বভ্রুবাহন' চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে চরিত্রটি বহির্মুখী (Extrovert)।

ক. অলিক্ষরা—"কায়মনোবাক্যে সতী তুমি। তুমি কিনা অদৃষ্টের আক্রমণে চিন্তা কাতর। মুছে ফেল ললাট থেকে বিধিলিপি···স্বেচ্ছায় মনোমত অদৃষ্টের সৃষ্টি কর।"

(সাবিত্রী—তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য।)

ক্ষাত্রতেজ, ক্ষাত্রবীর্য্য, দেবভক্তি, আত্মসম্মানবোধ, মাতৃভক্তি, রণনিপুণতা ইত্যাদি গুণে এই চরিত্রের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে। জন্মলগ্ন থেকে পিতা অর্জুনের সঙ্গে বভ্রুবাহনের প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়নি। পিতাকে তিনি কোনদিন দেখেননি। পিতাকে দেখার জন্য, তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করার জন্য, অর্জুনের পুত্র বভ্রুবাহন ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। আজন্ম পিতার স্নেহ থেকে বঞ্চিত বভ্রুবাহনের মনের চেতনস্তরে পিতার সঙ্গে পরিচিত হবার বাসনা তীব্র হয়ে ওঠে। বাসনার তীব্রতায় পিতার সঙ্গে দর্শনলাভের লাভের আকাঙ্খা তাঁর কাছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভের বাসনার থেকেও বড় হয়ে ওঠে (২/৪)। এই আকাঙ্খা পূরণের উদ্দেশ্যে এবং পিতা অর্জুনের জন্য বিমাতা উলুপীর দুশ্চিন্তা ও বেদনার ভাব লাঘব করার জন্য বভ্রুবাহন উলুপীর পরামর্শমত অর্জুনের অশ্বমেধের ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেন। অশ্বমেধের ঘোড়ার গতি রুদ্ধ হয়।ক কিন্তু গর্ভধারিনী মা চিত্রাঙ্গদার নির্দেশে বভ্রুবাহন ধৃত অশ্বমেধের ঘোড়াকে অর্জুনের কাছে ফিরিয়ে দেন। সেই সময় বভ্রুবাহনের মা চিত্রাঙ্গাদা সম্পর্কে অর্জুন কঠোর নিন্দা-বাক্য প্রয়োগ করেন। এর ফলে বভ্রুবাহনের পুত্রসত্তা লাঞ্ছিত হয়। তাঁর আত্মমর্য্যাদাবোধ পীড়িত হয়। পিতার গর্হিত আচরণে বভ্রুবাহনের মধ্যে এতদিনের সযত্নে পোষিত পিতার উজ্জ্বল ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়। পিতার আকর্ষণ অপেক্ষা মায়ের আকর্ষণ বভ্রুবাহনের নিকট প্রবল হয়ে ওঠে। পিতার নীতিবর্জিত ঘৃণ্য প্রবৃত্তির বাতাবরণ থেকে মায়ের সম্মান রক্ষা করার কাজই বভ্রুবাহনের শ্রেয় ও প্রেয় হয়ে ওঠে। মায়ের সম্মান রক্ষার জন্য এবং মায়ের প্রতি পুত্রের কর্তব্য পালনের আহ্বানে পিতৃঅনুরাগী বভ্রুবাহন পিতৃদ্রোহী হয়ে ওঠেন।খ

রণক্ষেত্রে বভ্রুবাহন অর্জুনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। উলুপীর প্রেরণায় আর জাহ্নবীর আশীর্বাদে বভ্রুবাহন অমিত শক্তির অধিকারী। রণক্ষেত্রে তাঁর ক্ষত্রিয় সত্তা দীপ্ত হয়ে ওঠে। বভ্রুবাহনের কাছে অর্জুন পরাজিত হয়। অর্জুনের এই পরাজয়ে বভ্রুবাহনের মাতৃসম্মান রক্ষার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়।

ক. বভ্রুবাহন—"মা পিতার নাম শুনেই দেখার সাধ জ্বলে উঠেছিল। তোমার মলিন মুখ যেই আমার মনের সম্মুখে ছলছল নেত্রে তোমার হৃদয়ের অতি তীব্র যন্ত্রণা প্রকাশ করতে এসে উপস্থিত হল তখন মা সব ভুলে গেলুম। দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ঘোড়া ধরলুম।"

(তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য। 'উলুপী'।)

খ. বভ্রুবাহন—ক্ষত্রিয় ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে ক্রোধের জন্য নয়। মহারাজ স্বর্গাদপী গরীয়সী জননীর মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য আপনার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলাম।"

(—তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য। উলুপী।)

পরশুরাম (ভীষ্ম—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)।

এই চরিত্রটি বিশেষ ক্ষেত্রে 'ভীষ্মের' বিরোধী চরিত্র 'অম্বার' সহযোগী চরিত্ররূপে ক্রিয়াশীল হয়েছে। ভীষ্ম অম্বাকে বীর্যশুল্কে গ্রহণ করেন। কিন্তু ভীষ্ম তাঁকে বিবাহ করে স্ত্রীর মর্য্যাদা দিতে অসম্মত হন। স্ত্রীর মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অম্বা ভীষ্মের গুরু পরশুরামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। অম্বার দাবীর সমর্থনে পরশুরাম সহমত জ্ঞাপন করেন এবং ঐ বিষয়ে ভীষ্মকে রাজী করানোর জন্য তিনি উদযোগ গ্রহণ করেন (২/৬)। কিন্তু ভীষ্ম তাঁর অস্ত্র-গুরু পরশুরামের প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় পরশুরাম ভীষ্মের প্রতি ক্ষুব্ধ হন। তিনি ভীষ্মকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করেন। কর্তব্যবোধের তাগিদে এবং আশ্রিতের ধর্মরক্ষার দায়বদ্ধতায় পরশুরাম চরিত্রটি যেন মানবিক মূল্যবোধের কষ্টিপাথর। এই ধর্ম রক্ষার জন্য পরশুরাম তাঁর প্রাণপ্রতিম শিষ্যকে অস্ত্রাঘাত করতেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। যুদ্ধে ভীষ্মের নিকট পরশুরাম পরাজিত হন। তাঁর উদ্দেশ্য বিফল হয় (৩/২)। কিন্তু এ পরাজয় ধার্মিক পরশুরামের ভাবমূর্তিকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছে।

মহামায়া, গুরুগোবিন্দ, ব্যাসদেব, কুমারিল ভট্ট, সনন্দন ও শান্তিরাম।

(শঙ্করাচার্য্য—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

এই চরিত্রগুলি 'শংকরাচার্য্য' নাটকের প্রধান চরিত্র 'শঙ্করাচার্য্যের' সহযোগী চরিত্র। শঙ্করাচার্য্য ভারতবর্ষে অদ্বৈতবাদ-এর প্রচারক ও প্রতিষ্ঠাতা। এই উদ্দেশ্যে তাঁকে বিভিন্ন ধরণের কাজ করতে হয়েছে। তিনি গুরু গোবিন্দের কাছ থেকে সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণ করেন (১/৭)। মহামায়ার কাছ থেকে শক্তিলাভ করেন (২/২)। শিষ্য সনন্দন ও শান্তিরামের সক্রিয় সহযোগিতায় তিনি তাঁর বিরোধী শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করেন (৪/৫, ৫/৩)। এসব কাজে মহামায়া, গুরুগোবিন্দ, ব্যাসদেব প্রমুখ চরিত্রগুলি তাঁর উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক হয়েছে।

ঐন্দ্রিলা (ঐন্দ্রিলা—মনোমোহন রায়)।

এই নাটকের প্রধান চরিত্র 'বৃত্রাসুরের' সহযোগী চরিত্ররূপে চিত্রিত 'ঐন্দ্রিলা' চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। গন্ধর্ব-তনয়া বৃত্রাসুরের স্ত্রী ঐন্দ্রিলার শারিরীক ও সামাজিক ধারা অনুসারে তাঁর মনস্তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। সমস্তক্ষেত্রে নিজের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব স্থাপনের উচ্চাশায় তিনি আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর হয়েছেন। ইন্দ্রের পত্নী শচীর অসাধারণ রূপ-গুণ ও ঐশ্বর্য্য-গরিমা ঐন্দ্রিলার মধ্যে হীনমন্যতার (Inferior Complex) সৃষ্টি করেছে। এই হীনমন্যতা ঐন্দ্রিলাকে শচীর প্রতি ঈর্ষান্বিত করে তোলে। দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী শচীর উপর এবং সমস্ত স্বর্গরাজ্যের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠার (self esteem) প্রবল বাসনা ঐন্দ্রিলার মধ্যে জেগে ওঠে। শচীকে তাঁর ব্যক্তিগত দাসীর কাজে ব্যবহার

করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য ঐন্দ্রিলা বৃত্রাসুরকে প্রেরোচিত করেন।ক উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে তিনি একমুখী। নাট্য চরিত্রের এই মানসিক স্তরে স্বজাতি-প্রেম, পতি-প্রেম ও পুত্রপ্রেম অপেক্ষা তাঁর আত্মপ্রেম (self-love) বড় হয়েছে। ঐন্দ্রিলার প্ররোচনায় হিতাহিত-জ্ঞান হারিয়ে বৃত্রাসুর ইন্দ্রের স্ত্রী শচীকে বন্দী করেন। তাঁকে লাঞ্ছিত করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধ শুরু হয়। ঐন্দ্রিলার নির্দেশে তাঁর পুত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়। ঐন্দ্রিলার মধ্যে অহম্ (ego) প্রবল হওয়ায় তাঁর মাতৃসত্তা ক্ষুণ্ণ হয়। তাই পুত্রের অকাল-মৃত্যুর মর্ম্মস্পর্শী ঘটনাও তাঁর মধ্যে শুভবোধের উন্মেষ ঘটাতে পারেনি। এর মূলে আছে তাঁর অহম্ সর্বস্ব কায়েমী স্বার্থের তাগিদ। তাই পুত্রের মৃত্যুর পরও তাঁর আত্ম-প্রতিষ্ঠার দুর্নিবার আকাঙ্খার নিবৃত্তি হয়নি (৫/৪)। ঐন্দ্রিলা তাঁর আকাঙ্খাকে পূর্ণ করতে চান। এর জন্য নারীত্বের সব কিছু মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতেও ঐন্দ্রিলা প্রস্তুত। উদ্দেশ্য পূরণের অক্ষমতার চেয়ে মৃত্যুই তাঁর কাছে শ্রেয়।খ নিজের অহম্ প্রবৃত্তিকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে ঐন্দ্রিলা তাঁর স্বামী বৃত্রাসুরকেও বিপথে চালিত করেন। তাঁর প্রতি বৃত্রাসুরের প্রেমকে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য পূরণের মূলধন হিসাবে ব্যবহার করেন। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ঐন্দ্রিলা নিজেই নিজের চরম সর্বনাশকে ডেকে আনেন। যুদ্ধে বৃত্রাসুরের মৃত্যুতে তাঁর বৈধব্য বেশ সেই সর্বনাশের একটি দিক। ঐন্দ্রিলা চরিত্রের এই দিকটি তাঁর স্বতন্ত্রতার পরিচয় তুলে ধরেছে। স্বামী ও পুত্র হারা ঐন্দ্রিলার বাসনা পূরণের ব্যর্থতা, তাঁর প্রিয়জনের শোকের জ্বালা-যন্ত্রণা, তাঁকে উদভ্রান্ত ও ক্ষীপ্ত করে তোলে। মানসিক অবস্থার এই ক্রমোন্নতির স্তরে ঐন্দ্রিলার মধ্যে তীব্র প্রতিহিংসার মনোভাব

ক. ঐন্দ্রিলা—"বৃথা
মম রূপগর্ব, বৃথা ঐশ্বর্য্য গরিমা
বৃথা দৈত্যরাজ জয়া আমি, যদি দাসী
রূপে শচি আসি নাহি করে সেবা এই
চরণযুগল মম"

(—প্রথম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য। ঐন্দ্রিলা)

খ. ঐন্দ্রিলা—"অমৃত অপূর্ণ আশা রুদ্ধ করি
বক্ষের ভিতরে হৃদয়ের তপ্ত অশ্রু
সেকে সযতনে করিয়া বর্দ্ধিত, এবে
নিজ হস্তে উন্মূলিত হইবে তাদের
তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

(—৫ম অংক, ৪র্থ গর্ভাংক। ঐন্দ্রিলা।)

গড়ে ওঠে। প্রতিহিংসা প‍ূরণের জন্য ঐন্দ্রিলা সক্রিয় হন (৪।৫।৬)। প্রকৃতপক্ষে এই হিংসা-ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা প্রব‍ৃত্তিই বধ‍ূ-ঐন্দ্রিলা, মাতা-ঐন্দ্রিলা ও রাজমাতা ঐন্দ্রিলার সামগ্রিক ম‍ূল্যবোধকে বিনষ্ট করেছে। ম‍ূল্যবোধের বিনষ্টিতে যে ঐন্দ্রিলার স‍ৃষ্টি হয়েছে তাঁর মধ্যে আদিম প্রব‍ৃত্তি, দানবী প্রব‍ৃত্তি এবং পিশাচী প্রব‍ৃত্তি প্রধান হয়ে উঠেছে। এই প্রব‍ৃত্তিই প‍ূর্বের দন‍ুজ-দল-অধীশ্বরী ঐন্দ্রিলাকে রিক্ত-নিঃস্ব-সর্বভুক ঐন্দ্রিলাতে র‍ূপান্তরিত করেছে। আদিম প্রব‍ৃত্তির উন্মাদনার নীচে ঐন্দ্রিলার মাতৃসত্তা চাপা পড়েছিল। ঘটনার আবর্তনে স্বামী-হারা, প‍ুত্রহারা, ঐন্দ্রিলার নিবিড় একাকীত্ব তাঁর মনের মাঝে প‍ুরানো স্ম‍ৃতিকে ছবির মত তুলে ধরে। তাঁর মাতৃসত্তার লাঞ্ছনার ও স্ত্রীসত্তার অবমাননার জন্য ঐন্দ্রিলা নিজেকে নিজেই দায়ী করেন। তিনি অন‍ুভব করেন যে এসব তাঁর কৃতকর্মের ফল। এইবোধে অন‍ুতাপে দগ্ধ হন ঐন্দ্রিলা। মাতৃত্বের শ‍ূন্যতা তাঁকে শ্মশানের শ‍ূন্যতার মাঝে ছ‍ুঁড়ে ফেলে দেয়। প‍ুত্রশোকের অন্তর্জ্বালায় ঐন্দ্রিলা জ্ব‍লতে থাকেন। এই জ্বালা-যন্ত্রণার জন্য নিজের দায়বদ্ধতার কথা স্মরণে আসার ফলে তাঁর মধ্যে এক আক্রমণাত্মক শক্তি (Aggressive impulse) জেগে ওঠে। সেই আক্রমণাত্মক শক্তির মধ্যে তিনি তাঁর আত্মহননের পথ খ‍ুঁজে পান। অর্থাৎ এই আক্রমণাত্মক শক্তি দিয়ে তিনি নিজেকে নিজেই আক্রমণ করেন। তীব্র শোকানল ও অন‍ুতাপের জ্বালা-যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে তিনি "মন্দাকিনী" নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন।[গ] ঐন্দ্রিলার আত্মহত্যার পিছনে তাঁর এই মানসিক পর্য্যায়ের বিশ্লেষণ পর্বটির বিন্যাসে নাট্যকারের ম‍ুন্সিয়ানা আছে। আত্মহত্যার কার্য্যকারণ সম্পর্কের এই পটভূমিকার প্রতি মনোবিজ্ঞানীদের সমর্থন ও পাওয়া যায়।[২২]

● (ক/৪) **পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের নাট্যঘটনায় গতিসঞ্চারকারী চরিত্র** (Pivotal character)।

রোহিনী (ক্ষত্রবীর—ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

নাট্য ঘটনার গতি সঞ্চারকারী চরিত্র র‍ূপে 'রোহিনী' চরিত্রটি নাটকে চিত্রিত। বিচক্ষণতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বাক‍্কুশলতা, সমর-জ্ঞান ইত্যাদি গ‍ুণে রোহিনী চরিত্রটি বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। পাতিব্রত্যের আদর্শেও চরিত্রটি উজ্জ্বল। গর্গ

গ. ঐন্দ্রিলা—"জ্বালা! জ্বালা! দার‍ুণ বিষের জ্বালা কেমনে
জ‍ুড়াবে ?·····ওহো ধিকি
ধিকি জ্বলে বহ্নি হৃদয়ের মাঝে ব‍ুঝি
মম হৃৎপিণ্ড হল ছারখার।
মন্দাকিনী! শ‍ুনেছি মা পতিত পাবনী
তুই—তোর ব‍ুকে অভাগিনী পাবে নাকি
স্থান ?"
(—পঞ্চম অঙ্ক, নবম দ‍ৃশ্য। ঐন্দ্রিলা।)

মুনির অভিশাপে মর্তলোকবাসী অভিমন্যুরূপী চন্দ্রদেবের সঙ্গে সুদীর্ঘ দিনের বিচ্ছেদ-বেদনায় রোহিনী অধীর হন। স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলন লাভই তাঁর উদ্দেশ্য।ক এই উদ্দেশ্যে তিনি স্বর্গ থেকে মর্তে আসেন (১।১)। মর্তে এসে তিনি জানতে পারেন যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আসন্ন। সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবেন অভিমন্যুরূপী তাঁর স্বামী চন্দ্রদেব। রণক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যুতেই রোহিনীর স্বামীর অভিশাপমুক্তি ঘটবে। স্বামীকে দেখার জন্য রোহিনী পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করেন (১/৪)। নাট্য ঘটনায় ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়। কুরুক্ষেত্র রণে অভিমন্যুর মৃত্যু ত্বরান্বিত করার জন্য রোহিনী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। অভিমন্যু তখন উত্তরার প্রেমাষ্পদ। গার্হস্থ্য জীবনের আকর্ষণ অভিমন্যুকে বারবার পিছন দিকে টানে। রণক্ষেত্রের তুর্যনাদের চেয়ে প্রিয়ার প্রেম-মধুর আহ্বানে তাঁর মন চঞ্চল হয়। রণক্ষেত্রে ক্ষত্রিয় অভিমন্যু ও গার্হস্থ্যক্ষেত্রে উত্তরার জীবন-দেবতা অভিমন্যুর এই দুই শক্তির মাঝে পড়ে অভিমন্যুর মন দুর্বল হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে রোহিনী অভিমন্যুকে ক্ষাত্রধর্মের প্রতি তাঁর কর্ত্তব্য সম্পর্কে তাঁকে সচেতন করে তোলেন। অভিমন্যুকে রোহিনী এই বলে উৎসাহিত করেন যে গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-স্বপ্ন নয়, রণক্ষেত্রে ধনুর টঙ্কারই ক্ষত্রিয় হিসাবে অভিমন্যুর কাছে বড় হওয়া উচিত। রোহিনী এইভাবে নাট্যক্রিয়ায় গতির সঞ্চার করতে থাকেন। চক্রব্যূহ যুদ্ধে রোহিনী অভিমন্যুর সাহায্য গ্রহণ করেন (২/৫)। চক্রব্যূহের দ্বার থেকে রোহিনী কৌশলে ভীমকে সরিয়ে দেন। রণক্ষেত্রের মাঝে একাকী অভিমন্যুকে নিয়ে এসে রোহিনী নাট্য ঘটনায় সঙ্কট সৃষ্টি করেন। চারিদিকে কৌরব সপ্তরথী। মাঝে একা অভিমন্যু। এভাবে বালক অভিমন্যুকে বধ করতে কর্ণ অসম্মত হন। কিন্তু রণক্ষেত্রে অভিমন্যুর মৃত্যু না হলে রোহিনীর স্বামী অভিমন্যুরূপী চন্দ্রদেব গর্গমুনির অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবেন না। তাই অভিমন্যুকে বধ করার জন্য রোহিনী কর্ণকে নানাভাবে প্ররোচিত করেন (৪/২)। সপ্তরথীর আক্রমণে অভিমন্যুর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অভিমন্যুরূপী চন্দ্রদেব গর্গমুনির অভিশাপ থেকে মুক্ত হন। স্বামী চন্দ্রদেবের সঙ্গে রোহিনীর মিলনে নাট্যক্রিয়া পরিণতি লাভ করে (৪/৬)।

● **(ক/৫)—পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকের বিশেষ চরিত্র** (Special Characters):

বশিষ্ঠ (তপোবল—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)।

বিশ্বামিত্রের দ্বন্দ্বের মূল কারক বশিষ্ঠ চরিত্রটি নাটকে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে চরিত্রটি অন্তর্বৃত্ত স্বরূপ (Introvert)।

ক. রোহিনী—"স্বামী বিনা রমণীর কিবা আছে গতি ?
মিলাইয়া দেহ প্রাণেশ্বরে—
দয়াময় রক্ষা কর সতীর জীবন।" (—প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য। ক্ষত্রবীর।)

ত্যাগে, প্রেমে, সহিষ্ণুতায়, আত্মসংযমে ও জ্ঞানে বিশ্বামিত্র চরিত্রের বিপরীত মেরুতে এঁর অবস্থান। এই চরিত্রের সমুন্নত নৈতিক দিকের চিত্রণ অংকনের ক্ষেত্রে নাট্যকারের উপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহান চরিত্রের প্রভাব বিদ্যমান।[২৩] বশিষ্ঠের চরিত্রের উৎকর্ষ একদিকে যেমন বিশ্বামিত্র চরিত্রের ক্রমিক পরিবর্তনের স্তরকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে তেমনি নাট্যঘটনার ক্রমোআরোহণ পর্ব থেকে তার চূড়ান্ত পরিণতির বিভিন্ন স্তরকেও এই চরিত্রটি সমৃদ্ধ করেছে।

ভগন্দর (শঙ্করাচার্য্য—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)।

ভগন্দর ব্যাধিকে চরিত্ররূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এখানে ব্যাধি ব্যক্তিরূপ লাভ করেছে (Personified)।

ইন্দুবালা (ঐন্দ্রিলা—মনোমোহন রায়)।

ইন্দুবালা চরিত্রের পাতিব্রত্য, সুগভীর ধর্মজ্ঞান ও নৈতিক বোধ চরিত্রটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। স্বামী রুদ্রপীড়কে সর্বদাই অন্যায় প্রবৃত্তির করাল গ্রাস থেকে রক্ষার চেষ্টায় ইন্দুবালা তাই যত্নবান হয়েছেন। পিতা বৃত্রাসুর ও মাতা ঐন্দ্রিলার প্ররোচনায় রুদ্রপীড় যাতে শচীর সম্মানহানিকর কোনরূপ কার্য্য না করে, সেজন্য ইন্দুবালা রুদ্রপীড়কে শুভ বোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন। স্বামীর প্রেমকে তিনি ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করেন নি। স্বামীর মঙ্গল কামনায় ইন্দুবালা নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। নারীত্বের এ বিশিষ্ট ধর্মের দিক থেকে ইন্দুবালা চরিত্রটি ঐন্দ্রিলা চরিত্রের বৈপরীত্য (Contrast) সৃষ্টি করেছে। এইভাবে নাট্যকার নাটকের চরিত্র চিত্রণে গভীরতা আনয়ন করেছেন।

উত্তরা (ক্ষত্রবীর—ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

পতিব্রতা উত্তরা চরিত্রটি এক নিঃসীম বেদনার প্রতিমূর্তি। পতিই তাঁর ইহজীবনের ও পরজীবনের একমাত্র আরাধ্য দেবতা। ক্ষত্রকুলে জন্ম হলেও স্বামী অভিমন্যুকে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে প্রেরণ করতে উত্তরা তাই সম্মত হননি। এক্ষেত্রে ক্ষাত্রধর্মের আকর্ষণ অপেক্ষা স্বামীর জীবন রক্ষাই তাঁর কাছে বড় হয় (৩।৪)। কুরুক্ষেত্র রণে চক্রব্যূহ যুদ্ধের ব্যাপকতা অপেক্ষাও উত্তরার সমগ্র সত্তা আর এক যুদ্ধের ভারে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে। এ যুদ্ধ তাঁর স্বামীকে ফিরে পাওয়া আর না পাওয়ার আশঙ্কাজনিত আশা-নিরাশার এক উৎকণ্ঠাময় মানসিক যুদ্ধ। বস্তুতপক্ষে স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক গার্হস্থ্য জীবনই তাঁর কাছে একমাত্র কাম্য। ক্ষত্রকুলের শ্রেয় তাঁর কাছে প্রার্থিত নয়। রণাঙ্গনে বীরের মৃত্যু তাঁর স্বামীর কপালে জয়টীকা পরিয়ে দিলেও সে জয়টীকা তাঁর অভিপ্রেত নয়। পতিসঙ্গই তাঁর একমাত্র প্রার্থনীয়।[ক] পতিপ্রাণা উত্তরা তাই পতির সন্ধানে

ক. উত্তরা—'পতিসঙ্গ' বিনা উত্তরা জানে না কিছু।

(—তৃতীয় অংক, সপ্তম দৃশ্য, —ক্ষত্রবীর।)

পাণ্ডব শিবির ত্যাগ করে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ছুটে যান।[খ] কুরুক্ষেত্র রণে অভিমন্যুর দেহাবসানে উত্তরার অন্তরের বেদনা আরও অতলস্পর্শী হয়ে ওঠে। প্রয়াত পতীর বাহ্যিক চিহ্ন স্বরূপ নারী দেহের সকল অলঙ্কার এক এক করে খুলে দেওয়ার ঘটনায় সে বেদনা ক্রমশ সংহত ও অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে (৫।৮)। এইভাবে পতিব্রতা উত্তরা নিঃসীম বেদনার মানবীয় প্রকাশরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

● (খ/১) ঐতিহাসিক নাটকের প্রধান চরিত্র।

রিজিয়া ঃ

এই নাটকের প্রধান চরিত্র 'রিজিয়া'। নাট্য ঘটনায় গতির সঞ্চার করায় 'রিজিয়া' চরিত্রটি নাট্য ঘটনার গতি সঞ্চারকারী চরিত্রও বটে। সুলতান ইলতুৎমিসের কন্যা রিজিয়া চরিত্রের শারীরগত, সামাজিকগত এবং মনস্তত্ত্বগত মান বজায় রাখা হয়েছে। প্রশাসনিক দক্ষতা, ক্ষমতার শীর্ষ বিন্দুতে ওঠার উচ্চাকাঙ্খা, রাজ্যের শাসন ব্যবস্থায় নিরঙ্কুশ ক্ষমতালাভের প্রচেষ্টা, আত্মপ্রতিষ্ঠার অদম্য প্রয়াস, সাহসিকতা, রণনিপুণতা, তেজদীপ্ততা এই চরিত্রের বিশেষ দিক। প্রথাগত সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী রিজিয়ার মধ্যে পুরুষোচিত ভাবের (Masculinity in women sex) প্রাধান্য চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আপাত প্রেম-বিমুখতা এই চরিত্রের ব্যক্তিত্বের একটি উল্লেখযোগ্য প্রলক্ষণ (Traits)। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ অনুযায়ী এই প্রলক্ষণকে 'Reaction character Trait' বলা হয়।[২৪] রিজিয়ার নারী হৃদয়ে প্রেম আছে। জীবনে পুরুষের প্রেম পাবার এবং প্রেমাষ্পদকে প্রেম দেবার আকাঙ্খা আছে। কিন্তু তাঁর মনের মানুষের সন্ধান না পাবার জন্য তিনি তাঁর প্রেম-বাসনাকে দমন করে রাখেন। তাই আপাত প্রেম-বিমুখতার অন্তরালে একটি প্রেম-সর্বস্ব মন শুক্তির মাঝে মুক্তর মত গোপনে খেলা করে। প্রেম প্রতিদানে প্রেমেরই আকাঙ্খা করে। রিজিয়ার জীবনেও এটা সত্য। কর্ণাটের করদ নৃপতি বীরেন্দ্র রিজিয়ার সেনাপতি। রাজা বীরেন্দ্রের পুরুষোচিত শৌর্য্য-বীর্য্য ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে রিজিয়া তাঁর যোগ্য প্রেমিকের সন্ধান পান। রাজা বীরেন্দ্রকে কেন্দ্র করে তাঁর প্রেমের বাসনা পূরণের ইচ্ছা ক্রিয়াশীল হতে থাকে। রাজা বীরেন্দ্রের কাছ থেকে রিজিয়া তাঁর প্রেমের স্বীকৃতি দাবী করেন। কিন্তু রাজা বীরেন্দ্র বিবাহিত। ধর্মের দিক থেকেও দুইজন দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছেন। রাজা বীরেন্দ্র হিন্দুধর্মাবলম্বী। সুলতানা রিজিয়া ইসলামধর্মী। রাজা বীরেন্দ্রের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থান রিজিয়ার উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি

খ. উত্তরা—'নহে সে ক্ষত্রিয় শূদ্র—চণ্ডাল ব্রাহ্মণ
পতিবিনা নাহি আর অন্য পরিচয়।' (তৃতীয় অঙ্ক, সপ্তম দৃশ্য, ক্ষত্রবীর)।

করে। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য রিজিয়া রাজা বীরেন্দ্রের স্ত্রী 'ইন্দিরাকে' কৌশলে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন দুর্গে বন্দী করে রাখেন। রাজা বীরেন্দ্রের প্রতি তাঁর প্রেমকে বাস্তবায়িত করার সুতীব্র বাসনায় ভাবাবেগ ও কল্পনার অতিচারিতায় রিজিয়া বাস্তবজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ধর্ম ও সমাজের অনুশাসন তাঁর কাছে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। সুলতানা রিজিয়ার প্রেমসত্তার কাছে তাঁর রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় সত্তা ম্লান হয়ে পড়ে। রাজা বীরেন্দ্রের কাছ থেকে প্রেমের স্বীকৃতি ও সম্মান লাভ করার মধ্য দিয়ে রিজিয়া তাঁর প্রেমসত্তাকে জয়ী করতে চান। এই পটভূমিকায় রিজিয়া চরিত্রের মধ্যে চাওয়া-পাওয়া, আশা-নিরাশা, সাফল্য-অসাফল্য—ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া গড়ে উঠেছে (৪/৬)। রাজা বীরেন্দ্র রিজিয়ার প্রেমের আহ্বানে সাড়া না দেওয়ায় রিজিয়া অপমানিত বোধ করেন। তীব্র 'অহম' বোধে তিনি বাস্তব-বোধ হারিয়ে ফেলেন। রাজা বীরেন্দ্রের এই মনোভাবকে তিনি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁর অধীনস্থ করদ-নৃপতির এই ব্যবহারে তাঁর প্রেম-সত্তার অবমাননায়, নারী-সত্তার লাঞ্ছনায় এবং রাজ্ঞী-সত্তার অমর্যাদায় তাঁর মধ্যে তীব্র প্রতিহিংসা জেগে ওঠে। পূর্বের প্রেমময়ী রিজিয়া ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বর্তমানে প্রতিহিংসাপরায়ণী রিজিয়াতে পরিণত হন। রিজিয়ার আদেশে ঘাতক রাজা বীরেন্দ্রকে হত্যা করে (৪/৬)। রাজা বীরেন্দ্রের অভাবে তাঁর সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশ্বাসঘাতক বক্তিয়ারের সহযোগিতায় বাইরের শত্রুর আক্রমণে রিজিয়া সিংহাসনচ্যুত হন। রিজিয়াকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় (৫/৬)। এর ফলে তাঁর রাজ্ঞী-সত্তা বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু তাঁর প্রেমিক সত্তা চিরজাগ্রত থাকে। রাজা বীরেন্দ্রকে তিনি প্রকৃত অর্থেই ভালবাসতেন। তাই কারাগারে বন্দী অবস্থায় রিজিয়ার মানসিক স্তরে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষকরণ (Hallucination) তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করে (৫/৭)। রাজা বীরেন্দ্রকে ঘিরে তাঁর মনের মধ্যে প্রেম ও মিলনের তীব্র আকাঙ্খার অপূর্ণতাই এই ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষকরণের প্রেক্ষাপট। প্রেমিক রিজিয়া রাজা বীরেন্দ্রকে হত্যা করেনি। প্রতিহিংসাময়ী রিজিয়া রাজা বীরেন্দ্রকে হত্যা করেছে। রাজা বীরেন্দ্রের হত্যাকাণ্ডের পর সিংহাসনচ্যুত রিজিয়ার প্রতিশোধের স্পৃহা কমে আসে। ধীরে ধীরে জেগে ওঠে প্রেমিক রিজিয়া। মানসিকতার এই স্তরে রাজা বীরেন্দ্রের হত্যা-কাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাঁর মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মানসিক ক্রিয়ার ঘাত-প্রতিঘাতে তিনি জর্জরিত হন। শাসন ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে থেকে অনেকে এ ধরনের হত্যাকাণ্ডকে প্রশাসনের স্বাভাবিক কাজ বলে মনে করেন। তাঁদের মনে এ ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হয় না। এ বিষয়ে রিজিয়া একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র। রাজা বীরেন্দ্রের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে রিজিয়া তাই সহজ ও স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেননি। এ কারণেই রিজিয়ার মানসিক প্রতিক্রিয়া এত তীব্র। মনোবিজ্ঞানীদের দর্শনেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।[২৫] তীব্র মানসিক ক্রিয়া

প্রতিক্রিয়ায় যন্ত্রণাবিক্ষুব্ধ রিজিয়া বীরেন্দ্রের হত্যাকাণ্ডের জন্য নিজেকে দায়ী করেন। এই বোধ তাঁর মধ্যে গভীর অনুশোচনাকে জাগিয়ে তোলে। এই অনুশোচনার জ্বালায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে রিজিয়া আত্মহত্যা করেন (৫/৭)।

প্রতাপাদিত্য (বঙ্গে প্রতাপাদিত্য—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)।

নাটকের প্রধান চরিত্র 'প্রতাপাদিত্য'। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে চরিত্রটি বহির্মুখী (Extrovert)। প্রতাপাদিত্যের দেশপ্রেম, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সাংগঠনিক শক্তি, রণনিপুণতা উল্লেখযোগ্য। এই গুণেই চরিত্রটি বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। যশোর তথা সমগ্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করাই চরিত্রের উদ্দেশ্য (১/৩)। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে প্রতাপাদিত্যের দৃঢ়-ইচ্ছাশক্তি নাট্যক্রিয়ায় গতির সঞ্চার করেছে। কিন্তু নাটকের মধ্যে অসংলগ্ন ঘটনার আতিশয্য এবং চরিত্রের বিভিন্ন ক্রিয়ার উপর অলৌকিক শক্তির প্রভাব থাকায় চরিত্র-চিত্রণ বিশ্বাস-যোগ্য হয়ে ওঠেনি। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রতাপাদিত্য মোঘল-শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এই ঘটনার বিন্যাসে নাট্যক্রিয়ার মধ্যে বহির্দ্বন্দ্বের কিছুটা প্রকাশ ঘটলেও (৩/৩, ৪/৩, ৪/৫, ৫/৪) অন্তর্দ্বন্দ্বের অভাবে প্রতাপাদিত্যের চরিত্রটি আকর্ষনীয় হয়ে ওঠেনি।

সিরাজদ্দৌলা (সিরাজদ্দৌলা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

এই নাটকের প্রধান চরিত্র 'সিরাজদ্দৌলা'। শারীরগত এবং বংশগত ধারা অনুসারে এই চরিত্রের মনস্তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। শৈশব অবস্থা থেকে মাতামহের অতিরিক্ত স্নেহে লালিত হবার ফলে সিরাজদ্দৌলার মধ্যে আত্মসংযম প্রবৃত্তি, আত্মবিশ্বাস, সাংগঠনিক শক্তি এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতা সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠেনি। অপরিণত বুদ্ধি, ধৈর্য্যের অভাব, যৌবনজাত চঞ্চলতা এবং পরিণাম-জ্ঞানের অভাবের জন্য সিরাজদ্দৌলার চরিত্রের ইচ্ছাশক্তিও দুর্বল হয়ে পড়েছে। ইংরেজদের আক্রমণকে প্রতিহত করে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করাই চরিত্রের উদ্দেশ্য।ক দুর্বল ইচ্ছাশক্তির ফলে এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য চরিত্রের মধ্যে দৃঢ় পৌরুষ-ব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বের অভাব লক্ষ্যনীয়। বাংলার নবাবের মসনদ গ্রহণ করার আগে তাঁর স্বেচ্ছাচার ও ব্যভিচারের অতীত অধ্যায়গুলি সিরাজদ্দৌলার মধ্যে মানসিক হীনমন্যতার সৃষ্টি (Inferior Complex) করেছে। এই হীনমন্যতাও তাঁর

ক. সিরাজদ্দৌলা—"বিদেশী ফিরিঙ্গী কভু নহে আপনার
স্বার্থপর চাহে মাত্র রাজ্য অধিকার
হও সবে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত।"

(—প্রথম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য, সিরাজদ্দৌলা।)

ব্যক্তিত্বকে দুর্বল করেছে। এ কারণেই স্বার্থপর ও ষড়যন্ত্রকারী অমাত্যগণ ও বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিদের বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। একদিকে দেশীয় অমাত্য ও সেনাপতিগণের দেশের স্বার্থ বিরোধী ষড়যন্ত্র এবং অপরদিকে বাংলার মসনদ দখল করার জন্য ইংরেজদের আগ্রাসনমূলক কাজের ফলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়; সিরাজদ্দৌলার নবাবী-সত্তার নিরাপত্তাও ব্যাহত হয়ে পড়ে। এই রাজনৈতিক পট-ভূমিকার প্রভাবে সিরাজদ্দৌলার মধ্যে তীব্র উৎকণ্ঠাময় ভীতিপ্রবণ মানসিকতা গড়ে ওঠেছে।[খ] এই উৎকণ্ঠা ও মানসিক ভীতি সিরাজদ্দৌলার স্নায়বিক দুর্বলতার কারক হয় এবং তাঁর বিচার ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে শিথিল করে দেয়। তাঁর প্রক্ষোভগুলি (emotions) সুসংহত না হয়ে অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে। অনিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগের প্রাবল্যের ফলে সিরাজদ্দৌলা যে কোন সংকট মুহূর্তে তাঁর আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেন। এর ফলে দেশের সংকট মুহূর্তে তাঁর বিভিন্ন কাজের মধ্যে স্ব-বিরোধী মনোভাব (self-contradiction) প্রকাশিত হয়। কলকাতায় ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ-বিমুখ মনোভাব ও ইংরেজ-শক্তির জয়গান (২।৬), ইংরেজদের সামরিক শক্তিতে ভীত হয়ে সিরাজদ্দৌলা কর্তৃক ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের প্রয়াস (২।৬), ক্লাইভের সন্ধিপত্রের দাবী মেনে নিয়ে বাংলাদেশ থেকে ফরাসীদের বিতাড়িত করা (৩।১), মীরজাফর, জগৎশেঠ প্রমুখ বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী রাজকর্মচারী ও অমাত্যগণের কাছে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা (১।২, ৩।৫), পলাশীর যুদ্ধের মুহূর্তে মীরজাফরের কাছে অসহায় সিরাজদ্দৌল্লার আত্মসমর্পন (৫।২)—এসব ঘটনা এদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁর এসকল কাজ এটাই প্রমাণ করে যে তিনি অস্থির-মতী যুক্ত বিচার বুদ্ধিহীন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন (Empirical or Irrationality—an irrational factor that destines a man to emancipate himself from herd and from its well worn patts[২৬])। জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতাই তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞানের উৎস ছিল। এই সাধারণ অভিজ্ঞতা নিয়ে রাজকার্য্য পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি রাজকার্য্য পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। মূলত বহির্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ইংরেজ-শক্তির সঙ্গে সিরাজদ্দৌলার সংঘর্ষের ঘটনা বিন্যস্ত হয়েছে। নাট্যঘটনার কোন সংকটই এই চরিত্রের মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে পারেনি। এর অভাবে এই চরিত্রের গভীরতা ও আকর্ষণ হ্রাস পেয়েছে।

খ. সিরাজদ্দৌলা—"আমার আহার নাই, নিদ্রা নাই
শয়নে স্বপনে ক্লাইভের ভীষণ মূর্তি
আমার সম্মুখে বিরাজিত……
আমি বড়ই কাতর হয়েছি" (—তৃতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য। সিরাজদ্দৌলা।)

মীরকাশিম (মীরকাশিম—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

মীরকাশিম নাটকের প্রধান চরিত্র 'মীরকাশিম'। কৌশলে মীরজাফরকে হঠিয়ে দিয়ে মীরকাশিমের বাংলার নবাবী পদ গ্রহণের ঘটনার (১।৭) মধ্য দিয়ে নাট্যঘটনায় গতির সৃষ্টি হয়েছে। বাংলার নবাবী পদ গ্রহণের পর মীরকাশীম দেশের স্বার্থে কাজ করতে থাকায় ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ও সংঘর্ষের সূচনা হয়। এই ঘটনা নাট্যঘটনার গতিকে ক্রমশঃ উর্দ্ধমুখী করে তোলে (২।৩,—২।৫)। ইংরাজদের বিরুদ্ধে মীরকাশিমের ক্রমাগত সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নাট্যঘটনার আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় (২।৬, ৩।২, ৩।৫, ৪।২, ৪।৪, ৪।৬)। অবশেষে মীরকাসিমের চূড়ান্ত পরাজয়ে (৫।৯) নাট্যঘটনা পরিণতি লাভ করে। এভাবে নাট্যঘটনায় গতির সঞ্চার করায় মীরকাশিম চরিত্রটি নাট্যঘটনার গতিসঞ্চারকারী চরিত্র হিসাবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রধান চরিত্র এবং নাট্যঘটনার গতিসঞ্চারকারী চরিত্র হিসাবে মীরকাশিমের গভীর দেশপ্রেম, কর্ত্তব্যানুরাগ, প্রজাবৎসলতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা চরিত্রটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। অর্থনীতির দিক থেকে দেশ যে ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে, জমিদার, মুৎসুদ্দি ও বেনিয়ারা দেশের স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের স্বার্থকেই বড় করে দেখছে, সমগ্র দেশের মধ্যে যে বুর্জোয়া মূল্যবোধের ক্রম-বিকাশ ঘটছে এবং অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি লাভই প্রধান হয়ে উঠছে (১।১, ২।১, ২।৩)—মীরকাশিম তা বুঝেছিলেন।[ক] এ সকল অবস্থার প্রতিবিধানের জন্য তাঁর মনে এক অদম্য বাসনার সৃষ্টি হয়। বলিষ্ঠ কার্য্যবলীর মধ্য দিয়ে এই বাসনাকে ক্রিয়াশীল করে তোলার জন্য তিনি সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। এক্ষেত্রে তাঁর বাসনা (wish) দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির (will) দ্বারা পরিচালিত হয়।[২৭] দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ইংরেজদের উচ্ছেদ করাই তাঁর জীবনের ব্রত হয়। এই উদ্দেশ্যসাধনের

ক (১) "ইংরাজের অযথা বাণিজ্য বিস্তারে প্রজার সর্বনাশ হচ্ছে… বেইমান দেশের লোক, নিজে অর্থ দিয়ে তাদের মুৎসুদ্দির পদ গ্রহণ করে… বণিকদের নিকট মুচলেখা লিখিয়ে নিয়ে অল্পমূল্যে পণ্য দ্রব্য ক্রয় করে আর দশ গুণ মূল্যে বিক্রয় করে। এতে সমস্ত প্রজা দিন দিন নিঃস্ব হচ্ছে।"

(—মীরকাশিম, প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য।)

(২) "ঘৃত, চাউল, লবন, সুপারি, খড়, বাঁশ, পান, তামাক, চিনি প্রভৃতি দেশীর নেতাদের সামান্য ব্যবসা পর্যন্ত আর দেশীয় লোকের নাই"

(—দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য, মীরকাশিম।)

(৩) "দীন প্রজার পীড়ক জমিদার প্রভৃতি উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণ একদিনের নিমিত্ত দীন প্রজার মুখ চায় নাই—"

(—দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য, মীরকাশিম।)

জন্য নানাভাবে ইংরেজদের বিরোধিতা করতে গিয়ে মীরকাশিমের মধ্যে বহির্দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠে। মীরকাসিমের সঙ্গে ইংরেজদের সশস্ত্র সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এই বহির্দ্বন্দ্ব ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে পড়ে। দেশের অন্যান্য অমাত্য ও রাজকর্মচারীদের মধ্যে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি অপেক্ষা ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির প্রবণতা অধিক থাকায় মীরকাসিমের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের জন্য ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে মীরকাশিম পরাজিত হয়। উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যর্থতা মীরকাসিমের মনে মানসিক প্রদাহের সৃষ্টি করে। এরকম অবস্থায় সিরাজদ্দৌলার প্রতি তাঁর পূর্বকৃত গর্হিত কর্মের জন্য মীরকাসিমের অন্তরে অনুতাপ দেখা দেয়। এর ফলেই মীরকাসিম তাঁর মানসিক ক্ষমতার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন ও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যান। নাটকে ঘটনার বাহুল্যে চরিত্রের এই ক্রমবিকাশ দানা বেঁধে ওঠেনি।

পরিশেষে বলা যায় যে প্রজাবৎসল মীরকাসিম চরিত্রের মাধ্যমে প্রজার মঙ্গল সাধনই রাজধর্ম—এই সত্যটির প্রতি নাট্যকার আলোকপাত করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি পরোক্ষভাবে ভারতবাসীর উপর ইংরেজদের শোষণমূলক কার্য্যাবলীর প্রতি জনগণকে সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

শিবাজী (ছত্রপতি শিবাজী—গিরিশ চন্দ্র ঘোষ)।

নাটকের প্রধান চরিত্র 'শিবাজী'। 'শিবাজী' চরিত্রটি নাট্যঘটনার গতিসঞ্চারকারী চরিত্ররূপেও চিত্রিত। মোঘলের অধীনতা থেকে দেশের স্বাধীনতা তথা মাতৃভূমির মুক্তি সাধনই শিবাজীর উদ্দেশ্য।[ক] জায়গীরদার শাহজী ও পতিব্রতা রমনী জিজাবাঈ-এর পুত্র 'শিবাজী' দাদাজী কোণ্ডদেবের নিকট হতে স্বদেশপ্রেম, ত্যাগ ও বীরত্বের শিক্ষা লাভ করেন। দীক্ষাগুরু রামদাস স্বামীর নিকট হতে ধর্মনৈতিক শিক্ষালাভ করেন এবং তিনি পার্বতীয় অঞ্চলের যোদ্ধা মবলাদের সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন প্রকার গেরিলা যুদ্ধের কৌশল রপ্ত করেন। এই বংশগত ও সমাজগত পরিবেশের প্রভাবেই দেশপ্রেমিক, বীর, মাতৃভক্ত, দেব-দ্বিজে আস্থাবান, সুদক্ষ রাজনৈতিক সংগঠক, বিবেক ও বিচারবান শিবাজীর মনস্তত্ত্ব ও ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে।[২৮] 'শিবাজীর' চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে নাট্যকার বস্তুতপক্ষে শিবাজীর আনুপূর্বক জীবন বৃত্তান্ত রচনা করেছেন। সেক্ষেত্রে চরিত্রের তিনটি ভিত্তিভূমি লক্ষ্যনীয়—(১) দৈবের ওপর নির্ভরশীল অবতার রূপে চিত্রিত শিবাজী। (২) দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্দীপ্ত বীর ও সংগ্রামী শিবাজী। এই পরিমণ্ডলে শিবাজীর রাজনৈতিক জীবনকে তুলে ধরা হয়েছে। (৩) মাতা-পুত্র ও স্ত্রীর দ্বারা পরিবৃত শিবাজীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবন। অবতার রূপে শিবাজী দেবী

ক. শিবাজী—"স্বাধীনতা অর্জন কিবা জীবন বিসর্জন এই আমার সংকল্প।"
(—প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, শিবাজী।)

ভবানীর পুত্র। এক্ষেত্রে অধর্মের বিনাশ ও হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই তাঁর লক্ষ্য (১/২)। দেশকে স্বাধীন করাই শিবাজীর রাজনৈতিক লক্ষ্য। পরিবারের অন্যতম দায়িত্বশীল ব্যক্তিরূপে পরিবারের শৃঙ্খলা বজায় রেখে নিজের পুত্রসত্তা, পিতৃসত্তা ও স্বামীসত্তাকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই শিবাজীর গার্হস্থ্য জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য। শিবাজীকে অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে নাট্যকার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শিবাজীর সংগ্রামী সত্তাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। আওরঙ্গজেবের প্রাসাদে নজরবন্দী হয়ে পড়ায় মানসিক দিক দিয়ে শিবাজী কিছুটা ভেঙে পড়েন। সেই সময় তাঁর মুখ দিয়ে দেবী ভবানীর বাক্য নিঃসরণ, দেবী ভবানীর বাক্যে তাঁর মানসিক স্থিতাবস্থা লাভ (৩/৬)—এ সকল ঘটনার কার্যকারণ অসংগতি ও আকস্মিকতা বাস্তববোধকে আঘাত করেছে। এর ফলে শিবাজীর সংগ্রামী সত্তার মানবীয় প্রকাশ ব্যাহত হয়েছে। মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ চরিত্রের মধ্যে বহির্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। পারিবারিকক্ষেত্রে পুত্র শম্ভাজীর বিশ্বাসঘাতকতায় ও ব্যাভিচারিতায় শিবাজীর পিতৃসত্তার লাঞ্ছনার (৫/২, ৪, ৫) ঘটনাটি শিবাজীর মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে পারেনি। সামগ্রিকভাবে উপরোক্ত তিনটি স্তরে শিবাজীর কার্যাবলী বহুধা বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এর ফলে চরিত্রটি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

শিবাজী চরিত্রের তিনটি লক্ষ্যকে একমুখী করে গড়ে তুলতে না পারায় নাট্যক্রিয়া চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে নাট্যচরিত্রে একাধিক লক্ষ্য থাকতে পারে। কিন্তু তার মধ্যে একটি লক্ষ্যকে প্রধান করে চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়। এর অভাবে নাট্য চরিত্র ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। 'শিবাজী' চরিত্রটি এর ব্যতিক্রম নয়।

অশোক (অশোক—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)।

নাটকের প্রধান চরিত্র 'অশোক'। নাট্য ঘটনায় গতিদান করায় চরিত্রটি নাট্য-ঘটনার গতিসঞ্চারকারী চরিত্র রূপেও প্রতিষ্ঠিত। নাট্যচরিত্র গঠনের দিক থেকে চরিত্রটি ত্রৈমানিক। মগধের সম্রাটরূপে অশোকের প্রতিষ্ঠালাভ এবং বৌদ্ধ ধর্মাশ্রিত অশোকের মোক্ষলাভ—এই দুই পর্বে চরিত্রটির সার্বিক পরিচয় বিন্যস্ত। গভীর আত্মসম্মানবোধ, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, বীর্যবত্তা, সংগ্রামী চেতনা, মাতৃভক্তি ইত্যাদি গুণে চরিত্রটি সমৃদ্ধ। ভবিষ্যতে রাজ্যের সম্রাট হবার বাসনা পূরণের জন্য এই চরিত্রটি নাটকের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে (১/২)। পিতৃবিয়োগের পর ভ্রাতা সুসীমের বিদ্রোহ দমন করে অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন (২/৪)। কলিঙ্গরাজ তাঁকে সম্রাট বলে স্বীকার না করায় তাঁর সম্রাট সত্তা আহত হয়। সম্রাট-সত্তার অবমাননা তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়কে তীব্র করে তোলে। শৈশব অবস্থা থেকে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বঞ্চনা ও রাজনৈতিক নিপীড়নের আঘাতে

(১/১, ২, ৪) তাঁর পুত্র-সত্তা লাঞ্ছিত হয়। আত্মসম্মানবোধ ক্ষুন্ন হয়। এর ফলে 'অশোক' চরিত্রের মধ্যে এক আক্রমণমুখী মনোভাব (Aggressive inpulse) গড়ে ওঠে (২/১)। মগধের সিংহাসনলাভের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর ভ্রাতা সুসীমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। এই ভ্রাতৃ-দ্বন্দ্বে তাঁর বিরোধীদের দমন করার ক্ষেত্রে তিনি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। কলিঙ্গের যুদ্ধে সম্রাট অশোক পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার নজীর সৃষ্টি করেন। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুসারে এই নিষ্ঠুরতার মধ্যেই তাঁর চরিত্রের 'আক্রমনাত্মক মনোভাবের' সর্বাত্মক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় (২/৮, ৩/১)। প্রসঙ্গক্রমে নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'অশোক' নাটকটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই নাটকেও কণিষ্করাজের সহযোগিতায় 'অশোক' কর্তৃক পিতাকে সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী করা এবং ভ্রাতা বীতশোককে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার ঘটনার মধ্য দিয়ে চরিত্রের "আক্রমণাত্মক মনোভাবের" প্রকাশ ঘটেছে (৫/১, ৫/২)।

কলিঙ্গের যুদ্ধে "অশোকের" নিষ্ঠুরতা ও প্রবৃত্তির ভয়ঙ্করতা পরিশেষে তাঁর মনে আতঙ্ক ও অনুশোচনার সৃষ্টি করে। এর ফলে অশোকের মনের মধ্যে ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষকরণ (Hallucination) ঘটে (৩/৩)। উপগুপ্তের প্রেমের বানী তাঁর মধ্যে শুভবোধের উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করে। কিন্তু ক্ষমতার মোহ, আধিপত্য প্রতিষ্ঠার গভীর ইচ্ছা এবং রিপুর প্রাবল্যে তাঁর মধ্যে অহংভাব বড় হয়ে ওঠে। চরিত্রের মধ্যে একদিকে রিপুজাত ভোগের প্রবৃত্তি ও অপরদিকে ধর্মবোধজাত ভোগ থেকে নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্বে ভোগের প্রবৃত্তিই বড় হয়ে ওঠে। ঘটনাক্রমে "অশোক" বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ন্যাগ্রোধের (৩/৮) এবং রিপুজয়ী উপগুপ্তের সান্নিধ্য ও আশীর্বাদ লাভ করেন। সম্রাট অশোক জৈন-ধর্মাবলম্বীদের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। তাঁদের বধ করার আদেশ দেন। জৈনধর্মাবলম্বীদের রক্ষার জন্য 'অশোকের' ভ্রাতা 'বীতশোক' নিজের জীবন-দান করেন। এই ঘটনাটি জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর মধ্যে নতুন চেতনা এনে দেয়। 'অশোকের' শুভবোধ জাগ্রত হয়। তাঁর ধর্মসত্তার জাগরণ ঘটে। এই ধর্মসত্তার জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রীর সাহচর্য্যও উল্লেখযোগ্য। নাটকের শেষে রিপু-তাড়িত 'অশোকের' রিপুজয়ী 'অশোকে' উত্তরণ ঘটে। বৌদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে তিনি মোক্ষলাভ করেন (৫/১০)।

নাটকের প্রথম পর্বে মগধের সিংহাসন লাভের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পিতা বিন্দুসার ও ভ্রাতা সুসীমের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয়। এই বিরোধ চরিত্রের মধ্যে বহির্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে (২/১, ২/৮)। কলিঙ্গযুদ্ধের পর চরিত্রের মধ্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এটি চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব (৩/৬)। কিন্তু চরিত্র গঠনের মুন্সিয়ানার অভাবে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়ে ওঠেনি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'অশোক' নাটকের 'অশোক' চরিত্রটি আগাগোড়াই বহির্দ্বন্দ্বজাত। নাটকের 'অশোক' চরিত্রের ক্রমপরিবর্তনের বিভিন্ন

পর্য্যায়গুলি কার্যকারণ সম্পর্কে গড়ে না ওঠায় 'অশোক' চরিত্রের বিন্যাস আকস্মিকতা দোষে দুষ্ট (৫/৪, ৫/৫)। এর ফলে চরিত্রটি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। উভয় নাটকের "অশোক" চরিত্রই অবাঞ্ছিত ঘটনার ভারে ভারাক্রান্ত।

গিরিশচন্দ্রের 'অশোক' নাটকের 'অশোক' চরিত্রের একটি বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। এই চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশবাসীদের প্রতি প্রেম ও সম্প্রীতি দ্বারা লালিত মানবিক মূল্য বোধের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এর দ্বারা পরোক্ষভাবে তিনি সে সময়কার ইংরাজ শক্তির প্রেমহীন সহিংস রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দেশবাসীকে সজাগ হবার আহ্বান জানিয়েছেন।

রাণাপ্রতাপ সিংহ (রাণা প্রতাপ সিংহ—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

নাটকের প্রধান চরিত্র 'রাণা প্রতাপ সিংহ'। চরিত্রের গঠন-বিন্যাসের দিক থেকে চরিত্রটি ত্রৈমানিক। নাট্য ঘটনায় গতির সৃষ্টি করায় এই চরিত্রটি গতি-সঞ্চারকারী চরিত্রও বটে। মোঘলের পরাধীনতা থেকে চিতোরকে স্বাধীন করাই তাঁর উদ্দেশ্য (১/১)। গভীর দেশপ্রেম, অমিত ক্ষাত্রবীর্য্য, সাংগঠনিক দক্ষতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, কর্ত্তব্য নিষ্ঠা, স্বাধীনতা প্রিয়তা, সততা ও সহিষ্ণুতার গুণে এই চরিত্রটি আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছে। চিতোর উদ্ধারের জন্য মোঘল সম্রাট আকবরের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষময় নাট্য ঘটনার মধ্য দিয়ে চরিত্রের বহির্দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে (১/৮, ২/৫, ২/৭)। মোঘল শক্তির বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রামে যুক্ত থাকার ফলে তাঁর পারিবারিক জীবন-যাত্রা ব্যাহত হয়। অনাহার, অনিদ্রা আর দুশ্চিন্তা নিত্যসঙ্গী হয়। এ সময় তাঁর কন্যা ইরার মৃত্যুতে রাণাপ্রতাপের পারিবারিক অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। তাঁর পিতৃসত্তা আহত হয়। এই বিপর্য্যয়ের মুখে দাঁড়িয়েও রাণাপ্রতাপ সিংহ চিতোরের স্বাধীনতার সংগ্রামে একনিষ্ঠ যোদ্ধা হিসাবে অবিচল থাকেন। এই সংগ্রামশীলতা, এই ত্যাগ, এই শৌর্য্যের মূলে রয়েছে স্বাধীনতা প্রিয় রাণাপ্রতাপ সিংহের গভীর দেশপ্রেম। রাণপ্রতাপ সিংহের তীব্র অহম্ (Ego) বোধ চরিত্রের দীপ্তিকে কিছুটা ম্লান করেছে। অহম্-বোধের প্রাবল্যে রাণাপ্রতাপ সিংহের মধ্যে দেশের গৌরব অপেক্ষা স্বীয় বংশ গৌরব, দেশাভিমান অপেক্ষা জাত্যাভিমান, দেশপ্রেমের উদারতা অপেক্ষা দেশাচারের সঙ্কীর্ণতা ও ধর্মান্ধতা অধিকমাত্রায় ক্রিয়াশীল হয়েছে। রাণা প্রতাপসিংহের ভাই শক্ত সিংহ দৌলতউন্নিসাকে বিয়ে করেন। রানাপ্রতাপ সিংহ তাঁর ধর্মীয় সংস্কারের জন্য এই বিবাহকে মেনে নিতে পারেন নি। তাই তিনি স্বাধীনতার যুদ্ধের চরম মুহূর্তে তাঁর সংগ্রামের অন্যতম সাথী ভাই শক্ত সিংহের সঙ্গে সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন (৫/৩)। ক্ষুদ্র দেশাচার, ধর্মীয় সংস্কার এবং সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্নতার উর্দ্ধে উঠতে না পারায় রাণাপ্রতাপ সিংহের চরিত্রের গভীরতা ও

মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। চরিত্রের এই দুর্বলতাই চরিত্রের উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছে।

নাট্যকার এই চরিত্রটিকে আদর্শায়িত করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এর ফলে চরিত্রের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের প্রচেষ্টার (Motive and Motivations) সঙ্গে সম্পর্কহীন কিছু ঘটনা নাটকে স্থান পেয়েছে। এসব ঘটনা চরিত্রটিকে ভারাক্রান্ত করেছে।

দুর্গাদাস (দুর্গাদাস—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)।

নাটকের প্রধান চরিত্র দুর্গাদাস। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে চরিত্রটি বহির্মুখী। দুর্গাদাসের মাধ্যমে নাট্যকার একাধারে দেশের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছেন, দেশপ্রেমের জাগরণ ঘটাতে প্রয়াসী হয়েছেন এবং অসাধারণ চারিত্রিক গুণের মাহাত্ম্য প্রচার করতে চেয়েছেন। এই তিনটি উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসাবে দুর্গাদাস চরিত্রটি চিত্রিত। এই সুগভীর দেশানুরাগ, স্বদেশ বৎসলতা, স্থিরতা, ধীরতা, কর্তব্য পরায়ণতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও উদারচিত্ততা দুর্গাদাস চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব। ঔরংজেবের প্রস্তাব মত যশোবন্তের পত্নী ও পুত্রকে ঔরংজেবের কাছে দুর্গাদাস সমর্পন করতে রাজী হননি (১/১)। সামন্তগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও ঔরংজেবের পুত্র আকবরকে দুর্গাদাস আশ্রয় দান করেন (৩/১০)। ঔরংজেবের মহিষী গুলনেওয়ারের প্রেমকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন (৪/৮)। রাজিয়ার নারীত্বের সম্মান রক্ষার জন্য তিনি মাড়বারের রাণা অজিত সিংহের অনৈতিক কাজের বিরোধিতা করেন এবং রাজিয়ার নিরাপত্তার কথা ভেবে তাকে ঔরংজেবের নিকট প্রেরণ করেন। এসব কাজের জন্য মাড়বারের রাণা দুর্গাদাসকে তাঁর রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন (৫/৫)। এ সকল ঘটনা দুর্গাদাসের সংযমশিলতা, আশ্রিত ধর্ম রক্ষা, জিতেন্দ্রিয়তা, এবং মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় বহন করে। এইভাবে দুর্গাদাস চরিত্রটি দোষেগুণে গঠিত সাধারণ মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে এক বিশিষ্ট আদর্শের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কে পরিণত হয়েছে। সে জ্যোতিষ্ক বাস্তবের পাদপীঠ থেকে বহু ঊর্ধ্বে স্বপ্নের জগৎকে আলোকিত করেছে মাত্র। দুর্গাদাসকে আদর্শের প্রতিমূর্তি করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নাট্যকারের উপর তাঁর পিতার চরিত্রের প্রভাব বিদ্যমান।[২৯]

মাড়বারের স্বাধীনতা ও প্রভুপত্নীর সম্মান রক্ষার ক্ষেত্রে ঔরংজেবের সঙ্গে দুর্গাদাসের সংঘাত চরিত্রের মধ্যে বহির্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করলেও সেই দ্বন্দ্ব চরিত্রটিকে একমুখী গতি দান করেনি। নাটকে দুর্গাদাস অনেক বিচ্ছিন্ন ও অবিশ্বাস্য ঘটনার (৩।৬, ৪।১, ৪।৬, ৭, ৮, ৫।৩) ধারক ও বাহক হয়ে পড়ায় চরিত্রের সুষ্ঠু বিকাশ ব্যাহত হয়েছে এবং চরিত্রটি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

পরিশেষে বলা যায় যে দ্বিজেন্দ্রলালের সময়ে যুগ ধর্মের প্রয়োজনে জাতির

নির্মল চরিত্র গঠনের উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়োজনও দেখা দিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের দুর্গাদাস চরিত্রটি সেই যুগ চেতনার পরিচয় বহন করেছে।

নুরজাহান (নুরজাহান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

নাটকের প্রধান চরিত্র 'নুরজাহান'। নাট্য ঘটনার চালিকাশক্তি হিসাবে এই চরিত্রটি নাট্য ঘটনায় গতির সৃষ্টিও করেছে। তাই এ চরিত্রটি নাট্য ঘটনার গতিসঞ্চারকারী চরিত্রও বটে। চরিত্র গঠনের দিক থেকে নাট্যকার চরিত্রের শারীরিক সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক এই তিনটি দিকের মান বজায় রেখেছেন। নুরজাহান ক্ষমতা-প্রিয়। দিল্লীর সিংহাসনে নিজের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করাই নুরজাহানের মূল উদ্দেশ্য। কুমারী নুরজাহান ও বিবাহিত নুরজাহান এই দুটি পর্বের সমন্বয়ে তাঁর নারীত্বের চালচিত্র নাট্য ঘটনায় প্রকাশিত হয়েছে। অবিবাহিত জীবনে নুরজাহান কুমারী 'মেহের' হিসাবে যৌবনোচিত কামনা বাসনার আধার। বিবাহিত জীবনে তাঁর দুটি ভাগ। একভাগে নুরজাহান শের আফগানের বধূ ও লায়লার মা, এবং অপর ভাগে নুরজাহান জাহাঙ্গীরের স্ত্রী।

কুমারী অবস্থায় মেহের সেলিমের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন। সেলিমের প্রতি তাঁর এ আকর্ষণ প্রেম-জাত নয়। মানুষ সেলিম অপেক্ষা আকবর-পুত্র সেলিম, ভারতের ভাবী সম্রাট সেলিম, ভবিষ্যৎ ক্ষমতার শীর্ষকোণ সেলিম-ই মেহেরের আকর্ষণ অনুভবের মূলে ক্রিয়াশীল ছিল। নৈশভোজের আসরে নিজের রূপ ও গুণের দ্বারা সেলিমের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পেরে মেহের তাই বিজয়গর্বে গর্বিত হন (১।৪)। ঘটনাক্রমে মেহের শের আফগানের বধূ হন। কিন্তু সেলিম সম্পর্কে তাঁর অবদমিত বাসনা তাঁকে চিন্তান্বিত করে তোলে। এই চিন্তাই পরবর্তীকালে তাঁর কার্য্য-কারণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ লাভ করে। অতীতের সেলিমের বর্তমানে জাহাঙ্গীর নাম গ্রহণ, ক্ষমতাশূন্য সেলিমের পূর্ণ ক্ষমতা লাভ এবং সম্রাট পুত্র সেলিমের সম্রাট পদে জাহাঙ্গীর নামে অভিষিক্ত হওয়ার ঘটনায় মেহেরের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাবে মেহের তাঁর অবদমিত বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য সক্রিয় (Active) হয়ে ওঠেন।[ক] এই পটভূমিকায় দুই বিপরীত শক্তির আকর্ষণে চরিত্রের মধ্যে সঙ্কট দানা বাঁধতে থাকে।

এই দুই বিপরীত শক্তির একদিকে মেহেরের উচ্চাশা পূরণে সক্ষম ক্ষমতাবান সম্রাট জাহাঙ্গীর, অপরদিকে মেহেরের উচ্চাশা পূরণে অক্ষম ক্ষমতাশূন্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের ওমরাহ শের আফগান। একদিকে জাহাঙ্গীরের আনুগত্য লাভের মাধ্যমে রাজনৈতিক মঞ্চে নিজেকে ক্ষমতার অধীশ্বরী করে তোলার সম্ভাবনা,

ক. নুরজাহান—"সেলিম সম্রাট! আবার সে কথা কেন মনে আসে? ···এখন আবার সে চিন্তা কেন" (—প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য—নুরজহান।)

অপরদিকে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে প্রেমময় শের-আফগানের হৃদয়ানুগত্যে নিজের দাম্পত্যজীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে তোলা। এই দুই বিপরীত মেরুবৃত্তের মাঝে দাঁড়িয়ে মেহেরের ভবিষ্যৎ জীবন নূতন পথ-পরিক্রমার দিকে অগ্রসর হয়। ব্যক্তিগত উচ্চাশা পূরণের তীব্র ইচ্ছার নীচে মেহেরের মনুষ্যত্ব ও নৈতিক মূল্যবোধ চাপা পড়ে যায়। তাই মেহের প্রেমিক শেরআফগানকে শুকনো পাতার মত জীবন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজ-ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার বাতাবরণে নিজেকে আবৃত করে রাখেন। এই স্তরে মেহেরের মধ্যে শুভ ও অশুভবোধের দ্বন্দ্বে চরিত্রটি গতিশীল হয়ে ওঠেছে। শুভবোধের ফলে প্রেমময়, শৌর্যময়, বীর্য্যবান শের আফগানকে স্বামীরূপে লাভ করে মেহের গর্ব অনুভব করেন (১/৪)। অজানা বিপদের আশঙ্কায় মেহের শের আফগানকে আগ্রায় যেতে নিষেধ করেন (১/১)। শের আফগানকে হত্যার জন্য জাহাঙ্গীরের একাধিক চক্রান্তে নূরজাহান স্তম্ভিত হন। নিজের উচ্চাশার প্রবৃত্তিকে দমন করতে সচেষ্ট হন (১/৮)। তথাপি অশুভবোধের প্রাবল্যে সে শুভবোধ ঢাকা পড়ে যায় (১/৮)। তাই ব্যক্তিগত উচ্চাশার উন্মাদনায় শের আফগানের বধূ হিসাবে জাহাঙ্গীরের চক্রান্ত থেকে শেরআফগানকে বাঁচানোর কোনরূপ আন্তরিক প্রচেষ্টা তাঁর মধ্যে দেখা যায় না। তাই বধূ মেহের অকৃত্রিম প্রেমের দ্বারা শের আফগানের প্রেমিকসত্তাকে সম্মানিত করতে পারেননি। উদার প্রেমময় শের আফগানকে বধূ মেহের তাঁর অন্তরের ভক্তি প্রদীপ জ্বালিয়ে আরতি করতে চেয়েছেন মাত্র।[খ]

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির এই দ্বন্দ্বে বধূসত্তার কণ্ঠরোধ করার মধ্য দিয়ে মেহের তথা নূরজাহানের অশুভবোধ নূরজাহানের শুভবোধকে গ্রাস করে ফেলে। এই অশুভবোধই হচ্ছে নূরজাহানের শয়তানী বা পিশাচী সত্তা (২/৩, ৫, ৮)। এই পিশাচী সত্তার রূপ কল্পনার দ্বারা নাট্যকার চরিত্রের আদিম এবং অমানবিক প্রবৃত্তির উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন। চরিত্রের অহং (ego) যখন অধিক মাত্রায় ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে তখনই তা শয়তানের রূপ ধারণ করে। এই শয়তান মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধির অবলুপ্তি ঘটায়। এরফলে মানুষের মধ্যে ইদমের (ID) প্রবৃত্তিগুলি জাগরিত হয় এবং তখন সে সুস্থচেতনা সম্পন্ন মানুষের কাছে ঘৃণা ও নিন্দার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।[৩০] নূরজাহানের মধ্যেও এর প্রভাব উল্লেখযোগ্য।

শের আফগানের মৃত্যুর পর নূরজাহান জাহাঙ্গীরের প্রাসাদে আশ্রয়গ্রহণ করেন। জাহাঙ্গীরের নির্দেশে ও ষড়যন্ত্রে শের আফগানকে হত্যা করা হয়। সেই জাহাঙ্গীরের প্রতি নূরজাহানের আপোষকামী মনোভাবকে লায়লা মেনে নিতে

খ. নূরজাহান—"ও! স্বামী! যদি ভক্তি প্রেমের শূন্যতা পূর্ণ কর্ত্তে পার্ত্তো, তবে সে ভক্তি তোমার পায়ে ঢেলে দিতাম।"

(—প্রথম অংক, অষ্টম দৃশ্য—নূরজাহান।)

পারেনি। লায়লার কাছে তাঁর পিতা শেরআফগানের হত্যাকারির ক্ষমা নেই। তাই তার মা নূরজাহানের নৈতিক-বোধ শূন্য কাজের বিরুদ্ধে লায়লা সোচ্চার হয়। সে মায়ের অনৈতিক মনোভাবের প্রতিবাদ করে। নূরজাহানকে তীব্র ভাষায় ভৎর্সনা করে। লায়লার তীব্র ভৎর্সনা নূরজাহানের মাতৃসত্তা ও স্ত্রী সত্তার পবিত্রতা সম্পর্কে গভীর জিজ্ঞাসা তুলে ধরে। কন্যার এরূপ ব্যবহারের মধ্যে নূরজাহান তাঁর প্রবৃত্তির নগ্নরূপ দেখে লজ্জিত হন (২/৩)। নিজের প্রবৃত্তির সঙ্গে মাতৃত্ববোধের দ্বন্দ্বে নূরজাহানের শুভবোধ তাঁকে তাঁর পিশাচী বৃত্তির ক্লেদাক্ত আবর্ত থেকে টেনে আনতে চেষ্টা করে। শের আফগানের কাছে অবিশ্বাসিনী হয়ে নূরজাহান তাঁর বধূসত্তাকে অবমানিত করলেও লায়লার কাছে অবিশ্বাসিনী ও অশ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে নূরজাহান তাঁর মাতৃসত্তাকে লাঞ্ছিত করতে রাজী হননি। মাতৃসত্তার অখণ্ডতাকে রক্ষা করার জন্য নূরজাহান শের-আফগানের স্মৃতিকে সম্বল করে কন্যা লায়লাকে বুকে ধরে রাখতে চান। এইভাবে নূরজাহান তাঁর নারীত্বের স্বাভাবিক ধর্মকে বজায় রাখতে প্রয়াসী হন।[গ] কিন্তু এক্ষেত্রে সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী রেবার বদান্যতা নূরজাহানকে ভারতের সম্রাজ্ঞী হবার সুযোগ এনে দেয়। ভ্রাতা আসফের প্ররোচনায় নূরজাহানের উচ্চক্ষমতা লাভের বাসনা আবার উর্দ্ধমুখী হয়ে ওঠে। এরূপ অবস্থায় মাতৃসত্তার সম্মান বজায় রাখার জন্য নূরজাহানের মানবী বৃত্তি আর উচ্চাশাপূরণের জন্য তাঁর শয়তানী বৃত্তির মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে নূরজাহানের ন্যায়নীতিবোধ অবলুপ্ত হয়। তাঁর মানবী বৃত্তির পরাজয় ঘটে।[ঘ] কুমারী মেহেরের অবদমিত বাসনা পূরণের জন্য নূরজাহান তাঁর বধূসত্তাকে হত্যা করে পিশাচী সত্তার কাছে প্রথম আত্মবিক্রয় করেন। এবার সম্রাজী সত্তার প্রতিষ্ঠার জন্য মাতৃসত্তার লাঞ্ছনার দ্বারা নূরজাহান সেই আত্মবিক্রয়ের পথেই আরও এগিয়ে যান।

জাহাঙ্গীরকে বিয়ে করে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ক্ষমতা লাভের আগ্রাসনী ভূমিকা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। ক্ষমতার আকর্ষণে নূরজাহান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন একাধিপত্য লাভের জন্য সচেষ্ট হন (২/২, ৩/৪)। প্রবৃত্তির এই

গ. "না আমি পালাবো, আর কিছুর জন্য না হোক পালাবো তোর জন্য লায়লা। আমি তোর কাছেও অবিশ্বাসিনী হব না··· ।"

(২য় অংক, ৩য় দৃশ্য, নূরজাহান।)

"আমি বর্ধমানে ফিরে গিয়ে আমার স্বামীর স্মৃতির ধ্যান করে মর্বো।"

—দ্বিতীয় অংক, পঞ্চম দৃশ্য—নূরজাহান।

ঘ. "আমার মধ্যে যে শয়তানী আছে তাকে আমি জয় করে এনেছিলাম, এখন তোমরা সবাই এসে তার সঙ্গে যোগ দিলে। আমি হঠেছি।"

(—দ্বিতীয় অংক, পঞ্চম দৃশ্য। —নূরজাহান)

অন্ধ তাড়নায় তাঁর প্রতি জাহাঙ্গীরের গভীর অনুরাগকেও তিনি নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন। জাহাঙ্গীরের প্রতি তাঁর প্রেমের পর্বটি নূরজাহানের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির একটি চাল মাত্র। নূরজাহানের মত ক্ষমতালিপ্সু উচ্চাভিলাষী চরিত্র আত্মস্বার্থ সিদ্ধির যূপকাষ্ঠে প্রেমকে বলি দিয়েই থাকেন। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে নূরজাহানের এরকম মানসিক প্রবণতা সমর্থনযোগ্য।[৩১] কূটকৌশলে নূরজাহান জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ঠপুত্র খসরুকে হত্যা করেন। ভ্রাতৃহত্যার অপরাধে সাজাহানকে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে প্রকারান্তরে সিংহাসনের উত্তরাধিকার থেকে সরিয়ে ফেলতে নূরজাহান প্রয়াসী হন। সেনাপতি মহাবৎ খাঁর পদচ্যুতি ঘটিয়ে তিনি কৌশলে সামরিক বাহিনীতে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপনেও ক্রিয়াশীল হন (৪/২, ৬)। এই স্তরেও চরিত্রের মধ্যে অহং (ego) এবং অধিসত্তার (super ogo) দ্বন্দ্ব ঘটে। খসরুকে হত্যা করায় রেবার প্রতি তাঁর অকৃতজ্ঞতার নিদর্শনে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান নিজেই ধিক্কৃত ও লাঞ্ছিত হন (৩/৪)। এই সর্বনাশা প্রবৃত্তির আবর্ত্ত থেকে মানবী নূরজাহান ফিরে আসতে চান। কিন্তু নূরজাহানের অহংজনিত শয়তানী সত্তা প্রবল থাকায় মানবী নূরজাহান ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন (৩/৪)। বিদ্রোহী মহাবৎ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধে জাহাঙ্গীর তথা নূরজাহান পরাজিত হন। তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়। এই পরাজয়ে নূরজাহানের সম্রাজ্ঞীসত্তার পরাজয় সূচিত হয় (৪/৭)। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখলের লড়াই-এ সাজাহানের কাছে বিজিত নূরজাহানের সম্রাজ্ঞী সত্তা পরিপূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় (৫/৭)।

ক্ষমতা লাভের জন্য নূরজাহান স্বামী শের আফগানের কাছে তাঁর বধূসত্তার মর্য্যাদাহানী করে বধূ হিসাবে তাঁর সামাজিক মর্য্যাদা হারান। একই কারণে জাহাঙ্গীরকে বিয়ে করে নূরজাহান তাঁর মাতৃসত্তার অবমাননার দ্বারা মাতা হিসাবে তাঁর সামাজিক বিশিষ্টতাকে নষ্ট করেন। ক্ষমতা লাভের নেশায় সম্রাজ্ঞীর ক্ষমতার অপব্যবহারের দ্বারা তিনি তাঁর সম্রাজ্ঞী সত্তাকে কলুষিত করে তাঁর রাজনৈতিক সম্মানকেও বিনষ্ট করেন। তথাপি তিনি তাঁর ক্ষমতাকে ধরে রাখতে পারেননি। লক্ষ্যপূরণের ব্যর্থতা নূরজাহানকে হতাশাগ্রস্ত করে তোলে। পুনরায় অধিসত্তার (super ego) জাগরণের ফলে শের আফগান, লায়লা ও জাহাঙ্গীরের প্রতি তাঁর গর্হিত অমানবিক কৃতকর্ম্মের জন্য তাঁর মন পাপবোধের ভারে ভারাক্রান্ত হয়। পাপবোধের প্রতিক্রিয়ায় মেঘগর্জনকে নূরজাহান শের আফগানের তিরস্কার বলে মনে করেন (৫/৮)। এইভাবে একদিকে লক্ষ্যপূরণের ব্যর্থতা এবং অন্যদিকে বধূ মেহের, মাতা মেহের ও সম্রাজ্ঞী নূরজাহান হিসাবে তাঁর সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক বিধ্বস্ত হওয়ায় নূরজাহান মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। বধূ, মাতা ও সম্রাজ্ঞী—এই ত্রয়ী সত্তার লাঞ্ছনায় ক্ষমতাস্খোত নূরজাহান ব্যর্থতা আর মানবিক মূল্যবোধের রিক্ততায় জীবনের নিঃসীম হাহাকারের অতল গহ্বরে হারিয়ে যান।

সাজাহান (সাজাহান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

নাটকের প্রধান চরিত্র সাজাহান। চরিত্রের শারীরিক ও সামাজিক বিন্যাস অনুযায়ী চরিত্রের মনস্তত্ব গড়ে উঠেছে। মনস্তত্বের দিক দিয়ে চরিত্রটি বহির্মুখী (Extrovert)।

অপত্য স্নেহ দিয়ে সন্তানদের নিজের অনুগত করে রাখার প্রচেষ্টা এই চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। এই দিকের উন্মোচনের ক্ষেত্রে সম্রাট সাজাহান ও পিতা সাজাহানের দ্বন্দ্বে চরিত্রটি মনের দিক থেকে গতিশীল ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সাজাহানের পিতৃত্ব সাজাহানের সম্রাটত্বকে খর্ব করেছে। সম্রাটের শাসন অপেক্ষা পিতার স্নেহের শাসন সাজাহানের চরিত্রে বড় হয়ে উঠেছে। স্নেহের শাসনকে বজায় রাখতে গেলে সময়ে সময়ে পিতৃত্বের কঠোরতারও প্রয়োজন হয়। পুত্রদের অসংযমী আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পিতা সাজাহান সেই কঠোরতা পালনে পরাঙ্মুখ হয়েছেন। এর মূলে আছে মমতাজের প্রতি সাজাহানের গভীর প্রেম। এই প্রেমই মাতৃহারা পুত্রদের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে পুত্রদের প্রতি মমতাজের স্নেহ প্রবনতার কথা সাজাহানকে অধিকভাবে মনে করিয়ে দিয়েছে। পিতা সাজাহান তাই পিতৃস্নেহের অধিক প্রাবল্যের দ্বারা পুত্রদের মাতৃস্নেহের অভাব পূরণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। পিতা সাজাহানের হৃদয়ের অন্তরালে মাতা মমতাজ সক্রিয় হয়ে ওঠায় সময়ের নিরীখে পিতা সাজাহান তাই কঠোর হতে পারেননি।[ক]

সাজাহানের বিরুদ্ধে সুজা, মোরাদ ও ঔরংজেবের বিদ্রোহ চরিত্রের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি করে। এ সমস্যা তাঁর পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তার মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। সম্রাট সাজাহান হিসাবে রাজ্যের বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করে রাজ্যে শান্তি ও ন্যায়ের বিধান রচনা করা তাঁর প্রাথমিক কর্ত্তব্য। কিন্তু এই কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য তিনি স্থির সঙ্কল্প গ্রহণ করতে পারেননি। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি বারবার বিচলিত হয়ে পড়েছেন। সম্রাট সাজাহান পিতা সাজাহানের কাছে দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এই মানসিক ও রাজনৈতিক বাতাবরনের মধ্যে একদিকে সাজাহানের তিনপুত্রের বিদ্রোহ দমনের দ্বারা পিতা সাজাহানকে সম্রাট সাজাহানরূপে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে সাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারা ও জ্যেষ্ঠা কন্যা জাহানারা আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। অপরদিকে আত্মঘাতী কলহ থেকে পুত্রদের থামাবার জন্য সম্রাট সাজাহান পিতা সাজাহানের নিকট নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এইভাবে চরিত্রের মধ্যে সমস্যা ঘনীভূত হতে থাকে।

ক. সাজাহান—"আমার হৃদয় শুধু এক শাসন জানে। সে শুধু স্নেহের শাসন। বেচারী মাতৃহারা—পুত্রকন্যারা আমার! তাদের শাসন করবো কোন প্রাণে জাহানারা। ঐ চেয়ে দেখ—ঐ স্ফটিক গঠিত ঐ তাজমহলের দিকে চেয়ে দেখ্—তারপর বলিস্ তাদের শাসন কর্ত্তে।"

(—প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, সাজাহান।)

পিতা সাজাহানের আত্মাও সমস্যার ভারে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায়। দুই বিরোধী শিবিরে ন্যস্ত তাঁর আত্মজদের যে কোন পক্ষের জয় বা পরাজয় তাঁর মর্ম্মবেদনার কারণ। ভাই-এ ভাই-এ যুদ্ধ বস্তুতপক্ষে সম্রাট সাজাহানের এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের যুদ্ধ। সম্রাট সত্তার আহ্বানে আত্মজদের উপর তিনি কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে চান। কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজনিয়তা তিনি অনুভব করেন। কিন্তু পিতা সাজাহান সম্রাট সাজাহানের এই কঠোরতায় বিচলিত হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় প্রজাপালনের ধর্ম্মরক্ষা অপেক্ষা পুত্ররক্ষার ধর্ম্ম পালনে সাজাহান অধিক ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠেন। কঠোর রাজদণ্ডের বদলে সাজাহান স্নেহের কোমল দণ্ড হাতে তুলে নিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু তাতেও তিনি তাঁর সমস্যার সমাধানে পরাঙ্মুখ হন। পরিশেষে পুত্রদের বিদ্রোহ দমনের ভার সাজাহান জ্যেষ্ঠপুত্র দারার হস্তে অর্পণ করেন। পিতৃসত্তা বিভক্ত হয়ে পড়ায় সাজাহানের সম্রাটসত্তা এ স্থলে জয়ী হয়। কিন্তু এ জয় সাময়িক ও আংশিক মাত্র। পুত্রদের বিদ্রোহ দমনের জন্য দারাকে তাঁর সমস্ত ক্ষমতা অর্পন করার পর-মুহূর্তেই তিনি দারাকে নিরস্ত করার জন্য এবং তাঁর আদেশ ফিরিয়ে নেবার জন্য পুনরায় দারার সন্নিধানে ছুটে আসেন। এই ঘটনায় মধ্যে তাঁর পিতৃ-সত্তা বড় হয়ে ওঠেছে (১/১)।

পিতৃ সত্তার আধিক্যেই যুদ্ধে দারার পরাজয় সাজাহানের মর্মযন্ত্রণার কারণ হয় এবং ঔরংজেবের জয় তাঁর নিকট একাধারে লজ্জা ও গৌরবের বিষয় হয়ে ওঠে। পিতার বর্তমানে পিতার বিরুদ্ধাচারী ঔরংজেব, ভ্রাতৃরক্ত পানকারী ঔরংজেব তাই পিতা সাজাহানের লজ্জা। আর প্রবল পরাক্রান্ত মোঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়ী ঔরংজেবের শৌর্য্য, বীর্য্য ও বীরত্ব পিতা সাজাহানের গর্বের সামগ্রী। সাজাহানের পিতৃত্ব রাজনীতিবিদ সাজাহানকেও ম্লান করে দিয়েছে। স্নেহের বশে ঔরংজেবের কথামত তাঁর সৈন্যদের আগ্রার দুর্গে প্রবেশের অধিকার দিয়ে সম্রাট সাজাহান রাজনৈতিকভাবে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। রাজনৈতিক সত্তাকে ক্ষুণ্ণ করায় সম্রাট সাজাহান বন্দী সাজাহানের পরিণতি লাভ করেন (১/৭)। আত্মমর্য্যাদার এই অবমাননায় ব্যক্তি সাজাহান আবার আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। বন্দী অবস্থায় তাঁর মানসিকতার স্তরে আবার সম্রাট সত্তার জাগরণ ঘটেছে। অকৃতজ্ঞ ঔরংজেবকে সমুচিত শাস্তি দেবার জন্য এবং শঠ, ধূর্ত ও কপটাচারী ঔরংজেবের অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্য বন্দী সাজাহান তাঁর বর্তমান সম্রাটত্বের কঙ্কালের উপর অতীতের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী সম্রাট সাজাহানকে স্থাপন করতে চেয়েছেন।[খ] ঔরংজেবের পুত্র মহম্মদের কাছে তাঁর মুকুট

খ. সাজাহান—"মহম্মদ ! ভেবেছো আমি এই শাঠ্য, এই অত্যাচার—এখানে এইরকম বসে নিঃসহায়ভাবে সহ্য কর্ব্ব !······আমি বৃদ্ধ সাজাহান বটে, কিন্তু আমি সাজাহান। এই কে আছো ! নিয়ে এস আমার বর্ম্ম আর তরবারি···"
(—প্রথম অংক, সপ্তম দৃশ্য, সাজাহান।)

আর কোরাণ তথা ক্ষমতা আর ধর্মকে গচ্ছিত রেখে সাজাহান এই বন্দী দশা থেকে শুধু মাত্র একবারের জন্য মুক্ত করে দেবার কাতর প্রার্থনা জানিয়েছেন। মহম্মদের কাছে তাঁর মুক্তি ভিক্ষা অর্থহীন হয়েছে। ঔরংজেবকে শাস্তি দান করে তাঁর সম্রাটত্বের অহংকে চরিতার্থ করার প্রবণতাই এর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এখানেও তিনি প্রার্থিত আশা ভঙ্গে আরও ভেঙে পড়েছেন। তাই তিনি উপায়ান্তর না দেখে সম্রাটত্বের প্রতিষ্ঠাকল্পে দারাকে বিজয়ীরূপে দেখতে চেয়েছেন (২/২)। দারা তো তাঁর বিশ্বস্ত ও অনুগত প্রতিনিধি। সে আশাও তাঁর সফল হয়নি। ঘটনাক্রমে পিতার বর্তমানে ঔরংজেব দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। এই ঘটনায় (২/২) পুত্রের কৃতঘ্নতার আঘাতে পিতা সাজাহান আরও মর্মাহত হন। আত্মজের এই কৃতঘ্নতার প্রতিকারের আশায় বন্দী সাজাহান তাঁর সম্রাটত্বকে ফিরে পাবার জন্য প্রজাগণের কাছ থেকে নৈতিক ও সক্রিয় সমর্থন আশা করেছিলেন। প্রজাগণের কাছ থেকে এ বিষয়ে গঠনমূলক কোন সাড়া না পাওয়ায় সাজাহানের সম্রাটসত্তা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে তীব্র হতাশা আর বেদনা সাজাহানের মধ্যে এক আক্রমনাত্মক মনোভাবের সৃষ্টি করে। এই আক্রমনাত্মক মনোভাবের সঠিক পথে ব্যবহৃত হবার সুযোগ না থাকায় তা আত্মমুখী হয়ে পড়ে। এর প্রতিক্রিয়ায় সাজাহানের মধ্যে নিজেকে ধ্বংস করার উদ্দাম প্রবৃত্তির সৃষ্টি হয়।[গ]

ঔরংজেবের হস্তে দারার বন্দীত্ব ও দারাকে হত্যা করার জন্য ঔরংজেবের প্রচেষ্টা পিতা সাজাহানকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। পুত্রকে রক্ষার জন্য সাজাহান দুর্গের ভিতর থেকে লাফ দিয়ে তাঁর বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবার বাসনা প্রকাশ করেন (৪/৪)। একদিকে দারার নিরাপত্তার অভাব অপরদিকে দারাকে রক্ষা করার জন্য তাঁর ক্ষমতার অভাব এবং এই দুইয়ের বিপরীতে ঔরংজেব কর্তৃক সংঘটিত পূর্বের এক একটি অমানবিক নিষ্ঠুর ঘটনার অভিজ্ঞতা, পিতা সাজাহানের মনে ভীতির সঞ্চার করে। এই ভীতিই ক্রমশ গভীর হয়ে সাজাহানের মনে দীর্ঘস্থায়ী উদ্‌বেগের সৃষ্টি করে। এই উদ্বেগই তাঁর মনের ভারসাম্যকে নষ্ট করে দেয়। দারার নিরাপত্তার অভাবজনিত আতংক তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। নিদ্রিত সাজাহান ঘুমের মধ্যে দারার রক্তাক্ত দেহের ভ্রান্ত প্রত্যক্ষকরণ করে (Hallucination) শিউরে ওঠেন (৫/২)। নিজের সার্বিক নিরাপত্তার অভাব তীব্র হওয়ায় সাজাহান তাঁর মণিমুক্তাকে নিজের বুকে আগলে রাখতে চান। অর্থমূল্য হিসাবে এসবকে আগলে রাখা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিন পুত্রের মৃত্যুতে ও তাঁর বন্দীত্ব প্রাপ্তিতে সাজাহানের 'আমিত্ববোধ' ও তাঁর অধিকারবোধ খন্ডিত হয়ে পড়ায় সাজাহান তাঁর

গ. সাজাহান—"ইচ্ছা কচ্ছে জাহানারা যে···এই সাদা চুল ছিঁড়ে এই বাতাসে উড়িয়ে এই বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিই। ইচ্ছা কচ্ছে যে আমার বুকখানা খুলে বজ্রের সম্মুখে পেতে দিই। ইচ্ছা কচ্ছে যে এখান থেকে আমার আত্মাকে টেনে ছিঁড়ে বার করে তা ঈশ্বরকে দেখাই··· ।" (—৫ম অংক, ৪র্থ দৃশ্য, সাজাহান)

মণিমুক্তাকে আগলে রাখার মাধ্যমে তাঁর সেই বোধগুলিকে রক্ষা করার বাসনা প্রকাশ করেছেন। তিনপুত্রের হত্যাকারী ঔরংজেবকে শাস্তি দিতে না পারায় সাজাহানের লাঞ্ছিত পিতৃসত্তা প্রতিহিংসামুখী হয়ে পড়ে। তিনপুত্রের কোন একটি সন্তানের মাধ্যমে ঔরংজেবের প্রতি তাঁর সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবার সুযোগ না থাকায় সাজাহানের বিদীর্ণ হৃদয়ের মধ্য থেকে গভীর আক্ষেপ বেরিয়ে আসে (৫/৬)। সম্রাটত্বকে বিসর্জন দিয়েও পিতৃসত্তাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে না পারায় সাজাহান এ হেন যন্ত্রণাময় জীবন থেকে মুক্তি চান। তাঁকে বধ করার জন্য ঔরংজেবের কাছে তিনি তাঁর লোলবক্ষ মেলে ধরেন (৫/৬)। কিন্তু তাঁর কাছে অনুতপ্ত ঔরংজেব ক্ষমাভিক্ষা প্রার্থনা করলে প্রতিশোধমুখী ও আত্মধ্বংসোন্মুখী সাজাহানের মধ্যে পিতা সাজাহান পুনরায় বলদীপ্ত হয়ে ওঠে। তাঁর স্নেহ প্রবণ হৃদয় আর মমতাজের মাতৃত্বের স্মৃতি সাজাহানের পিতৃসত্তার কোমলতাকে আরও গভীর করে তোলে (৫/৬)। ঔরংজেবের নির্দয় অত্যাচারে ও অবিচারে বিধ্বস্ত সম্রাট সাজাহানের কাছে পিতা সাজাহানের আহ্বান বড় হয়ে ওঠে। তাই পিতা সাজাহান ঔরংজেবকে ক্ষমা করেন। এর মধ্য দিয়ে সামগ্রিকভাবে সাজাহানের পিতৃসত্তা চিরজাগরুক হয়ে উঠেছে।

সম্রাট সাজাহান ও পিতা সাজাহানের এই দ্বন্দ্বে পিতা সাজাহানের মধ্যে মানসিক সক্রিয়তা ও বাহ্যিক নিষ্ক্রিয়তার টানাপোড়েনে সাজাহানের সংগ্রামমুখী চেতনা বলিষ্ঠভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে তাঁর মানসিক ও বাচিক প্রতিক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষমতাহীন সাজাহান তাঁর পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তাই প্রলয়ংকরী প্রাকৃতিক শক্তির সান্নিধ্য কামনা করেছেন (২/২, ৫/৩) এবং সেই শক্তির সাহায্যে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করে সাজাহান তাঁর বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার বাসনা (wish) প্রকাশ করেছেন। এইভাবে বন্দী সাজাহানের বাসনা (wish) বাস্তবায়িত হবার সুযোগ না থাকায় সাজাহান বাস্তবের পাদপীঠ থেকে সরে এসে কল্পনার দ্বারা আপাত বাস্তবধর্মী পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁর অভিপ্রায় পূরণে সচেষ্ট হয়েছেন। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে সাজাহানের মনোভাবের এ রকম প্রকাশভঙ্গী বাসনাজাত মানসিক দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ (Intrapsychic psychotic conflict)।[৩২]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান নাটকের সাজাহান চরিত্রের সঙ্গে শেকস্‌পীয়রের 'কিংলিয়ার' নাটকের 'কিংলিয়ার' চরিত্রের কিছু সাদৃশ্য বর্তমান। কিংলিয়ার ও সাজাহান দুইজনেই নাটকের প্রধান চরিত্র। সন্তানদের কৃতঘ্নতার বেদনা দুইজনকেই সহ্য করতে হয়েছে। সন্তানদের কৃতঘ্নতার বিরুদ্ধে দুইজনের বাচিক ও মানসিক সক্রিয়তা বিদ্যমান। কিন্তু ক্ষমতা না থাকার জন্য তাঁদের মানসিক সক্রিয়তা কর্মে রূপায়িত হতে পারেনি। সেক্ষেত্রে তাঁদের বাসনাকে কর্মে রূপায়িত করার জন্য দুজনেই প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। সর্বোপরি সন্তানদের অকৃতজ্ঞতায় ও তাদের অত্যাচারে দুজনেই মানসিক দিক থেকে

ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। (King Lear—sceen. IV of Act-I, Sceen IV of Act II, Sceen II of Act-III, Sceen IV of Act-III, Sceen VI of Act-IV)।[৩৩]

চন্দ্রগুপ্ত (চন্দ্রগুপ্ত—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) :

'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের প্রধান চরিত্র চন্দ্রগুপ্ত। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে চরিত্রটি বহির্মুখী। মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত চরিত্রের মনস্তত্ত্ব তাঁর শারীরিক ও সামাজিক বিন্যাস অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের কাছ থেকে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করাই চরিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য।[ক] চন্দ্রগুপ্তের দৃঢ় মানসিকতা, লক্ষ্য-পূরণের জন্য একনিষ্ঠতা, সামরিক বিদ্যা অর্জনের জন্য গভীর অধ্যবসায়, সাহসিকতা, সমর শাস্ত্রে নিপুণতা, আত্মমর্য্যাদাবোধ, মাতৃপ্রেম ও ভক্তি তাঁর উদেশ্য পূরণের সহায়ক হয়ে উঠেছে।

মগধের রাজ্যহারা রাজকুমার চন্দ্রগুপ্তের সম্রাট চন্দ্রগুপ্তে পরিণতির ক্ষেত্রে তাঁর রাজসত্তা, ভ্রাতৃসত্তা, পুত্রসত্তা, বন্ধুসত্তা, শিষ্য সত্তা ও প্রেমিক সত্তা—এই ষষ্ঠ সত্তার বিকাশের মধ্য দিয়ে চরিত্রটি মনোমুগ্ধকর হয়েছে। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ অন্যায়ভাবে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন। তাঁর মা মুরাকে অপমানিত করেন। এই ঘটনায় চন্দ্রগুপ্তের রাজসত্তা ও পুত্রসত্তা ক্ষুণ্ণ হয়। চন্দ্রগুপ্তের আত্মমর্য্যাদাবোধ লাঞ্ছিত হয় (১/১, ১/৩)। এই অসম্মান ও লাঞ্ছনা তাঁকে আত্মমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার ব্রতে একনিষ্ঠ সৈনিক করে তোলে। মন্ত্রী চাণক্যের সহায়তায় হৃত সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য চন্দ্রগুপ্ত প্রয়াসী হন। রাজা নন্দের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধের চরম সন্ধিক্ষণে চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে রাজসত্তা ও সম্রাটসত্তার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। প্রথমদিকে এ দ্বন্দ্বে ভ্রাতৃসত্তা প্রবল হয়ে ওঠায় সাম্রাজ্যের জন্য চন্দ্রগুপ্ত ভ্রাতা নন্দের গায়ে অস্ত্রাঘাত করতে অস্বীকৃত হন (২/৫)। এমতাবস্থায় নন্দ কর্তৃক লাঞ্ছিতা চন্দ্রগুপ্তের মা মুরার আর্তি চন্দ্রগুপ্তের পুত্রসত্তার মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। এই দ্বন্দ্বে তাঁর পুত্র সত্তা জয়ী হলেও ভ্রাতৃসত্তার প্রবাহ তাঁর হৃদয়ে ফল্গুধারার মত চিরজাগরুক থাকে। নন্দের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বিপর্য্যস্ত নন্দ চন্দ্রগুপ্তের কাছে তাঁর প্রাণ-রক্ষার জন্য কাতর আবেদন জানায়। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ত্যাগ করেন (২/৫)। পরে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী নন্দকে হত্যার জন্য রাজ্যের প্রশাসনিক স্তরের বিধানকে খারিজ করার জন্যও চন্দ্রগুপ্ত সচেষ্ট হন। এসব ঘটনার মধ্যে চন্দ্রগুপ্তের ভ্রাতৃসত্তার এই ক্রিয়াশীলতা লক্ষ্য করা যায়। মন্ত্রী চাণক্য ও বন্ধুবর চন্দ্রকেতুর সহায়তায় চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন লাভের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়। ক্ষমতা লাভের পর চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে অহংভাব ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকে। রাজকার্য্যের সকল ক্ষেত্রে

ক. "আমার ইচ্ছা শুদ্ধ আমার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করা। এইমাত্র—"
(—প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, চন্দ্রগুপ্ত।)

চাণক্যের ক্ষমতার প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে চন্দ্রগুপ্তের সম্রাট সত্তার অহংবোধে আঘাত লাগে। গুরুদেব ও মন্ত্রী চাণক্যের উপর চন্দ্রগুপ্ত ক্ষুব্ধ হন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে নন্দের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে চাণক্যের মত পার্থক্য ঘটেছিল। এই মত পার্থক্যের ফলে উভয়ের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল (২/৫)। পরবর্তীকালে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের নির্দেশ অমান্য করে চাণক্য নন্দের হত্যার কার্য্য সম্পন্ন করেন (৩/৬) এবং রাজ্য জুড়ে চন্দ্রগুপ্তের বিজয় উৎসব বন্ধ করার নির্দেশ দেন (৪/২)। এসব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চন্দ্রগুপ্তের সম্রাটসত্তার সঙ্গে চাণক্যের মন্ত্রীসত্তার দ্বন্দ্ব গড়ে ওঠে। এই দ্বন্দ্বময় অবস্থায় চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে চাণক্যের শিষ্য সত্তা অপেক্ষা তাঁর সম্রাট সত্তাই প্রবল হয়ে ওঠে। মানসিকতার এই স্তরে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের আর ছায়ামাত্র নন। তিনি সম্রাট সত্তায় সমুদ্ভাসিত এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব। এর ফলে চন্দ্রগুপ্তের শিষ্য সত্তা অবমানিত হয়ে পড়ে (৪/২)।

অহংমুখী সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে নিজের ক্ষমতা ও মর্য্যাদা সম্পর্কে এক উচ্চমন্যতার (superior complex) সৃষ্টি হয়। এই উচ্চমন্যতার দ্বারা চালিত হয়ে তিনি তাঁর সংগ্রামের সাথী চন্দ্রকেতুর বন্ধুত্ব সুলভ হৃদয় বৃত্তিকেও আঘাত করেন। এতে তাঁর বন্ধুসত্তা লাঞ্ছিত হয় (৪/২)।

সেলুকসের নেতৃত্বে গ্রীক সৈন্যের পুনরাক্রমণের সময় তাঁর সম্রাট সত্তার অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুদেব চাণক্যের রাজনীতিজ্ঞান ও বন্ধু চন্দ্রকেতুর সামরিক সান্নিধ্যের প্রয়োজনীয়তা চন্দ্রগুপ্ত মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। এঁদের অভাবে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত সামরিক ও মানসিক উভয়দিক থেকেই নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন (৪/৫)। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তাঁর ক্ষমতা ও মর্য্যাদার দম্ভ চূর্ণ হয়। চন্দ্রগুপ্তের অধিসত্তার (super ego) জাগরণ ঘটে। পূর্বকৃত কর্মের জন্য চন্দ্রগুপ্ত নিজেকে দায়ী করেন এবং তার জন্য তিনি অনুতপ্ত হন। আত্মগ্লানিতে তাঁর অন্তর ভরে যায় (৪/৫)। এই আত্মগ্লানি থেকে মুক্ত হবার অন্য কোন উপায় না থাকার জন্য চন্দ্রগুপ্ত নিজের উপরই আক্রমণমুখী হন।* এর ফলে তাঁর মধ্যে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি দেখা দেয়।[৩৪] চাণক্যের কর্তব্যপরায়ণতা ও চন্দ্রকেতুর অকৃত্রিম বন্ধু বৎসলতা চন্দ্রগুপ্তকে এ হেন সংকট মুহূর্ত থেকে উদ্ধার করে।

পরাজিত ও বন্দী-মুক্ত গ্রীক সেনাপতি সেলুকসের কন্যা হেলেন ও বন্ধুবর চন্দ্রকেতুর ভগনী ছায়াকে কেন্দ্র করে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের জীবনে তাঁর প্রেমিক সত্তা ও বন্ধুসত্তার দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় (৫/১)। প্রেয়সী হেলেনকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা তাঁর প্রেম সত্তার মর্ম্ম আর তাঁর বন্ধু মুমূর্ষু চন্দ্রকেতুর

খ. "আমি নিজের উপর প্রতিশোধ নেব। আমি আত্মহত্যা করব—"

…চতুর্থ অংক, পঞ্চম দৃশ্য। চন্দ্রগুপ্ত।

আবেদনকে রক্ষা করার জন্য চন্দ্রকেতুর ভগ্নী ছায়াকে বিয়ে করা তাঁর বন্ধু সত্তার ধর্ম। এই মর্ম্ম আর ধর্মের টানাপোড়নে 'চন্দ্রগুপ্তের আত্মার বিভক্ততা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। বন্ধুত্বের ধর্ম রক্ষার ক্ষেত্রে চন্দ্রগুপ্তের বাহ্যিক তাগিদ যতটা ছিল অন্তরের তাগিদ ততটা ছিল না। এর ফলে এই দুই সত্তার দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করেনি। হেলেনকে বিয়ে করার মাধ্যমে চন্দ্রগুপ্তের প্রেম সত্তার জয়লাভ ঘটে।

বাজীরাও (বাজীরাও—মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়)

নাটকের প্রধান চরিত্র বাজীরাও। বহিশত্রুর আক্রমণ থেকে মহারাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করাই চরিত্রের মূল উদ্দেশ্য। তাঁর জলন্ত দেশপ্রেম, স্বাধীনতাপ্রিয়তা, রণনিপুণতা, সাহসিকতা চরিত্রের অনন্য সম্পদ। এছাড়া বাজীরাওয়ের ধর্মপরায়ণতা, আশ্রিত ধর্ম রক্ষা, বিপন্নকে উদ্ধার করা—এ সকল গুণ তাঁর চরিত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। মহারাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি একাধারে হায়দ্রাবাদ অধীশ্বর নিজাম, মালবেশ্বর, দিল্লীশ্বর এবং অযোধ্যারাজের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বহির্দ্বন্দ্বের রূপ ধারণ করেছে (২/৫, ৩/৬, ৭, ৪/৮, ৫/১, ২, ৩)।

শেরশাহ (মোঘল পাঠান—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

শেরশাহ এই নাটকের প্রধান চরিত্র। সমগ্র হিন্দুস্থানে পাঠান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাই চরিত্রের লক্ষ্য। তাঁর দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, অসীম বীরত্ব, বুদ্ধিমত্তা, কূটনৈতিক তৎপরতা, রণনৈপুণ্য তাঁর উদ্দেশ্যকে সার্থক করেছে। দিল্লীর সিংহাসন করায়ত্ত করার ক্ষেত্রে হুমায়ুনের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বহির্দ্বন্দ্বময় হয়েছে (১/২, ৪· ২/৫, ৬, ৩/৬)। রাজ্যবিস্তারের ক্ষেত্রে যোধপুরাধিপতি মল্লদেব এবং কালেঞ্জর দুর্গাধিপতির সঙ্গে শেরশাহের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যেও এই বহির্দ্বন্দ্বের প্রকাশ লক্ষ্যণীয় (৪/৩, ৪, ৫, ৫/৭)।

আলাউদ্দীন (দেবলা দেবী—নিশিকান্ত বসুরায়)

'দেবলা দেবী' নাটকের প্রধান চরিত্র 'আলাউদ্দীন'। কমলার প্রতি কামবাসনা চরিতার্থ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে কমলার মনোরঞ্জনের জন্য আলাউদ্দীন কমলার ইচ্ছা অনুযায়ী মেয়ে দেবলাকে কমলার কাছে এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন (১/২)। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে আলাউদ্দীন তাঁর পুত্র খিজিরকে গুজরাটে প্রেরণ করেন (১/৩)। এর ফলে নাট্য ঘটনায় গতির সৃষ্টি হয়। খিজির গুজরাট দখল করে দেবলাকে বন্দী করেন। কিন্তু পরে দেবলাকে মুক্তি দেন। আলাউদ্দীনের বিনা অনুমতিতে খিজির বন্দী দেবলাকে মুক্ত করে দেওয়ায় আলাউদ্দীন কমলাবাই-এর প্ররোচনায় রাজদ্রোহের অপরাধে খিজিরের মৃত্যুর দণ্ডাদেশ দান করেন ও তাকে বন্দী করে আনার জন্য সেনাপতি কাফুরকে প্রেরণ করেন (৩/১)।

আলাউদ্দীনের এই কার্য্যে নাট্য ঘটনার গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। খিজিরের প্রাণদণ্ডাদেশ কার্য্যকর হবার পর আলাউদ্দীন পুত্রশোকে অধীর হন। মানসিক দিক দিয়ে তিনি ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। দেবলার জন্যই তিনি খিজিরকে হত্যার আদেশ দিয়েছেন—এই ভাবনা তাঁর মনের অস্থিরতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। দেবলার প্রতি তিনি প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং তিনি দেবলাকে হত্যা করতে উদ্যত হন। সেই সময় আলাউদ্দীন কাফুরের ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারান। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নাট্যঘটনার গতি পরিণতি লাভ করে (৫/৫)। এইভাবে নাট্য ঘটনায় গতি দান করায় এ চরিত্রটি নাট্যঘটনার গতিসঞ্চারকারী চরিত্র রূপেও চিত্রিত হয়েছে। আলাউদ্দীনের অতিচারী যৌন-লালসা তাঁকে অবিবেচক ও হঠকারী কার্য্যকলাপের জনক করেছে। এর ফলে তাঁর পিতৃসত্তা, সম্রাটসত্তা ও বিচারক সত্তা বিনষ্ট হয়। কমলাবাই-এর প্রতি মোহাচ্ছন্ন থাকায় তিনি খিজিরের কার্য্যকে সঠিকভাবে বিচার করতে পারেননি। আলাউদ্দীন চরিত্রের এই দুর্বলতাকে প্রতিহিংসাময়ী কমলাবাই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির মূলধন হিসাবে ব্যবহার করেন। আলাউদ্দীনের কাছ থেকে কৌশলে কমলাবাই খিজিরের প্রাণদণ্ডের আদেশ আদায় করেন। এ সময় আলাউদ্দীনের মধ্যে কোন প্রকার অন্তর্দ্বন্দ্ব গড়ে ওঠেনি। পরে খিজিরের মৃত্যুর দণ্ডাদেশ বহাল রাখার সময় আলাউদ্দীনের পিতৃসত্তার সঙ্গে সম্রাট সত্তা ও বিচারক সত্তার দ্বন্দ্ব গড়ে ওঠে। কিন্তু নাট্যঘটনার সঙ্গে যুক্তিপূর্ণ সাযুজ্য রক্ষা করে এ দ্বন্দ্বটি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠেনি। হঠাৎ গড়ে ওঠা এ ধরনের দ্বন্দ্বে চরিত্রের গঠন সৌন্দর্য্য ব্যাহত হয়েছে।

(খ/২) ঐতিহাসিক নাটকের প্রধান চরিত্রের বিরোধী (Antagonist) **চরিত্র।**

বক্তিয়ার (রিজিয়া—মনোমোহন রায়)।

'রিজিয়ার' বিরোধী চরিত্র হিসাবে বক্তিয়ার চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। এই চরিত্রটি তার শারীরিক, সামাজিক ও মনস্তাত্বিক এই তিনটি দিকের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। রিজিয়াকে অঙ্কলক্ষ্মী করার বাসনা পূরণই বক্তিয়ারের উদ্দেশ্য।[ক] তাই প্রথম থেকেই রিজিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাঁর হৃদয়ানুগত্য লাভের আশায় বক্তিয়ার সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। সেইজন্যই রিজিয়ার বহিশত্রু 'মালবেশ্বর'কে পরাজিত করার জন্য তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। রিজিয়ার কথামত বীরেন্দ্রকে যুদ্ধের সেনাপতি পদে বরণ করে নিয়ে তিনি রিজিয়ার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন (২/১)। এসব ঘটনার

ক. "…ছলে বলে
অথবা কৌশলে রিজিয়ারে অঙ্কলক্ষ্মী করিব নিশ্চয়।"
(—দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য, রিজিয়া।)

মধ্য দিয়ে রিজিয়ার প্রতি বক্তিয়ারের সহযোগীমূলক ভূমিকা গড়ে ওঠে। রাজা বীরেন্দ্রর শৌর্য্য-বীর্য্য ও রূপ-সৌন্দর্য্যের প্রতি রিজিয়া অধিক আকর্ষণ অনুভব করেন। রিজিয়ার মন ও হৃদয়ের উপর বক্তিয়ারের একাধিপত্য লাভের প্রচেষ্টা এর ফলে ব্যাহত হয়। বীরেন্দ্রের প্রতি বক্তিয়ার ঈর্ষাপরায়ণ হন। এই ঈর্ষা তাঁকে হিংস্র করে তোলে। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে বক্তিয়ারের এ মানসিকতা সমর্থনযোগ্য।[৩৫] বীরেন্দ্রের প্রতি রিজিয়ার অন্তরের অকৃপণ দাক্ষিণ্যের প্রকাশ দেখেও বক্তিয়ার তাঁর প্রতি রিজিয়ার অন্তরের সঠিক পরিচয় বুঝতে অক্ষম হন। পরবর্তীকালে বক্তিয়ারের প্রেম-বাসনাকে রিজিয়া সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন (৪/২)। বাসনাপূরণের অচরিতার্থতায় বক্তিয়ার রিজিয়ার উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করতে সচেষ্ট হন। বিদ্রোহী বাইরামের দলে যোগদান করে বক্তিয়ার রিজিয়ার বিরোধী শক্তিকে বলশালী করে তোলেন। বক্তিয়ারের বিশ্বাসঘাতকতায় বাইরামের সঙ্গে যুদ্ধে রিজিয়া পরাজিত হন। রিজিয়ার পরাজয়ে বক্তিয়ারের প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয় (৫/৫, ৬)। এইভাবে পূর্বের রিজিয়ার সহযোগী বক্তিয়ার তাঁর আশাভঙ্গের জন্য রিজিয়ার বিরোধী চরিত্রে পরিণত হন।

ক্লাইভ (সিরাজদ্দৌলা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)।

এই নাটকের প্রধান বিরোধী চরিত্র ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভ। বণিকের ছদ্মবেশে বাংলা বিহার উড়িষ্যার উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম করাই তাঁর উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে স্বজাতিপ্রেম, সাংগঠনিক শক্তি, সামরিক ও রাজনৈতিক বুদ্ধি ও দক্ষতা ও তাঁর লক্ষ্যকে সার্থক করে তুলতে সাহায্য করেছে।

ভ্যান্সিটার্ট (মীরকাসিম—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)।

এ চরিত্রটি নাটকের প্রধান বিরোধী চরিত্র। অর্থগৃধ্নতা, রাজনৈতিক ক্রূরতা, রাজনীতির দূরদর্শিতা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, প্রশাসনিক দক্ষতা এঁর বিশেষ গুণ। বাংলাদেশে ইংরেজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই এঁর লক্ষ্য। এঁর দেশীয় ও জাতিগত প্রেম এদেশের লোকেদের চারিত্রিক হীনমন্যতাকে অধিকতর প্রকট করে তুলেছে।

আকবর (রাণা প্রতাপ সিংহ—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)।

'রাণা প্রতাপ সিংহ' নাটকের প্রধান বিরোধী চরিত্র হিসাবে 'আকবর' চরিত্রটি চিত্রিত। রাজপুতবীর রাণা প্রতাপসিংহকে পরাজিত করে সমগ্র রাজস্থানে নিরঙ্কুশ মোঘল আধিপত্য স্থাপনই তাঁর লক্ষ্য। আকবরের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, শাসন দক্ষতা—তাঁর চরিত্রের অমূল্য সম্পদ। নাটকে আকবরের রাজনৈতিক সত্তা ও পিতৃসত্তা উভয়ই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সম্রাট আকবর তাঁর কন্যা মেহেরুন্নিসাকে অন্যায়ভাবে তিরস্কার করেন। এই তিরস্কার সহ্য করতে না পেরে মেহেরুন্নিসা পিতার আশ্রয় ত্যাগ করেন। এ ঘটনায় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত আকবর ব্যথিত হন। রাণা প্রতাপের

কাছ থেকে কন্যাকে ফিরে পাবার ফলে আকবরের পিতৃত্বের সেই বেদনা দূর হয় (৫/৫)। সম্রাট আকবর কন্যার উপর যে কঠোরতা প্রদর্শন করেছিলেন পিতৃসত্তার অবগাহণে সেই কঠোরতা কোমলতায় পরিনত হয়। রাণা প্রতাপসিংহের কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত তাঁর মানবিক মূল্যবোধের আদর্শ সম্রাট আকবরকে রাণা প্রতাপের প্রতি শ্রধান্বিত করে তোলে। সম্রাট আকবর রাণা প্রতাপের বিরুধে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন ও তাঁকে পরম মিত্র বলে গ্রহণ করেন (৫/৫)। আকবরের এই গুণগ্রাহিতা ও উদারতা তাঁর ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। নাট্যকারের কল্পনার আতিশয্যে চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেও চরিত্রের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। এর ফলে ঘটনার বাহুল্যে আকবর চরিত্রটি তার মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং চরিত্রের গঠনবিন্যাস দুর্বল হয়ে পড়েছে।

সাজাহান (নূরজাহান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)।

'নূরজাহান' নাটকের প্রধান বিরোধী চরিত্র 'সাজাহান'। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে চরিত্রটি বহির্মুখী (extrovert)। গঠন বিন্যাসের দিক থেকে চরিত্রটি ত্রৈমানিক (Three Dimensional)। বিদ্রোহী সাজাহান, সম্রাট সাজাহান ও প্রেমিক সাজাহান—এই তিনটি রূপাবয়বের মধ্য দিয়ে সাজাহান চরিত্রটি বিন্যস্ত। মোঘল সাম্রাজ্যের উপর তাঁর উত্তরাধিকার সত্তা প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর উদ্দেশ্য। খসরুকে হত্যার দায়ে জাহাঙ্গীর সাজাহানকে অযৌক্তিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করলে, সাজাহান তাঁর পিতার অপৌরুষোচিত ব্যক্তিত্ব ও জাহাঙ্গীরের স্ত্রৈণত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন। এ ঘটনা সাজাহানকে তাঁর পিতার প্রতি নূরজাহানের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব সম্পর্কেও সচেতন করে তোলে (৩/৪, ৫)। নূরজাহানের প্রতি অন্ধ আসক্তিজনিত জাহাঙ্গীরের ক্লীবত্ব সাজাহানকে তাঁর জন্মগত পিতৃস্নেহের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং এর ফলে তাঁর পুত্র সত্তা আহত হয়। সর্বোপরি জাহাঙ্গীরের উপর নূরজাহানের অসীম প্রভাব এবং নূরজাহানের ক্ষমতালিপ্সার ফলে সাজাহানের উত্তরাধিকার সত্তার লাঞ্ছিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এইভাবে তাঁর পুত্রসত্তা আহত হওয়ায় এবং উত্তরাধিকার সত্তার নিরাপত্তার অভাব ঘটায় সাজাহান সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের বিরোধী হয়ে ওঠেন। উত্তরাধিকার সত্তার রক্ষার জন্য পিতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানে সাজাহান অংশগ্রহণ করেন। জাহাঙ্গীরের কাছে তিনি পরাজিত হন। এর ফলে সাজাহানের উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার এই প্রচেষ্টা ব্যাহত হয় (৩/৬, ৭, ৮)। উদ্দেশ্যপূরণে একনিষ্ঠ সাজাহান পিতার মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখলের লড়াই-এ নূরজানকে পরাজিত করেন ও তাঁর উত্তরাধিকার সত্তা তথা তাঁর সম্রাট সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন (৫/৭)। সম্রাট সাজাহান পরাজিতা বন্দিনী নূরজাহানকে মুক্ত করে দেন এবং তাঁর ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করেন। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে মানবিক মূল্যবোধের দীপ্ততায় ন্যায়াধীশ

সাজাহানের সম্রাট সত্তা উজ্জ্বল হয়ে ওঠেছে। তাঁর সম্রাট সত্তার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মেবারের রাণা কর্ণ সিংহ সহযোগিতা করেছিলেন। সাজাহান রাণা কর্ণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সম্রাট সাজাহান তাঁর উষ্ণীষ মেবারের রাণাকে পরিয়ে দিয়ে তাঁকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন (৫/৭)। সম্রাট সাজাহানের সঙ্গে মেবারের রাণা কর্ণের এই মিলনের ঘটনাটি নাট্যকারের কল্পনা প্রসূত। তৎকালীন যুগচেতনার পরিচয় বহন করেই নাট্যকার এই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। খাদিজার সঙ্গে সাজাহানের প্রণয় সম্পর্কিত একটি ঘটনা নাটকে বিন্যস্ত। এই ঘটনার ভিতর দিয়ে সাজাহানের প্রেমিক সত্তার পরিচয় পাওয়া যায় (৩।১, ৪, ৫।৫)। বাস্তবমুখী চিন্তাধারা তাঁর প্রেমিকসত্তাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কিন্তু সাজাহানের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁর এই সত্তা-প্রসূত কার্যাবলীর কোনরূপ কার্য্য-কারণ যোগ ঘটেনি। এরফলে অনাবশ্যকভাবে সাজাহান চরিত্রের গতি ব্যাহত হয়েছে।

ঔরংজেব—(সাজাহান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

সাজাহান নাটকের প্রধান বিরোধী চরিত্র হিসাবে ঔরংজেব চরিত্রটি চিত্রিত। ঔরংজেব চরিত্র গঠনের দিক থেকে নাট্যকার ঔরংজেবের শারীরিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক—এই তিনটি দিকের মান বজায় রেখেছেন। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে চরিত্রটি উভয়মুখী (Ambivert)। দিল্লীর সিংহাসনে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে সমগ্র মোঘল সাম্রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট হবার বাসনা চরিতার্থ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। পিতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটিয়ে ঔরংজেব নাট্য ঘটনায় গতির সূচনা করেন (১/১)। মোরাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে তিনি তাঁর বিরোধী মোঘল রাজশক্তিকে কৌশলে পরাজিত করেন কূটনৈতিক বুদ্ধির সাহায্যে আগ্রা দুর্গে প্রবেশ করে তিনি তাঁর পিতা ও সম্রাট সাজাহানকে বন্দী করেন (১/২ ৩, ৫, ৭)। এ সব ঘটনার মাধ্যমে নাট্য ঘটনার গতি ক্রমশ উর্দ্ধমুখী হয়ে ওঠে। দিল্লীর সিংহাসনকে নিষ্কণ্টক করার জন্য ছলনার দ্বারা তিনি ভ্রাতা মোরাদকে বন্দী করেন (২/১)। পিতার বর্তমানে ঔরংজেব দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করেন। এর ফলে (২/২) নাট্যঘটনার বেগ অধিকতর বৃদ্ধি পায়। বন্দী দারা ও মোরাদকে হত্যা করে ঔরংজেব নাট্য ঘটনার গতিকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। ভ্রাতাদের প্রতি পৈশাচিক আচরণ ও পিতার প্রতি অমানবিক কার্য্যকলাপের জন্য ঔরংজেব পরে অনুতপ্ত হন। তিনি পিতা ও ভগ্নীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এইভাবে নাট্যঘটনার গতি পরিণতি লাভ করে (৫/৬)। ঔরংজেব চরিত্রটি নাট্যঘটনায় এইভাবে গতির সৃষ্টি করেছে। এ চরিত্রটি তাই নাট্যঘটনার গতিসঞ্চারী (P!votal) চরিত্র রূপেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ঔরংজেবের সুদৃঢ় মানসিক শক্তি, একনিষ্ঠতা, রণনিপুণতা, কূটনৈতিক

পারদর্শিতা তাঁর উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক হয়েছে। জীবন সম্পর্কে ঔরংজেবের ধারণা তাঁর কায়েমী স্বার্থ চিন্তার সংকীর্ণতার দ্বারা পরিব্যাপ্ত। যে কোন কিছুর বিনিময়ে এবং যে কোন উপায়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধিই তাঁর মূল লক্ষ্য।[ক]

ঔরংজেবের এই আত্মকেন্দ্রিকতাই তাঁর সামাজিক সত্তাকে বিনষ্ট করেছে। ঔরংজেব কর্তৃক পিতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা, পিতা সাজাহানকে ছলে বন্দী করা এবং পিতার বর্তমানে নিজের সিংহাসনে আরোহন করা ইত্যাদি ঘটনার দ্বারা ঔরংজেব তাঁর পুত্রসত্তাকে কলুষিত করেন। বন্দী দারা ও মোরাদকে হত্যা করে এবং সুজাকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করে ঔরংজেব তাঁর ভ্রাতৃ সত্তাকে লাঞ্ছিত করেন। মানবিক মূল্যবোধকে তিনি বিসর্জন দেন। ঔরংজেব তাঁর পুত্র মহম্মদকে গোয়ালিয়রের দুর্গে বন্দী করেন (৩।৫, ৫।১)। এর ফলে তাঁর পিতৃসত্তার মর্যাদা নষ্ট হয়। রাজনৈতিক কায়েমী স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সাজাহানের পুত্র আওরঙ্গজেব, দারা, মোরাদ এবং সুজার ভ্রাতা আওরঙজেব, এবং মহম্মদের পিতা আওরঙজেব হিসাবে ব্যক্তি আওরঙজেবের এই ত্রিবিধ সামাজিক সম্পর্ক সার্বিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে।

ঔরংজেবের ধার্মিক সত্তা তাঁর অপরিণত ধর্মবোধের পরিচায়ক। তাই নিজের স্বার্থসিদ্ধির হীন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ঔরংজেব তাঁর সকল প্রকার অমানবিক ও নীতি-গর্হিত কাজের পিছনে ধর্মের দোহাই দিয়ে ধর্মের সমর্থন পাবার চেষ্টা করেছেন (২।৫, ৪।৫)। ইসলাম ধর্মের পবিত্রতা ও অখণ্ডতা রক্ষার ক্ষেত্রে ভ্রাতাদের হত্যা করা ও পুত্রকে বন্দী করার কার্য্যাবলীকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে বস্তুতপক্ষে তিনি ধর্মবোধকে ধূলুণ্ঠিত করেছেন।[খ] পরিণত ধর্মবোধের অভাব থাকার জন্যেই ঔরংজেব প্রকৃত ধর্মপ্রাণ উদার দৃষ্টি ভঙ্গীর অধিকারী হতে পারেন নি। ধর্ম তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টায় ক্ষমতালোভী ঔরংজেব ও ইসলাম ধর্ম রক্ষার ভাণকারী ঔরংজেব মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছে। অপরিণত ধর্মবোধের ফলে চরিত্রের মধ্যে এ ধরণের মানসিকতা গড়ে উঠেছে। মনস্তাত্ত্বিক বিজ্ঞানে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।[৩৬]

ঔরংজেবের চরিত্রে ইদম (ID) ও অহম (Ego) এর প্রভাব যতটা ছিল অধিসত্তার (Super Ego) প্রভাব ততটা ছিল না। এর ফলে তাঁর মধ্যে পারিবারিক ও ধর্মনৈতিক বিষয়ে নীতিবোধের অভাব লক্ষ্যণীয় হয়। তাই স্বার্থসিদ্ধির

ক. ঔরংজেব—"কার্য্য সিদ্ধির জন্য যত রকম উপায় আছে তা ভাবতে হবে"
—প্রথম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, সাজাহান।

খ. ঔরংজেব—"ভাই পুত্র যাউক। ধর্ম প্রবল হউক"।
—পঞ্চম অংক, প্রথম দৃশ্য, সাজাহান।

প্রচেষ্টায় পিতাকে বন্দী করা, একের পর এক ভ্রাতাদের হত্যা করা, পুত্রকে দুর্গে বন্দী করা, সত্য ভাষণ সহ্য করতে না পারা, অপরের অধিকারবোধকে লঙ্ঘিত করা, ধর্মের নামে কপটাচার করা এবং ছলে বলে কৌশলে সিংহাসন অধিকার করে রাজ্য শাসনের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করা—প্রভৃতি অশুভ ও অমানবিক প্রবৃত্তি ঔরংজেবের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। তাঁর মানসিক স্তরের এই বিশ্লেষণ অনুসারে ঔরংজেব মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে Psychopethic Personality শ্রেণীর ব্যক্তি ছিলেন।[৩৭]

এ ধরণের ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবার ফলে পিতা, ভ্রাতা ও ভগ্নীর সঙ্গে তাঁর সামাজিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয়। তাঁর মানসিক ভারসাম্য ব্যাহত হয়, মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে তাঁর যুক্তিবোধ শিথিল হয়ে পড়ে। প্রচলিত রীতি নীতি সম্পর্কে তাঁর ধ্যান ধারণাও স্তিমিত হয়ে যায়। শেষ পর্য্যন্ত তাঁর জঘন্য কৃতকর্ম তাঁর মনে পাপবোধ জনিত আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এর ফলে ঔরংজেবের মানসিকতায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষকরণ (Hallucination) ঘটে (৫।৫)।[৩৮] এই পাপবোধের উন্মেষ প্রকৃতপক্ষে ঔরংজেবের মধ্যেকার অবদমিত অধিসত্তার (Super ego) জাগরণেরই ফলশ্রুতি (৫।৬)। এই অধিসত্তার ক্রিয়াশীলতায় ঔরংজেবের মধ্যে ইদম্ ও অহম্ এর প্রভাব ক্রমশঃ দূর হয়ে যায়।[৩৯] মানবিক মূল্যবোধের অপচয়ের গ্লানিতে ভারাক্রান্ত সম্রাট ঔরংজেব পিতা ও ভগ্নীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর হৃদয়ের ভার লাঘব করতে সচেষ্ট হন। ঔরংজেবের চরিত্রের মধ্যে অধিসত্তার জাগরণের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

● (খ/৩) **ঐতিহাসিক নাটকের প্রধান ও বিরোধী চরিত্রের সহযোগী চরিত্র** (Allied Agents of Protagonist and Antagonist)।

মীরজাফর (সিরাজদ্দৌলা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

এই চরিত্রটি সিরাজদ্দৌলা নাটকের বিরোধী চরিত্র ক্লাইভের সহযোগী চরিত্র বিশেষ। বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাবের সিংহাসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাই মীরজাফরের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে মীরজাফর সিরাজদ্দৌলার বিরোধী শক্তির সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রেখে নিজের কার্য্যকলাপকে লক্ষ্যের দিকে কেন্দ্রায়িত ও সংগঠিত করেন। মিষ্টভাষণ, কূটনৈতিক দক্ষতা, কপটাচার ও স্বার্থপরতা তাঁর উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হয়েছে। রাজদরবারের অমাত্যগণকে কৌশলে তিনি নিজের পক্ষে আনেন (১।১২, ৩।১)। সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে তিনি ইংরেজদের সকল প্রকারে সহযোগিতা করেন এবং এর দ্বারা তিনি ইংরাজ শক্তির আস্থা অর্জন করেন (২।১, ২।৬)। অবশেষে ভবিষ্যতে সিরাজদ্দৌলার অবর্তমানে বাংলার নবাবের সিংহাসনে নিজের অধিকার কায়েম করার জন্য মীরজাফর ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর মীরজাফরের মধ্যে দেশপ্রেম অপেক্ষা আত্মপ্রেম (self love) বড় হয়।

পলাশীর রণাঙ্গনে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সিরাজদ্দৌলা পরাজিত হন। বাংলার নবাবের সিংহাসনে আরোহন করে মীরজাফর তাঁর উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে তোলেন।

মীরমদন ও মোহনলাল (সিরাজদ্দৌলা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)।

সিরাজদ্দৌলা নাটকের প্রধান চরিত্র 'সিরাজদ্দৌলার' সহযোগী চরিত্র হিসাবে মীরমদন ও মোহনলাল চরিত্রদ্বয় একই বৃন্তে দুটি ফুল। সততা, বিশ্বস্ততা, শৌর্য্য, বীর্য্য, মহত্ত্ব ও ঔদার্য্যে এই চরিত্র দুটি প্রাতঃস্মরণীয়। দেশপ্রেমের মন্ত্রে এঁরা সঞ্জীবিত। এই প্রেমেই তাঁরা বাংলা বিহার উড়িষ্যার অধিপতি সিরাজদ্দৌলাকে তাঁদের বক্ষঃপঞ্জরের মধ্যে আবৃত করে রেখেছেন। নবাবের স্বার্থরক্ষার অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে এই প্রেমই তাঁদেরকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করে তুলেছে। জীবনের মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে এই প্রেমই তাঁদেরকে সত্যের একনিষ্ঠ সাধক করে তুলেছে। এই প্রেমেই তাঁরা আত্মত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষিত। রাজনীতির হলাহল, স্বার্থের কোলাহল, অর্থের দীনতা, প্রবৃত্তির হীনতা এই প্রেমের শুদ্ধতাকে নষ্ট করতে পারেনি। সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও গভীর দেশপ্রেম মীরমদন চরিত্রের আকর্ষণকে বৃদ্ধি করেছে। রাতের অন্ধকারে ইংরেজরা হঠাৎ কলকাতা আক্রমন করলে মীরমদন এই আত্মপ্রত্যয়ের জোরেই ইংরেজদের আক্রমণ প্রতিহত করে নবাবের সম্মান তথা দেশের সম্মান রক্ষার্থে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন (২।৬)। এই যুদ্ধে উদ্‌ভ্রান্ত সিরাজদ্দৌলা তাঁর শত্রু পক্ষ ইংরেজদের শক্তির প্রশংসা করলে মীরমদন মার্জিত ভাষায় সিরাজদ্দৌলার এই কাজের তীব্র প্রতিবাদ করেন। এই ঘটনায় চরিত্রের রাজানুগত্য অপেক্ষা দেশানুগত্য বড় হয়ে উঠেছে। পলাশীর রণক্ষেত্রে স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সৈনিক হিসাবে মীরমদন বুকের রক্তে দেশপ্রেম আর আত্মত্যাগের মহান আদর্শ রচনা করেছেন (৪।২)।

রণক্ষেত্রে বীরের মৃত্যুর মর্য্যাদা মোহনলাল লাভ করতে পারেননি। পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ স্বাধীনতা সূর্য্যের অস্তমিত রেখা তাঁকে বেদনায় বিদীর্ন করেছে। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার ভাগ্য বিপর্য্যয় তাঁকে উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত করেছে। এই বিরাট ভাঙণের বুকে দাঁড়িয়ে নির্মল দেশপ্রেম ও ত্যাগের গৈরিকতায়, আত্মপ্রত্যয়ের সজীবতায়, শুদ্ধচিত্তের পবিত্রতায় মোহনলাল আরও দীপ্ত ও বরেণ্য হয়েছেন। দেশের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং নবাব সিরাজদ্দৌলার জীবন ও সম্মান রক্ষার উদ্দেশ্যে মোহনলাল পলাশীর যুদ্ধে রণনিপুণতা আর বীরত্বের নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন। পলাশীর যুদ্ধের পর নবাব মীরজাফরের বিচারে মোহনলালকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মরণের মুখে দাঁড়িয়েও মোহনলাল স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী মীরজাফরের উদ্দেশ্যে ধিক্‌কার আর ঘৃণার শাণিত বাক্যপ্রয়োগ করেন। এইভাবেই মোহনলাল তাঁর বলিষ্ঠ দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়ে যান (৫।৬)। ঘাতকের হাতে তাঁর মৃত্যু হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী।

যুগের প্রয়োজনে নাট্যকার নাট্যসাহিত্যের মাধ্যমেও দেশবাসীকে নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমে উদবুদ্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।[৪০] এই চরিত্র দুটি তারই অন্যতম ফলশ্রুতি।

আলী ইব্রাহিম, তকী খাঁ, লালসিং (মীরকাসিম—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)।

'মীরকাসিম' নাটকের প্রধান চরিত্র মীরকাসিমের সহযোগী চরিত্ররূপে এসব চরিত্র উল্লেখযোগ্য। দূরদর্শী, স্পষ্টবাদী ও দেশপ্রেমিক আলী ইব্রাহিম প্রকৃত বন্ধু হিসাবে মীরকাসিমের যে কোন বিপদের দিনে নিজের প্রান তুচ্ছ করে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। বাক্‌চাতুর্য্য ও বাক্‌বৈদগ্ধ্যের সাহায্যে তিনি দেশের রাজনীতিগত প্রকৃত অবস্থা, ইংরেজদের অভিপ্রায়, এবং মীরকাসিমের সামরিক শক্তির দুর্বলতা সম্পর্কে মীরকাসিমকে সচেতন করেছেন (১/৩, ২/৩, ৬, ২/৬, ৪/৪, ৬)। রাজভক্ত হিসাবে নিজের প্রাণের বিনিময়ে সুজাউদ্দৌলার চক্রান্ত থেকে নবাব মীরকাসিমকে উদ্ধার করার কাজে ব্রতী হয়েছেন (৫/৫)। মানবিক মূল্যবোধ, পরার্থপরতা এবং সততা আর বিশ্বস্ততার গুণে চরিত্রটি অনন্য সুন্দর। বীরত্ব, দেশপ্রেম, রাজভক্তি, কর্তব্য নিষ্ঠা ও রণদক্ষতায় তকী খাঁ আর লাল সিং মীরকাসিমের সামরিক শক্তিকে সমৃদ্ধ করেছেন। এর ফলে নবাব মীরকাসিমের মনোবল বেড়েছে (১/৪, ২/৬ ৩/১, ১০, ১২)। দেশপ্রেমিক লাল সিং এবং তকী খাঁ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন। এই দিক দিয়ে তাঁরা প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও বীরের মর্য্যাদায় আসীন।

গোবিন্দসিংহ (মেবার পতন—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)।

'মেবার পতন' নাটকের প্রধান চরিত্র "রাণা অমরসিংহের" সহযোগী চরিত্র রূপে এই চরিত্রটি চিত্রিত। দেশপ্রেম সত্তা ও পিতৃসত্তা—এই দ্বৈত সত্তায় অবগাহন করে গোবিন্দ সিংহ চরিত্রটি অনন্য সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। ক্ষাত্রবীর্য্যের প্রতিষ্ঠার দ্বারা মাতৃভূমির সম্মান ও মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।[ক] এই লক্ষ্য পূরণের জন্য তাঁর অসাধারণ মানসিক শক্তির দৃঢ়তা উল্লেখযোগ্য। তাঁর জীবনের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে তাঁর রূপায়িত কর্মের মেলবন্ধন চরিত্রের একমুখী গতিকে সমৃদ্ধ করেছে। জাতির অতীত ঐতিহ্যের শরীক গোবিন্দসিংহ। এই গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাকে গোবিন্দসিংহ রক্ষা করতে চান। বীর রসে তেজদীপ্ত জাতীয় চরিত্রের স্মৃতিচারণ তাঁর দেশপ্রেমের প্রবাহকে তরঙ্গায়িত করেছে। দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে দারিদ্র্য ও দুঃখের কণ্টক-মুকুট তাঁর কাছে তাই বরণীয়। স্বাধীনতার রণক্ষেত্রে শত্রুকে পরাজিত করে তার রক্তপানের মধ্যেই

ক. গোবিন্দসিংহ—"মেবার রাজ্য এখনও স্বাধীন। গোবিন্দ সিংহ জীবিত থাকতে সে স্বাধীনতা বিক্রয় কর্ব্বে না।"

—প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, মেবার পতন।

গোবিন্দসিংহের ক্ষাত্রশক্তি পরিতৃপ্তি লাভ করতে চায়। এই পটভূমিকায় মেবারের রাণা অমরসিংহের আপোষকামী মনোভাবকে গোবিন্দ সিংহ মেনে নিতে পারেননি। মোঘল-শক্তি মেবার আক্রমণ করলে রাণা অমর সিংহ মোঘলের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব গোবিন্দসিংহের ক্ষাত্রসত্তা ও তার দেশপ্রেম সত্তাকে আঘাত করে।[খ] তিনি বেদনাহত হন। সত্যবতীর প্রেরণায় রাণা অমরসিংহ তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেন এবং মোঘলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই ঘটনায় গোবিন্দসিংহের বেদনা দূর হয় (১/৩)।

দেশপ্রেমের এই সত্তাই গোবিন্দসিংহের পিতৃসত্তাকে আবৃত করে রাখে। তাই দেশ-দ্রোহী ও বিধর্মী জামাতা মহাবৎ খাঁর প্রতি কন্যা কল্যাণীর পাতিব্রত্যের একনিষ্ঠতাকে গোবিন্দসিংহ মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। এক্ষেত্রে একদিকে জাত্যাভিমান ও ধর্মান্ধতার সংকীর্ণতায় গোবিন্দসিংহের চরিত্র কলুষিত হয়েছে (২/৬) এবং অপরদিকে দেশের শত্রু হিসাবে মহাবৎ খাঁকে চিরশত্রু হিসাবে ত্যাগ করার ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর দেশপ্রেমের আবেদনই বড় হয়ে উঠেছে।[গ] গোবিন্দসিংহের কন্যা কল্যাণী দেশদ্রোহী মহাবৎ খাঁকে স্বামীরূপে স্বীকার করেন। এই ঘটনায় গোবিন্দসিংহের দেশপ্রেম সত্তা আহত হয়। তাই পিতা গোবিন্দ সিংহ তাঁর পিতৃসত্তার বেদনাকে অন্তরালে সরিয়ে রেখে কন্যা কল্যাণীকে ত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে শত্রুসৈন্যের হাতে কন্যা কল্যানীর লাঞ্ছনা ও পুত্র অজয়ের মৃত্যুতে তাঁর পিতৃসত্তা বেদনার্ত হয়ে ওঠে (৪/৪, ৫/৩)। আত্মজের মৃত্যুতে তাঁর মানসিক ভারসাম্য বিচলিত হয়। তথাপি স্বজন হারানো শশ্মানের মধ্যে দাঁড়িয়েও তিনি মাতৃভূমির উদ্ধারের কার্যে অবিচল থাকেন (৫/৩)। দেশকে গভীরভাবে ভালবাসার ফলে তিনি মেবারের পরাজয়কে মেনে নিতে পারেন নি। উদয়পুর দুর্গের সম্মুখে মোঘল সেনাপতি মহাবৎ খাঁকে তিনি দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহবান করেন (৫/৪ ।। গুপ্তঘাতকের হস্তে গোবিন্দ সিংহের মৃত্যু হলেও দেশপ্রেমের অগ্নি-দীপ্তিতে গোবিন্দসিংহ অমরত্ব লাভ করেন। পরিশেষে বলা যায় যে শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ত্যাগে ও প্রেমে গোবিন্দসিংহ চরিত্রটি নাটকের মূল চরিত্র রাণা অমরসিংহ অপেক্ষা অধিক আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সমগ্র নাটকের চরিত্রের মধ্যে ঐকতান রচনার ক্ষেত্রে এটা বাঞ্ছনীয় নয়।

দিলীর খাঁ (দুর্গাদাস—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)।

'দুর্গাদাস' নাটকের বিরোধী চরিত্র ঔরংজেবের সহযোগী চরিত্র হিসাবে দিলীর খাঁ চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। স্পষ্টবাদিতা, সরলতা, উদারচিত্ততা, নির্ভীকতা এবং

খ. গোবিন্দসিংহ—'বজ্র! তোমার ভৈরবস্বরে এ হীন উচ্চারণকে ঢেকে ফেল। মেবার! মোগল প্রভুত্ব স্বীকার করার আগে একটা বিরাট ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যাও।' —(প্রথম অংক, তৃতীয় দৃশ্য, মেবার পতন)

গ. গোবিন্দসিংহ—'কল্যানী! যে অন্তরে দেশের শত্রু, আমার গৃহে তার স্থান নাই। ...আমার ধর্ম দেশ।' —(দ্বিতীয় অংক, ষষ্ঠ দৃশ্য। মেবার পতন)।

পরিণামদর্শিতার গুণে দিলীর খাঁ চরিত্রটি সমৃদ্ধ হয়েছে। রাজনীতি, সমরনীতি ও ব্যক্তিগত-নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই চরিত্রটি সর্বদাই শুভবোধে দীপ্ত। সমরাধিনায়ক হিসাবে দিলীর খাঁ ঔরংজেবের সমরশক্তি বৃদ্ধি করেছেন। ঔরংজেবের চরিত্রের ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামী, হীনমন্যতা, কপটতা, ও অপরিণামদর্শিতার প্রতি প্রত্যক্ষভাবে অঙ্গুলী নির্দেশ করে দিলীর খাঁ ঔরংজেবকে তাঁর ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে সচেতন করেছেন (৩/৯, ৪/১)। বিরোধী চরিত্রের সহযোগী চরিত্র হিসাবে তাঁর এহেন দ্বৈত্যভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। নাটকে দিলীর খাঁর কিছু কিছু কার্য ঐশ্লামিক যুগের সম্রাট ও সেনাপতির মধ্যেকার যুগোচিত পরিমণ্ডল রচনার পরিপন্থী হয়েছে। সেক্ষেত্রে মহিষী গুলনেওয়ারের নির্দেশ উপেক্ষা করে এবং সম্রাটের বিনা অনুমতিতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দী দুর্গাদাসকে দিলীর খাঁর মুক্ত করে দেওয়া (৪/৮), ঔরংজেবের বিরুদ্ধে আকবরের বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে দিলীর খাঁ কর্তৃক সম্রাট ঔরংজেবকে তাঁর পিতার বিরুদ্ধে পূর্বেকার বিদ্রোহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে লজ্জিত করে তোলা (৩/৯), কাশ্মীরী বেগম গুলনেওয়ারকে ত্যাগ করার জন্য দিলীর খাঁ কর্তৃক ঔরংজেবকে প্ররোচিত করা (৩/৯)—এ সকল কার্য্যাবলী উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে বলা যায় যে নাট্যকার অতিচারী কল্পনার দ্বারা দিলীর খাঁ চরিত্রটিকে আদর্শের বিগ্রহ রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

মহাবৎ খাঁ (নূরজাহান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)।

মহাবৎ খাঁ বীর সেনাপতি। সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রতি তাঁর কর্তব্যবোধ খুব প্রবল ছিল। কিন্তু নূরজাহানের দুর্ব্যবহারে ও অবিচারে লাঞ্ছিত হয়ে তিনি সাজাহানের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত এই চরিত্রটি নূরজান নাটকের বিরোধী চরিত্র সাজাহানের সহযোগী চরিত্র রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাঁর শৌর্য্য ও বীর্য্যের দ্বারা তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সম্রাজ্ঞী নূরজাহানকে বন্দী করেন (৪/৭)। পরে সম্রাটের অনুরোধে তিনি নূরজাহানের প্রাণদণ্ডের আদেশ মকুব করেন (৪/৮)। এইভাবে কর্তব্যপরায়ণ ও মহানুভব মহাবৎ খাঁর চরিত্র চিত্রণ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এর আগে রাজদণ্ডাজ্ঞা থেকে খসরুর প্রাণ বাঁচানোর জন্য তিনি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিলেন (২/২)। তাঁর এই প্রয়াস তাঁর মনুষ্যত্ববোধের পরিচয়কে তুলে ধরেছে।

জাহানারা (সাজাহান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)।

নাটকের প্রধান চরিত্র সাজাহানের সহযোগী চরিত্র রূপে জাহানারা চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। পিতা সাজাহানকে তাঁর অন্ধ স্নেহের দুর্বলতা থেকে মুক্ত করার এবং সিংহাসনচ্যুত সম্রাট সাজাহানকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য। জাহানারার পিতৃভক্তি, কর্তব্যপরায়ণতা, তেজদীপ্ততা, বাগ্মিতা, চরিত্রের অনন্য সম্পদ বিশেষ। পিতার অনুরাগী জাহানারার কন্যা সত্তাকে কেন্দ্র করে চরিত্রের

বিভিন্ন দিকের পরিচয় নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জাহানারার বিদ্রোহী সত্তা ও জাহানারার মমতাময়ী নারী সত্তার বিকাশ উল্লেখযোগ্য। সাজাহান চরিত্রের দুটি সত্তা বিদ্যমান। সম্রাট সাজাহান ও পিতা সাজাহান—এই দুই সত্তার দুটি রূপ। এই দুই রূপের সুষ্ঠু সমন্বয়ের মধ্যে জাহানারা তাঁর পিতার অনিন্দ্য সুন্দর রূপ প্রত্যক্ষ করতে চান (১/১)। সাজাহানের এই দুই রূপের অখণ্ডতাই কন্যা জাহানারার একমাত্র কাম্য। সম্রাট সাজাহানের বিরুদ্ধে মোরাদ-সুজা আর ঔরংজেব এই তিন পুত্রের বিদ্রোহের সন্ধিক্ষণে পিতা সাজাহানের অন্ধস্নেহ তাঁর সম্রাট সত্তাকে আচ্ছন্ন করতে উদ্যত হলে সম্রাট নন্দিনী জাহানারা অত্যন্ত বিচলিত হন। ভ্রাতাদের এই আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এবং সাজাহানের সম্রাটসত্তাকে রক্ষা করার জন্য তিনি প্রতিবাদে মুখর হন। সম্রাট সাজাহানের যোগ্য প্রতিনিধি স্বরূপ জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাকে রাজ্যের বিদ্রোহ দমনে উৎসাহিত করে তুলে (১/১) সম্রাট তনয়া জাহানারা পিতার সম্রাটত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন তা তাঁর কর্তব্যবোধ ও চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচায়ক। এই কর্তব্যবোধে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে জাহানারা পিতা সাজাহানের সম্মুখে ভ্রাতা ঔরংজেবকে কৌশলে আগ্রা দুর্গে বন্দী করতে সচেষ্ট হন (১/৭)। পিতা সাজাহানের অবিমৃষ্যকারিতায় ও ঔরংজেবের শঠতায় জাহানারার এ কৌশল ব্যর্থ হয়। সাজাহানের বন্দীত্ব ও ঔরংজেবের সিংহাসনের আরোহণের ঘটনায় সম্রাট সাজাহানের লাঞ্ছনা ও বেদনা জাহানারাকে বেদনার্ত করে তোলে। নিঃসীম বেদনায় ভেঙে পড়া সাজাহানের মানসিক শক্তিকে সংহত ও দৃঢ় করে তোলার উদ্দেশ্যে জাহানারার উত্তেজনাপূর্ণ সংলাপের মধ্যে ঔরংজেবের অন্যায়ের প্রতিকারের নিমিত্ত তাঁর বাসনা (wish) ও তাঁর সংগ্রামী চেতনার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় (১/৭)।ক এই সংগ্রামী চেতনাই জাহানারাকে ঔরংজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে। প্রকাশ্য রাজদরবারে সম্রাট ঔরংজেবকে রাজদ্রোহী, পিতৃদ্রোহী ও ভ্রাতৃহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করে অমাত্যগণের সমক্ষে সাজাহানকে সম্রাট সাজাহানরূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসের মধ্যে জাহানারার বিদ্রোহী সত্তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে (২/৫)। বন্দী সাজাহানের সেবা, যত্ন ও সাহচর্যের মধ্য দিয়ে জাহানারার মমতাময়ী নারী সত্তা বিকাশ লাভ করেছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পিতার প্রতি ভালোবাসা ও কর্তব্যবোধের

(ক) জাহানারা—"বাবা, এই কারাগারের কোণে বসে অসহায় শিশুর মতন ক্রন্দন করলে কিছু হবে না, পদাহত পঙ্গুর মত বসে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে অভিশাপ দিলে কিছু হবে না।...উঠুন দলিত ভুজঙ্গের মত ফণা বিস্তার করে উঠুন; হৃতশাবা ব্যাঘ্রীর মত প্রমত্ত বিক্রমে গর্জ্জে উঠুন; অত্যাচারী ক্ষিপ্ত জাতির মত জেগে উঠুন। নিবৃত্তির মত কঠিন হোন; হিংসার মত অন্ধ হোন, শয়তানের মত ক্রূর হোন। তবে তার সঙ্গে পার্ব্বেন।"

(প্রথম অংক, সপ্তম দৃশ্য। সাজাহান)

দিক দিয়ে শেক্সপীয়রের 'কিংলিয়ার' নাটকের কিংলিয়ার কন্যা 'করডেলিয়া' চরিত্রের সঙ্গে জাহানারার চরিত্রের কিছু সাদৃশ্য বিদ্যমান।

চন্দ্রকেতু (চন্দ্রগুপ্ত—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)।

এ চরিত্রটি 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের প্রধান চরিত্র চন্দ্রগুপ্তের সহযোগী চরিত্র। চন্দ্রকেতুর অকপট সারল্য, অকৃত্রিম বন্ধুত্ব, অকুণ্ঠ আত্মত্যাগ, রণনৈপুণ্য, কর্তব্য-পরায়ণতা, বিনয়-নম্রতা তাঁর চারিত্রিক পরিমণ্ডলকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। চন্দ্রকেতুর বন্ধুসত্তাই চন্দ্রকেতুকে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের একান্ত অনুগত বিশ্বস্ত সেবক রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে (১/৪, ৩/৬, ৪/২, ৪/৫)। মৃত্যুর পূর্বে ভগিনী ছায়াকে বিবাহ করার জন্য চন্দ্রগুপ্তের নিকট চন্দ্রকেতুর আবেদনের মধ্যে তাঁর ভ্রাতৃসত্তার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

● (খ/৪) ঐতিহাসিক নাটকের নাট্য ঘটনায় গতিসঞ্চারকারী চরিত্র (Pivotal Charactar)।

জহরা (সিরাজদ্দৌলা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)।

সিরাজদ্দৌলা নাটকে 'জহরা' চরিত্রটি নাটঘটনার গতিসঞ্চারকারী চরিত্র। জহরা পতিপরায়ণা রমনী। সিরাজদ্দৌলা জহরার স্বামী হোসেন কুলি খাঁকে হত্যা করলে জহরার স্ত্রী সত্তা বিধ্বস্ত হয়। এরফলে পতিপরায়ণা রমনীর মধ্যে প্রতিহিংসার মনোভাব জেগে ওঠে (২/২)। এই চরিত্রের 'মরণশক্তি' (Thanatos) চরিত্রের মধ্যেকার ধ্বংসাত্মক প্রবণতাকে বৃদ্ধি করে তোলে। রূপময়ী ও গুণময়ী জহরা নারীত্বের সকল কোমলতাকে বিসর্জন দিয়ে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। জহরার শয়তানী সত্তা ও তাঁর পিশাচী সত্তা—এই প্রবৃত্তিরই রূপকল্প। এই প্রবৃত্তির তাড়নায় জহরার বিভিন্ন কার্য্যাবলী নাট্য ঘটনায় গতির সূচনা করেছে। জহরা মীরজাফরকে ভাবী বাংলার নবাব হবার জন্য প্ররোচিত করেন (২।১)। এর ফলে মীরজাফর তাঁর বাসনা পূরণের জন্য মানসিক দিক দিয়ে নতুন শক্তি লাভ করেন এবং সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বাংলার নবাবের পদ লাভের চেষ্টায় ক্রিয়াশীল হন। নাট্যঘটনায় গতির সূচনা হয়। ঘসেটির কাছ থেকে জহরা মতিঝিলের রত্ন ভাণ্ডারের চাবি সংগ্রহ করেন (২।২) এবং সেই অর্থের দ্বারা মীরজাফরের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে বৃদ্ধি করেন (৩।৩,৫)। কৌশলে নবাবী মোহর সংগ্রহ করে (২।৩) জহরা সিরাজদ্দৌলার নামে মিথ্যা পত্র রচনা করেন। এই পত্রের দ্বারা তিনি সকল হিন্দু প্রজাগণকে সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধাচারী করে তোলেন। সিরাজদ্দৌলার জনবল খর্ব করেন (৩।৩)। জনসমর্থন হারাবার ফলে নবাব হিসাবে সিরাজদ্দৌলার সামগ্রিক শক্তি ব্যাহত হয়। জহরা নবাবের সমরায়োজনের গোপন খবর ক্লাইভকে দান করেন। নবাবের বিরুদ্ধ শক্তিকে একত্রিত করে রাতের অন্ধকারে কলিকাতায় নবাব সৈন্যকে আক্রমণ করার জন্য ক্লাইভকে

উৎসাহিত করেন। এভাবে জহরা নাট্যঘটনার গতিকে এগিয়ে নিয়ে যান। (২।৫,৬)। ক্লাইভের আক্রমণে দিশেহারা নবাব ইংরেজ শক্তির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করায় নাট্যঘটনার গতিবৃদ্ধি হয় এবং নাট্যঘটনায় ঔৎসুক্যের সৃষ্টি হয়। পরে জহরা ক্লাইভকে ভবিষ্যতে নবাব ও ফরাসী সৈন্যের মিলিত আক্রমণ সম্পর্কে শঙ্কিত করে তোলেন (৩।৩)। ক্লাইভ ইংরেজ শক্তির অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য নবাবের সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পলাশীর প্রান্তরে সে যুদ্ধের আয়োজন হয়। কিন্তু পলাশীর প্রান্তরে নবাবের রণসজ্জায় ভীত ক্লাইভ যুদ্ধ বিমুখ হয়ে পড়েন। সে সময় জহরা নবাবের সমরায়োজনের ভিতরকার সকল দুর্বলতার কথা ক্লাইভকে প্রকাশ করেন। ইংরেজ শক্তির জয়গানের দ্বারা ক্লাইভসহ সকল ইংরেজ সৈন্যের মনোবল বৃদ্ধি করেন। ক্লাইভ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এরফলে নাট্যঘটনার গতি সমৃদ্ধ হয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় (৪।১)। যুদ্ধে মীরমদনের মৃত্যুর পর জহরা কৌশলে নবাব সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করে দেন (৪।৩)। এর ফলে ক্লাইভের হাতে নবাবের পরাজয় ঘটে। জহরা এইভাবে নাট্যঘটনার গতিকে নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। জহরার প্ররোচনায় দানশা ফকির পরাজিত ও পলায়িত নবাবকে শত্রুপক্ষের কাছে ধরিয়ে দেয় (৪।৬)। মীরণের হাতে নিহত নবাবের উষ্ণ রক্তে জহরার প্রতিহিংসা চরিতার্থতা লাভ করে (৫।৩,৪)।

নাটকে পঁয়ত্রিশটি দৃশ্যের মধ্যে চৌদ্দটি দৃশ্য জুড়ে জহরার কার্যাবলী বিস্তৃত। জহরা চরিত্রের এই ক্রমবিকাশ কার্যকারণ যোগে, যুক্তিনিষ্ঠভাবে নাটকের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। এর ফলে এই চরিত্রটি বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করতে পারেনি। রাজ-অন্তঃপুর থেকে আরম্ভ করে রণক্ষেত্র পর্যন্ত সর্বত্রগামিনী, সর্বকার্যে পটিয়সী এবং সর্বপ্রকার বুদ্ধি ও শক্তির আধার জহরা চরিত্রটি বস্তুতপক্ষে নাট্যকারের অতিচারী কল্পনার রূপরেখা মাত্র। যাত্রা পালার প্রভাবে নাটকের মধ্যে অতিশয় ভাবাবেগ সৃষ্টি করার জন্য এবং হিন্দুর পতিব্রতা ধর্মকে অবলম্বন করে নাটকে দর্শকের আকর্ষণ বৃদ্ধি করার জন্য নাট্যকার নাটকের মধ্যে চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঔচিত্যবোধকে লঙ্ঘন করে এ ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন।[৪১]

চাণক্য (চন্দ্রগুপ্ত—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)।

'চাণক্য' চরিত্রটি চন্দ্রগুপ্ত নাটকের নাট্যঘটনার গতিসঞ্চারকারী চরিত্র। চন্দ্রগুপ্তের মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও তার বিস্তারের ক্ষেত্রে চাণক্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। মহারাজ নন্দ কর্তৃক অপমানিত চাণক্য নন্দবংশের ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করেন। হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যকে গুরু পদে বরণ করলে চাণক্য একদিকে তাঁর প্রতিজ্ঞা পূরণ ও অপরদিকে চন্দ্রগুপ্তের হৃতরাজ্য উদ্ধারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন (১।৪)। এর ফলে নাট্যঘটনায় গতির সৃষ্টি হয়। কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক বুদ্ধির দ্বারা চাণক্য নন্দের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তকে জয়ী করেন ও তাঁকে মগধের সিংহাসনে বসান। নাট্যঘটনার গতি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এর পর

চাণক্য নন্দসহ তার বংশের সকলকে নিধন করে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন নিষ্কণ্টকিত করেন (৩।৬)। নাট্যঘটনার গতি পরিণতির দিকে এগুতে থাকে। বিজয়ী চন্দ্রগুপ্তকে হত্যার জন্য বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করে তিনি চন্দ্রগুপ্তের জীবনের ও তাঁর সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা আনয়ন করেন (৪।২)। গ্রীক সেনাপতি সেলুকসকে সুকৌশলে পরাজিত করে এবং সেলুকসের কন্যা হেলেনের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিবাহের ব্যবস্থা করে চাণক্য মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাকে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন (৪।৫, ৬)। নাট্যঘটনার গতিকে তিনি এইভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন। পরিশেষে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীত্বের পদে হৃদয়বান কাত্যায়ণকে বসিয়ে তিনি রাজ্যপরিচালনার ক্ষেত্রটিকে সমৃদ্ধ করেন। সেই সঙ্গে নাট্যঘটনার গতিও পরিণতি লাভ করে। এভাবে চাণক্য চরিত্রটি নাট্যঘটনার গতিসঞ্চারকারী চরিত্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

চাণক্যের মানসিক শক্তির দৃঢ়তা, গভীর কূটনৈতিক জ্ঞান, দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা, সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, রাজনৈতিক পারদর্শিতা, বাগ্মিতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, এবং আত্মমর্য্যাদাবোধ—চরিত্রটিকে দীপ্ত ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। এ সব গুণের আধার ছিলেন বলেই সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য প্রণোদিত ক্রিয়ার মাধ্যমে (Purposive Action)[৪২] চাণক্য তার লক্ষ্যকে সার্থক করে তুলতে পেরেছেন।

রাজা কর্তৃক চাণক্যের ব্রহ্মোত্তর বাজেয়াপ্ত হওয়ায় এবং দস্যু কর্তৃক তাঁর কন্যা অপহৃত হওয়ায় চাণক্যের ব্রাহ্মণসত্তা ও পিতৃসত্তা লাঞ্ছিত হয়। ব্রাহ্মণসত্তার লাঞ্ছনা তাঁর আত্মমর্য্যাদাবোধে আঘাত হানে। এ আঘাতের ফলে আত্মসম্মানবোধে উদ্দীপ্ত চাণক্য রাজশক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণমুখী হোয়ে ওঠেন। (Aggressive Attitude)। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের শক্তি, ব্রাহ্মণের বল, ব্রাহ্মণের প্রতিভা তথা ব্রাহ্মণত্বের প্রতিষ্ঠায় তিনি ব্রতী হন। চাণক্য মানুষ ও ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন (৩।৩)। ব্রাহ্মণ কাত্যায়ণের প্রতি রাজা নন্দের অত্যাচার এবং নন্দ কর্তৃক চাণক্যের অপমানের ঘটনায় রাজশক্তির বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণাত্মক মনোভাব অধিক তীব্র হয়ে প্রতিহিংসায় রূপান্তরিত হয় (১।৩)। এই প্রতিহিংসার মনোভাবের গভীরতায় ও তীব্রতায় চাণক্য প্রকৃতির রূপাবয়বের মধ্যেও আক্রমণমুখী মনোভাবের ভ্রান্ত প্রকাশ দেখতে পান (Hallucination—২/২)। চরিত্রের মধ্যে অহম্ (ego) শক্তিশালী হয়ে পড়ায় চরিত্রের অধিসত্তা (super ego) এক্ষেত্রে কার্য্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। ত্যাগ-তিতিক্ষা ও ক্ষমা—ব্রাহ্মণের এ সকল বৃত্তির পরিমণ্ডল থেকে বিচ্যুত হয়ে চাণক্য হিংসা-প্রতিহিংসা এবং বিদ্বেষ-এর অন্ধকারময় জগতে প্রবেশ করেন। স্নেহ ভালবাসা এ সকল মানবিক বৃত্তিতে সমৃদ্ধ আলোকময় জগতই হচ্ছে ঈশ্বরের জগৎ আর নীচ প্রবৃত্তির অন্ধকারময় ঘৃণ্য জগৎই হচ্ছে পিশাচের জগৎ। হৃদয়বৃত্তির শুষ্কতায় চাণক্যের মনীষা এই ঘৃণ্য জগতের ধারক হয়ে ওঠে (৩।৩, ৪।১)। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণ চাণক্যের

মধ্যে কন্যার অপহরণজনিত পিতৃসত্তার বেদনা ফল্গুধারার মত প্রবাহিত ছিল। নন্দবংশের ধ্বংস ও তার হত্যার কার্য্য সম্পন্ন করার পর চাণক্যের প্রতিহিংসা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বৃত্তি নিবৃত্ত হলে কন্যাহারা পিতা চাণক্যের হৃদয়ের হাহাকার আরও তীব্র হয়ে পড়ে। আত্রেয়ীকে ফিরে পাওয়ায় চাণক্যের পিতৃসত্তা তাই উদ্বেলিত হয়ে ওঠে (৫।২)। পিতৃত্বের আহ্বানে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীত্বের পদ স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে চাণক্য তাঁর কন্যা আত্রেয়ীকে নিয়ে আবার সংসারে ফিরে যান। মননবৃত্তির সঙ্গে হৃদয় বৃত্তির এই দ্বন্দ্বে রাজশক্তিতে ক্ষমতাবান চাণক্য অপেক্ষা হৃদয়বান পিতা চাণক্য-ই বড় হয়ে উঠেছে (৫।৫)।

চাণক্য চরিত্রের সঙ্গে ভিক্‌টোরিয় যুগের মহিলা ঔপন্যাসিক জর্জ এলিয়ট (১৮১৯—৮১) বিরোচিত "সাইলাস মার্নার" নামক ছোট উপন্যাসের প্রধান চরিত্র 'সাইলাস মার্নারের' সঙ্গে মিল দেখা যায়। এই চরিত্রও একসময় মানুষ ও ভগবানের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু 'এ্যাপি' নামক শিশুকে ফিরে পেয়ে 'সাইলাস মার্নার' তাঁর হারানো মানবিক সত্তাকে ফিরে পান। তিনি স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন।[৪৩]

হৃদয়হীন মনীষা সুখকর নয়। জীবনের এই সত্যটি চাণক্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। চাণক্য চরিত্রের এই অংশের সঙ্গে এ. এল. টেনিসনের (১৮৩০-১৮৬০) "The Palace of Art" কবিতার একটি অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। এই কবিতার "Palace of Art" নির্মাণকারী শিল্পীর কাছে হৃদয়বৃত্তির অভাবে তাঁর নির্মাণকার্য্য অর্থহীন হয়ে ওঠে। তাই শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাঁর রাজকীয় নির্মিতি পরিত্যাগ করে দূরের এক কুটিরে চলে যাওয়ার বাসনা প্রকাশ করেন।[৪৪]

চাণক্য চরিত্রের সঙ্গে বিশাখ দত্তের 'মুদ্রারাক্ষসের' কিছু প্রভাব আছে। মুদ্রারাক্ষস Drame af Intrigue এবং বৃত্ত (Plot) প্রধান। চন্দ্রগুপ্ত নাটকও তাই। মুদ্রারাক্ষসের চাণক্য প্রাণহীন যন্ত্রবৎ ঘটনার চাকা ঘুরিয়েছেন। মন্ত্রী রাক্ষসের প্রচেণ্টা ব্যর্থ করে চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে বসিয়েছেন এবং ব্রত সমাপ্ত হলে রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী করে শিখা বন্ধন করেছেন।[৪৫]

দ্বিজেন্দ্রলালের চন্দ্রগুপ্ত নাটকে এর প্রভাব আছে। এই নাটকেও চাণক্যই চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসনে বসিয়েছেন এবং প্রাক্তন মন্ত্রী কাত্যায়ণকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীত্বের পদ দিয়েছেন। তৎসত্ত্বেও এই বৃত্তপ্রধান নাটকটিকে দ্বিজেন্দ্রলাল চরিত্রপ্রধান করে গড়ে নিয়ে মানুষ চাণক্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। কিন্তু বিশাখ দত্ত চাণক্যকে সেভাবে গড়ে তোলেন নি। এখানেই দুটি নাটকের চাণক্য চরিত্রের বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্যণীয়।

চাণক্য প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল চন্দ্রগুপ্ত নাটকের ভূমিকায় বলেছেন—"ইংরেজ ইতিহাসকারগণ চাণক্যকে ভারতের মাকিয়াভেল্লি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের মতে চাণক্য বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও কূট ছিলেন। আমিও সেই মত গ্রহণ করিয়াছি।" ইটালীর অধিবাসী মাকিয়াভেল্লী নিকোলো (Maachia velli

Niccole—1496-1527) নিজের চেষ্টায় সাধারণ অবস্থা থেকে বড় হন। তিনি তখনকার ফ্লোরেন্সের হয়ে রাষ্ট্রদূতের কাজও করেছেন। তাঁর সময়ে তিনি একজন বড় বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। চাণক্যও সেইরকম খুব সাধারণ অবস্থা থেকে মৌর্য্য যুগে ভারতের বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বড় কূটনীতিবিদ হয়ে ছিলেন। সেইভাবেই নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকে চাণক্য চরিত্রটি চিত্রিত করেছেন।[৪৬]

(খ/৫) ঐতিহাসিক নাটকের কয়েকটি ট্র্যাজিক (Tragic) চরিত্র।

মীরকাসিম (মীরকাসিম—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

ইংরাজদের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চক্রান্তে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হলে দেশের ও দশের কল্যাণের জন্য মীরকাসিম বাংলার নবাবের পদ গ্রহণ করেন। এদেশের শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যকে ধ্বংস করে দিয়ে ইংরেজরা নিজেদের শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করতে চেয়েছিল। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সার্বিকভাবে নিজেদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। এই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দিক থেকেও এদেশের রাষ্ট্রীয়যন্ত্রের ক্ষমতা দখলের জন্যে ইংরেজরা তৎপর হয়ে ওঠে। মীরকাসিম এটা বুঝতে পেরেছিলেন। সেইজন্য জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে তিনি দেশের শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেন। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং এদেশ দখলের জন্য ইংরাজদের দুরভিসন্ধিকে সমূলে বিনষ্ট করে দেওয়াই মীরকাসিমের জীবনের লক্ষ্য ছিল। বলিষ্ঠ ইচ্ছাশক্তি ও সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সাহায্যে তিনি তাঁর লক্ষ্য পূরণের জন্য সক্রিয় হন। নিজের সুখ ভোগের নবাবী-স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে দেশের স্বার্থরক্ষায় মীরকাসিম আত্মনিয়োগ করেন। ইংরেজ শক্তির সঙ্গে তিনি একের পর এক সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এই সংঘর্ষের সময় তাঁর মধ্যে বহির্দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠে। মীরকাসিম চরিত্রের এই সচেতনতা, নৈতিকতা ও বীরোচিতভাব চরিত্রটিকে সাধারণ থেকে উচ্চ পর্য্যায়ে স্থাপন করেছে। দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের কার্য্যাবলীর জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অক্লান্ত চেষ্টার পরও দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের জন্য দেশকে ইংরাজদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শৃংখল থেকে মুক্ত করতে না পারার দুঃখে, বেদনায়, জ্বালায় ও যন্ত্রণায় মীরকাসিম মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। পরিশেষে উন্মাদ অবস্থায় তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন।

বীর ও মহানুভব দেশপ্রেমিক মীরকাসিমের এই শোচনীয় পরিণতি আমাদের মনকে করুণায় (Pity) সিক্ত করে দেয়। আবার দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের কার্যকলাপ সঠিকভাবে প্রতিরোধ করা না গেলে তাদের দেশদ্রোহীমূলক কার্য্যকলাপে যে কুফল ফলে তার কথা ভেবে আমরা ভীত (Fear) ও ত্রস্ত হয়ে পড়ি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মীরকাসিম চরিত্রে Doing ও Suffering যেমন আছে, Pity ও fearও তেমন আছে। এই উপাদানগুলির দ্বারা নাট্যকার গিরিশচন্দ্র মীরকাসিমকে ট্রাজিক চরিত্ররূপে গড়ে তুলেছেন। কিন্তু মীরকাসিমের মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব না থাকায় ট্র্যাজিক চরিত্রের ভাবগম্ভীরময় গভীরতা চরিত্রটি অর্জন করতে পারেনি।

সিরাজদ্দৌলা (সিরাজদ্দৌলা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

ইংরেজরা যাতে মাতৃভূমির স্বাধীনতা হরণ করতে না পারে তার জন্য ইংরেজ বিদ্বেষী ও জাতীয়তাবাদী সিরাজদ্দৌলা সচেষ্ট হয়েছেন। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়োজনে সর্ব্বেবভাবে ইংরেজ শক্তিকে আঘাত করার জন্য তিনি জাতিকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। জাতিকে দেশপ্রেম ও সংগ্রামশীলতায় উদবুদ্ধ করেছেন। দেশের অমাত্য ও প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীগণ বাংলার নবাব হবার জন্য এবং নিজেদের আর্থিক ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দেশের স্বার্থকে বিপন্ন করে তুলতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। দেশীয় অমাত্যগণের এই ভূমিকা সম্পর্কে সিরাজদ্দৌলা সজাগ ছিলেন (১।২,১২,২।১,৩।১ ইত্যাদি)। এই কায়েমী স্বার্থবাজদের দ্বারা যাতে দেশের মুক্তি সংগ্রামের একমুখী প্রচেষ্টা ব্যাহত না হয় সেজন্য তিনি অন্য কোন দেশীয় ব্যক্তিকে বাংলার সিংহাসনে বসাবার আহবান জানিয়েছিলেন। নিজের নবাবী পদের বিনিময়েও তিনি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যত্নশীল হয়েছিলেন (১।৫)। কিন্তু দেশীয় বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁর এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়নি। পলাশীর যুদ্ধে তিনি ইংরেজদের কাছে পরাজিত হন। তাঁকে বন্দী করা হয়। বন্দী অবস্থায় অসহায় সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় সিরাজের ভাগ্য বিপর্য্যয় শোচনীয় রূপ লাভ করে (৫।৪)।

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একনিষ্ঠ সৈনিক হিসাবে সিরাজের এই চরম ভাগ্য বিপর্য্যয় আমাদের মনে করুণার (pity) উদ্রেক করে। দেশীয় বিশ্বাসঘাতকরা শক্তিশালী হয়ে উঠলে দেশ ও দেশবাসীর জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আমাদের মনে ভয়েরও (fear) সৃষ্টি করে।

ট্রাজিক চরিত্রের Doing, Suffering, Pity এবং Fear এই উপাদানগুলি সিরাজদ্দৌলা চরিত্রে বর্তমান থাকায় এই চরিত্রটি যে ট্র্যাজিক চরিত্র বিশেষ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু ট্র্যাজিক চরিত্রের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, বীরোচিত ভাব ও সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের অভাব সিরাজদ্দৌলা চরিত্রে বর্তমান। রাজকর্মচারী ও অমাত্যগণের কূটনৈতিক ষড়যন্ত্রে প্রথম থেকে অসহায়বোধে ভেঙে পড়া সিরাজদ্দৌলা (১।২, ১ ১২) এবং কলকাতায় ইংরাজদের আক্রমণে ভীতবিহ্বল দিশেহারা সিরাজদ্দৌলার (২।৬) প্রসঙ্গ এ বিষয়ে স্মরণ করা যেতে পারে। ট্র্যাজিক চরিত্রের কার্য্যাবলীর মধ্যে তার বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার গভীর ও আত্যন্তিক প্রচেষ্টার উদ্দীপনা থাকে। সিরাজদ্দৌলার চরিত্রের কার্য্যাবলীর মধ্যে এর অভাব

লক্ষ্যণীয়। ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে কেন্দ্র করে সিরাজদ্দৌলা চরিত্রের মধ্যে বহির্দ্বন্দ্ব বড় হয়ে উঠেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুর্বলচিত্ত সিরাজের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা তেমন গড়ে ওঠেনি। Tragic চরিত্রের পক্ষে এটা বাঞ্ছনীয় নয়। এ সব কারণে পলাশীর প্রান্তরে সিরাজের পরাজয়ের ফলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ায় দেশের কথা ভেবে আমাদের মন যতটা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, সিরাজের ভাগ্য বিপর্যয়ের ঘটনায় সিরাজের কথা চিন্তা করে আমরা ততটা ব্যথিত হই না। তাঁর শোচনীয় পরিণতির ফলে আমাদের মধ্যে কারুণ্যের ভাব অধিকভাবে জেগে ওঠে। তাই সিরাজ চরিত্রটি ভাবগম্ভীর সার্থক ট্র্যাজেডি হয়ে উঠেছে এ কথা ঠিক বলা যায় না।

সাজাহান (সাজাহান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)।

সম্রাট সাজাহান পুত্র ঔরংজেবের হাতে বন্দী হয়েছেন। সিংহাসনের বদলে তাঁর স্থান হয়েছে কারাগারে। একের পর এক পুত্র হত্যার পৈশাচিক ও হৃদয়বিদারক ঘটনা তাঁকে বিচলিত, সন্ত্রস্ত ও ভীত করেছে। এসব ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁর ভাগ্য-বিপর্যয়ের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই ভাগ্য বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে জীবনবোধ সম্পর্কে সাজাহানের অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী। অধিক স্নেহপ্রবণতাই তাঁর চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা।[ক] এই দুর্বলতাই সম্রাট সাজাহানের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে বিনষ্ট করেছে। সম্রাট সাজাহান ও পিতা সাজাহানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত বিদ্রোহী ঔরংজেবকে সাজাহান স্নেহের শাসনে বাঁধতে চেয়েছেন। এই স্নেহের তাগিদেই শঠ ও কূট ঔরংজেবকে বিশ্বাস করে তিনি আগ্রা দুর্গের দার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। স্নেহজাত দুর্বলতার এই ছিদ্রপথ দিয়ে সাজাহানের রাজনৈতিক ভ্রান্তিই সাজাহানের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে শোচনীয় করে তুলেছে।

পিতা সাজাহানকে বন্দী করা এবং একের পর এক ভ্রাতাদের হত্যা করার মধ্য দিয়ে ঔরংজেবের অকৃতজ্ঞতাজনিত কার্যকলাপে সাজাহানের পিতৃহৃদয় দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। সাজাহান মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হন। এই জীবন যন্ত্রণার (Suffering) ভিতর দিয়ে পিতা সাজাহান উপলব্ধি করেন যে পিতৃ-হৃদয়ের বাঁধ ভাঙা স্নেহ পিতারই অকল্যাণ করে থাকে। এই নতুন বোধ তাঁর জীবন যন্ত্রণাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই তিনি পিতৃ-হৃদয়ে এই স্নেহপ্রবনতা দানের জন্য ঈশ্বরকে অভিযুক্ত করেন।[খ] এই স্নেহজাত প্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করার জন্য সকল পিতার

ক. সাজাহান—'আমার হৃদয় শুধু এক শাসন জানে। সে শুধু স্নেহের শাসন… ।' (প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, সাজাহান)

খ. সাজাহান—"ঈশ্বর! পিতাদের এই বুকভরা স্নেহ দিয়েছিলে কেন? কেন তাদের হৃদয়কে লৌহ দিয়ে গড়নি… ।" (দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য, সাজাহান)

নিকট তিনি আকুল আবেদন জানান।[গ] কন্যা জাহানারার যাতে পুত্র না হয় তার জন্য অধীর আগ্রহে তাকে আশীর্বাদ করেন।[ঘ] পুত্রের অকৃতজ্ঞতাজনিত যন্ত্রণার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত সাজাহানের এই অভিযোগ, এই আবেদন, এই আশীর্বাদ—প্রকৃতপক্ষে তাঁরই বুকফাটা আর্তনাদ বিশেষ। জীবন সম্বন্ধে তাঁর এই নতুন চেতনার মধ্যেই Tragic চরিত্রের Suffering জাত বিশেষ গুণটি বর্তমান।[৪৭]

তথাপি শেষ পর্যন্ত তিনি পিতৃদ্রোহী ও তাঁর অন্যান্য পুত্রের হত্যাকারী ঔরংজেবকে ক্ষমা করেছেন। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে সাজাহানের পিতৃহৃদয়ের বিদীর্ণ আত্মার করুণ রূপই আরও গভীরভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

বন্দী সাজাহান বাহ্যশক্তির দিক থেকে নিস্ক্রিয় থাকলেও মানসিক দিক থেকে তিনি নিস্ক্রিয় নন। কৃতঘ্ন পুত্র ঔরংজেবের নীতি-বিরুদ্ধ অমানবিক কার্যকলাপকে সাজাহান সমর্থন করেননি এবং এ সকল কার্যের প্রতিকারের দ্বারা নৈতিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করার বাসনা তিনি প্রকাশ করেছেন (১।৭, ২।২, ৪।৫, ৫।৩)। বন্দী থাকার ফলে সেই বাসনাকে বাইরের দিক থেকে কর্মের মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। তাই তাঁর কর্মময়তা দৈহিক পর্যায়ের না হয়ে মানসিক পর্য্যায়ের থেকে গেছে। সাজাহান চরিত্রে Doing যেমন আছে Suffering ও তেমন বিদ্যমান। কিন্তু এই Doing অপেক্ষা Suffering তাঁর মধ্যে অধিকভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে। অসহায় বন্দী সাজাহানের শোচনীয় বিপর্যয়ের কারণ্যই তাঁকে ট্রাজিক চরিত্রের মর্য্যাদা দান করেছে।[৪৮]

সাজাহানের এই করুণ পরিণতি আমাদের মনে তাঁর জন্য করুণারও (Pity) উদ্রেক করে। আবার পিতা সাজাহানের এই অধিক স্নেহ আমাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকলে আমাদের এরূপ শোচনীয় পরিণতি লাভ করার সম্ভাবনায় আমাদের মনে ভয়েরও (Fear) সৃষ্টি হয়। সাজাহান চরিত্রে Pity, Fear যেমন আছে, তেমনি কিছু পরিমাণে Doing থাকলেও তার মধ্যে Suffering-এর প্রাধান্যই অধিকভাবে লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে। এদিক থেকে সাজাহান চরিত্রটিকে Pathetic Tragedy—ও বলা যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে খ্রীষ্টপূর্ব যুগের প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার Euripides-এর THE TROJEN WOMEN নামক প্যাথেটিক ট্র্যাজেডির কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

গ. সাজাহান—"পিতা সব, আর নিজে না খেয়ে পুত্রদের খাইও না, বুকের উপর রেখে ঘুম পাড়িও না, তাদের হাসিটি দেখার জন্য স্নেহের হাসিটি হেসো না। তারা সব কৃতঘ্নতার অংকুর। তারা সব শিশু শয়তান।"
—(প্রথম অংক, সপ্তম দৃশ্য, সাজাহান।)

ঘ. সাজাহান—"তোকে আশীর্বাদ করি···যেন তোর পুত্র না হয়, শত্রুরও যেন পুত্র না হয়।" —(চতুর্থ অংক, চতুর্থ দৃশ্য, সাজাহান।)

সেই নাটকেও ট্রয়বাসী মহিলাদের Doing অপেক্ষা Suffering-এর প্রাধান্য বর্তমান। প্রসঙ্গত Shakespeare-এর King Lear নামক ট্রাজেডির কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। কিং লিয়ার চরিত্রের মধ্যেও সন্তানদের অকৃতজ্ঞতায় পিতা কিং লিয়ার-এর মধ্যে Doing অপেক্ষা Suffering-এর প্রভাব বেশী দেখা যায়।[৪৯]

নুরজাহান (নুরজাহান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)।

ক্ষমতার লোভই নুরজাহান চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা। এই দুর্বলতার জন্য নুরজাহান চরিত্রের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। ক্ষমতাকে করায়ত্ত করার জন্য নুরজাহান ক্রমশ ক্রিয়াশীল (Doing) হন। এই উদ্দেশ্যে জীবনের নৈতিক মূল্যবোধকে বিনষ্ট করে নুরজাহান তাঁর সম্রাজ্ঞীসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নৈতিকতার এই বিনষ্টিই Tragic চরিত্রের লজ্জাজনক ও ভয়ংকর (Shameful and horrible) কার্য্য বিশেষ।[৫০] এই নীতি বিরুদ্ধ কার্য্যের ফলে বধূসত্তা ও মাতৃসত্তার সঙ্গে সম্রাজ্ঞীসত্তার দ্বন্দ্বে নুরজাহান মানসিক দিক দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়েন। ক্ষমতার একাধিপত্য লাভের আশায় বধূসত্তা (শেরশাহের বধূ), ও মাতৃসত্তাকে (লায়লার মা), বিসর্জন দিয়ে সম্রাজ্ঞীসত্তার (জাহাঙ্গীরের স্ত্রী) অধিকারী হয়েও নুরজাহান রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির অভাবে তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ধরে রাখতে পারেননি। নুরজাহানের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা যত প্রবল ছিল, রাজনৈতিক বুদ্ধি তত প্রবল ছিল না। ক্ষমতা দখলের চূড়ান্ত লড়াই-এ শেষ পর্যন্ত তাঁকে ক্ষমতাহীন হয়ে সেনাপতি মহাবৎ খাঁ ও জাহাঙ্গীরের পুত্র সাজাহানের সমবেত প্রচেষ্টার কাছে নতি স্বীকার করতে হয়। এইখানেই তাঁর বিশেষ পরাজয় (৫।৭,৮)। ক্ষমতা লাভের জন্য নারীসত্তার অমূল্য সম্পদগুলিকে বিনষ্ট করে দিয়েও ক্ষমতাকে ধরে রাখতে না পারায় মানসিক দিক দিয়ে নুরজাহান বিপর্যস্ত হন ও পরিশেষে উন্মাদ হয়ে যান। এটাই তাঁর জীবনের গভীরতম শোচনীয় পরিণতি ও ট্রাজেডী। বধূসত্তা ও মাতৃসত্তার বিনষ্টি ছাড়াও সম্রাজ্ঞী নুরজাহান তাঁর সঙ্গে সম্রাট পরিবারের পারস্পরিক পারিবারিক সম্পর্কেও কলুষিত করেন। জাহাঙ্গীরের স্ত্রী রেবা নুরজাহানকে বিশ্বাস করতেন। তাঁকে ভালবাসতেন। খসরুও নুরজাহানকে মায়ের মতই সম্মান করতেন। সম্রাট পরিবারে নিজের একক কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার নিরঙ্কুশ ভোগ-দখলের উদ্দেশ্যে নুরজাহান খসরুকে কৌশলে হত্যা করেন। অকৃতজ্ঞ নুরজাহান এইভাবে সম্রাট পরিবারের মধ্যে তাঁর পারিবারিক সত্তাকেও বিনষ্ট করেন। মহাবৎকে অন্যায়ভাবে পদচ্যুত করে সেনাপতি মহাবৎ খাঁর প্রতি তিনি অমানবিক আচরণ করেন। প্রেমের কুহকে জাহাঙ্গীরকে আচ্ছন্ন রেখে রাজ্যের পরিচালনার সকল ক্ষমতা তিনি কুক্ষিগত করেন। এইভাবে তিনি জাহাঙ্গীরের সম্রাটসত্তাকে ক্ষুন্ন করেন। এইভাবে জীবনব্যাপী অন্যায় ও অমানবিক কাজের ফলে পরিশেষে তিনি মানসিক দিক

দিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। তিনি উন্মাদ হয়ে যান। এভাবেই তিনি তাঁর কাজের সমুচিত শাস্তি লাভ করেন।[৫১] Tragic চরিত্রের Doing, Suffering— এবং তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের আবশ্যকীয় উপাদান দিয়েই নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নূরজাহান চরিত্রটিকে Tragic চরিত্র রূপে গঠন করেছেন।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে ট্রাজিক নারীচরিত্রে পুরুষোচিত দীপ্ত ভাব থাকলে তাকে She Tragedy বলা হয়। ক্ষমতা করায়ত্ত করা ও তাকে ধরে রাখার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নূরজাহান চরিত্রে এই বিশেষ দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। এদিক থেকে নূরজাহান চরিত্রটিকে She Tragedy বলা চলে। প্রসঙ্গক্রমে Shakespeare-এর 'Macbeth' নাটকের 'Lady Macbeth' চরিত্রটির উল্লেখ করা যেতে পারে। Lady Macbeth ক্ষমতার লোভে তাঁর স্বামী Macbeth-কে অনৈতিক ও অমানবিক কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ করে Macbeth-কে দিয়ে রাজা 'Duncan'-কে হত্যা করান। এভাবে অন্যায় কার্য্যের দ্বারা ক্ষমতা লাভ করতে গিয়ে 'Macbeth' মনের স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলেন। তাঁর আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তাঁর গর্হিত কর্মের কথা ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়ে পড়ে ('Macbeth'—Shakespear—3rd Act, First sceen)। স্বামীর এই দুরবস্থায় 'Lady Macbeth'-ও মানসিক দিক দিয়ে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েন। ক্ষমতা লাভের জন্য অনেক অন্যায় করেও Lady Macbeth তৃপ্ত হতে পারেননি এবং জীবনে অনেক কিছু লাভের বদলে তিনি যেন জীবনের সব কিছুকেই হারিয়ে ফেলেছেন—এই বোধে নৈরাশ্যে ও অনুশোচনায় তিনি পীড়িত হন।[৫২] পরিশেষে তিনি উন্মাদ হয়ে যান। 'Duncan'-এর হত্যার ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার আতঙ্ক তাঁর মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করে। তাই তিনি বারবার হাত ধুয়ে হাতের রক্ত পরিষ্কার করার চেষ্টা করেন।[৫৩]

'Lady Macbeth'-এর এই ভাগ্য বিপর্য্যয়ের সঙ্গে নূরজাহানের ভাগ্য বিপর্য্যয়ের ঘটনার ভাবগত ঐক্য বিদ্যমান। ক্ষমতার লোভে নূরজাহান নিজেই উদ্বুদ্ধ হয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ক্ষমতাকে অধিকার করেও তিনি ক্ষমতাকে ধরে রাখতে পারেননি। ক্ষমতাকে লাভ করার জন্য শের আফগান ও জাহাঙ্গীরের প্রতি তাঁর পূর্বকৃত কর্মের জন্য তাঁর মনেও গভীর অনুশোচনা দেখা দিয়েছে (৫/৮)। সব পেয়েও তাঁকে সব হারাতে হয়েছে। কিছুই লাভ হয়নি। ক্ষমতাকে পেয়েও তাকে ধরে রাখতে না পারায় তিনি এক অতৃপ্ত যাতনায় পীড়িত হয়েছেন। এই মানসিক অবস্থাকে প্রকাশ করার জন্য তিনি একবার হাত মুঠো করছেন আবার পরক্ষণেই হাত খুলছেন। এইভাবে নূরজাহানকে মঞ্চে উপস্থিত করা হয়েছে (৫/৮)। এর মাধ্যমে বোঝান হয়েছে যে নূরজাহান যেন কিছুই লাভ করতে পারেন নি।

(খ/৬) ঐতিহাসিক নাটকের কয়েকটি বিশেষ চরিত্র।

করিমচাচা (সিরাজদ্দৌলা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)।

করিমচাচা চরিত্রের উপস্থাপনার দ্বারা নাট্যকার তাঁর চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে নতুনত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই নতুনত্ব হোল মূল নাট্য ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন চরিত্রকে নাটকে গুরুত্ব দান করে চরিত্রটিকে আকর্ষণীয় করে তোলা। এ নাটকেও মূল নাট্য ঘটনার বিন্যাসে ও প্রধান চরিত্রের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে করিমচাচা চরিত্রটির কোনরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই। এই চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার নাট্যঘটনা ও নাট্যচরিত্রের অন্তর্নিহিত স্বরূপ উদঘাটনে প্রয়াসী হয়েছেন। ইতিহাসের স্বীকৃতি না পেলেও গিরিশচন্দ্রের মানস চরিত্র হিসাবে করিমচাচার স্পষ্টবাদিতা, নির্ভীকতা, সরলতা এবং লোকচরিত্র বিশ্লেষণে তাঁর পারদর্শিতার গুণে চরিত্রটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। নাট্যকারের ব্যক্তিসত্তা এই চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করেছে। জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হিসাবে বাঙালী জাতির চারিত্রিক দুর্বলতাকে তুলে ধরে করিমচাচা জাতিকে তার ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ দিয়েছেন (২।৪)। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হিসাবে জাতির অবিমৃষ্যকারিতার শোচনীয় পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত দান করে করিমচাচা জাতিকে হুঁসিয়ার করে দিয়েছেন (৩।২)। আবার স্বদেশ বৎসল হিসাবে দেশাত্ম-বোধ ও দেশপ্রেমের প্রচারের দ্বারা করিমচাচা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন (৩।২)।

করিমচাচা উপলব্ধি করেছেন যে স্বার্থপর বেনিয়ার দল দেশের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির দিকে অধিক যত্নবান। বেনিয়াদের পুঁজি-বৃদ্ধির প্রচেষ্টা দেশের মধ্যে পুঁজিবাদের সৃষ্টি করছে। এর ফলে দেশে এক বুর্জোয়া মনোভাব গড়ে উঠছে। এ দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ বিপন্ন হয়ে পড়ছে।ক সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শক্তির অর্থলোলুপতা যে স্বদেশী পুঁজিবাদকেও

ক. (১) করিমচাচা—"কোলকাতা থেকে পালিয়ে, পলতায় যখন ইংরাজ নোনাপানি খাচ্ছিল, তখন সম্ভার করে তাদের সামগ্রী বেচে লাভ করেছে। ...রসদ যুগিয়ে একগুণে একশো গুন তো দাম নিয়েছ চাচা। এক টাকায় একটা চাঁপা কলা বেচেছ। দিনকতক ইংরেজ থাকলে যা লুঠ করেছ তার দুনো আদায় করবে ভাবনা কি ?"

—দ্বিতীয় অংক, চতুর্থ দৃশ্য, সিরাজদ্দৌলা।

(২) করিমচাচা—"এলোমেলো করে দেমা, লুটে পুটে খাই।...সব ঠিক ঠাক হয়ে গেল। রাজ্য সুশৃঙ্খলতায় চললো, তাহলে আমার লাভ কি বলুন ? একটা ওলট পালট না হলে আমার সুবিধে কিসে হয় বলুন ? বেওয়ারিস প্রভাব দাবিয়ে মজা করি কিসে বলুন ?"

—দ্বিতীয় অংক, চতুর্থ দৃশ্য, সিরাজদ্দৌলা।

খতম করে দেবে সেটাও করিমচাচা বুঝেছেন।খ সর্বোপরি এই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজশক্তি যে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিকে করায়ত্ত করার মাধ্যমে সামন্ততন্ত্রের বদলে সাম্রাজ্যবাদের প্রসার চাইছে—সেটাও করিমচাচা হৃদয়ঙ্গম করেছেন।গ ইংরেজদের এই দুরভিসন্ধিকে সমূলে বিনষ্ট করার প্রয়োজনীয়তার উপর করিমচাচা গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এই উদ্দেশ্যে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার যুদ্ধ ঘোষণাকে তিনি সমর্থন করেছেন। নবাবের সামরিক শক্তির সঙ্গে মিলিত হয়েই ইংরেজদের বিরোধিতা করা যে দরকার—রাজনীতির এই দায়বদ্ধতাকে করিমচাচা অনুভব করেছেন।ঘ তাই তিনি ঐক্যবদ্ধভাবে সশস্ত্র যুদ্ধের দ্বারা ইংরেজদের বিরোধিতা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রতিকারের তীব্র বাসনাও করিমচাচার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও সামর্থ্য তাঁর ছিল না। তাই দেশের বেনিয়ার দল ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে করিমচাচা তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন। এর মধ্য দিয়েই তাঁর মনোগত অভিপ্রায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে তাঁর বাক্‌বৈদগ্ধ, ব্যাজস্তুতি ও বক্রোক্তিই তাঁর প্রধান সম্পদ।

খ. করিমচাচা—"চাচা…কথাটা শুনে নাও—যে যার স্বার্থে তো টেঁকে আছ, আখেরে কতটা টেঁকবে তা একবার ভাবছ কি?…শেঠ চাচা, নবাবই যেন টাকা চায়, গোরার বাচ্চা টাকার মুখ দেখে না কেমন? বাবা সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে টাকা কুড়ুতে এসেছে, নবাবকেই দাবড়ি লাগাচ্ছে, এ সব কথা একবার ভেবো।"

—তৃতীয় অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, সিরাজদ্দৌলা।

গ. (১) করিমচাচা—"বিদেশী বঁধুরে প্রাণ সঁপো না। চাচা ভাবছো গর্দানা দেবে ইংরেজ, আর নবাবি করবে তোমরা! সাদা চেহারা চেন না, শেষে পস্‌তাবে, ওরা খুব দাঁওবাজ, ওদের কাছে কারও দাঁও চলবে না…ইংরেজ তোফা কোল্‌কাতা গেদ্দো করে নিলে। বলতে বলে ব্যবসায়ী কুঠি, কিন্তু ওদের কুঠির মত কটা নবাবী কেল্লা আছে বল…চাচা চোখ চেয়ে কাজ করো।" —তৃতীয় অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য, সিরাজদ্দৌলা।

(২) করিমচাচা—"ফোর্ট উইলিয়াম। এখানে অনেক ব্যাটাকে সেলাম দিতে হবে। এখানে অনেক মুকুট গড়াগড়ি যাবে।…কিছু ভেবোনা তোমার এ শ্রী থাকবে না। তোমার পুষ্যিপুত্রেরা জাহাজে করে এলো বলে।"

—প্রথম অংক, দশম দৃশ্য। সিরাজদ্দৌলা।

ঘ. করিমচাচা—"সোজা পথে চলো। নবাবের খয়ের খা হও…সৈন্যসামন্ত যোগাড় করে কোমর বেঁধে লেগে যাও…সকলে মিলে ওদের আগে উচ্ছেদ করো।" —তৃতীয় অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য। সিরাজদ্দৌলা।

আলিবর্দী-বেগম (সিরাজদ্দৌলা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)।

সিরাজদ্দৌলা নাটকে আলিবর্দী-বেগম চরিত্রটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। পুত্র সিরাজদ্দৌলার নিরাপদে রাজ্যসুখ ভোগই তাঁর কাম্য। দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তে ও ইংরেজ শক্তির আক্রমণে সিরাজদ্দৌলার বিপন্নতায় তিনি উদ্বিগ্ন হন। তদুপরি ক্রোধান্ধ পুত্রের হিতাহিতজ্ঞানের অভাব এবং অবিমৃষ্য-কারিতা তাঁকে আরও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে। পুত্রের মঙ্গলের জন্য তিনি পুত্রকে তাঁর বিরোধী অমাত্যগণের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে রাজ্য পরিচালনা করতে পরামর্শ দেন। সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধাচারী রাজ-অমাত্য ও সৈন্যাধ্যক্ষগণের নিকট সিরাজদ্দৌলার রূঢ় ব্যবহারের জন্য তিনি নিজে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং সিরাজদ্দৌলার নিরাপত্তার অভাব দূর করার চেষ্টা করেন (১।১২)। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে সিরাজদ্দৌলার পক্ষ ত্যাগ করতে উদ্যোগী মীরজাফরকে তিনি সিরাজদ্দৌলার পক্ষে আনার জন্য চেষ্টা করেন (৩।৫)। এইভাবে নাটকে আলিবর্দী বেগম চরিত্রটি মমতাময়ী এবং বাৎসল্যপরায়ণা মা রূপে ক্রিয়াশীল হয়েছে। মাতৃত্বের কোমলতা দিয়ে তিনি সিরাজদ্দৌলাকে আবৃত করে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাজনীতির লড়াই-এ এই কোমলতা অর্থহীন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে টিঁকে থাকার জন্য দরকার সুষ্ঠু রাজনৈতিক জ্ঞান। লোক-চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়াও প্রয়োজন। এই জ্ঞান তাঁর ছিল না। এর ফলে তাঁর অধিক স্নেহে সিরাজদ্দৌলার রাজনৈতিক জীবনের সার্বিক বিকাশ ব্যাহত হয়েছে। বহিশত্রু ও অন্তশত্রুর মোকাবিলার জন্য সিরাজদ্দৌলাকে বীরধর্মে ও সুষ্ঠু রাজনৈতিক ধর্মে উদ্দীপ্ত না করে আলিবর্দী-বেগম তাঁকে ঈশ্বরানুরাগী এবং ভাগ্য-নির্ভরশীল ব্যক্তিস্বরূপে গড়ে তুলেছিলেন (১।২)। পুত্রের আচরণের জন্য অধীনস্থ রাজকর্মচারীদের নিকট নিজে ক্ষমাভিক্ষা করেছেন। এইভাবে আলিবর্দী-বেগম নিজের অজ্ঞাতসারে সিরাজদ্দৌলাকে তাঁর দেশীয় ষড়যন্ত্রকারী ও ইংরেজদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত করতে সাহায্য করেছেন।

তারা (মীরকাসিম—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)।

এই চরিত্রটির সঙ্গে নাটকের মূল কাহিনীর কোন যোগ নেই। নাটকের মোট পঁয়তাল্লিশটি দৃশ্যের মধ্যে এগারোটি দৃশ্য জুড়ে এই চরিত্রের কর্মধারা বিন্যস্ত। নাট্যকারের মুখপাত্র হিসাবে 'তারা' চরিত্রটি ক্রিয়াশীল হয়েছে। এঁর মাধ্যমে নাট্যকার ইংরেজদের ও তার সহযোগী বেনিয়া মুৎসুদ্দিদের চরিত্র উদ্ঘাটন করেছেন। দেশবাসীর চারিত্রিক দুর্বলতার প্রতি দেশবাসীকে সচেতন করে দিয়েছেন (২।৫)। দেশবাসীকে দেশের মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছেন (১।১, ১।৪)। কিন্তু নাটকের মধ্যে যুক্তি ও কার্যকারণযোগে চরিত্রটি উপস্থাপিত না হওয়ায় চরিত্রটি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

ইরা (রাণা প্রতাপসিংহ—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)।

মূল নাট্যঘটনার সঙ্গে সংযোগহীন 'ইরা' চরিত্রটি নাট্যকারের নিজস্ব সত্তার বিশিষ্ট শৈল্পিক প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে নাটকে চিত্রিত হয়েছে। এই চরিত্রটির সাহায্যে নাট্যকার শাশ্বত আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি আমাদেরকে সচেতন করতে চেয়েছেন। হিংসার বদলে অহিংসা, ঘৃণার বদলে প্রেম এবং লোভের বদলে ত্যাগের প্রতিষ্ঠার দ্বারা এই নরলোককে স্বর্গলোকে পরিণত করে তোলাই তাঁর লক্ষ্য (৩/৭)। ইরার চেতনার স্পর্শে ভ্রাতৃদ্রোহী ও দেশদ্রোহী পিতৃব্য শক্তসিংহের অন্তরে পরিবর্তন দেখা দেয় (২/৪)। পৃথিবীকে শান্তির নিকেতনে পরিণত করার জন্য ইরা রাণা প্রতাপসিংহের কাছে সম্ভাব্য যুদ্ধ বন্ধের জন্য আবেদন করে। কিন্তু মোঘলের বিরুদ্ধে রাজপুতদের যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে শক্তিবানের বিরুদ্ধে দুর্বলের আত্মরক্ষার বলিষ্ঠ প্রয়াস। তাই পরবর্তীকালে ইরা এ যুদ্ধকে স্বাগত জানায় (২/৪)।

আবাল্য প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত নাট্যকারের প্রকৃতি প্রেম ও তাঁর বিশিষ্ট জীবন দর্শনও ইরার চরিত্রে প্রতিফলিত। প্রকৃতির রূপের [illegible] মধ্যে ইরা ত্যাগ ও তিতিক্ষার মহামন্ত্রের সন্ধান পায় (২/৪)। নাট্যকারের বিশিষ্ট জীবনদর্শন তাঁকে পার্থিব জগতের বহু ঊর্ধ্বে আসীন করে রাখে। সেখানে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষই একে অপরের পরিপূরক। এক অনন্ত শক্তির বিশিস্ট প্রকাশ। পার্থিব জগতের মোহান্ধে সাধারণ মানুষ এই চেতনার আলোক থেকে বঞ্চিত। ইরার মাধ্যমে নাট্যকার মানুষের জীবনে সেই চেতনা-লোকের সন্ধান দিয়েছেন (৪/৪)। ইরা তাই শাশ্বত মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত মানব-প্রেম ও ভক্তির প্রদীপ্ত শিখা হিসাবে নাটকে অনন্য হয়ে উঠেছে।

গুলনেওয়ার (দুর্গাদাস—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)।

ভারত সম্রাট ঔরংজেবের মহিষী হিসাবে গুলনেওয়ারের সামাজিক বিন্যাস তাঁর মধ্যে ক্ষমতা ও মর্য্যাদার এক উচ্চমন্যতা (Superior Complex) সৃষ্টি করেছে। যোধপুরমহিষী মহামায়ার উপর গুলনেওয়ার তাঁর একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন। আত্মপ্রতিষ্ঠার এই উৎকট প্রবণতায় গুলনেওয়ারের মধ্যে অহম্ (ego) বলবতী হয়ে ওঠে এবং গুলনেওয়ারের মানবী-বৃত্তি বিনষ্ট হয়। নিজের বাসনার চরিতার্থতার জন্য গুলনেওয়ার আওরঙ্গজেবকে মেবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করেন। সে ক্ষেত্রে দেশপ্রেম ও স্বামীপ্রেম অপেক্ষা তাঁর ব্যক্তিপ্রেম (Self Love) বড় হয়ে উঠেছে। তাই মেবারের সঙ্গে মোঘলের যুদ্ধে মোঘল শক্তির জয়-পরাজয়ের ভাবনা অপেক্ষা এবং ঔরংজেবের মানসম্মানের চিন্তা অপেক্ষা যেমন করেই হোক যোধপুর মহিষীকে বন্দী অবস্থায়

পাওয়ার চিন্তাই তাঁর কাছে অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে।ক মেবারের সঙ্গে যুদ্ধে ঔরংজেবের পরাজয়ের ফলে গুলনেওয়ারের এ বাসনা সার্থক হয়ে ওঠেনি।

ঘটনার পরিক্রমায় গুলনেওয়ারের মধ্যে অতৃপ্ত প্রেমের বাসনাও প্রকাশিত হয়। মনোমত পুরুষকে ভালোবেসে জীবন ও যৌবনকে সার্থক করে তোলার প্রচেষ্টায় গুলনেওয়ার ক্রিয়াশীল হন। দুর্গাদাসের পৌরুষধ্যাঞ্জক দীপ্ত ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের মধ্যে গুলনেওয়ার তাঁর আকাঙ্ক্ষিত হৃদয়েশ্বরের সন্ধান লাভ করেন। বর্ষীয়ান সম্রাট ঔরংজেব তাঁর স্বামী হলেও গুলনেওয়ারের যৌবনোদ্ধত জীবনের স্বাভাবিক বাসনা কামনা তাঁর দ্বারা পূরণ না হওয়ায় গুলনেওয়ার ঔরংজেবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। ইসলামধর্মী ঔরংজেবের সামনে সুরাপানে মত্ত গুলনেওয়ার ইসলাম ধর্মের অনুশাসনের বিরোধিতার দ্বারা প্রকারান্তরে স্বামী ঔরংজেবের প্রতি তাঁর বীতস্পৃহ মনোভাবের প্রকাশ ঘটান।খ

দুর্গাদাসের বলিষ্ঠ দীপ্যমান চেহারা, তাঁর শৌর্য্য-বীর্য্য ও প্রাণচঞ্চলতার আকর্ষণে গুলনেওয়ার তাই দিশেহারা হন (৪।৭)। চরিত্রের এই মানসিকতার মধ্যে তাঁর যৌবনোচিত উদগ্র প্রবৃত্তি, লালসার উদ্দামতা প্রকট হয় (৪।৭)। ঔরংজেবের হাতে বন্দী দুর্গাদাস গুলনেওয়ারের প্রেম প্রত্যাখ্যান করলে প্রেমবাসনার অচরিতার্থতায় গুলনেওয়ার প্রতিহিংসাময়ী হয়ে ওঠেন এবং দুর্গাদাসকে হত্যা করতে উদ্যত হন। মোঘল সেনাপতি দিলীর খাঁর প্রচেষ্টায় গুলনেওয়ারের এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয় (৪।৮)। প্রথমে ক্ষমতার জন্য উদ্ধত গুলনেওয়ারের যোধপুর মহিষীর উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের ব্যর্থতা এবং পরে দুর্গাদাসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা তাঁর প্রেম বাসনার ব্যর্থতার—ফলে গুলনেওয়ারের মনোবল ভেঙে পড়ে। সর্বোপরি তাঁর চারিত্রিক হীনতা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা স্বামী ঔরংজেব ও ইসলামী সমাজ কর্তৃক ধিক্কৃত হওয়ায় তাঁর স্ত্রীসত্তা ও সামাজিক সত্তা বিধ্বস্ত হয়। ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ক্ষমতালিপ্সু গুলনেওয়ার বাইরের ও অন্তরের দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়েন (৫।৬)। অহংকে চরিতার্থ করতে গিয়ে গুলনেওয়ার তাঁর নারী জীবনের মূল্যকে বিনষ্ট করে ফেলেন। এর ফলে পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতাও তিনি হারিয়ে

ক. গুলনেওয়ার—"আমি মেবার জয় চাহিনা। আমি যশোবন্তের রানীকে চাই। আর কিছু নয়।" —দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য। দুর্গাদাস।

খ. গুলনেওয়ার—"ধর্ম? ধর্ম আচরণের জন্য আমি তৈরী হইনি। আমার দিকে চাও দেখি সম্রাট? এই সুগোল কোমল বাহুযুগল দেখ। এই সুদীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ কেশদাম দেখ…এ রূপ কি মসজিদে গিয়ে মাথা খুঁড়বার জন্য তৈরী হয়েছিল? তুমি বড় ধার্মিক জাঁহাপনা। তবে…এক মোল্লানীকে বিবাহ করনি কেন?" —চতুর্থ অংক, সপ্তম দৃশ্য। দুর্গাদাস।

ফেলেন (৫।৬)। এ অবস্থায় গুলনেওয়ার তাঁর অহংকে চরিতার্থ করতে না পারার ব্যর্থতায় আত্মহত্যার পথে এগিয়ে যান (৫।৬)। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে গুলনেওয়ারের এ রকম আত্মহত্যাকে অহংমুখী আত্মহত্যা (Egoistic suicide) বলা যেতে পারে।[৫৪]

জাহাঙ্গীর (নূরজাহান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)।

নূরজাহান নাটকের জাহাঙ্গীর চরিত্রটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। মূলত চরিত্রের সম্রাট সত্তা ও প্রেমিক সত্তার দ্বন্দ্বে চরিত্রটি সমৃদ্ধ ও গতিশীল। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সম্রাট জাহাঙ্গীর, পিতা জাহাঙ্গীর এবং স্বামী জাহাঙ্গীর অপেক্ষা প্রেমিক জাহাঙ্গীর বড় হয়ে উঠেছে।

নাটকের প্রথমেই যে জাহাঙ্গীরের চিত্র পরিস্ফুট সে জাহাঙ্গীরের হৃদয় গভীর ভালবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ। সে জাহাঙ্গীরের অন্তর অতৃপ্ত প্রেমের ভারে ভারাক্রান্ত। পিতা আকবরের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা জাহাঙ্গীর-রেবার দাম্পত্য জীবন হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ক্ষেত্রটিকে উর্বর করে তুললেও উভয়ের হৃদয়ের মিলনের ক্ষেত্রটিকে উর্বর করে তুলতে পারেনি। রাজনীতির যূপকাষ্ঠে রেবার নারীত্ব বলিপ্রদত্ত হওয়ায় রেবার মধ্যে শোষিতের বেদনাবোধ প্রবল হয়। এর ফলে রেবা জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাঁর বিবাহের বন্ধন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হন। তাই রেবার পক্ষে জাহাঙ্গীরের অতৃপ্ত প্রেমের তৃষ্ণা নিবারণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।[ক] প্রেমের বাসনা চরিতার্থ না হওয়ায় জাহাঙ্গীরের প্রেমের আকাঙ্ক্ষা অবদমিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় অপূর্ব সৌন্দর্য্যময়ী মেহেরের প্রেম ও অনুরাগময় ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাহাঙ্গীরের পূর্বস্মৃতি তাঁর অবদমিত প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে ক্রমশ বর্ধিত করে তোলে। মেহেরকে আশ্রয় করে তাঁর প্রেমাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হতে চায়। মেহেরকে পাবার বাসনা তাঁর মধ্যে প্রবল হয়। শের আফগানের স্বামিত্ব মেহেরকে পাবার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এর ফলে শের আফগানের প্রতি জাহাঙ্গীর আক্রমণমুখী হয়ে ওঠেন। জাহাঙ্গীরের অহংবোধ (Ego) তাঁর ন্যায় বোধকে বিনষ্ট করে দেয়। কৌশলে শের আফগানকে তিনি হত্যা করেন। এইভাবে জাহাঙ্গীর তাঁর বাসনা পূরনের দিকে এগিয়ে যান। এখানেই ন্যায়নীতির পুরোধা সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিচারকসত্তা প্রথম লাঞ্ছিত হয়ে পড়ে।[খ] শের আফগানের বিধবা

ক. জাহাঙ্গীর—"রেবা তুমি আমার জন্য যেমন সদা সর্বদা চিন্তিত সেই রকম আগ্রহে যদি আমায় ভালবাসতে পারতে।"

—প্রথম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য। নূরজাহান।

খ. জাহাঙ্গীর—"জানি এ ঘোরতর অন্যায়। ভয়ানক অবিচার। তবু শের খাঁকে মর্তে হবে।…ন্যায় অন্যায় বিচার বহুদূরে সরে গিয়েছে।"

—প্রথম অংক, পঞ্চম দৃশ্য। নূরজাহান।

পত্নীকে কৌশলে বিবাহ বন্ধনে আবন্ধ করতে গিয়ে জাহাঙ্গীর তাঁর শুভবোধের দ্বারা পুনরায় বাধাপ্রাপ্ত হন। তাই এ অন্যায় প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকার জন্য জাহাঙ্গীরের নিকট রেবার সনির্বন্ধ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জাহাঙ্গীরের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব লক্ষনীয় হয়ে ওঠে। জাহাঙ্গীরের এ রকম হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে শের আফগানের কন্যা লায়লা তাঁকে তীব্র ভর্ৎসনা করে। এর প্রত্যুত্তরে ন্যায়াধীশ জাহাঙ্গীর তাঁর কার্য্যের স্বপক্ষে কোনরূপ যুক্তিগ্রাহ্য নৈতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে পারেননি (২।৪)। জাহাঙ্গীরের বিচারবোধ তাঁকে এ হেন কার্য্য থেকে বিরত করার চেষ্টা করলেও জাহাঙ্গীরের অহংবোধের প্রাবল্যে তাঁর বিচারবোধ চাপা পড়ে যায়। শের আফগানের মেহের সম্রাজ্ঞী নুরজাহানরূপে জাহাঙ্গীরের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরফলে প্রবৃত্তির চাপে জাহাঙ্গীর তাঁর স্ত্রী রেবার প্রতি বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ হতে পারেননি। জাহাঙ্গীরের এই নৈতিক দুর্বলতা রেবার স্ত্রী সত্তাকে আহত করে। প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য জাহাঙ্গীর তাঁর স্বামীসত্তাকে এইভাবে পদদলিত করেন

নুরজাহানের প্রতি জাহাঙ্গীরের অন্ধপ্রেমের তাড়নায় পিতা জাহাঙ্গীর তৃণখণ্ডের মত ভেসে যায়। প্রেম সত্তার আধিক্যে জাহাঙ্গীরের বিচারক সত্তা অবদমিত হয়ে পড়ায় জাহাঙ্গীর খসরুর হত্যার প্রকৃত অপরাধীকে দণ্ড দিতে পারেননি। নুরজাহানের কথামত নিরপরাধ সাজাহানকে ভ্রাতৃহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করে জাহাঙ্গীর পিতা-পুত্রের সহজ সরল ও সুন্দর সম্পর্ককে নষ্ট করেন (৩।৪, ৩।৮)। নুরজাহানের প্রতি প্রেমিক সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রেমের বন্যা জাহাঙ্গীরের বাৎসল্য-ভাবের ক্ষেত্রভূমিকে ভাসিয়ে দিয়েছে। এই প্রেম প্রবৃত্তির বশে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজনৈতিক সত্তাও বিধ্বস্ত হয়। সেনাপতি মহাবৎ খাঁর পদমর্য্যাদাকে তিনি অকারণে লাঞ্ছিত করেন। এর ফলে রাজ্যের সামরিক শক্তির ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। মহাবৎ খাঁর পদমর্য্যাদা-হানির চক্রান্তের পিছনে নুরজানের দুরভিসন্ধি ছিল। জাহাঙ্গীর সেটা জানতেন। তবুও নুরজাহানের প্রতি তাঁর অন্ধ-প্রেমের দুর্বলতার জন্যে সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দৃঢ়তা নিয়ে নুরজাহানের এ রকম দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেননি। সাম্রাজ্য পরিচালনার সমুদয় শক্তি সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের হাতে তুলে দিয়ে জাহাঙ্গীর তাঁর রাজনৈতিক সত্তা তথা তাঁর সম্রাটসত্তার অবমাননা করেছেন (৪/২)। তাঁর অধিনস্থ সেনাপতি মহাবৎ খাঁ তাঁর অনুগত ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে মহাবৎ খাঁ সম্রাট জাহাঙ্গীরের আনুগত্য ত্যাগ করেন। মহাবৎ খাঁ বিদ্রোহী হন। বিদ্রোহী মহাবৎ-এর হাতে জাহাঙ্গীর পরাজিত হন। জাহাঙ্গীরকে নজরবন্দী অবস্থায় রাখা হয়। এ সময় তিনি মহাবৎ খাঁ-এর কাছে নুরজাহানের জন্য প্রাণভিক্ষার আবেদন করেন। এই ঘটনায় জাহাঙ্গীরের সম্রাটসত্তা সমাধিস্থ হয় ৪/৫, ৭/৮)।

নুরজাহানের প্রতি জাহাঙ্গীরের অন্ধ-প্রেম তাঁর স্বামীসত্তা, পিতৃসত্তা ও সম্রাট-সত্তাকে লাঞ্ছিত করে তাঁকে ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের ঘোরান্ধকারে নিক্ষেপ করেছে।

এ বিষয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজনৈতিক সচেতনতা প্রেমিক জাহাঙ্গীরের প্রেমের গতিধারাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। আগুনের দীপ্তির আকর্ষণে ধাবিত পতঙ্গ যেমন আগুনের প্রদাহ শক্তির মধ্যে পতিত হয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়, নূরজাহানের রূপবহ্নির আকর্ষণে সম্মোহিত প্রেমিক জাহাঙ্গীরও সেভাবে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছেন। পূর্বের অহংবোধের (ego) তাড়নায় জাহাঙ্গীর নিজের হীন প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার সময় তাঁর অধিসত্তাকে (Super Ego) অবদমিত করে রাখেন। পরে সেই অধিসত্তা তাঁর মধ্যে আর জাগ্রত হয়ে ওঠেনি। এর ফলে জাহাঙ্গীরের স্বামীসত্তা, পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তা—এই ত্রয়ী সত্তার পরাজয় ঘটা সত্ত্বেও জাহাঙ্গীর নূরজাহানের মোহ থেকে আর মুক্ত হতে পারেননি।[গ] জীবনের তিনটি সত্তার বিনিময়েও নূরজাহানকে সম্পূর্ণভাবে প্রেমের মধ্যে পাবার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ না হওয়ায় জাহাঙ্গীর মনেপ্রাণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়েন। সম্রাটসত্তা, স্বামীসত্তা ও পিতৃসত্তার বিসর্জনে জাহাঙ্গীরের আত্মিক মৃত্যু ঘটে আর মোহময়ী নূরজাহানের সৌন্দর্যসুরা পান করতে করতে পথহারা, ব্যক্তিত্বহারা, সম্রাট জাহাঙ্গীর নূরজাহানের সহযোগীরূপে জীবনের সমাপ্তি ঘটান।

কল্যানী, সত্যবতী এবং মানসী (মেবার পতন—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

মেবার পতনের এই ত্রয়ী চরিত্রের উপস্থাপনার দ্বারা নাট্যকার তাঁর জীবন ও জগত সম্পর্কে নিজস্ব ভাবধারার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। সেইদিক থেকে নাট্যকারের তিনটি পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য সিদ্ধির মুখপাত্র হিসাবে এই তিনটি চরিত্র তাঁর কণ্ঠস্বরকে নাটকের মধ্যে তুলে ধরেছে। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী যথাক্রমে আদর্শায়িত দাম্পত্যপ্রেম, দেশপ্রেম ও বিশ্বমানব প্রেমের দৃষ্টান্তস্বরূপে নাটকে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু নাটকের মূল কাহিনীর সঙ্গে সংযোগ রেখে কার্য্য-কারণযোগে তিনটি চরিত্র সৃষ্টি হয়নি। নাটকের মধ্যে নাট্যকারের আদর্শ প্রচারের দৃষ্টিভঙ্গী প্রবল হয়ে ওঠায় নাট্যচরিত্র সৃষ্টির শিল্প সৌন্দর্য্য ব্যাহত হয়েছে। কার্য্যকারণের যোগাযোগ না রেখে এ সকল চরিত্রের বিস্তৃত উপস্থাপনা নাটককে ভারবাহী করে তুলেছে। নাট্যমধ্যস্থ চরিত্রের ঐকতানও এর ফলে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। নাট্যরচনা শিল্পের মাধ্যমে নাট্যকার তাঁর আদর্শকে প্রচার করতে পারেন কিন্তু সেক্ষেত্রে নাটকের ঘটনাবিন্যাস, চরিত্র সৃষ্টি, সংলাপ গ্রন্থনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নাটকের শৈল্পিক মর্য্যাদা আগে রক্ষা করা প্রয়োজন।[৫৫] এর অভাবের জন্যই এই তিনটি চরিত্র নাটকের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।

গ. জাহাঙ্গীর—"তোমার কি মোহমন্ত্রে আমায় মুগ্ধ করে রেখেছ হে যাদুকরী! তোমার কি বিষাক্ত নিঃশ্বাসে আমায় অভিভূত করে রেখেছ—হে কাল ভুজঙ্গী! আমি তোমায় মগ্ন হয়ে আছি। উঠতে পাচ্ছি না। পথ হারিয়ে গিয়েছে—বেরোবার সাধ্য নাই।"

—চতুর্থ অংক, চতুর্থ দৃশ্য, নূরজাহান।

উপরের তিনটি চরিত্র কিভাবে নাটকের মধ্যে নাট্যকারের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে তার আলোচনা করা যাক।

সামাজিক আচার বিচার ও ধর্মের সংস্কার প্রথমাবস্থায় কল্যাণীর মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি করে। এর ফলে ইসলামধর্মী মহাবৎ খাঁর প্রতি তাঁর পতিপ্রেমের ধারা বাইরে প্রকাশ লাভ করতে পারেনি। মানসীর সান্নিধ্যে এসে জীবনে প্রেমের প্রকৃতি সম্পর্কে সরল সত্যের সন্ধান লাভ করায় তাঁর পূর্বের সংস্কারের অচলায়তন ভেঙ্গে যায়। এর প্রভাবে বিধর্মী মহাবৎ খাঁর প্রতি তাঁর গোপন প্রেম্ প্রকাশ্য দিবালোকের মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মহাবৎ খাঁ হিন্দু না মুসলমান, মহাবৎ খাঁ স্বধর্মী না বিধর্মী, মহাবৎ খাঁ দেশের শত্রু না মিত্র—এসব প্রশ্ন কল্যাণীর কাছে গুরুত্ব লাভ করেনি। মহাবৎ খাঁ তাঁর স্বামী, তাঁর প্রাণপুরুষ—তাঁর ইহকাল ও পরকাল। মহাবৎ খাঁর এই পরিচয়ই কলাণীর কাছে প্রথম ও শেষ পরিচয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই বিধর্মী ও দেশের শত্রু মহাবৎ খাঁকে পিতা গোবিন্দসিংহের নির্দেশে ত্যাগ করতে কল্যাণী সম্মত হননি। মহাবৎ খাঁকে কেন্দ্র করে পিতার সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব গড়ে ওঠে। এই দ্বন্দ্বে কল্যাণীর কন্যা সত্তার চেয়ে স্ত্রী সত্তাই বড় হয়ে উঠেছে। দেশধর্ম অপেক্ষা পাতীব্রত্যের ধর্মই তাঁর কাছে বরেণ্য হয়েছে। 'পতিচরণ-শরণের-আনন্দে' পিতাকে ত্যাগ করার বেদনা তাঁর কাছে শ্রেয় হয়ে উঠেছে।ক এই পতিপ্রেম তাঁর দৃষ্টিশক্তিকে স্বচ্ছ ও উদার করেছে। এই প্রেম তাঁকে কর্তব্যের পথ দেখিয়েছে। প্রেমের আহ্বানে কর্তব্যের কঠোরতায় কল্যাণী নিরীহ জনগণের উপর অত্যাচারী মহাবৎ খাঁকে তার অহংমুখী কার্যকলাপের জন্য তীব্র ভর্ৎসনা করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। নাটকের শেষে পূর্বকৃত কর্মের জন্য মহাবৎ খাঁ অনুতপ্ত হন এবং মনুষ্যত্ববোধে উদ্দীপ্ত হন। মানসিক দিক দিয়ে মহাবৎ খাঁর এই পরিবর্তন কল্যাণীর প্রকৃত প্রেমেরই ফলশ্রুতি।

সত্যবতী দেশপ্রেমের পবিত্র গর্ভাধার। দেশের মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের পথ প্রদর্শিকা। মেবারের স্বাধীনতা সংগ্রামের বেদীমূলে রক্তাঞ্জলীর দীপ্ত শপথকে কার্যকরী করে তোলাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য (১/৩)। জাতির সকল প্রকার জড়ত্ব, ক্লীবত্ব ও মানসিক দুর্বলতার মূলে সত্যবতী কুঠারাঘাত করেন। এইভাবে জাতিকে সবল ও সচল করে তোলার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে সত্যবতী তাঁর লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে যান। তাঁর দেশপ্রেমের জ্বালাময়ী ভাষণে, বীরত্বপূর্ণ কর্মের ব্যঞ্জনার মধ্যে রাণা অমরসিংহ এবং অন্যান্য রাজপুতগণ মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বীরের মৃত্যুশয্যাকেই বরণ করে নেন। এই গভীর দেশপ্রেমের জন্যই সত্যবতী তাঁর পিতা দেশদ্রোহী সগর সিংহকে ক্ষমা করেন নি। কন্যাসত্তার চেয়ে তাঁর দেশপ্রেম

ক. কল্যাণী—"আমি পিতা বুঝি না, জাতি বুঝি না, ধর্ম বুঝি না। আমার ধর্ম পতি। এর চেয়ে মহৎ ধর্ম শাস্ত্রকারেরা আমার জন্য লেখেন নি।"
(—প্রথম অংক, ষষ্ঠ দৃশ্য, মেবার পতন)।

সত্তাই এখানে বড় হয়েছে (২/৭)। মোঘলের সঙ্গে যুদ্ধে মেবারের পরাজয় সত্যবতীকে বেদনার্ত করে তোলে। সে বেদনা তাঁর কর্তব্যবোধের অবসান ঘটাতে পারেনি। অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে চারনী সত্যবতী জাতির অতীত গৌরব স্মৃতির রোমন্থনের দ্বারা জাতির ভগ্নবুকে আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে যান। পরাধীন দেশমাতার দৈন্যদশার প্রতি জাতিকে সচেতন করে তুলে মায়ের কলঙ্ক মোচনের জন্য জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেন। জাতির পুনরুত্থানের জন্য জাতিকে দেশপ্রেমের মন্ত্রে সঞ্জীবিত করেন (৫/৬)।

মানসী মানবতার পূজারিণী। আপামর সকল মানুষকে ভালোবাসা ও সেবার মধ্য দিয়ে মানসী মানবতার বাণীকে ছড়িয়ে দিতে চান। অজয়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত প্রেম তাঁকে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। তাঁর প্রেমের উদার বিশাল ক্ষেত্রটি বিশ্বমানবের সেবায় উৎসর্গীকৃত (১।১)। মোঘল-রাজপুতের রণক্ষেত্রটি মানসীর এই ব্রত উদযাপনের যজ্ঞাধারে পরিণত হয়। শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ জ্ঞানশূন্যা হযে নির্বিচারে সকল আহত সৈন্যের সেবার মধ্য দিয়ে মানসীর মাতৃত্বময় কল্যাণময়ী করুণাঘন শোভনীয় মূর্তি তাঁকে স্বর্গীয় সুষমায় ভরিয়ে তোলে (১।৭)। দুঃখ প্রপীড়িত মানুষকে দূরে সরিয়ে রেখে বা মনুষ্য সংসার থেকে নিজেকে দূরে রেখে মানব সেবার শিবহীন যজ্ঞে মানসীর অন্তর সাড়া দেয় না। মনুষ্য সংসারের মধ্যে থেকেই দুঃখ-যন্ত্রণার বিষে নীল হয়ে যাওয়া মানুষকে বিষমুক্ত করে তোলার মধ্যেই মানসী তাঁর মানবতাবোধের দীক্ষাকে সার্থক করে তুলতে চান (৪।১)। অজযের মৃত্যু তাঁর হৃদয়-তন্ত্রীতে বিয়োগ বেদনার ঝড় তুললেও সে ঝড়ে মানসীর এই চিরন্তন শাশ্বত বৈশিষ্ট্য বিধ্বস্ত হয়নি। হতে পারেনি। আত্মত্যাগী বিবেক-সন্ন্যাসিনী মানসী তাঁর কর্মপ্রবাহের মোহনায় দাঁড়িয়ে কল্যাণীকে এই মহান ও পবিত্র কর্মের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য এবং কল্যাণীর ব্যক্তিগত প্রেমকে সার্বিক মানবপ্রেম তথা বিশ্বপ্রেমের মহামিলনের সমুদ্রে রূপান্তরিত করার জন্য বলিষ্ঠ ও উদাত্ত আহ্বান জানায় (৫।৭)। এ বিশ্বপ্রেমের ধারায় স্নাত হয়ে সমস্ত জাতি, সমস্ত দেশ, তথা বিশ্বমানব নতুন প্রাণের স্পর্শে নন্দিত হয়ে ওঠে। নাটকের শেষে মানসী এই মনুষ্যত্ববোধ ও বিশ্ববোধের দীপশিখাকেই প্রজ্বলিত করেছেন।

দিলদার (সাজাহান—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)।

দিলদার চরিত্রটির সঙ্গে মূল নাট্যঘটনার কোন যোগ নেই। নাটকের মোট তিরিশটি দৃশ্যের মধ্যে সাতটি দৃশ্য জুড়ে চরিত্রের কার্যাবলী বিস্তৃত। সাধারণ বিদূষকের মতো শুধুমাত্র স্থূলহাস্য রসের অবতারণা করাই দিলদারের উদ্দেশ্য নয়। এদিক দিয়ে চরিত্রটির স্বতন্ত্রতা বিদ্যমান। এশিয়ার বিজ্ঞতম সুধী হিসাবে দিলদারের অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে জীবন-দর্শনে পারদর্শী করেছে। এই অন্তর্দৃষ্টির অভাবেই সাধারণ মানুষ পার্থিব ভোগের বাসনায় তার ইহজীবনকে উৎসর্গ করে

থাকে এবং মনুষ্যত্বের আবাস ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। নানাবিধ অমানবিক কর্মে লিপ্ত হয়ে মনুষ্য জীবনকে পাশবিক বৃত্তিনিচয়ের আধার করে তোলে। মানুষের এই চারিত্রিক অধঃপতনের এবং মনুষ্যত্বের এই অবমাননায় দিলদারের হৃদয় পীড়িত হয়। প্রচ্ছন্ন বেদনায় তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। এই যন্ত্রণা ও বেদনার বহ্নি তাঁকে দগ্ধ করে (১।২)। এই যন্ত্রণার প্রশমনের জন্য দিলদার মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধের পরিচয় কামনা করেন। তাই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত সৎ ও ধার্মিক দারাকে বাঁচানোর জন্য তিনি চেষ্টা করেন (৪।৫)। অন্যান্য ভ্রাতার প্রতি ঔরংজেবের কপটতার আচরণ উন্মোচন করেন (৫।৫)। ভোগ-বিলাস সর্বস্ব মোরাদকে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক পটভূমিকা ও চারিত্রিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে সচেতন করেন (১।২, ২।১)। এ সকল কাজের মধ্য দিয়ে দিলদার মনুষ্যত্বের পূজা করেছেন। এইভাবে দিলদারের চরিত্রটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। দিলদার চরিত্রের সংলাপে বহু স্থলে বাক্‌বৈদগ্ধ্যপূর্ণ (wit) হাস্যরসের পরিচয় পাওয়া যায়। দার্শনিক নিয়ামৎ খাঁ রাজপরিবারে এসে মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চেয়েছিলেন ভাল ও মন্দ এই দুই রকমের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্য দিযে তাঁর সেই উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে উঠেছে। এই অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি সম্রাট পরিবারের বিদূষকের ভূমিকা পরিত্যাগ করে স্বদেশে প্রস্থান কবেন।

মুরা (চন্দ্রগুপ্ত—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)।

শূদ্রানীসত্তা ও মাতৃসত্তার আলোকে 'মুরা' চরিত্রটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। মুরার মাতৃসত্তার আবার দুটি পর্ব বিদ্যমান। মুরা নন্দের ধাত্রীমাতা। আবার সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গর্ভধারিণী মুরা রাজমাতাও বটে। শূদ্রানী হিসাবে ক্ষত্রিয়রাজ নন্দ মুরাকে লাঞ্ছিত কবেন। এতে মুরার মাতৃসত্তা আহত হয়। এর ফলে মুরার মধ্যে প্রতিহিংসার মনোভাব জেগে ওঠে। চন্দ্রগুপ্তের সাহায্যে তিনি তাঁর প্রতিহিংসাকে চরিতার্থ করার উদযোগ গ্রহণ করেন।[ক] মুরার মাতৃসত্তায় এই প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি স্থায়িত্ব লাভ করেনি। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে নন্দের যুদ্ধের মুহূর্তে তাঁর মাতৃসত্তা তাঁর দুই পুত্রের কল্যাণ কামনায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। নন্দের লাঞ্ছনার কথা ভুলে গিয়ে মুরা গুরুদেব চাণক্যের নিকট এই যুদ্ধ বন্ধের জন্য আবেদন করেন (২।২)। মুরার মাতৃসত্তা কোন পুত্রেরই অকল্যাণ চায় না। চাণক্যের অসম্মতিতে তাঁর আবেদন ব্যর্থ হয়। কিন্তু মুরার শূদ্রানীসত্তার মধ্যে প্রতিহিংসার স্পৃহা তীব্রভাবেই থাকে। মাতৃসত্তার কোমলতার পরিবর্তে শূদ্রানীসত্তার কঠোরতা লক্ষ্যণীয় হয়। নন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অসম্মত চন্দ্রগুপ্তকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য তিনি উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ দান করে চন্দ্রগুপ্তকে যুদ্ধে উদবুদ্ধ করেন (২।৫)।

ক. মুরা—"চন্দ্রগুপ্ত যেন তার মাতার অপমানের প্রতিশোধ নেয়।
(১ অংক, ৩য় দৃশ্য, চন্দ্রগুপ্ত)।

যুদ্ধে নন্দের পরাজয়ের পর চন্দ্রগুপ্ত মগধের সম্রাটের পদ লাভ করেন। চন্দ্রগুপ্তের গর্ভধারিণী মুরা রাজমাতৃসত্তার অধিকারিণী হন। রাজমাতার সম্মান লাভ করলেও মুরা আগের অসম্মানের কথা ভুলতে পারেন নি। নন্দের প্রতি তাঁর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য তিনি তাঁর প্রশাসনিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করেন। তাই বন্দী নন্দের হত্যার কার্য্য বন্ধের জন্য রাজাদেশ ঘোষিত হলে মুরা এই রাজাদেশের বিরোধিতা করে নন্দের হত্যার কার্য্য সম্পন্ন করার জন্য তাঁর রাজমাতৃসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করেন (৩।৫)। এ সময় মুরার মাতৃসত্তার চেয়ে শূদ্রানীসত্তার অহম ও ইদম প্রবৃত্তি বড় হয়ে উঠেছে। নন্দের হত্যার কার্য্য সম্পন্ন হলে মুরার শূদ্রানীসত্তার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হয়। কিন্তু এই একই ঘটনা তাঁর মাতৃসত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করে। প্রতিহিংসার উন্মত্ততায় নিজের মাতৃসত্তার বিরোধী কর্মের জন্য মাতা মুরা আত্মগ্লানিতে আপ্লুত হন। এই আত্মগ্লানিই মুরাকে নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী করে তোলে। তাই মাতা মুরা পুত্র চন্দ্রগুপ্তের নিকট তাঁর যোগ্য শাস্তি ভিক্ষা করে নিজের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্য করার বাসনা প্রকাশ করেন (৩।৬)।খ

কাত্যায়ন (চন্দ্রগুপ্ত—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

পিতৃসত্তার লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণ করাই কাত্যায়ণের মূল উদ্দেশ্য।ক নন্দের অত্যাচারে তাঁর শতপুত্রের মৃত্যুতে পিতা কাত্যায়ণ তাই নন্দের পক্ষ ত্যাগ করে চন্দ্রগুপ্তের পক্ষ অবলম্বন করেন। এই একই উদ্দেশ্যে কাত্যায়ণ পণ্ডিত চাণক্যের সাহায্য ভিক্ষা করেন (১।৩)। কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে মানসিক দৃঢ়তা, একনিষ্ঠতা ও আত্মবল থাকার প্রয়োজন ছিল কাত্যায়ণের মধ্যে তার অভাব গভীরভাবে লক্ষিত হয়। অর্থাৎ কাত্যায়ণের চরিত্রে বাসনা (wish) যতটা ছিল ইচ্ছাশক্তি (will) ততটা ছিল না। এইজন্যই কাত্যায়ণ বিভিন্ন ঘটনার প্রভাবে উদ্ভূত পরিবেশ ও ভাবাবেগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছেন। ঘটনা ও আবেগকে নিজের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সুসংহত ও সুসংগঠিতভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন নি। সে জন্য যুদ্ধে পরাজিত মহারাজ নন্দ তাঁর কাছে প্রাণভিক্ষার আবেদন করলে পিতা কাত্যায়ণ তাঁর পুত্রের মৃত্যুর জন্য দায়ী নন্দের প্রতি তাঁর প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে অতি সহজেই নন্দকে ক্ষমা করেন (৩।২)। এক্ষেত্রে কাত্যায়নের পিতৃসত্তা অপেক্ষা ব্রাহ্মণসত্তার ক্ষমাধর্ম বড় হয়ে উঠলেও কাত্যায়নের মধ্যে এই দুই সত্তার অন্তর্দ্বন্দ্বে চরিত্রটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি।

খ. মুরা—"এরা নন্দকে বধ করেছে!—ঐমুখে আমার স্তন্য দিয়েছি…ও! কি করেছি! কি করেছি…আমার অপরাধের শাস্তি দাও বৎস"।

—তৃতীয় অঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্য—চন্দ্রগুপ্ত।

ক. কাত্যায়ন—"প্রতিশোধ নেবার জন্যই আমি বেঁচে রইলাম।

(১ম অংক, ২য় দৃশ্য—চন্দ্রগুপ্ত)।

পরবর্তীকালে চাণক্যের প্ররোচনায় কাত্যায়ন কর্তৃক নন্দকে হত্যা করা (৩।৬), চাণক্যের মন্ত্রীত্বে ঈর্ষান্বিত হয়ে চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে সেলুকসের সঙ্গে কাত্যায়নের গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া (৪।১), চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে যুদ্ধে সেলুকস পরাজিত হলে চাণক্যের ঔদার্যে কাত্যায়নের চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীত্বের পদ গ্রহণ—এসব ঘটনা কাত্যায়নের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত ও কার্যকারণযোগে গড়ে ওঠেনি। এই চরিত্রটি ঘটনার স্রোতে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ভেসে বেড়িয়েছে। চরিত্রের ভিত্তিভূমির দৃঢ়তার অভাবে এটা সম্ভব হয়েছে।

কাত্যায়নের সুযোগ সন্ধানী মনোভাব, ভাবাবেগের অসামঞ্জস্য, মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর অস্থিরতা এবং তাঁর হঠকারী কার্যকলাপের ফলে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়েও চরিত্রটি দুর্বল শ্রেণীভুক্ত হয়েছে।[৫৬]

(গ/১) **সামাজিক নাটকের প্রধান ও গতিসঞ্চারকারী চরিত্র** (Protagonist and Pivotal Characters)।

করুণাময় (বলিদান—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)।

নাটকের প্রধান চরিত্র করুণাময়। শারীরিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক—এই তিনটি মানের সামঞ্জস্যে চরিত্রটি গড়ে উঠেছে। নাট্যঘটনায় গতিদান করায় এ চরিত্রটি নাট্যঘটনার গতি-সঞ্চারকারী চরিত্রও বটে। করুণাময়ের শিষ্টাচার, কর্তব্যপরায়ণতা, সামাজিক বোধ, স্নেহপরায়ণতা তাঁকে বিশিষ্টময় করেছে। বংশগৌরব, সম্ভ্রমবোধ, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি নিয়ে করুণাময় চরিত্রটি মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের প্রতিনিধি।

তিন কন্যাকে সুপাত্রস্থ করে কন্যাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করাই তাঁর লক্ষ্য। উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে পণসর্বস্ব বিবাহমূলক সামাজিক নীতির প্রতিবন্ধকতা তাঁকে আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার ভারে জর্জরিত করেছে। করুণাময়ের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। তাই সমস্যার শুরুতেই তিনি সমস্যা-সম্পর্কে আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। এ ধরনের মানসিকতা চরিত্রের দুর্বল ইচ্ছাশক্তির পরিচয় বহন করে।[ক] আশানুরূপ পণ না দেওয়ায় শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে দুই মেয়ে কিরণময়ী ও হিরণময়ীর লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত জীবনযাপন এবং পরিশেষে উভয়েরই পিতৃগৃহে আশ্রয় গ্রহণের ঘটনায় (১।৫, ২।২, ৪) করুণাময়ের পিতৃসত্তা যন্ত্রণায় ও বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়। এই যন্ত্রণা ও বেদনার কারণ হিসাবে সামাজিক রীতি-নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে এর প্রতিকারের একটি বাসনা (wish) তাঁর মধ্যে গড়ে ওঠে। কিন্তু তাঁর দুর্বল ইচ্ছাশক্তির জন্য এই বাসনা (wish) কাজের মধ্য দিয়ে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠেনি।

ক. করুণাময়—"কিরণ আমাদের শত্রু, কিরণ হতে সর্বনাশ হবে। ও! কন্যাদায়! কন্যাদায়! গৃহস্থ ঘরে কি সর্বনাশ।

প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য, বলিদান।

তাই তিনি সমাজের ধ্বংসের কামনা (১।৪) করেছেন।[খ] কন্যাদের বিয়ে না দিয়ে কুমারী অবস্থায় তাদের পিতৃগৃহে রেখে দেওয়ার অভিপ্রায় জ্ঞাপন (১।৪) করেছেন। এর মধ্য দিয়ে করুণাময়ের এই বাসনাজনিত দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে।

দেনার দায়ে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করুণাময় কর্মচ্যুত হন। এর ফলে তাঁর সামাজিক ও পারিবারিক সত্তা লাঞ্ছিত হয়। চরিত্রের মনোবল আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের চাপে করুণাময় মানসিকভাবে ও ভাবাবেগের দিক থেকে অস্বাভাবিক হয়ে ওঠেন (৪।৪)। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়েও করুণাময়ের মানসিক পরিবর্তনের এই পটভূমিকার সমর্থন পাওয়া যায়।[৫৭] তিনি কন্যাদের তীব্র ভৎর্সনা (৪।৪) করেন, তাদের মৃত্যুকামনা করেন এবং আত্মধিক্কারের মধ্য দিয়ে হীনমন্যতায় ভুগতে থাকেন। করুণাময়ের মানসিক অবস্থা এ সবের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। কন্যা হিরণময়ীর আত্মহত্যার ঘটনায় করুণাময়ের পিতৃসত্তা বিধ্বস্ত হয় (৪।৭, ৫।১)। এভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিকূলতায় করুণাময়ের সামাজিকসত্তা, পারিবারিকসত্তা ও পিতৃসত্তা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হওয়ায় করুণাময় সামাজিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর মানসিক ভারসাম্যকে হারিয়ে ফেলেন (৫।৩, ৫।৪)। সর্বোপরি দুর্বল ইচ্ছাশক্তির ফলে সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণমুখী মনোভাব কার্যকর হতে না পারায় এই আক্রমণমুখী মনোভাব আত্মমুখী হয়ে ওঠে। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও গভীর নৈরাশ্যবোধ তাঁর মধ্যে আত্মহত্যার প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে।[গ] করুণাময় আত্মহত্যা করেন। এভাবেই করুণাময়ের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

প্রসন্নকুমার (শাস্তি কি শান্তি—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)।

নাটকের প্রধান চরিত্র প্রসন্নকুমার। প্রসন্নকুমার তাঁর বিধবা কন্যা প্রমদার পুনরায় বিবাহের ব্যবস্থা করে নাট্যঘটনায় ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেন, নাট্যগতিকে বর্দ্ধিত করেন এবং নাট্যঘটনাকে আকর্ষণীয় করে তোলেন (২।৭)। প্রমদাকে পুনরায় বিবাহ দেওয়া সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের অধঃপতনের কারণে কন্যা প্রমদার দাম্পত্যজীবন লাঞ্ছিত ও বিপর্যস্ত হয়। এই

খ. করুণাময়—"ওঃ! অবলা বালিকার নিঃশ্বাসে বাঙ্গলাদেশ জ্বলে যায় না। দিগ্‌দাহ হয় না।"

(প্রথম অংক চতুর্থ দৃশ্য, বলিদান)।

গ. করুণাময়—"আজ আমি বুঝেছি কেন আত্মহত্যা করে। জনপূর্ণ সংসার অরণ্য দেখে। স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, বাঘ-ভাল্লুক দেখে। চারিদিক অন্ধকার দেখে, সে অন্ধকারে নৈরাশ্য মুখব্যাদান করে আছে।"

(চতুর্থ অংক, চতুর্থ দৃশ্য, বলিদান)।

ঘটনায় পিতা প্রসন্নকুমার ব্যথিত হন। বিধবা কন্যা ভুবনমোহিনীর ব্যাভিচারময় জীবনযাপনের ঘটনাকে প্রসন্নকুমার মেনে নিতে পারেননি। এর ফলে তাঁর পিতৃসত্তা ও সামাজিক সত্তা বিধ্বস্ত হয়। ঘটনাক্রমে সন্তানদের দুরবস্থায় মর্মাহত হয়ে প্রসন্নকুমারের স্ত্রীর মৃত্যু হলে প্রসন্নকুমার পারিবারিক এবং মানসিক দিক দিয়ে নিঃসঙ্গ ও অসহায় হয়ে পড়েন। এ রকম সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিকূল অবস্থার চাপে প্রসন্নকুমারের মানসিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়।[৫৮] এরই ফলে তিনি ভুবনমোহিনীকে হত্যা করে নিজে আত্মঘাতী হন। প্রসন্নকুমারের মানসিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়া, কন্যাকে হত্যা করা এবং তাঁর আত্মঘাতী হওয়ার মধ্য দিয়ে নাট্যঘটনার গতি বৃদ্ধি হয় এবং পরিশেষে নাট্যক্রিয়া পরিণতি লাভ করে। এইজন্য প্রসন্নকুমার চরিত্রটি এ নাটকের নাট্যঘটনায় গতিসঞ্চারকারী চরিত্রও বটে। সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রসন্নকুমার কর্তৃক প্রমদার বিয়ে দেওয়া, কন্যা ভুবন-মোহিনীর ব্যাভিচারিতায় আহত হয়ে তাকে হত্যা করা—ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রসন্নকুমারের মধ্যে পিতৃসত্তা ও সামাজিক সত্তার সংঘর্ষ কিছু পরিমাণে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে।

উপেন্দ্র (গৃহলক্ষ্মী—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)।

এ চরিত্রটি নাটকের প্রধান চরিত্র। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে চরিত্রটি বহির্মুখী (Extrovert)। একান্নভুক্ত যৌথ পরিবারের ধর্মকে সার্বিকভাবে রক্ষা করাই তার উদ্দেশ্য। উপেন্দ্রর সরলতা, মমতা, উদারতা তার অনন্য সম্পদ। ভাই শৈলেন্দ্রের ব্যাভিচার (১।৩, ৫, ৬), পুত্র নীরোদের স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব (৩।৩, ৪, ৪।২, ৪।৪) এবং স্ত্রী তরঙ্গিনীর কুটিলতা যৌথ পরিবারে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করে। এই ভাঙন রোধ করার জন্য উপেন্দ্রের মধ্যে বাসনা (wish) থাকলেও চরিত্রের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির (will) অভাবে তাঁর বাসনা বাস্তবায়িত হতে পারেনি। বস্তুতপক্ষে উপেন্দ্র চরিত্রটি প্রধানত ভাবাবেগসর্বস্ব (emotional) হয়ে উঠেছে। এর ফলে লক্ষ্য পূরণের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংহত কার্যকলাপ এই চরিত্রের মধ্যে গড়ে ওঠেনি এবং সর্বদাই সমস্যায় ভেঙে পড়ার মনোভাব চরিত্রের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে (১।১, ৬, ২।৭, ৩।৫, ৪।২, ৮)। তাই উপেন্দ্র তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে এই পটভূমিকায় এটাই স্বাভাবিক।[৫৯] স্ত্রী ও পুত্রের আচরণে তাঁর স্বামীসত্তা ও পিতৃসত্তার অবমাননায় (৪।৮, ৫।২, ৬) এবং শৈলেন্দ্রের গর্হিত কার্যকলাপে তাঁর ভ্রাতৃসত্তার লাঞ্ছনায় উপেন্দ্র হৃদয় বিদারক যন্ত্রণায় কাতর হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মহিম (পরপারে—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)।

এ চরিত্রটি নাটকের প্রধান চরিত্র। নাট্যঘটনায় গতির সঞ্চার করায় চরিত্রটি নাট্যঘটনার গতিসঞ্চারকারী চরিত্ররূপেও বিকাশ লাভ করেছে। বিয়ের পর মহিম মায়ের প্রতি অন্যায় ও অমানবিক আচরণের দ্বারা তার পুত্রসত্তাকে বিনষ্ট করেন

(১।৫, ২।৪)। হীন প্রবৃত্তির তাড়নায় মদ্যপ ও বেশ্যাসক্ত মহিম স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করেন। এ ঘটনায় তাঁর স্বামীসত্তা ধূলুণ্ঠিত হয় (৪।৩, ৪।৫, ৫।৫)। পরে তার মধ্যে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা জাগে। দ্বন্দ্বের অভাবে চরিত্রটি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। বেশ্যা শান্তার কৃপায় তাঁর চৈতন্য লাভের ঘটনাটি মূল ঘটনার সঙ্গে কার্যকারণযোগে গঠিত না হওয়ায় ঘটনাটির বিন্যাস বিশ্বাসযোগ্য হয়নি (৫।৫)।

(গ/২) সামাজিক নাটকের প্রধান চরিত্রের বিরোধী (Antagonist) **চরিত্র।**

মাতঙ্গিনী, মোহিতমোহন,

দুলালচাঁদ ও রূপচাঁদ মিত্র (বলিদান—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

বলিদান নাটকে এ সকল চরিত্র সম্মিলিতভাবে বিরোধী চরিত্ররূপে (Group of antagonists) চিত্রিত হয়েছে। দুর্নীতিগ্রস্ত সামাজিক শোষণ ব্যবস্থার এক একেকটি দিক এসকল চরিত্রের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে। অর্থপিশাচী মাতঙ্গিনী হৃদয়হীনতা ও নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্তি। কন্যাপক্ষের অর্থনৈতিক অক্ষমতাই তার বধূ নির্যাতনের মূলধন। এরই অত্যাচারে করুণাময়ের বড়মেয়ে কিরণময়ী শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করতে বাধ্য হয় (১।৫)। মাতাল ও অর্থ-লোভী দুশ্চরিত্র মোহিতমোহনের উচ্ছৃংখল জীবনযাত্রার ফলে করুণাময়ীর বিপর্যস্ত দাম্পত্য জীবন করুনাময়কে বেদনার্ত করে তোলে (১।৫, ২।২, ৩।১, ৬)। বস্তুতপক্ষে ইংরেজী শিক্ষিত মাতাল ও অর্থপিশাচ মোহিতমোহনের মত চরিত্ররা পুরুষ শাসিত প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে নারীকে পন্য হিসাবেই ব্যবহার করে থাকে। এর পূর্বে মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের নবকুমারের মধ্য দিয়ে ইংরেজী শিক্ষিত মদ্যপ ও বেশ্যাসক্ত চরিত্রের পরিচয় আমরা পেয়েছি।[৬০] ইংরেজী শিক্ষা এবং মদ্য ও বেশ্যাসক্তর দিক দিয়ে মোহিতমোহনের সঙ্গে এই নবকুমার চরিত্রের সামঞ্জস্য থাকলেও এই দুটি চরিত্রের মধ্যে অসামঞ্জস্যও আছে। মোহিতমোহন অর্থপিশাচ। প্রচলিত বিবাহ ব্যবস্থার দ্বারা অর্থসংগ্রহে তার যথেষ্ট উদ্যোগ লক্ষ্যণীয়। নবকুমারের মধ্যে এ ধরণের প্রবৃত্তির পরিচয় নেই।

দুলালচাঁদের লাম্পট্য ও নারীলিপ্সা করুণাময়কে তার মেয়ের নারীত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছিল। ধনাঢ্য রূপচাঁদের কপটতা এবং তার কায়েমী স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা করুণাময়ের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে বিব্রত করেছে (৫।২)। এ সবের ফলে করুণাময়ের সুষ্ঠু জীবনযাপন ব্যাহত হয়েছে। সমাজের দুর্নীতিগ্রস্থ অনুশাসনকে কেন্দ্র করে এ সকল চরিত্র তাদের অসামাজিক ও অমানবিক কার্য্য-কলাপের দ্বারা করুনাময়ের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে তুলে করুনাময়ের বিরোধী চরিত্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

প্রকাশ, ঘেঁচী, মিঃ বাসু (শাস্তি কি শান্তি—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)।

নাটকে এই সকল চরিত্র সম্মিলিতভাবে নাটকের প্রধান চরিত্র প্রসন্নকুমারের উদ্দেশ্যপূরণের ক্ষেত্রে চরম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। অর্থভোগী ও দেহ-ভোগ সর্বস্ব প্রকাশের কপটবন্ধুত্ব ও প্রেমের ছলনা ভুবনমোহিনীকে দ্বিচারিনী হবার সুযোগ দেয় (১।৪, ২।১, ৫, ৩।২, ৪।১)। এর ফলে ভুবনমোহিনী অসঙ্গত-ভাবে গর্ভবতী হওয়ায় প্রসন্নকুমারের পিতৃসত্তা ও সামাজিকসত্তা অবমানিত হয়। মদ্যপ ও লম্পট ঘেঁচী এবং চরিত্রহীন মিঃ বাসুর অত্যাচারে প্রমদার বিবাহিত জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে (৩।১, ৩, ৬, ৭)। এর ফলে কন্যাকে সুখী করার জন্য সমাজের সনাতন ধারার বিরোধিতা করে প্রসন্নকুমার তাঁর বিধবা কন্যা প্রমদার পুনরায় বিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনে যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা ব্যর্থ হয়ে যায়। এই ব্যর্থতার বেদনায় ও কন্যাদের শোচনীয় জীবন যাপনের ঘটনায় প্রসন্নকুমার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। এইভাবে স্বাভাবিক জীবন যাপন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ার ফলে তিনি আত্মহত্যার মাধ্যমের জীবন যন্ত্রনার অবসান ঘটান।

(গ/৩) সামাজিক নাটকের ট্র্যাজিক চরিত্র।

করুণাময় (বলিদান—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)।

পণসর্বস্ব সামাজিক ব্যবস্থার চাপে করুণাময় তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় কন্যাকে সমাজের কাছে বলি দিয়ে নিজেও বলি প্রদত্ত হন। মধ্যবিত্ত পিতৃসমাজের প্রতিনিধি করুণাময় কন্যাকে বিয়ে দিয়ে তার সুস্থ ও স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু বিত্তধারী সমাজের পণসর্বস্ব বিবাহ ব্যবস্থায় তাঁর সে প্রার্থনা পূরণ হয়নি। যথাসাধ্য ব্যয় করেও করুণাময় কন্যাদের শ্বশুরবাড়ির অর্থের চাহিদা পূরণ করতে পারেননি। এর ফলে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে তাঁর দুই কন্যাই পিতৃগৃহে চলে আসতে বাধ্য হয়। করুণাময় আর্থিক ও মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যাস্ত হয়ে পড়েন। অবশেষে পারিবারিক ও সামাজিক লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য কন্যা প্রমদার আত্মহত্যার ঘটনায় পিতা করুণাময়ের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়। পিতা হয়ে কন্যাকে বাঁচাতে না পারার বেদনায় এবং সমাজের পণসর্বস্ব বিবাহ ব্যবস্থার শোষণে বিক্ষুব্ধ ও হতাশাগ্রস্ত করুণাময় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে মৃত-কন্যার সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ ঘটান।

পণমুখী এই সামাজিক বিবাহ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু কিছু বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলার বাসনা করুণাময়ের ছিল। অসবর্ণ বিবাহ ব্যবস্থার প্রচলন করা (১।১), মেয়েকে বিয়ে না দিয়ে ঘরে রেখে দেওয়া (১।৪)—ইত্যাদি চিন্তাধারার মধ্যে তাঁর এই বাসনা প্রকাশিত হয়। কিন্তু করুণাময়ের মধ্যে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানসিকতা সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকায় এই বাসনাকে করুণাময় বাস্তবায়িত করতে

পারেননি। সামাজিক পণসর্বস্ব বিবাহ ব্যবস্থার সঙ্গে যেমনভাবেই হোক সামঞ্জস্য রচনা করে নিজের সামাজিক মর্য্যাদা রক্ষার দ্বারা কোন রকমে টিকে থাকার মধ্যে এই মধ্যবিত্ত মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। এই মানসিকতার জন্যই তাঁর মধ্যে সামাজিক প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে যাবার মত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অভাব দেখা দেয়। দুর্বল ইচ্ছাশক্তির ফলে সমস্যার ভারে প্রথম থেকেই তিনি ভেঙে পড়েছেন (১।১, ২।২, ৩।৩)।

তাই বিবাহ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে সমাজের অমানবিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কার্য্যকরী ভূমিকা গ্রহণের জন্য করুণাময় কোনরূপ গঠনমূলক বলিষ্ঠ কর্মশীলতার পরিচয় দিতে পারেননি। এর ফলে সামাজিক ব্যবস্থার শোষণে তাঁর যন্ত্রনার সীমা বাড়লেও যন্ত্রনা থেকে মুক্ত হবার জন্য তাঁর কর্মের সীমা সে রকম বাড়েনি। এছাড়া সামাজিক প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংঘর্ষে তাঁর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব অপেক্ষা বহির্দ্বন্দ্বই প্রবল হয়ে উঠেছে। সামাজিক ব্যবস্থার চাপে কন্যাদায়গ্রস্ত করুণাময়ের শোচনীয় পরিণতির মধ্য দিয়ে তাঁর Doing তুপেক্ষা Suffering-এর প্রাধান্যই বিদ্যমান।

কন্যাকে সুখী করতে গিয়ে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা করুণাময়ের আর্থিক ও মানসিক দিক দিয়ে সর্বস্বান্ত ও নিঃস্ব হয়ে পড়া, কন্যাকে বাঁচাতে না পারার ফলে করুণাময়ের পিতৃহৃদয়ের দুঃসহ বেদনা এবং পরিশেষে কন্যার শোকে তাঁর আত্মহত্যার ঘটনায় আমাদের মন তাঁর প্রতি করুণায় ভরে ওঠে। এরূপ সামাজিক ব্যবস্থা বর্তমান থাকলে আমাদেরও করুণাময়ের মত অবস্থাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আমাদেরকে ভীত করে তোলে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মেয়েদেরকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাধীন করে গড়ে তোলার চিন্তা স্ত্রী সরস্বতীর মধ্যে দেখা দেয় ও কন্যা জ্যোতির্ময়ীর মধ্যে সেই চিন্তা ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে (৪/২)। পণসর্বস্ব সামাজিক বিবাহ ব্যবস্থার চাপে বিপর্য্যস্ত পিতার মধ্যে এ ধরণের ক্রিয়াশীলতা সুষ্ঠুরূপ লাভ করলে করুণাময়ের মত কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিদের শোচনীয় অবস্থাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়। Doing অপেক্ষা Suffering এবং কারুণ্যের (Pity) মাত্রা বেশী থাকায় এ চরিত্রটি Pathetic Tragedy হয়ে উঠেছে।

(গ/৪) সামাজিক নাটকের কয়েকটি বিশেষ চরিত্র।

জ্যোতির্ময়ী (বলিদান—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

পণপ্রথার অত্যাচারের হাত থেকে মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েদের মুক্তি পেতে হলে যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দরকার এটা জ্যোতির্ময়ী বুঝতে পারেন। এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আনার জন্য মোজা বোনার মত ক্ষুদ্র শিল্প কর্মের মধ্য দিয়ে

জ্যোতির্ময়ী এটাকে সম্ভব করে তুলতে চেয়েছেন।[ক] সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁর এই সত্যের উদ্ঘাটন এবং এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে তাঁর গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণের ঘটনাটি প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা এই চরিত্রের একটি বিশেষ ব্যবহারিক দিক।[৬১] এই চেতনা সরস্বতীর মধ্যেও কিছুটা দেখা যায়। কিন্তু মধ্যবিত্তের মর্যাদাবোধকে বিসর্জন দিয়ে সরস্বতী তার ভাবনাকে কর্মের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি (৪/৪)।

জোবি (বলিদান—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)।

মূল নাট্যঘটনার সঙ্গে জোবি চরিত্রের কোন সম্পর্ক নেই। তথাপি নাটকের মোট তেত্রিশটি দৃশ্যের মধ্যে আটটি দৃশ্য জুড়ে এ চরিত্রের কার্যাবলী বিস্তৃত। এই চরিত্রের উপস্থাপনার দ্বারা নাট্যকার হিন্দু রমণীর পাতিব্রত্যের ধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছেন (২।৪, ৫, ৪।৩)। হিন্দুনারী জীবনের এ সার-সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে নাট্যকার তাঁর সংরক্ষণশীল মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। স্বামীপ্রেমে বঞ্চিতা জোবি তাই স্বামী পরিত্যক্তা কিরণময়ীর প্রকৃত সমধর্মিনী হয়েছে (১।৫, ২।৫)। কিন্তু এটাই জোবি চরিত্রের মূল কথা নয়। বস্তুতপক্ষে অসহায় মধ্যবিত্ত কন্যাদায়গ্রস্ত পরিবারের উপর বহু অত্যাচারের বলি জোবি।[ক] সকলের কাছ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।[খ] সতীত্বের আড়ালে যে অসহ্য

ক. জ্যোতির্ময়ী—"কেন দিদি, তুমি কাঁদছ? আমি সংসার চালাবো। আমি মোজা বুনতে শিখেছি। মেমসাহেব জাপান হতে কল কিনে দিয়েছেন, তিন আনা করে মোজার জোড়া, আমি দিনে-রেতে আট জোড়া করে মোজা বুনতে পারি। দিদি তোমার ভয় কি? মেমসাহেব তোমায় কাজ শিখাবেন। তুমি কাঁদছ কেন? আমরা ক বোনে মেহনত করে সংসার চালাতে পারবো না?"

—চতুর্থ অংক, চতুর্থ দৃশ্য, বলিদান।

ক. জোবি—"পালিয়ে এসেছি। তারা বড্ড মারে, ছ্যাঁকা দেয়, চুল কেটে দেয়। এই দেখ না—এই দেখ না সে মাগী বড্ড বজ্জাত, খেতে দেয় না। মারে। আমায় পাল্কী করে নিয়ে গেল, মুখ খুলে দেখে ঠোনালে, বাবা গয়না দিয়েছিল, মনে ধরল না। বরণডালা কপালে ঠুকে দিলে, রক্ত বেরুলো, দাগ রয়েছে দেখ না।"

—প্রথম অংক, চতুর্থ দৃশ্য, বলিদান।

খ. জোবি—"বাড়ী খেয়েছ, সব খেয়েছ, আমার কুঁড়ে পাথর গিলতে এসেছ, 'দূর-হ দূর-হ। আবার ধরে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। আমি দৌড়ে পালালাম।"

—প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য, বলিদান।

অত্যাচার চলে জোবি যেন সেই অত্যাচারেরই প্রতিবাদী চরিত্র।গ তাই সে শেষ পর্যন্ত মেয়েদের উপর অত্যাচারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গান গেয়ে গেয়ে নারীজাতি ও সমাজকে সচেতন করে তোলার জন্য চারণকবির দায়িত্ব পালন করেছে (১।৪, ১।৫)।ঘ

হরমণি ও পাগোল (শাস্তি না শান্তি—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

মূল নাট্য ঘটনার সঙ্গে যোগ না থাকা সত্ত্বেও এ চরিত্র দুটি বহুলাংশে নাটকের ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এ দিক দিয়ে এ দুটি চরিত্র চিত্রণ নাট্য রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকারের বিশিষ্ট নাট্যরীতির বাহক স্বরূপ। হরমনি চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকার পতিব্রতা ধর্মের আদর্শ প্রচার করেছেন। স্বামীর বিচ্ছেদ বেদনাকে প্রশমিত ও অবদমিত করে রাখার জন্যই হরমনি ভগবৎপ্রেম সাধনায় এবং অনাথ-সেবার কাজে ব্রতী হয়। বিধবা বিবাহের সামাজিক অপকারীতাকে তুলে ধরার জন্য পাগোল চরিত্রটির মধ্য দিয়ে নাট্যকারের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে (২।৬)। স্থানে স্থানে এই পাগোল চরিত্রটি নাট্য চরিত্রের ত্রুটি বিচ্যুতি এবং ভণ্ডামীর আবরণ উন্মোচন করতে ক্রিয়াশীল হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্গাত্মক বাক্যবানই চরিত্রের উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যম স্বরূপ (১।৪, ৩।৫)।

'হরমণি' চরিত্রের অনাথ সেবার আদর্শ এবং মানব সেবায় তার পরোপকার ব্রত ধারণ, 'পাগোলের' কর্মময় সংসারে কর্মযজ্ঞের আহ্বান এবং ভগবৎ শক্তির প্রতি উভয় চরিত্রের নিবিড় আস্থা পোষণের (১।১, ৫।৩) ঘটনাগুলি বস্তুতপক্ষে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ গিরিশচন্দ্রের আধ্যাত্মিক মানসিকতার প্রতিফলন।[৬২]

গ. জোবি—"কিরণ কে ? তোর মেয়ে নাকি! বে দিয়েছিস ? কই কাঁদছিস্ নি—কাঁদছিস্ নি ? ···তোদের বাড়ী খাব না, আমি চল্লুম। তুই তো মা, তোর বুক ধড়ফড় কর্‌বে। আমার মা আছাড় খেয়ে পড়েছিল, তাইতে তো মরে গেল! তোদের বাড়ী খাব না, তোরা কাঁদ্‌বি।"

—প্রথম অংক, চতুর্থ দৃশ্য, বলিদান।

* জোবি—"তুই পালিয়ে যা, তোর এখনো মা আছে, তুই পালিয়ে বাড়ী যা, পালিয়ে'বাড়ী যা। পথ না চিন্‌তে পারিস, আমি পথ চিনিয়ে বাড়ী নে যাব।" —প্রথম অংক, পঞ্চম দৃশ্য, বলিদান।

ঘ. জোবি—"উলু নয় রোদন-ধ্বনি
প্রাণ কাঁপে শাঁখের ডাকে।
বাপ-মা যেচে, পেটের মেয়ে
বলি দিতে দেয় কাকে॥
নয়ন জলে নারী ভাসে
সে দেশে কি অন্ন থাকে——"

—দ্বিতীয় অংক, চতুর্থ দৃশ্য, বলিদান।

শান্তা (পরপারে—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়).

এই চরিত্রটি নাটকের মূল ঘটনার সঙ্গে যুক্ত না থেকেও তার মানবিক মূল্যবোধ, অ[illegible]ন্যায়বোধ এবং আত্মত্যাগের গুণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। জীবিকার তাগিদে শান্তা বারাঙ্গনা। কিন্তু মানবিক মূল্যবোধের দিক দিয়ে শান্তা উন্নত। তাই নাটকে এই চরিত্রটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তবে যুক্তির শিথিলতায় কার্যকারণের অভাবে চরিত্রের বিন্যাস নাটকের উপযোগী হয়নি।

(ঘ/১) অন্যান্য নাটকের প্রধান চরিত্র (Protagonist)।

রঘুবীর (রঘুবীর—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)

এটি একটি কাল্পনিক নাটক। নাটকের প্রধান চরিত্র রঘুবীর। চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে নাট্যকার রঘুবীরের শারীরিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক এই তিনটি দিকের মানই বজায় রেখেছেন। রঘুবীরের সরলতা, শক্তিমত্তা, পরার্থপরতা, সাহসিকতা, আত্মপ্রত্যয়, সহিষ্ণুতা, কর্তব্যপরায়ণতা, সংগ্রামশীলতা চরিত্রকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বিপন্ন আশ্রিতকে রক্ষা করাই রঘুবীর চরিত্রের উদ্দেশ্য (১।৬)। এই উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণত্ব ও ভীলত্বের দ্বন্দ্বে চরিত্রটি আকর্ষণীয় হয়েছে। জন্মলগ্নে ভীলত্ব অর্জন করলেও জন্মাবধি ব্রাহ্মণ অনন্তরাওয়ের আশ্রয়ে ও তাঁর শিক্ষাধীনে বড় হওয়ায় রঘুবীরের মধ্যে ব্রাহ্মণের শম-দম-ত্যাগ ও তিতিক্ষার জীবনাদর্শন গড়ে ওঠে। এর ফলে চরিত্রের মধ্যে ভগবৎশক্তি ও অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায় (৩।৪)। জাফরের লালসাবহ্নি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য উদভ্রান্ত পরীবানুকে রঘুবীর আশ্রয় দেয়। এই ঘটনা থেকেই রঘুবীর নাটকে নাটকীয়তার সূত্রপাত ঘটে (১।৬)। পরীবানুকে আশ্রয় দেওয়ায় রঘুবীরের পিতৃতুল্য গুরুদেব অনন্তরাওকে জাফর বন্দী করে। এই ঘটনায় রঘুবীর চরিত্রে কর্ত্তব্যবোধ ও ব্রাহ্মণকুলজাত ধর্মবোধের মধ্যে দ্বন্দ্ব ধীরে ধীরে শুরু হতে থাকে (৩।৪)। এ সময় তার মধ্যে ব্রাহ্মণ কুলজাত গুণের প্রভাব বেশী থাকায় রঘুবীর কর্ত্তব্যের আহ্বানে আত্মত্যাগের ধর্মকে বরণ করে নেয়। জাফরের সামনে স্বেচ্ছায় নিজের জীবনের বিনিময়ে রঘুবীর তাঁর প্রভু অনন্তরাওয়ের উদ্ধারকার্য্যে ব্রতী হয় (৩।৫)। এর মাধ্যমে রঘুবীর নিজের পুত্রসত্তা ও শিষ্যসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কিন্তু জাফরের ক্রমাগত অত্যাচারে ভীলেদের মধ্যে চরম দুরবস্থা দেখা দেয়। রঘুবীর ভীলেদের রক্ষক। ভীলেরা তার ভাই। ভীলেরা তার বন্ধু। তাই ভীলেদের দুর্দশা যত চরমে উঠতে থাকে রঘুবীরের মধ্যে ততই তার ভ্রাতৃসত্তা, বন্ধু সত্তা ও রক্ষক সত্তার দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়। এই দ্বন্দ্বের ফলে রঘুবীরের মধ্যে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণের অহিংস ভাব দূর হয়ে ভীল জাতির তেজদীপ্ত হিংস্র প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠতে থাকে।[ক] জাফরের কক্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধ রঘুবীর শৃঙ্খল ভেঙে ফেলে পরীবানুর

ক. রঘুবীর—"হৃদয়ের নিভৃত গুহায়——
নিদ্রালসা প্রতিহিংসা
প্রবৃত্তি আমার, সেইমত তুলে বুঝি
বিষম ঝঙ্কার······
বলদর্পে সে চাহিবে চারিধার—" —চতুর্থ অংক, প্রথম দৃশ্য, রঘুবীর।

সতীত্বের ধর্ম রক্ষার চেষ্টা করে। এই ভাবেই রঘুবীরের মধ্যে সহিংস মনোভাবের প্রথম প্রকাশ ঘটে (৪।৭)। জাফর রঘুবীরের ভ্রাতা বলদেবসহ অন্যান্য ভীলেদের বন্দী করে। রঘুবীরের দূত হিসাবে প্রেরিত সখারামকে জাফর হত্যা করে। প্রভু অন্তরাও সহ আশ্রিতা পরীবানু জাফরের ভয়ে সন্ত্রস্ত জীবন যাপন করে। এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় রঘুবীরের মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম সম্পূর্ণভাবে অবদমিত হয়ে পড়ে। জন্মগত ভাবে পাওয়া ভীলের ভাবাবেগ, প্রক্ষোভ ও ধর্ম তার কাছে প্রবল হয়ে ওঠে। চরিত্রের এই সঙ্কট মুহূর্তে তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব ও ভীলত্বের দ্বন্দ্ব উত্তুঙ্গমুখী হয়ে উঠেছে (৫।৩)। পূর্বের অদৃষ্টবাদী এবং ভগবৎশক্তিতে বিশ্বাসী বিনয়ী, নম্র ও অহিংস ব্রাহ্মণ-রঘুবীর ঘটনার আবর্তনে প্রতিহিংসাপরায়ণ উন্মত্ত ভীল-রঘুবীরে পরিণত হয়।[খ] রঘুবীর জাফরকে হত্যা করে। এইভাবে অহিংস ও ক্ষমাময় রঘুবীরের সহিংস ও ক্ষমাহীন রঘুবীরের ক্রমোন্নতি ও পরিনতি নাটকে চিত্রিত হয়েছে (৫।৬)।

(ঘ/২) অন্যান্য নাটকের বিরোধী (Antagonist) **চরিত্র।**

জাফর (রঘুবীর—ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ)।

নাটকের প্রধান বিরোধী চরিত্র 'জাফর'। পরীবানুকে অঙ্কশায়িনী করার কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করাই তার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পূরনের জন্য গুজরাটের নবাব মামুদসাকে হত্যা করে জাফর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু পরীবানুকে রক্ষার জন্য রঘুবীরের প্রচেষ্টায় তার উদ্দেশ্য পূরণ ব্যহত হয়। এরফলে রঘুবীরের সঙ্গে তার সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। নাটকে এ সংঘর্ষ বহির্দ্বন্দ্বের রূপ গ্রহণ করেছে। রঘুবীরের সঙ্গে সংঘর্ষে জাফর পরাজিত হয়। রঘুবীর তাকে হত্যা করে। জাফরের ক্রূরতা, কপটতা, প্রবৃত্তির উদ্দামতা এবং নিষ্ঠুরতা তার চরিত্রের অশুভ প্রবৃত্তির এক একটি উপাদান।

খ. রঘুবীর—"রঘুয়া! রঘুয়া! রঘুবীর নাহি আর।
পিতা মরে গেছে রঘুবীর।
মৃতপ্রাণ তার, মলভরা পূতিগন্ধ মৃত্তিকার রাশি।
রঘুয়া কণ্টক তরু উঠেছে সেথায়
তীব্র ফুল গন্ধে তার ভরিবে মেদিনী।
এস দ্বিজ লইতে আহ্বান।।"

পঞ্চম অংক, তৃতীয় দৃশ্য, রঘুবীর।

সূত্র-পরিচিতি

১. "The essential mark of volition···that which distinguishes it from simple desire, or simple conflict of desires—is that the personality as a whole······" P.—240, An Introduction to social psychology—W. Mcdugal, 7th edition, London.

২. "Dramatic action, therefore, is not with a view to the representation of character, character comes in as subsidiary to the action."—P.—343, Aristotles theory of Poetry and Fine Arts.—S. H. Butcher—Ludhiana, 1974

৩. "Action and characters are each in term the outcome of the other."—Page-366, Aristotles theory of Poetry and fine Arts—S. H- Butcher, New York, 1951

৪. "Geneuine dramatic art consists in the expression of individuals in the conflict of their interests and the discord roused between their characters and their transitory passions···" —P. 18, Hegel on Tragedy—Ane and Henry Paolucci, New York, 1975.

৪.(ক) "Gross inconsistency in character displeases the intelligent spectator for more than an unlikely plot, for where as almost anything can happen in human life, very sudden changes of character are rare and inconvincing."—P.-5, The Anatomy of Drama, M. Boulton, 1960, London.

৫. "Dramatic art···is an art of Progressive revelation"—P. 231, What happens in Hamlet—J. Doverwilson, Cambridge, 1935

৬. "A mark of the tragic hero is his limited knowledge and mark of Tragic irony is the contrast between the heroe's ignorance and the audience's knowledge···"—P. 29, The Paradox of Tragedy—D. D. Raphell, London,

৭. "The tragic sense of life······is a subphilosophy or a prephilosophy more or less formulated more or less conscious"—P. 12, The vision of Tragedy—R. B. Selwall, 1960.

৮. "Tragic hero through the process of his destruction may learn the nature of evil and then attain a spiritual victory in spite of his death"—P.-10, Pattern in Shakespearean Tragedy—I. Ribner, London, 1960.

৯. "Laughter is caused either by some sudden act of their own that pleaseth them ; or by the apprehension of some deformed things in another by comparison where of they suddenly applaud themselves."—Page-27, Leviathan—T. Hobbes, Everyman's Library edition, 1914.

১০. Page-399. Aristotles theory of Poetry and Fine Arts—S. H. Butcher, 1951, New York.

১১. "Since however each cromosome 'thread' is composed by numerous infinite simal unite called genes, it is more proper as Gilliand suggests, to regard the latter as the real basis of inheritance."—Page-46, Psychological Foundation of Personality"—P. Louis Thrope, New York, 1938.

১২. "Parents finally influence personality development by being models. Much of a child's learning is by imitation. By watching his father a son learns how to act like a man and the daughter learns how she assume the role of wife and mother by watching his mother." —Page-239, An Introduction to Psychology-C. T. Morgan, New York, 1914.

১৩. "Heredity only endows him with certain abilities. Environment only gives him certain impressions. These abilities and impressions and the manners in which he "experiences" them—that is to say, the interpretation he makes of these experiences are the bricks which he uses in his own "Creative" way in building up his attitude toward life...."—"Page-206, The Individual Psychology of Alfred Adler—H. Ansbacher and R. Ansbacher, London, 1956.

১৪. "They are neither markedly introvert nor extrovert but incline only a little to one side or the other of the happy mean, the midpoint of the scale."—Page-43, Character and conduct of life—W. Mcdugal, London, 2nd edition.

১৫. "Everything unconscious that behave in this way, that can easily exchange the unconscious condition for the conscious one is that better described as 'Capable of entering consciousness, or as Preconscious"—Page-19, An outline of Pscho-Analysis—Sigmaund Freud, 1949, London.

১৬. "The ego is that part of the Id,. which has been modified by the direct influence of the external world" —P.-29, The Ego and the Id—S. Freud, London, 1927.

১৭. "The long period of childhood, during which the growing human being lives in dependence upon his parents, leaves behind it a precipitate which forms within his ego a special agency in which this parental infiuence is prolonged. It has received the name of Super-ego"—Page-4, An outline of Psycho Analysis—S. Freud, London, 1949.

১৮. "In this kind of conflict a person is repelted and attached by the same goal object"—P-255, Introduction to Psychology, C. T. Morgan, 5th edition, New York.

১৯. "Dreams are disguished fulfilments of repressed wishes". Page-90, On Dreams, S. Freud, London, 1952.

১৯(ক) 'গিরিশচন্দ্র চৈতন্যদেব, বুদ্ধদেব প্রভৃতি কজন মহাপুরুষদের জীবনলীলা অবলম্বন করিয়া কয়েকখানা নাটক লিখিয়াছেন।...নানা অপ্রাকৃত ও অতিলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করিয়া তিনি ইহাদের চরিত্র মানবীয় কৌতুহল ও ধারণার অতীত করিয়া দিয়াছেন..." পৃষ্ঠা-১৯৭, বাংলা নাটকের ইতিহাস—অজিত কুমার ঘোষ,

২০. "বিবর্তন বা ট্রানজিশন গিরিশচন্দ্রের কাব্যে এক নূতনত্ব। কিরূপে মন পরিবর্তিত হইতেছে, কিরূপে ধীরে ধীরে একভাব হইতে মনের গতি অন্যদিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা তিনি অতি সুন্দরভাবে...দেখাইয়াছেন।" ...পৃষ্ঠা-৬৫, গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৯৪২, কলিকাতা।

২১. "Person's behaviour springs from his idea."—Page-19, Social interest—a challenge to mankind,—Alfred Adler, 21st edition, London.

২২. "In suicide the aggressive impulse is directed against the individual himself in an attempt to expiate his own difficulties"—Page-109, Oppression—a study in social and criminal Psychology—T. Grygier and H. Mannheim, London. 1954.

২৩. "বিশ্বামিত্রের অতুলনীয় সাধনা এবং তপোশক্তির পরিচয় দিয়াও বশিষ্ঠের যে ত্যাগ, ধৈর্য্য ও ক্ষমা শক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা ঠাকুরের ক্ষমাশীলতা, সত্যানুরাগ ও আক্রোধের আদর্শ পাইয়াই সম্ভব হইয়াছে।…" পৃষ্ঠা-৯৯, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা।

২৪. "Reaction character traits are those which are as reaction to one opposite tendency in one-self which they repress"—Page-80, Psychology and the Mental health—J. A. Hadfield, 1952 London.

২৫. "One of the affective experience which still exists connected with the crime itself; this happens especially when the subject has committed the crime spontaneously without previously forming a systematic plan, as strong most often with murderers; they therefore have a very strong affective disturbance…"—P-78, The Nature of Human conflicts—A. R. Luria, 1932, New York.

২৬. "Page-176, The Development of Personality—C. G, Jung, Translated by R. F. C. Hull, London, 1944.

২৭. "Desire is a passive state. Will by contrast is active and is exhibited in intentional or voluntary action."—Page-42, Mind in action.—C. H. Whitely,

২৮. The individual…is a unique product of his organic construction, his bearing ability, his variability as to emotions, reactivity and intelligence and his own particular organisation of socially and culturally determined experience."—Page-9, Social Psychology—K. Young, New York, Second edition.

২৯. "তিনি মানুষ হয়েছিলেন তাঁর পিতৃদেব দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্রের দীপ্ত চরিত্রের পরিধির মধ্যে। উত্তরকালে যখন তিনি…দুর্গাদাসের মত আদর্শ

চরিত্র আঁকেন তখন তাঁর প্রিয়বন্ধু শ্রীলোকেন্দ্রনাথ পালিত বাস্তববাদের তরফ থেকে আপত্তি তুলতে তিনি বলেছিলেন—'এমন মানুষ অবাস্তব একথা মানবো কি দুঃখে লোকেন ? আমি কি দিনের পর দিন আমার পিতৃদেবকে দেখিনি ?'—পৃষ্ঠা-৪৫, মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল—দিলীপকুমার রায়, ১৯৬৬, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ।

৩০. "Egotism which is the extreme seperation of the conscious ego from the rest of being is characteristically attributed to Satan."—Page-48, The Duality of Human existence—David Baker, Chicago,

৩১. "Where love rules, is no will to power, and where power predominates there love is lacking. The own is the shadow of the other."—Page-87, Psychological Reflection—C. G. Young, 1943, London.

৩২. "One of the most impressive features of the intrapsychic psychotic conflict is the struggle between active and passive, sadistic and masochistic, destructive and self destructive tendencies……Psychotics give up reality and replace it by a newly created fantasy reality only if reality fails to lend itself to their purposes and to help them in their conflict solution" Page-20, Psychotic Conflict and Reality—S. Freud Edt.—E. Jacobson, New York,

৩৩. Page—1032, 1040, 1044, 1045, 1055 and 1058 respectively. The Complete Works of Shakespeare—W. Shakespeare, Odmas Press Ltd, London, 1923.

৩৪. "Suicide is the outcome of strong ambivalent dependence on sadistic super-ego and the necessity to get rid of an unbearable guilt tension at any cost."—Page-12, Clue to suicide—E. S. Shreiduman, New York

৩৫. "Jealousy arises when the object of the sentiment gives to another or merely is thought to give to another any part of the regard thus claimed for the self."—Page-139. An Introduction to social psychology—W. Mcdugal, seventeenth edition, London.

৩৬. "Most of the criticisim of religion is directed to its immature form. When immature it has not evolved the level of impulsive self gratification. Instead of dealing with psychogenic values it serves either a wish-fulfilling or soporific function for the self centered interests."—Page-54. The Individual and his Religion. Gordon. W. Alport, New York, 1954.

৩৭. "Psychopatts are characterised in generally irresponsibility and disregard for the feelings of other people···—They lack moral values. Committing······crimes with complete disregard for the rights and welfare of others."—Page-250, Introduction to Psychology—N. L. Munn,

৩৮. "Hallucinations may be roughly defined as false sense-impressions. The patient sees an object which has no real existence or hear an imaginary voice···on account of the sins he has committed"—page-30. Psychology of insanity—B. Hart. Cambridge, 1946.

৩৯. "The ego sees itself deserted by the super-ego and let itself die" —Mourning and Melancholia—S. Freud. Collected papers of volume—IV, London, 1925.

৪০. "তিনি স্বদেশীতন্ত্রের কবি।···তিনি···দেশাত্মবোধরূপ মহাদেবের জটাজুট হইতে দেশভক্তি-ভাগীরথীর পবিত্র প্রবাহ আনিয়া কোটি কোটি ভারত সন্তানের জীবনমুক্তির সলিল দান করিয়া গিয়াছেন।" পৃষ্ঠা-৮৮, দ্বিজেন্দ্রলাল—উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, কলিকাতা, ১৩২৬।

৪১. "এই চরিত্রটির প্রতি নাট্যকারের অনুচিত পক্ষপাতিত্বের ফলে নাটকের সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার শক্তি ও সংঘাত যেন শিথিল ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। মনে হয়, সমস্ত গুরুতর ঐতিহাসিক কার্যকারণের উপরে একটি প্রতিহিংসাময়ী নারীর প্রলয়ংকরী শক্তি জ্বলিয়া উঠিয়াছে আর বাংলা ও বাংলার নবাব সেই বহ্নিজ্বালায় পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের অসঙ্গত বিকৃতি সন্দেহ নাই।···" পৃষ্ঠা-২৩৬, বাংলা নাটকের ইতিহাস—অজিত কুমার ঘোষ,

৪২. "Purposive action is the action that seems to be governed or directed in some degree by prevision of its effects, by prevision

of that will still lies in the future of events which have not yet happend but which are likely to happen and to the happening of which the action itself may contribute."—Page-49. An outline of Psychology—W Mcdugal. London, 10th edition.

৪৩. "He had no distinct idea about the baptism and the church going, except that Dolly had said it was for the good of the child ; and in this way, as the weeks grew to months, the child created fresh and fresh links between his life and the lives from which he had hitherto shrunk continually into narrower isolation."—Chapter-14, Page-147. Silas Marner—(The weaver of Raveloe) by George Eliot—Orient longman edition, 1979, Calcutta. Edited by R. Radhakrishnan.

৪৪. "She howl'd aloud, "I am on fire within.
There comes no murmur of reply.
What is it that will take away my sin,
And save me lest I die ?"
So when four years were wholly finished,
She threw her royal robes away.
"Make me a cottage in the vale" she said.
Where I may mourn and pray".
—"The Palace of Art"—Alfred Lord Tennyson
The Poems of A. L. Tennyson, ed. C. Ricks,
London.

৪৫. মুদ্রারাক্ষস—বিশাখ দত্ত। সপ্তম অংক।

৪৬. "চন্দ্রগুপ্ত নাটকের প্রধান আকর্ষণ চাণক্য।…চাণক্য ভারতের মাকিয়াভেল্লি-রূপে নাট্যকারের নতুন সৃষ্টি। চাণক্য বিদ্যাবুদ্ধি ও কূটনীতি বলে সাধারণ অবস্থা থেকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীরূপে ভারতের সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠেন।"—পৃষ্ঠা, ৫৭, সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল—ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য্য, পার্কসার্কাস বেনিয়াপুকুর, দুর্গোৎসব স্যুভেনির,

৪৭. "Suffering is properly tragic if and only if it generates knowledge in the sense of insight into understanding of man's fundamental nature or the fundamental human condition.—" Page-8, Elements of Tragedy—D. Krook, London, 1969.

৪৮. "সাজাহান দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক। একে 'ট্রাজেডি অফ্ সাফারিং' বলা হয়। সাজাহানের পিতৃসত্তা ও সম্রাটসত্তাকে ঔরংজীব নির্মমভাবে আঘাত করেন। সাজাহান শেষ পর্যন্ত উদ্ধত বিজয়ী পুত্রদের মার্জনা করলেও, ঔরংজীব কর্তৃক পরপর পুত্রহত্যার ফলে ব্যথিত সাজাহানের পিতৃসত্তা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। এই আত্মবিভক্ত পিতৃহৃদয়ের দুঃসহ বেদনায় বন্দী সাজাহানের জীবন ট্রাজেডি[illegible]রুণ্যে ভরে ওঠে।" পৃষ্ঠা-৫৭, সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল—ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য্য, পার্কসার্কাস বেনিয়াপুকুর দুর্গোৎসব স্যুভেনির,

৪৯. The position of the hero in this tragedy is in one important respect peculiar.······When the conclusion arrives the old king has for a long while been passive. We have long regarded him not only as 'a man more sinned against than sinning,' but almost wholly as a sufferer, hardly at all as an agent." —Page-231, Shakespearean Tragedy—A. C. Bradley 1976, London.

৫০. "the primary" act of shame is then seem to be shameful and horrible because it is a violation of a moral order which is objectively real and absolutely binding···" Page. 17, Elements of Tragedy—D. Krook, London,

৫১. Tragedy guided by Philosophy come also to show that those who do evil never unpunished since an unquiet mind is the inevitable reward of evil doing. Passions create in the heart of a man such turbulance that there is no longer possible to him the quiet mind on which the happiness is conditioned."—Page-23 Shakespeare's Tragic heroes—L. B. Campbell, New York,

৫২. Lady Macbeth—"Naught's had all's spent,
where our desire is got without content"
—Scene-II, Act-III, Macbeth, Shakespeare.

৫৩. Lady Macbeth—"Here's the smell of the blood still !
all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. Oh, Oh, Oh ;"—Scene I Act-V

৫৪. Egoistic suicide, in which the individual is not sufficiently integrated into his society."—Page-12, Clue to suicide—E. S. Shneidman and N. L. Farberow, New York, 1957.

৫৫. Plays written for propaganda purposes seldom succeed in the theatre unless they are also works for art……In other words he must concern himself first with writting a good play in which the propaganda is a secondary attribute."—P-42. The plays the thing—L. Langner, New York,

৫৬. "man of specially weak character or lacking in character is the man whose sentiments not only have not been organised in any system but have not been consolidated and confirmed by habitual action in accordance with their prompting, because the man has constantly allowed himself to be moved by the entirely unorganised and fleeting impulses evoked sporadically by each situation as it arises."—Page-260, An Introduction to Social Psychology—W. Mcdugal, Seventeenth edition, London.

৫৭. "An individual's mental and emotional ill health is a reaction of his personality to the multiple stresses of the total environment whether the stresses be in the external environment or in his own complicated emotional imbalances."—Page-512, An Outline of abnormal psychology—G. Murphy, New York, 1954.

৫৮. "psychological disorder…is mainly a function of the strength of the social pressure—" Page-53, Social status and psychological disorder—B. P. Dohrenwend and B. S. Dohrenwend New York, 1969.

৫৯. "Emotional behavior is commonly regarded as disorganised lacking goal direction…"—Page-357, Motivation and emotion —P. T. Young, New York

৬০. "নবকুমার—কিন্তু জেণ্টলম্যান্ এখন এদেশ আমাদের পক্ষে যেন কি মস্ত জেলখানা,…এই গৃহ কেবল আমাদের লিবরটি হল্ অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান, এখানে যার যা খুসি সে তাই কর। জেণ্টেলম্যেন,

ইনদি নেম্‌ অব্‌ ফ্রীডম, লেট্‌ অস এনজয় আওয়ারসেল্‌ভস্‌…ওহে বলাই একবার সকলকে দেও না…

বলাই—আচ্ছা এই এস (সকলের মদ্যপান)।

নবকুমার—তবে এইবার নাচ আরম্ভ হোক। কম্‌ ওপেন দি বল্‌ মাই বিউটিস্‌। ও পয়োধরি, তুমি ভাই আমার আরম্‌ নেও।…”

দ্বিতীয় অংকের প্রথম গর্ভাংক, ‘একেই কি বলে সভ্যতা’

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৬১. “The manifestation of purpose or the striving to achieve an end is…the mark of behaviour and behaviour is the characteristic of living thing.”—Page-20, Psychology—the study of behaviour—W. Mcdugal, London, 1903.

৬২. ‘গিরিশচন্দ্রের অধিকাংশ নাটকেরই…চরিত্রের পরিকল্পনা শ্রীপরমহংসদেব ও শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীর আলোকে আলোকিত।’…পৃষ্ঠা-১৫, গিরিশচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ বসু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯।

চতুর্থ অধ্যায়

নাট্য-সংলাপের বৈশিষ্ট্য ॥

নাটকের জগৎ ভাব ও ভাবনার জগৎ। সেই ভাব ও ভাবনাকে কর্মে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা দৈনন্দিন সংলাপের মধ্যে থাকে না। সংলাপ মঞ্চের ভাষা। নাটকে অবশ্য প্রয়োজনীয় একাধিক উপাদানের সহযোগিতায় সংলাপের মাধ্যমে জীবনকে রূপায়িত করা হয়। নাটকের এই প্রয়োজনীয় একাধিক উপাদানের সঙ্গে সংলাপের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। নাট্যসংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকারের মনোগত ভাব, চিন্তাধারা, নাটকের মূল বক্তব্য, নানান চিন্তা-ভাবনা, চরিত্রের ভাবাবেগ ও বিভিন্নপ্রকার মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। এটাই সংলাপের প্রধান কাজ।[১]

তাই 'সর্বশিল্প প্রদর্শকম্'[২] নাটকের সুষ্ঠু গ্রন্থনা ও উপস্থাপনার জন্য সংলাপকে বহুগুণে গুণান্বিত হতে হয়। তাই দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে সংলাপের সঙ্গে নাট্যসংলাপের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়।

সংলাপ, নাট্যবৃত্ত ও নাট্যক্রিয়া।

ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে গড়ে ওঠা নাটকের সিদ্ধান্ত বাক্যকে (Premise) সংলাপের সাহায্যে প্রমাণ করতে হয়। সংলাপ নাট্যবৃত্তের বাহক স্বরূপ। তাই সংলাপের সাহায্যে নাট্যঘটনাকে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। নিছক তথ্য পরিবেশণের মধ্যেই নাট্যসংলাপ সার্থক হয়ে ওঠে না। সংলাপ বর্তমান ঘটনাকে উপস্থাপিত করবে এবং প্রয়োজনে অতীত ও ভবিষ্যৎ ঘটনার ইঙ্গিত দেবে। সংলাপের সঙ্গে নাট্যক্রিয়ার গভীর যোগ বর্তমান। নাট্যক্রিয়ার প্রয়োজনীয় ও অবশ্যম্ভাবী মুহূর্ত গড়ে তোলার ক্ষমতা নাট্যসংলাপের মধ্যে থাকা চাই। সংলাপের সাহায্যেই নাট্যক্রিয়ার বিভিন্নস্তর প্রকাশিত ও অর্থবহ হয়ে ওঠে। সেজন্য সংলাপ অবশ্যই ক্রিয়ানুসারী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সংলাপ ও চরিত্র।

সংলাপের সাহায্যে চরিত্রের বাসনা (wish) এবং বাসনা পূরণের জন্য তার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি (will) প্রকাশ লাভ করে। নাট্যঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রের মানসিক ও বাচিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সংলাপের মাধ্যমেই মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। সংলাপ চরিত্রের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের দিক নির্দেশক[২ক]। চরিত্র সম্বন্ধে অন্যান্য চরিত্রের মন্তব্যের মধ্য দিয়েও চরিত্রের বিশিষ্টতা নির্দিষ্ট হয়। চরিত্রের সংকট

এবং দ্বন্দ্বের উত্তুঙ্গ অবস্থা (crisis and conflict) সংলাপের দ্বারাই বিশেষায়িত হয়। এদিক দিয়ে চরিত্রকে বিশেষায়িত করার যোগ্যতা নাট্যসংলাপের মধ্যে থাকা চাই। এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থার মধ্যবর্তী চরিত্রের বিভিন্ন ক্রমিক পরিবর্তন (Transitory period of Growth) এবং নাটকের শেষে চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিবর্তন (Total growth) সংলাপের সাহায্যেই পরিস্ফুট হয়।[৩] সংলাপকে তাই নাট্যচরিত্রের বিকাশের উপযোগী হতে হয়। চরিত্রকে সার্থকভাবে উপস্থাপিত করার জন্য সংলাপ চরিত্রানুগ হওয়া সমীচীন। এরজন্য চরিত্রের শারীরিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক এই তিনটি মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে সংলাপকে চরিত্রের প্রকৃতি অনুযায়ী গড়ে তোলা প্রয়োজন।[৪] নাট্যচরিত্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, চরিত্রের গতি, তাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি প্রভৃতি উন্মোচনের দ্বারা দর্শকদের আকৃষ্ট করতে হয় বলে চরিত্রের বিভিন্ন প্রকার ভাবাবেগের অবস্থা (emotional load), হৃদয়াবেগের গভীরতা ও সূক্ষ্মতা, চরিত্রের মননশীলতা, সংলাপের মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠা প্রয়োজন। এসব ব্যতিরেকে নাট্যসংলাপ প্রাণহীন হয়ে পড়ে।

সংলাপ ও নাট্য-পরিবেশ।

নাট্যকাহিনীর বিস্তার ও চরিত্রের বিকাশের জন্য নাটকের উপযুক্ত পরিবেশকে সংলাপের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে হয়। সেক্ষেত্রে নাটকের প্রতিটি দৃশ্যের অন্তর্নিহিত অর্থের বাহক হওয়ার যোগ্যতা সংলাপের থাকা প্রয়োজন এবং নাটকের মূল ঘটনার সঙ্গে সাযুজ্য রচনা করে দৃশ্য-মধ্যস্থ অর্থকে বিশেষত্ব দান করার ক্ষমতা সংলাপের থাকা আবশ্যক।

সংলাপ ও নাট্যশৃঙ্খলা।

নাট্যবৃত্তের সার্থক উপস্থাপনা, নাট্যচরিত্রের সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নতি, নাট্যক্রিয়ার সার্থক প্রকাশ, নাট্যাবস্থার উপযুক্ত পরিস্ফুটন এবং নাটকের বিভিন্ন ভাবসমূহকে উদ্দীপ্ত করে নাট্যরস সৃষ্টিতে যথোচিত সাহায্যকারী ভূমিকা পালনের জন্য নাট্যসংলাপের বিন্যাস সংযত, সংহত ও যথোচিত হওয়া প্রয়োজন। এরজন্য সুষ্ঠু শব্দের নির্বাচনের দ্বারা সংলাপ গঠন করতে হয় এবং সংলাপের মধ্যে কার্যকারণ যোগে একটা শৃঙ্খলা গড়ে তোলাও অত্যাবশ্যক। এর ফলে সংলাপ সুসংহত হয়ে ওঠে। সংলাপের সামগ্রিক কাঠামো থেকে সংলাপের মধ্যেকার কোন অংশকেই আর বাদ দেওয়া যায় না। বাদ দিলে সংলাপের সমগ্র কাঠামোই দুর্বল হয়ে পড়ে। এটাই সুসংহত, সুসংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত সংলাপের বৈশিষ্ট্য।[৫] সংলাপ গঠন কৌশলের মাধ্যমেই এই বিশিষ্টতা অর্জন করতে হয়।

সংলাপের পদ্যময়তা ও গদ্যময়তা।

নাট্যসংলাপ পদ্যধর্মী ও গদ্যধর্মী এই দুই প্রকারের হতে পারে। পদ্যধর্মী সংলাপের কাব্যময়তা স্পষ্ট এবং গতি নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত। এই গুণের জন্য এর সম্মোহন শক্তিও অধিক। নাটকের চূড়ান্ত মুহূর্ত গঠন, চরিত্রের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিশেষ দিকের উন্মোচন, জীবন সত্যের অনালোকিত দিকের পরিস্ফুটন এবং নাট্যকারের বিশেষ জীবন দর্শনের ভাবগভীরতা বজায় রেখে তা প্রকাশ করার পক্ষে পদ্যধর্মী সংলাপ খুবই উপযুক্ত। এই পদ্যধর্মী সংলাপের শব্দ সংগীত (Music of words) ও কাব্যময়তা সংলাপের সাহিত্যিক ও শিল্পগত গুণকে সমৃদ্ধ করে তোলে। এর ফলে নাটকের শ্রব্যধর্মীতার গুণ বেড়ে যায়, নাটক শ্রুতিমধুর হয় এবং তা পাঠক ও দর্শককে সমধিকভাবে আকর্ষণ করে থাকে। সর্বোপরি এ ধরণের সংলাপ দর্শকের মানসিকতায় বিশিষ্ট অনুভূতির সৃষ্টি করে নাটকের প্রতি তাদের যথাযথ প্রতিক্রিয়াকে সহজে উদ্দীপ্ত করে তোলে। তবে শুধুমাত্র নাটকের বাহ্যিক অংগ হিসাবে সংলাপের কাব্যময়তা বাঞ্ছনীয় নয়। নাটকের স্বাভাবিক ধর্মকে বজায় রাখা এবং তাকে সমুন্নত করে তোলার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী কাব্যময়তাই সংলাপে আবশ্যক। এই প্রয়োজনের অধিক কাব্যময়তায় নাট্যসংলাপ তার বিশিষ্টতা হারিয়ে ফেলে এবং তাতে নাটকের নাটকীয়ত্বও ক্ষুণ্ণ হয়।[৬] সুতরাং নাট্যসংলাপে কাব্য ও নাটকীয়ত্বের সুষ্ঠু সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থান বাঞ্ছনীয়।

প্রাচীন গ্রীস ও এলিজাবেথীয় যুগের পদ্যধর্মী সংলাপের কাব্যময়তা এদিক দিয়ে খুবই সমৃদ্ধময়। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত নাটকেও গদ্যসংলাপের পাশে প্রভূত পরিমাণে পদ্যময় সংলাপের শ্লোকরূপে ব্যবহার এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। নাটকের পদ্যসংলাপও আবার দুই রকমের হতে পারে। অলঙ্কারবহুল (Rhetrorical) সংলাপ এবং সহজ সরল (simple) পদ্যময় সংলাপ। অলঙ্কারবহুল ভাষা শ্রুতিরঞ্জক ও ওজঃগুণযুক্ত সাহিত্যিক গুণের পরিপোষক। এতে নানা প্রকারের অলংকার প্রয়োগ ও চিত্রধর্মিতা স্থান লাভ করে। এক সময়ে নাটকে এ জাতীয় সংলাপের অধিক প্রচলন লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছিল। নাটকের ভাষা সহজ সরল পদ্যময় হলেও সেখানে যত্নসহকারে শব্দ নির্বাচনের দ্বারা সংলাপ গ্রন্থন করতে হয়। এতেও প্রয়োজন স্থলে সাহিত্যিক গুণ আরোপ করতে হয় এবং আবেগ প্রকাশের জন্য ভাষাকে কিঞ্চিৎ সমুন্নত করেও তুলতে হয়।

নাটকে একই সঙ্গে গদ্য এবং পদ্য এই উভয় প্রকার সংলাপ ব্যবহার করা যায়। সেক্ষেত্রে গভীরভাবের প্রকাশের জন্য পদ্য সংলাপ এবং সাধারণ ভাব প্রকাশের জন্য গদ্যসংলাপ সংযোজিত হয়ে থাকে। এ রীতি শেক্‌সপীয়রের নাটকেও অনুসরণ করা হয়েছে।[৭]

নাট্যসংলাপ পদ্যময় ও গদ্যময় যাই হোক না কেন তা স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও সহজবোধ্য হয়ে ওঠা চাই। সংলাপের গঠন ভঙ্গীমা ও রীতি সহজ সরল ও সর্বপ্রকার জটিলতা মুক্ত হলে সংলাপ সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। এ সকল গুণে নাট্যসংলাপ গুণময় হলে তা জীবন্ত ও আকর্ষণীয় হয়। নাটকের সার্থকতা অনেকাংশে এই জীবন্ত সংলাপের উপর নির্ভরশীল।[৮]

নাট্য-সংলাপের বিভিন্ন প্রথা।

নাটকে 'জনান্তিক' (Aside) সংলাপ, 'আত্মগত' সংলাপ (Soliloquy), 'অপরারিকত' সংলাপ, 'আকাশ বচন' সংলাপ ব্যবহৃত হয়। 'জনান্তিকে' জাতীয় সংলাপ মঞ্চে উপস্থিত আছে এমন কোন চরিত্রকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় এবং সেই চরিত্রই কেবলমাত্র সেই সংলাপ শোনে। মঞ্চে উপস্থিত অন্য অভিনেতারা যেন তা শুনতে পায় না। এ প্রসঙ্গে বলা যায়—"The function of the aside is to throw light on a situation or to reveal any motive, or intentions which may be obscure to the audience and is understood not to be heard by the other actors on the stage."[৯]

এই 'জনান্তিক' সংলাপের দ্বারা কোন বিষয়ে নাট্যকারের ব্যাখ্যামূলক (Private Personal Address) মন্তব্য চরিত্রের মুখে বলা হয় মাত্র। নাটকে চরিত্রমুখে এ জাতীয় সংলাপ ব্যবহার করা সমীচীন নয়। স্বতঃস্ফূর্ত সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্রের সবকিছু প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেই জন্যই এ কালের নাটকে 'জনান্তিক' জাতীয় সংলাপ ব্যবহারের রীতি অপ্রচলিত হয়ে উঠেছে।

আত্মগত সংলাপ তিন ধরণের হতে পারে—(i) Soliloquy, (ii) Pseudo-Soliloquy, (iii) Pseudo-monologue.

(i) মঞ্চে একা উপস্থিত থেকে নিজের জীবনের ও জগতের ব্যাথা-বেদনা, সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিমর্ষ, শোক-আনন্দ ইত্যাদির কথা বলা হলে তাকে Soliloquy বলা হয়। এই Soliloquy-র দ্বারা চরিত্রের গভীর মনোগত ভাবের প্রকাশ ঘটান হয়। এ জাতীয় সংলাপ অন্যের শ্রব্য নয়।[১০]

(ii) মঞ্চে উপস্থিত থেকে নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন ও বাস্তব পরিবেশ বহির্ভূত অন্য কোন সত্যের কথা (Reality) এককভাবে বল্লে তাকে Pseudo-soliloquy বলা হয়।[১১]

(iii) মঞ্চে একা উপস্থিত থেকে বক্তার কাছে ও দর্শকের কাছে প্রত্যক্ষ কোন বিদেহী আত্মা বা অমানবিক বস্তুর (Non-human) উদ্দেশ্যে কিছু বলা হলে তাকে Pseudo-Monologue বলা হয়।[১২]

'অপবারিতক' সংলাপের (concealed speaking) দ্বারা মঞ্চে উপস্থিত কারোর কানে কানে গোপন কথা বলা হয়। 'আকাশ বচন' সংলাপের দ্বারা মঞ্চে অনুপস্থিত চরিত্রের সঙ্গে সংলাপ বিনিময় করা হয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে নাট্যসংলাপ কখনই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নয়। এটা যেন স্বাভাবিক (as if real)। কারণ সংলাপকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে গেলে থিয়েটারের এক হাজার দর্শককে সমস্ত রকম সংলাপ শোনানো সম্ভব হোত না। কিন্তু মঞ্চে পরিবেশিত সমস্ত সংলাপই দর্শকদের শ্রুতিগোচর হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমন কি কোন দৃশ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে স্বাভাবিক কথা হয় মঞ্চে অভিনয়ের সময় সে সব কথাও দর্শকদের শোনাতে হয়। এই সব কারণেই মঞ্চের সংলাপ পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে পারে না। বাস্তবে যখন আমরা কথা বলি তখন সমস্ত কথাই গুছিয়ে বলি না। কিছু গুছিয়ে বলি, কিছু এলোমেলো বলি। এ সময় সংলাপের সাহিত্যিক গুণ আছে কিনা সে কথা আমাদের ভাববার একবারও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মঞ্চে এটা চলে না। সেইজন্যই মঞ্চের সংলাপ কখনই পুরো স্বাভাবিক হতে পারে না। বিভিন্ন যুগের নাট্যবিদ্‌রা এটা জানেন। সেইজন্যই প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন যুগের নাট্যসংলাপের বিভিন্ন প্রকারের প্রথা (convention) গড়ে উঠেছে। সেই সব প্রথা অনুযায়ী নাটকের সংলাপ সংযোজিত হয়ে আসছে। তাই নাটকে কোন জাতীয় সংলাপ গ্রহণ করা হবে কিংবা হবে না— সে কথা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। অনেকে বলে থাকেন যে 'জনান্তিক' ও 'আত্মগত' সংলাপ অস্বাভাবিক এবং এটা নাটকে থাকা উচিত নয়। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। সংলাপ ব্যবহারের রীতি নির্ভর করে যুগোচিত প্রচলিত রীতির উপর।

সংলাপ ও সংগীত।

সংগীত ও নাটকের সংলাপ। তবে এটা সুরেলা সংলাপ। সুর যুক্ত এই সংলাপ নাটকের ভাবকে গভীর ও বিস্তৃত করে তোলে। তাই সুরহীন সংলাপের দ্বারা চরিত্রের মনোভাব গভীরভাবে প্রকাশ করতে না পারলে এই সুর যুক্ত সংলাপের সাহায্য নিতে হয়। নাটকের মধ্যে এ ধরণের সংলাপ সংযোজনার ক্ষেত্রেও নাটকের স্থান, কাল, পাত্র ও পরিবেশ বিবেচনা করা একান্তই প্রয়োজন। সংগীতের মাধ্যমে একটি নির্দ্দিষ্ট ভাব ব্যক্ত হয়। একই সঙ্গে গানের ঠিক পূর্বে বা ঠিক পরে অন্য কোনভাবে সেইভাব ব্যক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। এতে পুনরাবৃত্তির দোষ ঘটে। যাত্রায় এটা চলতে পারে কিন্তু থিয়েটারে নয়। যাত্রায় চলার কারণ উন্মুক্ত আসরে কয়েক সহস্র লোকের মধ্যে সংলাপ পরিবেশন করায় অভিনেতার বক্তব্য হয়ত সকলে স্পষ্টভাবে শুনতে পায় না। সেইজন্যই সংলাপে যা বলা হয় সংগীতে তাকে আরও গভীর করে সুরের সাহায্যে দর্শকদের মনে ধরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু নাট্যমঞ্চের বন্ধ জায়গায় স্বল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে নাটক পরিবেশিত হয়। এখানে সমস্ত বক্তব্য সহজেই দর্শকরা শুনতে পারে, বুঝতে পারে। তাই এখানে এ জাতীয় পুনরাবৃত্তি বাঞ্ছনীয় নয়। নাটকে পুনরাবৃত্তির

দোষ ঘটলে নাট্যসংহতি ক্ষুন্ন হয়। নাটক Time Art বলেই এভাবে নাট্যসংহতি নষ্ট করা ঠিক নয়। যাত্রাও Time Art। কিন্তু সেখানে থিয়েটারের চেয়ে অনেক দীর্ঘ সময় ধরে অভিনয় চলে। তাই যাত্রায় পুনরাবৃত্তির সময় পাওয়া যায়।

নাটকে নাট্যকার ইচ্ছা করলে সংগীতের ব্যবহার করতেও পারেন আবার নাও করতে পারেন। তবে সংগীত নাটকের বিরোধী নয়। প্রাচীন ভারতের নাট্য-শাস্ত্রী ভরত নাটকে সংগীত ব্যবহারের কতকগুলি নির্দেশ দিয়েছেন। এলিজাবেথীয় যুগেও প্রয়োজনে নাটকে কণ্ঠ সংগীত ব্যবহার করা হোত। আধুনিক কালে বেরটোল্ট ব্রেখটের 'The Good women of Setzuan', 'The Caucasian Chalk Circle' প্রভৃতি নাটকেও কিছু কিছু গানের পরিচয় পাওয়া যায়। এখন উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বিভিন্ন নাট্যকারের নাট্য সংলাপের পরিচয় নেওয়া যেতে পারে ঃ—

● গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও নাট্যসংলাপ ॥

(১) সারল্য ও সুবোধ্যতা গিরিশচন্দ্রের নাট্য সংলাপের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এ ধরণের সংলাপের সাহায্যে নাট্য চরিত্রের জ্বালা, যন্ত্রণা ও ভাবাবেগের প্রকাশ হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে বলিদান নাটকের করুণাময়ের সংলাপ উল্লেখ করা যেতে পারে।

অন্যায় পণপ্রথার কাছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে করুণাময়কে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। এইজন্য তার মধ্যে একটা ক্ষোভ ও বেদনা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় কন্যার আত্মহত্যার ঘটনায় পিতা হয়ে কন্যাকে বাঁচাতে না পারার যন্ত্রণা ও বেদনা আরও গভীর হয়ে ওঠে। নৈরাশ্যে, ক্ষোভে, অভিমানে তার মন ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে থাকে। নিম্নের সংলাপের মধ্য দিয়ে করুনাময়ের এ ধরণের জ্বালা-যন্ত্রণাময় মানসিক অবস্থাকে পরিস্ফুট করা হয়েছে। যেমন—

(ক) করুণাময়—"এই যে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। তাই তো বলি, আমার শান্ত মেয়ে রাস্তায় যাবে না—লজ্জাশীলা রাস্তায় যাবে না। মা-মা, অন্ন দিতে পারি নেই, এই যে আকণ্ঠ জল খেয়েছ। আহা, জল খেয়ে কি শীতল হয়েছ? ওমা, বড় জ্বালা—বড় জ্বালা পেয়েছ; এখন কি জুড়িয়েছ? ওমা!..."

(বলিদান—চতুর্থ অংক, ৭ম দৃশ্য।)

বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তে দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে এবং দেশ যে ইংরাজদের অধীন হয়ে যাচ্ছে মীরকাসিম তা বুঝতে পারেন। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিনি বলিষ্ঠ-ভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। কিন্তু দেশীয় বেনিয়া ও রাজকর্মচারীগণের বিশ্বাস-

ঘাতকতায় ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি পরাজিত হন। দেশীয় লোকেদের বিশ্বাস-হন্তায় এই পরাজয়ের জ্বালা ও বেদনায় তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। নিম্নের সহজ সরল সংলাপের মধ্য দিয়ে মীরকাসিমের এহেন মানসিক অবস্থা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন—

(খ) কাসিম—"আবার জগৎ শেঠ, আবার রামনারায়ণ, আবার সকলে নরক হতে উঠে এসেছ; আবার বাঙলায় ষড়যন্ত্র কচ্ছ। জানি—জানি—তোমাদের পাপ—তোমাদের গঙ্গা জলে যাবে না, সহস্র বৎসর আগুনে পুড়ে যাবে না। (বেগে উত্থিত হইয়া) আমি আবার তোমাদের দণ্ড দেবো। গুরগিন—গুরগিন—যুদ্ধে চলো, ছিন্ন মস্তক হাতে লয়ে যুদ্ধে চলো,—চলো-চলো—যুদ্ধে চলো।"

(মীরকাসিম—পঞ্চম অংকের দশম দৃশ্য।)

(২) নাট্য সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকার গদ্য এবং পদ্য এই উভয় প্রকার সংলাপ ব্যবহার করেছেন। পদ্যময় সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে অভিনেতব্য অংশ মুখস্থ রাখার সুবিধার জন্য এবং আবেগময় অভিনয়ের সুবিধার জন্য নাট্যকার গিরিশচন্দ্র বিভিন্ন নাটকে মাইকেল প্রবর্তিত[১৩] ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের বহুল প্রচার করেন। বহু পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকে চরিত্রের মানসিক অবস্থা ফুটিয়ে তুলতে, জীবনের গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যার জন্য এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র এ জাতীয় সংলাপ ব্যবহার করেছেন। আবার ঐতিহাসিক নাটকেও এ ধরণের সংলাপ প্রয়োগের দ্বারা তিনি চরিত্রের মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার রূপ ও বিশিষ্ট ভাবাবেগকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

'তপোবল' নাটকে অবিচল মানসিক দৃঢ়তা সম্পন্ন বশিষ্ঠের স্বার্থ-লেশহীন, ঐশ্বর্যমণ্ডিত আত্মত্যাগ ও উদার হৃদয় সর্বস্ব ব্রাহ্মণ্য শক্তির পরিচয় লাভ করে বিশ্বামিত্র বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। নিজের মধ্যে এ সকল গুণ না থাকায় তিনি নিজেকে ধিক্কার দিতে থাকেন। বিশ্বা-মিত্রের এই চেতনাই তাঁর মানসিক পরিবর্তন আনে। নীচের পদ্যময় সংলাপের সাহায্যে বিশ্বামিত্রের এই মনোগত অবস্থাকে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন—

ক) বিশ্বামিত্র—"………

এিক, এিক, কি প্রপঞ্চ করি দরশন।
অটল মেরুর সম নেহারি ব্রাহ্মণ।
কি মহাপ্রভাবে হেন মহা আত্মত্যাগ।

এ মাহাত্ম্য অভাব আমার,
... ...
ধিক্ ধিক্ তপস্যায় মম।
ধিক্ ধিক্ রাজর্ষিত্ব—মহর্ষিত্ব লাভ।
শত ধিক্, ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ আকাঙ্ক্ষায়।
ক্রোধন স্বভাব, চণ্ডালত্ব করেছে আশ্রয়।
পদরেণু ব্রাহ্মণের করিতে গ্রহণ,
কদাচন যোগ্য নহি আমি।
হে ব্রাহ্মণ কর ক্ষমা,
ক্ষান্ত হও আহুতি প্রদানে।"

(তপোবল—পঞ্চম অংকের ষষ্ঠ দৃশ্য।)

মনকে গুহ্য মূল থেকে শীর্ষে সহস্রদল পদ্মে উন্নীত করার কঠিন দার্শনিক তত্ত্বকে নাট্যকার সহজ সরলভাবে এই ছন্দাশ্রয়ী সংলাপের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। দৃষ্টান্ত—

(খ) শংকর—"সত্য সত্য, এই তো নেহারি—
মন নিজ স্থান পরিহরি
ভ্রমে গুহ্য-লিঙ্গ-নাভিকুন্ড স্থলে,
কামপূর্ণ স্থান,—পাশবীয় ইচ্ছার প্রসূতি।
এই কলুষিত স্থানে ভ্রমে সদা মন।
সামান্য মক্ষিকা যথা পুরীষ প্রয়াসী,
সেইরূপ নিম্ন পদ্মদলে ভ্রমে মন,
জড়প্রায় নাহি কোন জ্ঞান।
হৃৎপদ্ম—যথা ব্রহ্মজ্যোতি দীপ্তিমান্—
বারেক না উঠিবারে চায়।
উঠ মন! তুমি মধুমক্ষিকার প্রায়,
হৃৎপদ্মে বসি হের
উর্দ্ধ্বে পদ্ম কণ্ঠমাঝে রাজিত ষোড়শদলে।
... ...
কর ষট্পদ্ম ভেদ,
ব্রহ্মরন্ধে হের মুক্তিপথ
ব্রহ্মরন্ধ্রে পথ—ব্রহ্মরন্ধে পথ
চল পদ্মপাদ—"

(শঙ্করাচার্য—চতুর্থ অংক, ষষ্ঠ দৃশ্য।)

অশোক খুব মাতৃপরায়ণ ছিলেন। পিতার স্নেহ পাবার জন্যও তাঁর অদম্য বাসনা ছিল। কিন্তু বারংবার পিতার হৃদয়হীন কঠোর আচরণে তাঁর পুত্র-সত্তা লাঞ্ছিত হয়ে পড়ে। তদুপরি তক্ষশীলার বিদ্রোহ দমন করে আসার পর পিতা বিন্দুসার তাঁকে পূর্ব প্রতিশ্রুতিমত তক্ষশীলার রাজ-অধিকার না দেওয়ায় এবং ভবিষ্যতে তাঁর রাজা হবার যোগ্যতা সম্পর্কে হীন মন্তব্য করায় অশোক মর্মাহত হন। আজন্ম পিতৃস্নেহে বঞ্চিত অশোকের মধ্যে তখন তীব্র অভিমান, ক্ষোভ, হতাশা দেখা দেয়। জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে কখনো তিনি নিজের জীবন বিনাশের জন্য উদযোগী হন, আবার কখন পিতার এরূপ অন্যায় রূঢ় ব্যবহারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য পিতার প্রতি এক আক্রমণাত্মক মনোভাব তাঁর মধ্যে গড়ে ওঠে। এই মনোভাব গভীরভাবে আন্দোলিত হতে থাকে। অশোকের এই মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নিম্নের আভিয়নিক ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দময় পদ্যসংলাপের সাহায্যে নাট্যকার মূর্ত্ত করে তুলেছেন। যথা—

(গ) অশোক—"কোথা ধর্ম; নামে মাত্র আছ কি জগতে ?
ভাগ্যহীন বহুজনে ধরে'এ ধরনী,
কিন্তু অতি দীন জন
পিতৃস্নেহে বঞ্চিত নহেক কদাচন।
আত্মহত্যা উপায় কি মম ?
বিদ্রোহী হৃদয়,
এত অপমানে ধৈর্য্য না ধরিতে পারে।
মাতৃস্নেহ মাতৃবাক্য বন্ধন কেবল,
নহে প্রজ্বলিত কোপানলে
ভস্মসাৎ করিতাম এ পাপ সংসার।
যেন এ পাপ ধরায়,
পিতা-পুত্র পুনরায় সম্বন্ধ না হয়।

কিন্তু এবে রাখি যদি এ ঘৃণ্য জীবন,
স্তম্ভিত করিব ধরা নিষ্ঠুর আচারে।
দেখিব দেখিব,
প্রবল শোণিত-স্রোতে ভিত্তি বসুমতী
হয় বা না হয় তার আচার বর্ত্তন ;"

(অশোক—দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য।)

(৩) নাট্যচরিত্রের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং পারিপার্শ্বিকতা অনুযায়ী তিনি চরিত্রানুগ সংলাপ ব্যবহারে সার্থকতা লাভ করেছেন। কলকাতার মধ্যবিত্ত,

নিম্নবিত্ত ও ঝি, চাকর—এ সকল নিম্নশ্রেণীর এবং চোর, নেশাখোর, ভিক্ষুক, ধাপ্পাবাজ, ভণ্ড প্রভৃতি বিপথগামী চরিত্রের স্বাভাবিক সংলাপ সংযোজনার ক্ষেত্রেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য্য নাটকে শঙ্করের পুরাতন ভৃত্য জগন্নাথ (১৷১, ৩, ২৷২), চন্ডালরূপী মহাদেব (২৷১), 'শাস্তি কি শাস্তি' নাটকের দুশ্চরিত্র মাতাল ঘেঁচী, (১৷২, ২৷৩, ৩৷১, ৩৷৩, ৬), 'গৃহলক্ষ্মী' নাটকের বারবণিতা কুমদিনী (১৷৬, ৪৷৩), চরিত্রহীন বেশ্যাসক্ত হীরু ঘোষাল, শরৎ (২৷৩, ৪৷৩), 'বলিদান' নাটকের দুশ্চরিত্র মাতাল লম্পট দুলালচাঁদ (১৷৩, ২৷১, ৩, ৬, ৫৷২), ইংরেজী শিক্ষিত বেশ্যাসক্ত মাতাল মোহিত (১৷২, ৫৷২৷২৷৩৷৬), কালী ঘটক (১৷২, ৩৷৬), ঝি (১৷৪, ২৷২, ৩), নিম্নরুচি সম্পন্ন গ্রামের দজ্জাল শাশুড়ী মাতঙ্গিনী (১৷৫), গোয়ালিনী (৪৷৭), 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের দানসা ফকীর (১৷১১, ৪৷৪) ইত্যাদি চরিত্রের সংলাপ উল্লেখযোগ্য। তিনি যথেষ্ট সমাজ সচেতন ছিলেন বলে তাঁর পক্ষে এ ধরণের চরিত্রের মুখে যথোচিত সংলাপ দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে।[১৪]

(৪) গিরিশচন্দ্রের নাট্যসংলাপের প্রকাশ ক্ষমতার ব্যাপ্তিও উল্লেখযোগ্য। সংলাপের মাধ্যমে নাট্যঘটনা ও চরিত্র যেমন প্রকাশলাভ করেছে তেমনি এর মধ্য দিয়ে দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সুষ্ঠু রূপ লাভ করেছে। দেশের তৎকালীন এ সকল অবস্থা সম্বন্ধে নাট্যকার যে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন তার পরিচয়ও সংলাপের মধ্যে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

ইংরেজদের কূট চক্রান্তে দেশের মধ্যে সে সময় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেশের সংহতি বিনষ্ট করছিল এবং ইংরেজদের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধির ফলে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়ছিল। এ সময় দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জাতিধর্মনির্বিশেষে এক হয়ে ইংরেজদের বিরোধিতা করার মধ্য দিয়ে তাদের চক্রান্তের জাল ছিন্ন করার প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক। সিরাজদ্দৌলা নাটকে সিরাজের নিম্নোক্ত সংলাপের মধ্য দিয়ে দেশের এই রাজনৈতিক অবস্থাকে পরিস্ফুট করা হয়েছে। যেমন—

(অ) সিরাজদ্দৌলা—"ওহে হিন্দু মুসলমান—
এস করি পরস্পর মার্জনা এখন,
সিংহাসনে হয় যদি সকত স্থাপিত,
বাঙলার নাহি ক্ষতি তাহে।
হয় যদি বিদ্রোহ সফল,
বাঙলায় বঙ্গবাসী হইবে নবাব।
কিন্তু সাবধান—

নাহি দিও ফিরিঙ্গিরে সূচ-অগ্র স্থান

*　　*　　*

বঙ্গের সন্তান হিন্দু মুসলমান,
বাঙ্গলার সাধহ কল্যাণ,
তোমা সবাকার যাহে বংশধরগণ—
নাহি হয় ফিরিঙ্গি নফর।
শত্রুজ্ঞানে ফিরিঙ্গিরে কর পরিহার,
বিদেশী ফিরিঙ্গি কভু নহে আপনার,
স্বার্থপর চাহে মাত্র রাজ্য অধিকার।
হও সবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত।"

(সিরাজদ্দৌলা—প্রথম অংক, পঞ্চম দৃশ্য।)

ইংরেজ আমলে দেশের মুৎসুদ্দি ও বেনিয়া সম্প্রদায় দেশের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক স্বার্থ পূরণ করার জন্য অধিক সচেষ্ট ছিল। এর জন্য তারা ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দেশের সর্বনাশ সাধন করতেও কুণ্ঠাবোধ করত না। তদুপরি দেশের মধ্যে ইংরেজ বণিকরা বিনা শুল্কে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে থাকায় দেশীয় লোকদের ছোট বড় সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমে ক্রমে ইংরেজদের করায়ত্ত হতে থাকে। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশ ভেঙে পড়ে। দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের এই সচেতনতা মীরকাশিম ও অন্যান্য চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

(আ) কাশিম—"ইংরাজের অযথা বাণিজ্য বিস্তারে প্রজার সর্বনাশ হচ্ছে।···এখন স্বদেশী বাণিজ্য বিনাশুল্কে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কচ্ছে,—তার কর্মচারীরাও জনে জনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফার্ম্মান দেখিয়ে শুল্ক প্রদান করে না···বেইমান দেশের লোক, নিজে অর্থ দিয়ে তাদের মুৎসুদ্দির পদ গ্রহণ করে,···শিল্পীদের পীড়ন করে দাদন নিয়ে মুচলেখা লিখিয়ে নেয়, বণিকদের নিকট মুচলেখা লিখিয়ে নিয়ে অল্পমূল্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে আর দশগুণ মূল্যে বিক্রয় করে। এতে সমস্ত প্রজা দিন দিন নিঃস্ব হচ্ছে···"

(মীরকাশিম—প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য।)

(ই) তামাকের মহাজন—"হুজুর, দেশী লোকের সকল ব্যবসাই ইংরাজ নিলে, —লবণ, সুপারি, ঘৃত, চাউল, খড়, বাঁশ, মৎস্য, চিনি, তামাক, পান, যে কাজে দেশী লোক দু পয়সা পেতো, কুঠীওয়ালা ইংরাজ সকল ব্যবসা কেড়ে নিলে।"

(মীরকাসিম—প্রথম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য।)

তৎকালীন সমাজের প্রচলিত রীতি নীতি না মেনে চললে সমাজের লোকেদের কাছ থেকে নানাবিধ কটূক্তি, তিরস্কার ও লাঞ্ছনা শুনতে হোত। এমন কি কোন ব্যক্তি সামাজিক অনুশাসনের বিরোধী কাজ করলে তাকে প্রকারান্তরে সমাজ থেকে একঘরে করে দেওয়া হোত। সে সময়ের সামাজিক বিধি ভেঙে প্রসন্নকুমার তার বিধবা কন্যা প্রমদার পুনর্বার বিয়ে দেয়। কিন্তু শশুড়বাড়ীর অত্যাচারে প্রমদা পিতৃগৃহে চলে আসতে বাধ্য হয়। এরূপ অবস্থায় প্রসন্নকুমার সামাজিক লাঞ্ছনার শিকার হন। প্রসন্নকুমারের নিম্নোক্ত সংলাপের মধ্য দিয়ে সমাজের এই বিশিষ্ট চাল-চিত্রটি পরিস্ফুট হয়েছে ঃ—

(ঈ) প্রসন্নকুমার—"আমার কি প্রায়শ্চিত্ত করবে? আমি মুখ দেখাব কেমন করে। পাড়ায় নাম উঠেছে—খ্রিশ্চান প্রসন্ন। ঘটক সাবধান করে গেছে মেয়েবাড়ীতে থাক্‌লে ছেলের সঙ্গে কেউ বে দেবে না।……
কারো কথা মানি নি,—জাত যাবার ভয় করিনি, এক ঘরে হবার ভয় করিনি। ভেবেছিলুম আবার মেয়ের ঘর-বর হবে, তা বেশ ঘর করে দিয়েছি……

লোকে ঘৃণা করে করুক, মুখ দেখাতে না পারি না পারবো, এইখানেই থাক। যত্ন করে বিষ কিনে এনে গুলেছি এখন গিলতে হবে। না মলে তো জুড়োবে না।"

(তৃতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য—শাস্তি কি শান্তি।)

৫) নাট্য চরিত্রের মনোগত অবস্থা, চরিত্রের উদ্দেশ্য ইত্যাদি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে নাট্যকার কখনও কখনও আত্মগত সংলাপ ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টান্ত যোগে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে ঃ—

রাজবল্লভ ইত্যাদির সহযোগে ঘসেটি বেগম তার পালিত পুত্র এক্রামদ্দৌলাকে বাংলার নবাবপদে বসাতে সচেষ্ট হন। কিন্তু আলীবর্দ্দির মৃত্যুর পর তাঁর অনুরোধ অনুসারে রাজ-অমাত্য ও অন্যান্য প্রধানগণ সিরাজদ্দৌলাকেই বাংলার নবাব পদে অভিষিক্ত করেন। সিরাজদ্দৌলাকে সরিয়ে দিয়ে ঘসেটি বেগম মৃত এক্রামদ্দৌলার শিশুপুত্রকে সিংহাসনে বসাবার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার জন্য সিরাজদ্দৌলা মুর্শিদাবাদে ঘসেটি বেগমের মতিঝিল প্রাসাদের অধিকার গ্রহণ করেন এবং ঘসেটি বেগমকে সেখান থেকে নিজের প্রাসাদে নিয়ে আসেন। এতে ঘসেটির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। আশাহত ঘসেটির মধ্যে নৈরাশ্য বোধ জাগরিত হয়। সিরাজদ্দৌলার মাতা আমিনার সৌভাগ্য দর্শনে তিনি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। সিরাজদ্দৌলার প্রতি প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে তাঁর সর্বনাশ সাধনের বাসনায় ঘসেটি বেগম তৎপর হন। সিরাজদ্দৌলার

রাজ-অন্তপুরের এই বন্দী অবস্থা থেকে উদ্ধারের কোন আশা না থাকায় তিনি গভীর হাতাশায় নিমজ্জিত হন। ঘসেটি বেগমের এই মনোগত অবস্থা নিম্নের আত্মগত সংলাপের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়েছে। যথা—

(অ) ঘসেটি—"শিরায় শিরায় অগ্নি—শিরায় শিরায় অগ্নি! ছিঃ ছিঃ, এত অদৃষ্টে ছিল, আমিনার বাঁদী হলেম! আমিনার পুত্র সিংহাসনে, আমার একাম-দ্দৌলা কবরে! আমিনা নবাবমাতা, আমিনার পুত্রের গৃহে আমি বন্দী। ……আমি নবাবের জেষ্ঠা কন্যা, আমার ছায়া স্পর্শ করতে লোকে ঘৃণা করে, আমিনার ছায়ায় সেলাম দেয়!……আমার গুপ্ত ধনাগার লালকুঠি ইষ্টক চূর্ণে আবৃত!……থাকো—থাকো। যারা হত হয়েছো, অশরীরী অবস্থায় ধনাগার রক্ষা করো; সিরাজের শত্রুর হস্তে ধনাগার অর্পণ করো, যারা সিরাজের মস্তক ছেদন করে ভূতলে পাতিত করবে তাদের হস্তে অর্পণ করো। …আমি বন্দী, সিরাজের বাঁদী, সহায় সম্পত্তিহীনা; আমার গর্ভধারিনী মাতা কারারক্ষক! এমন কেউ নাই, যে আমায় এই কারাগার হতে উদ্ধার করে!"

(সিরাজদ্দৌলা, দ্বিতীয় দৃশ্য, দ্বিতীয় গর্ভাংক।)

(আ) এই প্রসঙ্গে মীরকাসিম নাটকে ইংরেজদের অত্যাচারের হাত থেকে প্রজাদের বাঁচাবার জন্য এবং ইংরেজদের দমন করার জন্য প্রজাবৎসল মীরকাসিম কর্তৃক দেশের রাজদণ্ড ধারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রসঙ্গে মীরকাসিমের-আত্মগত সংলাপ (১।৩), শঙ্করাচার্য্য নাটকে গুরুদেব গোবিন্দের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করার পূর্বে গুরু গোবিন্দের মাহাত্ম্য কীর্তন প্রসঙ্গে শংকরের আত্মগত সংলাপ (১।৭) প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

(৬) বিদেহী চরিত্র সম্পর্কে অন্য চরিত্রের মনোগত অভিপ্রায়কে গভীরভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য নাট্যকার কোথাও কোথাও Pseudo Soliloquy-র ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

'বলিদান' নাটকে পণপ্রথা সর্বস্ব বিবাহ ব্যবস্থায় পিষ্ট হয়ে করুণাময় আর্থিক দিক দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। তথাপি করুণাময় মেয়েকে বাঁচাতে পারেনি। কন্যার আত্মহত্যার ঘটনায় পিতা করুণাময় ক্ষোভে, দুঃখে, নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ে। জীবনের প্রতি তার বিতৃষ্ণা আসে। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে করুণাময় আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে মৃত কন্যার আত্মার সঙ্গে নিজের আত্মার মিলন ঘটাতে চায়। বাস্তব জীবন ও জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন এই পরলোক জগতে গিয়ে নিজের অভিপ্রায় পূরণের এই আর্তি নিম্নের Pseudo Soliloquy-র সাহায্যে নাট্যকার হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছেন।

অ) —"…মা এসেছ? আমি যাচ্ছি; খিড়কিতে বড় ভীড়, তাই এখানে এসেছি। অপেক্ষা করো, আমি যাচ্ছি…তুমি খেতে পাওনি, তাই জল খেয়ে পেট ভরিয়েছিলে। আমি তো খাচ্ছি, আমার জল খাবার প্রয়োজন নাই।…মা ব্যস্ত হয়ো না, অধিক বিলম্ব নাই। কিহে, আমার মতন অভাগা অনেক আছে, তাদের কাছে যেতে হবে, তাই ব্যস্ত হচ্ছ? বটে বটে একটু অপেক্ষা করো। এই আমি প্রস্তুত হচ্ছি; কোথা হতে ঝুলবো? ঐ জানালা থেকে। ঠিক অপেক্ষা করো, অপেক্ষা করো… আর বিলম্ব নাই… (বলিদান—৫ম অংক, ১ম দৃশ্য)

(৭) গিরিশচন্দ্রের নাট্যসংলাপ উপরোক্ত গুণে গুণান্বিত হলেও তাঁর নাট্যসংলাপের মধ্যে কিছু ত্রুটির পরিচয় পাওয়া যায়। নাটকের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর নাট্যসংলাপ সংহত ও সংযত রূপ ধারণ করতে পারেনি। এর ফলে নাট্যসংলাপ কার্যকারণহীন ভাবে অতি বিস্তৃত হয়ে পড়ায় নাট্যবস্তু ও নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে সংলাপের পারস্পরিক ঐক্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়েছে। দৃশ্যমধ্যস্থ নাট্য-ঘটনার গভীরতা খানিকটা ব্যাহত হয়েছে এবং নাট্যক্রিয়া ও নাট্যসংলাপের গতি কিঞ্চিৎ শ্লথ হয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে সিরাজদ্দৌলা নাটকে পলাশীর প্রাঙ্গণে নবাবের সৈন্যসজ্জায় ভীত ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভকে নবাবের প্রধান প্রধান সেনানায়কগণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার দ্বারা ক্লাইভকে নবাবের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধে উদবুদ্ধ করার প্রসঙ্গে জহরার সংলাপ (৪।১), সওকতজঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী নবাবকে প্রেম ও ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদনের দ্বারা অভ্যর্থনা করার জন্য উন্মুখ লুৎফার সংলাপ (২।৩), 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকে ফেরঙ্গজীকে দেশের স্বাধীনতা ও স্বজাতি ধর্ম রক্ষায় উদবুদ্ধ করে তোলার প্রসঙ্গে শিবাজীর সংলাপ (১।১), শিবলোকে গমন করার উদ্দেশ্যে প্রায়োগবেশনে দেহত্যাগ করার সন্ধিক্ষণে শিবাজীর প্রতি তাঁর মা জিজাবাঈয়ের সংলাপ (৫।২), শিবাজীর 'ছত্রপতি' রূপে অভিষেক করার সময় শিবাজীকে আদর্শায়িত রাজকর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার প্রসঙ্গে তাঁর প্রতি গুরুদেব রামদাস স্বামীর সংলাপ (৪।৫), 'শঙ্করাচার্য' নাটকে ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে 'হাবার' সংলাপ (৫।১), 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকে জীবনের অতীত অধ্যায়ের কথা প্রসঙ্গে হরমণির সংলাপ (১।১)…প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গিরিশযুগে দলগত অভিনয় অপেক্ষা ব্যক্তিগত অভিনয়ের প্রতি নাট্য দর্শকরা বেশী আকর্ষণ অনুভব করতেন। তাই প্রধান অভিনেতারা যাতে অনেকক্ষণ ধরে দর্শকদের সামনে মঞ্চে উপস্থিত থেকে নিজেদের অভিনয় কৌশল দেখাতে পারেন সেদিকে লক্ষ্য রেখেও নাট্যসংলাপ রচনা করা হোত। নাটকের মধ্যে সংলাপ দীর্ঘ হয়ে পড়ার এটা একটা কারণ বিশেষ।

এছাড়া সংলাপ দীর্ঘ হবার মূলে তৎকালীন দর্শকদের রুচিও বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল।[১৫]

(৮) সহজ সরল সংলাপ ব্যবহার করতে করতে কখনো কখনো নাট্যকার গিরিশচন্দ্র হঠাৎ অলঙ্কার বহুল ও সন্ধি সমাসযুক্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ ধরণের সংলাপ চরিত্রকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। যেমন—

'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকে স্বামীর মঙ্গলকামনায় তানাজীর পত্নী লক্ষ্মী বনমধ্যস্থ কালীমন্দিরে পূজো দিতে যান। সে সময় তার উপর মোঘল সৈন্যের আক্রমণ প্রতিহত করতে তিনি মায়ের খড়্গ হস্তে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। লক্ষ্মীর এই রূপ-দর্শনে বিস্ময়াভিভূত তানাজীর সংলাপ এবং পরে মোঘল সৈন্যদের সংহারসাধনে কঠোর প্রতিজ্ঞা পালন প্রসঙ্গে লক্ষ্মীর সংলাপ এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

(অ) তানাজী—"কই, শত্রু কোথা? এ কি রণ-রঙ্গিনী মূর্তি, মুক্তকেশী, অসিকরা ভৈরবী। ভীমা আরক্ত নয়না, কে এ শত্রু সংহারিণী; মার সহচরী কি আবির্ভূতা হয়ে শত্রু সংহার করছেন। একি লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, তুমি হেথায় কেন?"

... ...

লক্ষ্মী—"যখন পুরুষেরা দেব-দেবী মন্দির রক্ষা করতে অক্ষম, তখন রমণীরা খড়্গ ধারণ করে মন্দির রক্ষা করেন। ...আজ হতে আর আমি অন্তঃপুরবাসিনী নই, আমি রণস্থল বিহারিণী, ভীরুজন উৎসাহ-বর্দ্ধিনী, আমি রণরঙ্গিণী, জগদম্বার সহচরী।"

(ছত্রপতি শিরাজী—দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য)।

(আ) পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত বন্দী সিরাজের হত্যার মধ্য দিয়ে সিরাজের প্রতি জহরার প্রতিহিংসার বাসনা চরিতার্থ হয়। তখন সে সাধারণ পতি-পরায়ণা রমণী। এই মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে জহরার নিম্নোক্ত সংলাপ সন্ধি-সমাসযুক্ত শব্দের দ্বারা গঠিত হবার ফলে চরিত্রের ভাবাবেগের প্রকাশ সহজ—সাবলীল হতে পারে নি।

জহরা—"আমার ঘোরা শেষ হয়েছে, এখন তো আর জহরা নই, প্রেমিকা হোসেনা,—হোসেনের পদ-সেবিকা। প্রতিবিধিৎসা জহরে জর্জরিভুত হয়ে জহরা নাম গ্রহণ করেছিলেম। সে জহর নবাব শোণিতে ধুয়ে গিয়েছে, এখন আমি পতি পরায়ণা রমণী।"

(সিরাজদ্দৌলা—পঞ্চম অংক, চতুর্থ গর্ভাংক।)

(৯) নাটকে সংগীত রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের কতিপয় বিশেষত্ব বিদ্যমান। তিনি নাটকের প্রয়োজনে গানের দ্বারা কোথাও চরিত্রের বিশিষ্ট ভাবকে

সমৃদ্ধ করেছেন, কখনো কখনো নাটকের বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত দান করেছেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নাটকের পরিবেশ সৃষ্টি করতে গানের সংযোজন করেছেন।

শঙ্করাচার্য্য নাটকের নিম্নোক্ত গীতিটির বিশেষ নাট্যগুরুত্ব বিদ্যমান।

"স্বপন-গঠিত সময় বহিয়ে স্বপন গঠিত স্থানে।
অষ্ট বরষ শোক-হরষ জাগাও মানব প্রাণে ।।
... ...
মানব বেদনা স্মরণে, স্বপন ঘোর হরণে,
জ্ঞান-কিরণ দানে—
নর শঙ্করে হের ধরাপরে,
জাগাইতে মোহ নিদ্রিত নরে,
বিমল বেদগানে ।।"

এই গানের দ্বারা নাটকের মূল বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত দান করে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র দর্শকগণের মধ্যে নাটকের প্রতি ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করেছেন। এই নাটকের পঞ্চম অংকের ষষ্ঠ দৃশ্যের বিকটাগণ ও ভূতপ্রেতগণের গান দুটিও বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। অবিদ্যার সাধক কাপালিক ক্রকচকে শঙ্করাচার্য্য দমন করতে উদ্যত হলে ক্রকচ তার সহচর ভূত প্রেত ও বিকটাগণকে আহ্বান করে একটা অলৌকিক পরিবেশে অলৌকিক শক্তির দ্বারা শঙ্করাচার্য্যকে পরাভূত করতে চেয়েছিল। তাই এ সকল অশরীরীর আবির্ভাবের দ্বারা তাদের ভয়ংকর পৈশাচিক প্রবৃত্তির মঞ্চ মায়া (illusion) সৃষ্টির সাহায্যে মঞ্চে লোমহর্ষক নাট্যপরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র বিকটাগণ ও ভূত-প্রেতগণের নিম্নোক্ত গানের মাধ্যমে এই পরিবেশ সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হন।

।। বিকটাগণের গীত ।।

খুট্ খুট্ খুট্ খুট্ গুট্ গুট্ গুট্ গুট্
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝেঁকে ঝেঁকে।
কিল্ কিল্ কিল্ কিল্
খিল্ খিল্ খিল্ খিল্
ডেকে হেঁকে এঁকে বেঁকে ।।
... ...

।। ভূত প্রেতগণের নৃত্যগীত ।।

দে—দে রে দে রে দে না হানা।
মার্ মার্ মার্ মার্ ধর্ ধর্ ধর্ ধর্,
কাট্ কাট্ কাট্ কাট্ খা না খা না ।।

তড়্ তড়্ তড়্ তড়্ তোড়ে তাড়.
মাটী ফাড় পাড় পাহাড়,
মোচ্‌ড়া ঘাড়, চিবো হাড়,—
গুমে গুমে পোড়া হাওয়া।
... ...

'মীরকাসিম' নাটকের প্রথম অংকের দ্বিতীয় গর্ভাংকের তারার গানটিরও একটি বিশিষ্ট দিক আছে। তারার কণ্ঠে—"পরাধীনা জননী আমার লাঞ্ছিত সন্তানগণে পীড়নে কঙ্কাল সার।।"—এই গানের দ্বারা নাট্যকার পরাধীনা দেশমাতার দুর্দশার প্রতি দেশবাসীকে ওয়াকিবহাল করে তুলে তার প্রতিকারের জন্য দেশবাসীকে সচেষ্ট হতে আহ্বান জানিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে তৎকালীন আন্দোলনের পটভূমিকায় নাটকটি রচিত। দর্শকরাও এই নাটক দেখে দেশাত্ম-বোধে উদবুদ্ধ হতে চেয়েছেন। তাই নাটকের পটভূমিকার সঙ্গে এই গানটির গভীর সামঞ্জস্য বিদ্যমান। এছাড়াও এই নাটকের প্রথম অংকের চতুর্থ গর্ভাংকে 'তারার' গানটিও ("দুঃখিনী সন্তান কি আছে তোমার। দান—প্রাণদান রুধির ধার, তাপিতা মাতা তাপ নিবার···")—এই পটভূমিকার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এ সকল গানের মধ্য দিয়ে 'তারা' চরিত্রটি চারণ কবির মত দেশবাসীর মধ্যে দেশাত্ম-বোধের উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে।

ইংরেজদের চরিত্র সম্পর্কে এবং তাদের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি সম্পর্কে নাট্যকার দেশবাসীকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে 'মীরকাসিম' নাটকে নর্ত্তকীগণের নিম্নোক্ত গানটি খুবই উল্লেখযোগ্য। এই গানটির দ্বারাও স্বদেশী আবহাওয়াকে নাট্যকার সমৃদ্ধ করেছেন।

"বাঙ্গলায় বসেছে কোম্পানী।
রাজায়-প্রজায় সেলাম বাজায়,—
কৃপায় হয় ধনী মানী।।
... ...
দণ্ড ধরে, দণ্ড করে,
শঠের টোটে কারদানি।।
রোষে রাজা হয় ভিখারী,
ইঙ্গিতে হয় মুকুটধারী
তোপের মুখে হুকুমজারি,
ভাঙ্গে গড়ে রাজধানী।।"

(মীরকাসিম—প্রথম অংক, সপ্তম গর্ভাংক।)

'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকে নারীগণের কণ্ঠে গীত—'চল চল কুলনারী।… বীরসাজে সাজায়ে কুমারে, হাতে দিব তরবারি…' (২।৭), পুতলার কণ্ঠে গীত যথাক্রমে—"মাতৃভক্তি বিজয়মালা পরে যে গলায়।…মাতৃকার্য্যে জীবন সঁপে, কীর্তিমান্ ধরায়…" (২।৭), ও তৃতীয় অংকের দ্বিতীয় গর্ভাংকে—"জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী। মার ছেলে যে মাকে ডাকে / কীর্তি গায় তার রবি শশী।" —ইত্যাদি গানের দ্বারা মোগলের আক্রমণের হাত থেকে মারাঠা রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মারাঠাবাসীকে উদ্দীপ্ত করা হয়েছে এবং এর দ্বারা নাট্যকার প্রকারান্তরে ইংরেজ কবলিত ভারতমাতার শৃংখল মোচনের জন্য দেশবাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে তাঁর যুগোচিত ধর্ম পালন করেছেন।

তবে গিরিশচন্দ্রের নাটকে সংযোজিত সকল গানই সুপ্রযুক্ত হয়েছে একথা ঠিক বলা যায় না। নাটকের মধ্যে কোথাও কোথাও গানের ঠিক পরেই সেই গানেরই বক্তব্য সংলাপের মাধ্যমে বিস্তৃত করে বলা হয়েছে। আবার কখনো কখনো প্রথমে সংলাপের দ্বারা নাটকের ঘটনা বা বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করার পরই আবার গানের দ্বারা সেই একই ঘটনা বা বিষয়বস্তুকে বিধৃত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের চতুর্থ অংকের চতুর্থ দৃশ্যে লুৎফার একটি গানের কথা দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

পলাশীর যুদ্ধের সময় সিরাজদ্দৌলাকে অনেকক্ষণ দেখতে না পেয়ে বেগম লুৎফা অতিশয় উদ্বিগ্ন ও চিন্তাকুল হয়ে ওঠেন। নিম্নোক্ত সংলাপের সাহায্যে লুৎফার এই মনোভাব প্রকাশিত হয়ঃ—

লুৎফা—"আমার অন্তরে অনবরত হাহাকার ধ্বনি, আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠছে, সকলই যেন ঘোরতর তিমিরাচ্ছন্ন জ্ঞান হচ্ছে, চতুর্দিকে অমঙ্গল ধ্বনি, যেন পৈশাচিক উল্লাসে রাজপুরী পরিপূর্ণ" (৪।৪)।

ঠিক এর পরই গানের মাধ্যমে লুৎফার অন্তরের এই চিন্তা ও ভাবনাকে আবার তুলে ধরা হয়েছে।

লুৎফা— "কেন প্রাণ ওঠে হাহাকার
মলিন হৃদয়াশশী নেহারী আঁধার।
এ পুর শ্মশান সম ;
নগরে নিবিড়তম
শুনি যেন হয় ভ্রম করুণ রোদন কার।"

(চতুর্থ অংক, চতুর্থ দৃশ্য।)

এর ফলে সংলাপ ও সংগীতে পুনরাবৃত্তির দোষ ঘটেছে। গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটকে জোবির কণ্ঠে গীত "কলঙ্ক যার মাথার মণি" (৩।৪) এবং "শাস্তি কি শান্তি" নাটকে হরমণির মুখে গীত—"যদি শরণ নিতে পারি রাঙ্গা পায়" (৪।৫)—

এই গান দুটির মধ্যে এ ধরণের পুনরাবৃত্তির দোষ দেখা যায়। গ্রন্থের আলোচ্য সময় সীমার মধ্যে রচিত গিরিশচন্দ্রের বহু নাটকে এ জাতীয় সংগীত বিদ্যমান। এ সংগীতগুলি অনেকাংশে নাট্যসংহতিকে ক্ষুন্ন করেছে। থিয়েটারি নাটকে এটা বাঞ্ছনীয় নয়। তথাপি তৎকালীন থিয়েটারের দর্শকদের সংগীত পিপাসা চরিতার্থ করার জন্যই গিরিশচন্দ্র এগুলি নাটকে সংযুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

খ) নাট্যসংলাপ ও দ্বিজেন্দ্রলাল ॥

১) নাট্য সংলাপ রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিশিষ্টতা উল্লেখযোগ্য। নাট্যবৃত্তকে লক্ষ্যমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর নাট্যসংলাপ রচনার মুন্সিয়ানা উল্লেখযোগ্য। সংলাপের মাধ্যমে তিনি নাট্যক্রিয়ার বর্তমান অবস্থাকে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে এই ক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত অতীত ঘটনা সম্পর্কে তিনি নাটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাট্যক্রিয়ায় ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করেছেন।

"নুরজাহান" নাটকে সেলিম সম্রাট পদে অভিষিক্ত হলে ভাই আসফ মারফৎ নুরজাহান সে সংবাদ লাভ করেন। নুরজাহান তখন শের আফগানের বধূ মেহেরুন্নিসা। আসফের কাছ থেকে সেলিমের সম্রাট হবার খবর পাওয়া মাত্রই সেলিমের সঙ্গে তাঁর জীবনের পূর্ব-কথা স্মরণে আসে। 'নুরজাহান' চরিত্রের নিম্নোক্ত সংলাপের মাধ্যমে নাট্যকার চরিত্রের অতীত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত দান করে নাট্য ঘটনায় ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করেছেন।

(অ) নুরজাহান—"সেলিম সম্রাট! আবার সে কথা মনে আসে? —না, সে চিন্তাকে আমি মনে আসতে দেব না—না-না-না! সে প্রথম যৌবনের একটা খেয়াল মাত্র। এখন আবার সে চিন্তা কেন! সেলিম সম্রাট, তাতে আমার কি? আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি?"

(প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য।)

(২) নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সংলাপের সাহায্যে নাটকের ভবিষ্যৎ নাট্য-ক্রিয়ারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে "সাজাহান" নাটকের ঔরংজেবের একটি বিশিষ্ট সংলাপ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

দিল্লীর সিংহাসন লাভের জন্য ঔরংজেব তৎপর হয়ে ওঠেন। মোরাদকে নিজের আয়ত্তে আনার পর দারার সঙ্গে তাঁর সম্মুখ যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। সে যুদ্ধে ঔরংজেবের জয়লাভের সম্ভাবনা খুবই কম থাকায় ঔরংজেব এ বিষয়ে চিন্তান্বিত হন। এই দুশ্চিন্তার আবর্তনের ফাঁকে ফাঁকে আশা নিরাশার দোলায় দোদুল্যমান ঔরংজেব অবশেষে যেমন করেই হোক যুদ্ধে জয়ী হবার দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নিম্নের সংলাপের মধ্য দিয়ে ঔরংজেবের এরূপ মনোভাবের পরিচয় দান করে নাট্যকার ভবিষ্যৎ নাট্যক্রিয়ার প্রতি আলোকপাত করেছেন।

(অ) ঔরংজেব—'আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। —ঝড় উঠবে। —একটা নদী পার হয়েছি, এ আর এক নদী—ভীষণ কল্লোলিত তরঙ্গ-সঙ্কুল। এত প্রশস্ত যে তার ওপার দেখতে পাচ্ছি না। তবু পার হতে হবে—এই নৌকা নিয়েই।"

(সাজাহান—প্রথম অংক, পঞ্চম দৃশ্য।)

(৩) নাট্যকারের নাট্যসংলাপ চরিত্রের উদ্দেশ্য ও তার চারিত্রিক গুণগুলিকে পরিস্ফুট করে তুলেছে। উদাহরণ যোগে বিষয়টি আলোচনা করা যাক। আকবরের কাছ থেকে চিতোর উদ্ধার করাই রাণা প্রতাপসিংহের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু ন্যায়বান, বিবেকবান, নীতি পরায়ণ, বীর, সাহসী উদারচেতা রাণা প্রতাপ-সিংহ ন্যায়যুদ্ধের মাধ্যমেই একাজ সম্পন্ন করতে চান। চরিত্রের মুখে নিম্নোক্ত সংলাপ প্রয়োগের দ্বারা চরিত্রের এই উদ্দেশ্য ও তাঁর উপরোক্ত গুণগুলিকে নাট্যকার তুলে ধরেছেন।

(অ) রানা প্রতাপসিংহ—"আকবর! অন্যায় সমরে, গুপ্তভাবে জয়মলকে বধ করে চিতোর অধিকার করেছ। আমরা ক্ষত্রিয়; ন্যায় যুদ্ধে পারি তো চিতোর পুনরধিকার কর্ব্ব। অন্যায় যুদ্ধ কর্ব্ব না। তুমি মোগল, দূরদেশ থেকে এসেছো। ভারতবর্ষে এসে কিছু শিখে যাও। —শিখে যাও ধর্ম্মযুদ্ধ কাকে বলে; শিখে যাও—একাগ্রতা, সহিষ্ণুতা, প্রকৃত বীরত্ব কাকে বলে; শিখে যাও—দেশের জন্য কি রকম করে প্রাণ দিতে হয়।"

(রাণা প্রতাপসিংহ—প্রথম অংক, প্রথম দৃশ্য।)

(৪) চরিত্রের মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াও দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যসংলাপের মধ্য দিয়ে সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। দৃষ্টান্তযোগে এ বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

"নূরজাহান" নাটকে নূরজাহান ক্ষমতালোভী ছিলেন। জাহাঙ্গীরকে বিয়ে করে তাঁর সে উদ্দেশ্য পূরণের সুযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু নূরজাহান তখন নিহত-শের আফগানের 'স্ত্রী' ও কন্যা লায়লার 'মা'। একদিকে জাহাঙ্গীরকে বিয়ে করে সম্রাজ্ঞীত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বারা রাজ্যের সকল ক্ষমতাকে করায়ত্ত করার জন্য নূর-জাহানের মানসিক প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে কন্যার কাছে তাঁর মাতৃত্বের সম্মান রাখা এবং স্বামী শের আফগানের বধূ হিসাবে তাঁর বধূ সত্তার সম্মান অক্ষুন্ন রাখার চিন্তাও তাঁকে আচ্ছন্ন করে। এই একাধিক বিপরীতধর্মী চিন্তার টানাপোড়নে তাঁর মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া নিম্নের সংলাপের মাধ্যমে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

(অ) নূরজাহান—"ভারতের অধীশ্বরী! —না, একথা ভাবাও পাপ। কিন্তু আমার ভবিষ্যতে নিষ্ফল রোদন ছাড়া কি আর কিছুই নাই! না, এ

বিষয়ে আমি চিন্তা কর্ব্ব না। —উঃ অসহ্য গরম।...মানুষের মধ্যে কি দুটো মানুষ আছে! তা না হলে অশ্রান্ত দ্বন্দ্ব চলছে কার সঙ্গে? —উঃ কি গরম। —না, আমি কখনও তা কর্ব্ব না। এবার আমার হৃদয়কে দৃঢ় করেছি। আমার এ সংকল্প হতে আর কেউ আমায় বিচলিত কর্ত্তে পার্ব্বে না। এ বিষয়ে আমার একটা সম্মানের ঋণ আছে—আমার নিজের কাছে, আমার নিহত স্বামীর কাছে। —কখনও না।"

(নূরজাহান—দ্বিতীয় অংক, পঞ্চম দৃশ্য।)

(৫) নাট্যসংলাপের সুষ্ঠু গ্রন্থনার দ্বারা নাট্যকার চরিত্রের ভাবাবেগকে গভীর ভাবে মূর্ত করে তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে 'সাজাহান' নাটকের নাট্যসংলাপ বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

'সাজাহান' নাটকে স্নেহান্ধ সাজাহান পুত্রের কৃতঘ্নতায় মর্মাহত হন। ঔরংজেব কূটকৌশলে বৃদ্ধ পিতা সাজাহানকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং তাঁকে বন্দী করে রাখেন। তদুপরি ঔরংজেব সাজাহানের জ্যেষ্ঠ ও প্রিয়পুত্র দারাকে বন্দী করে তাঁকে হত্যা করার আয়োজন করেন। ঔরংজেবের এই ঘৃণ্য চক্রান্তের কথা কন্যা জাহানারার কাছ থেকে জানতে পেরে বন্দী সাজাহানের পিতৃহৃদয় বেদনায় বিদীর্ণ হয়ে যায়। ঔরংজেবের কাছ থেকে বন্দী দারাকে উদ্ধার করার তীব্র বাসনায় সাজাহান গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণের জন্য তৎপর হন। কিন্তু বন্দী থাকার ফলে তাঁর বাসনা বাস্তবায়িত হতে পারেনি। বাসনা পূরণের ব্যর্থতায় সাজাহান হতাশায়, বেদনায়, ক্ষোভে, এবং নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়েন। তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। প্রকৃতি-জাত শক্তি ও বস্তুগুলির সাহায্যে একটা ধ্বংসাত্মক শক্তির সৃষ্টি করে তার দ্বারা তিনি অকৃতজ্ঞ পুত্র ঔরংজেবকে আঘাত করতে চান। মানবতা ও নৈতিকতার বিরুদ্ধে ঔরংজেবের অনৈতিক ও অমানবিক অশুভ প্রবৃত্তি যে অন্ধকারময় জগতের সৃষ্টি করেছে তাকে তিনি প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যে ধ্বংস করতে চান। নিম্নোক্ত সংলাপের সাহায্যে সাজাহানের এই হৃদয়বিদারক বেদনামণ্ডিত ভাবাবেগকে গভীরভাবে ব্যক্ত করে তাকে অতলস্পর্শী করে তোলা হয়েছে।

(অ) সাজাহান—"ইচ্ছা কর্চ্ছে জাহানারা, যে এই রাত্রির ঝড় বৃষ্টি অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে একবার ছুটে বেরোই। আর এই শাদা চুল ছিঁড়ে, এই বাতাসে উড়িয়ে এই বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দিই। ইচ্ছা কর্চ্ছে যে আমার বুকখানা খুলে বজ্রের সম্মুখে পেতে দিই। ইচ্ছা কর্চ্ছে যে এখান থেকে আমার আত্মাকে টেনে ছিঁড়ে বার করে তা ঈশ্বরকে দেখাই! ঐ আবার গর্জন! মেঘ! বারবার কি নিস্ফল গর্জন কর্চ্ছ? তোমার আঘাতে পৃথিবীর বক্ষ খান খান করে দিতে পারো? অন্ধকার? কি অন্ধকার হয়েছো! তোমার পিছনে ঐ সূর্য্য নক্ষত্রগুলোকে একেবারে

গিলে খেয়ে ফেলতে পারো? বৃষ্টি! পড়ছো তো অশ্রান্ত ধারে; এই কুৎসিত জগৎকে ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিতে পারো?"

(সাজাহান—পঞ্চম অংক, তৃতীয় দৃশ্য।)

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পুত্রের জঘন্য কৃতঘ্নতার আঘাতে উন্মত্ত সাজাহান প্রাকৃতিক বস্তুগুলিকে আহ্বান করে একটা বিস্ফোরণ ঘটাতে চেয়েছেন। শেক্সপীয়ারের 'কিং লিয়ার' নাটকে সন্তানের অকৃতজ্ঞতায় মর্মাহত 'কিং লিয়ারও' প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্যে দুর্যোগ সৃষ্টির জন্য প্রকৃতির কাছে আবেদন করেছেন। 'কিং লিয়ার'-এর সংলাপের মূলগত ভাবের সঙ্গে সাজাহানের সংলাপের মূলগত ভাববস্তুর ঐক্য বিদ্যমান। এক্ষেত্রে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল যে শেক্সপীয়ারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন সে কথা বলা যেতে পারে। 'সাজাহান' নাটকের সাজাহান চরিত্রের আর একটি সংলাপের উদ্ধৃতির দ্বারা বিষয়টি পরিস্ফুট করা যেতে পারে। যেমন—

(আ) সাজাহান—"সূর্য্য! তুমি এখনো আকাশের উপরে কেন? নির্লজ্জ! নেমে এসো! একটা মহা সংঘাতে তুমি চূর্ণ হয়ে যাও। ভূমিকম্প! তুমি ভৈরব হুঙ্কারে জেগে উঠে এ পৃথিবীর বক্ষ ভেঙে খান খান করে ফেল। একটা প্রকাণ্ড দাবানল জ্বলে উঠে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়ে চলে যাও। আর একটা বিরাট ঘূর্ণি ঝঞ্ঝা এসে সেই ভস্মরাশি ঈশ্বরের মুখে ছড়িয়ে দাও।"

(সাজাহান—দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য)।

এ প্রসঙ্গে King Lear নাটকের তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সন্তানের অকৃতজ্ঞতায় বেদনাহত King Lear এর সংলাপ স্মরণ করা যেতে পারে।

King Lear—"Blow, winds, and crack your cheeks!
rage! blow!
You cataracts and hurricanoes, spout
Till you have drench'd our steeples drown'd the cocks!
You sulphurous and thought executing fires,
Vaunt couriers of oak-cleaving thunderbolts,
Singe my white head! And thou, all shaking thunder,
Strike flat the thick rotundity O' the world!
Crack nature's moulds, all germens spill at once,
That make ingrateful man!"

(King Lear—Act-III, II seene)

৬। কোন কোন ক্ষেত্রে নাট্যচরিত্রের বিশেষ ভাবাবেগ ও মনোভাবের গভীরতা প্রকাশ করার জন্য এবং নাট্যঘটনার গতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

উপমা ও অনুপ্রাস অলঙ্কারের দ্বারা অলঙ্কৃত এবং সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা সমৃদ্ধ সংলাপ গঠনে যত্নবান হয়েছেন। এর ফলে নাট্যসংলাপের মধ্যে একপ্রকার শব্দ সংগীতের সৃষ্টি হয়েছে। নাটকের কাব্যময়তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এবং নাট্য-সংলাপকে শ্রুতিমধুর করে তোলার জন্য সংলাপের এ রূপ-বৈচিত্র্য খুবই কার্যকরী হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের সংলাপ রচনার বিষয়টির উল্লেখ করা যেতে পারে।

চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চন্দ্রগুপ্ত হৃতরাজ্য উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হন। এই উদ্দেশ্য পূরণের নিমিত্ত তিনি চাণক্যকে গুরুর পদে অভিষিক্ত করেন। চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে শিষ্যরূপে বরণ করে নেন। এরদ্বারা তিনি শিষ্যের উদ্দেশ্য পূরণ করার এবং ক্ষত্রিয় রাজাদের দ্বারা লাঞ্ছিত, অপমানিত চাণক্য তার ব্রাহ্মণ্য শক্তির তেজ, বীর্য্য ও বুদ্ধিমত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ লাভ করেন। এই সুযোগকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের জন্য তিনি চন্দ্রগুপ্তের মনোবলকে আরো দীপ্ত করে তুলতে চান। এই উদ্দেশ্যে তাঁর নিম্নোক্ত অলঙ্কার বহুল সংলাপের সংগীত মূর্চ্ছনা একাধারে চাণক্যের মনোভাবকে গভীরভাবে প্রকাশ করেছে এবং নাট্যমুহূর্তের নাটকিয়তায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

অ) "চাণক্য—আমার চক্ষুর সম্মুখে কি দেখছি জানো?
চন্দ্রগুপ্ত—কি গুরুদেব!
চাণক্য—এই প্রধূমিতা প্রজ্বলিতা প্রবাহিতা রক্তস্রোতস্বতী ভৈরবী ভারত-ভূমির পরিবর্তে এক রত্নালঙ্কারা, পুষ্পোজ্জ্বলা, সংগীতমুখরা হাস্যময়ী জননী। জলধি হতে জলধি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এক মহাসাম্রাজ্য! সে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা তুমি, আর তার পুরোহিত এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ চাণক্য!
(—চন্দ্রগুপ্ত, প্রথম অংক, চতুর্থ দৃশ্য।)

৭। চন্দ্রগুপ্ত নাটকে পণ্ডিত চাণক্যের মুখে এ ধরণের সংলাপ ছাড়াও এই নাটকের গ্রীক সেনাপতি সেলুকস (১।১), গ্রীক সৈন্যাধ্যক্ষ আণ্টিগোনস্ (৩।১), পার্বত্যবাসী চন্দ্রকেতুর ভগিনী ছায়া (৩।৫, ৪।৫), গ্রীক সেনাপতি সেলুকসের কন্যা হেলেন (৫।৪), প্রমুখ চরিত্রের মুখেও এ জাতীয় সংলাপ প্রয়োগ করা হয়েছে। চরিত্র নির্বিশেষে এ ধরণের সন্ধি সমাস ও অলঙ্কারবহুল সংলাপ প্রয়োগের ফলে সংলাপ কোন কোন ক্ষেত্রে চরিত্রানুগ হয়ে ওঠেনি এবং স্থানে স্থানে সংলাপ বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়েছে।[১৫ক] এই প্রসঙ্গে 'রাণাপ্রতাপ' নাটকে জীবনে দুঃখ ও সুখের মধ্যে দুঃখের শ্রেষ্ঠত্ব ও তার গরিমার উল্লেখ প্রসঙ্গে প্রতাপসিংহের কন্যা 'ইরার' সংলাপ (১২ দৃশ্য), 'পরপারে' নাটকে ঘৃণ্য জীবিকার মাধ্যমে জীবনযাপনের জন্য অনুতপ্ত ও বেদনাহত বারাঙ্গণা 'শান্তা'র সংলাপ (১।৪ দৃশ্য), এই একই নাটকে মৃত্যুর প্রাক-মুহূর্তে পরকালের বিশ্বাস প্রসঙ্গে 'সরয়ূ'র সংলাপের (৪।৫ দৃশ্য) দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে।

৮। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যপ্রীতি সমধিক ছিল। চরিত্রাঙ্কনের প্রয়োজনে তিনি নাট্যসংলাপের কাব্যময়তা পছন্দও করতেন।[১৬] তাই নাট্যসংলাপ রচনায় তাঁর কবিসত্তার প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্রের মান অনুযায়ী সংলাপের মধ্যে এই কাব্যময়তার প্রয়োজন। কিন্তু নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল সর্বত্র এই রীতি অনুসরণ করতে পারেননি। তাঁর অলঙ্কারবহুল সংলাপও অনেক জায়গায় কাব্যময় হয়ে উঠেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কাব্যময়তা সৃষ্টির জন্যই তিনি অলঙ্কারবহুল সংলাপ সৃষ্টি করেছেন। চরিত্র নির্বিশেষে এ ধরণের কাব্যময় সংলাপ ব্যবহারের ফলে সংলাপ ভারী হয়ে উঠেছে এবং তা চরিত্রের স্বাভাবিকতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি আলোচনা করা যাক।

"রাণা প্রতাপ" নাটকে শক্তসিংহ দৌলতউন্নিসাকে বিবাহ করেন। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বংশগৌরব রক্ষার্থে প্রতাপসিংহ শক্তসিংহকে ত্যাগ করেন। তথাপি শক্তসিংহ দৌলতউন্নিসাকে পরিত্যাগ করেননি। দৌলতউন্নিসার মহত্ত্ব দর্শনে শক্তসিংহ অনেক আগেই মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন। নারীত্বের এই মহত্ত্বকে প্রকাশ করতে গিয়ে শক্তসিংহের সংলাপের কাব্যময়তা উপরোক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। যথা—

(অ) শক্তসিংহ—"সেও আমার চোখ খুলে নারীর মহত্ত্ব দেখিয়ে গিয়েছে।··· আমি নারীকে তুচ্ছ, অসার, কদাকার জীব বলে মনে করেছিলাম; সে দেখিয়ে দিলে নারীর সৌন্দর্য্য। কি সে সৌন্দর্য্য! আজ, প্রভাতে সে দাঁড়িয়ে ছিল আমার সম্মুখে—কি আলোকে উদ্ভাসিত, কি মহিমায় মহিমান্বিত, কি বিশ্ববিজয়ী রূপে মণ্ডিত! মৃত্যুর পরপারস্থ স্বর্গের জ্যোতিরচ্ছটা যেন তার মুখে এসে পড়েছিল; তার চির জীবনের সঞ্চিত পুণ্যের বারি রাশি যেন তাকে ধৌত করে দিয়েছিল। ···কি সে ছবি! সেই হত্যার ধূমীভূত নিঃশ্বাসে, সেই মরণের প্রলয় কল্লোলে, সেই জীবনের গোধূলি লগ্নে, কি সে মূর্তি!"

—(রাণাপ্রতাপ—৫ম অংকের ৩য় দৃশ্য)।

চন্দ্রগুপ্ত নাটকে যুদ্ধশেষে গ্রীকসৈন্যদের স্বদেশ অভিমুখে যাত্রার সময় গ্রীক-সৈন্যাধ্যক্ষ আণ্টিগোনসের সংলাপ ও এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে। দৃষ্টান্ত—

(আ) আণ্টিগোনস্—"···মেঘ করে আসছে, বাতাস উঠেছে। সমুদ্র গর্জন কর্চ্ছে। —যাও উচ্ছ্বসিত নীল সিন্ধু! কল্লোলিয়া যাও। মানবের ক্ষুদ্র দম্ভ উপেক্ষা করে কালের ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে, অনন্ত আকাশের সঙ্গে অঙ্গ মিশিয়ে দিয়ে, সৃষ্টির অনাদি সঙ্গীত গায়িতে গায়িতে মৃদুমন্দ আন্দোলনে পৃথিবীর প্রান্ত হতে প্রান্তে ধাবিত হও। স্বাধীন

উন্মুক্ত উদার তুমি, সৃষ্টির মহা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যুগে যুগে এক-একই ভাবে চলেছ। উপরে উন্মুক্ত নীল আকাশ, নিম্নে তুমি তার স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র মণ্ডলকে তুমি তোমার হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত কর···হে ভীম! হে কান্ত! হে অবাধ অগাধ সমুদ্র! তোমার উদ্দাম প্রমত্ত অন্ধ বিক্রমে যাও বীর! চিরদিন সমভাবে কল্লোলিয়া যাও।" —(চন্দ্রগুপ্ত, তৃতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য।)

৯। দ্বিজেন্দ্রলালের সংলাপে পৌরুষ ও ওজঃগুণ সংলাপকে সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এরদ্বারা চারিত্রিক আবেগ প্রকাশের দিক থেকেও সংলাপ গতিশীল হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি নাট্যসংলাপ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। যেমন—

চাণক্যের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত তাঁর ভাই নন্দের কাছ থেকে হৃতরাজ্য উদ্ধারের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন এবং তাঁর মা মুরাকে লাঞ্ছনার জন্য ভ্রাতা নন্দকে সমুচিত জবাব দিতেও চন্দ্রগুপ্ত প্রয়াসী হন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে ভ্রাতৃসত্তা অধিকভাবে ক্রিয়াশীল হয়। এর ফলে চন্দ্রগুপ্ত মায়ের লাঞ্ছনাকারী নন্দকে পরাজিত করার চেয়ে তাকে ক্ষমা করা ও তার সঙ্গে যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে ভ্রাতা নন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য মা মুরার আজ্ঞাও চন্দ্রগুপ্ত প্রকারান্তরে মানতে অসম্মত হন। এমতাবস্থায় মায়ের স্বর্গীয় মহিমা ও মায়ের প্রকৃতি বর্ণনার দ্বারা চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের মনে মাতৃভক্তিকে উদ্দীপ্ত করেন ও তাঁর মায়ের লাঞ্ছনার যোগ্য জবাব দেবার জন্য চন্দ্রগুপ্তকে নন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এবং তাকে পরাজিত করতে অনুপ্রাণিত করেন। এ সময় চাণক্যের নিম্নোক্ত সংলাপের ওজঃগুণ সংলাপকে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে।

(অ) চাণক্য—"না, জানো না! নইলে মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে সন্তান দ্বিধা করে? —মা—যার সঙ্গে একদিন এক অঙ্গ ছিলে—এক প্রাণ, এক মন, এক নিঃশ্বাস, এক আত্মা—যেমন সৃষ্টি একদিন বিষ্ণুর যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিল,—তারপর পৃথক হয়ে এলে—অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মত, চিরন্তন প্রহেলিকার প্রশ্নের মত! মা—যে তার দেহের রক্ত নিংড়ে নিভৃতে বক্ষের কটাহে চড়িয়ে স্নেহের উত্তাপে জ্বাল দিয়ে সুধা তৈরী করে তোমায় পান করিয়েছিল—যে তোমার অধরে হাস্য দিয়েছিল, রসনায় ভাষা দিয়েছিল, ললাটে আশিস চুম্বন দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিল; মা—রোগে, শোকে, দৈন্যে, দুর্দ্দিনে তোমার দুঃখ যে নিজের বক্ষ পেতে নিতে পারে, তোমার ম্লান মুখখানি উজ্জ্বল দেখবার জন্য যে প্রাণ দিতে পারে, যার স্বচ্ছ স্নেহ-মন্দাকিনী এই শুষ্কে তপ্ত মরুভূমিতে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে যাচ্ছে; মা—যার অপার শুভ্র করুণা মানবজীবনে প্রভাত সূর্য্যের মত কিরণ দেয়—বিতরণে কার্পণ্য

করে না, বিচার করে না, প্রতিদান চায় না—উন্মুক্ত, উদার কম্পিত আগ্রহে দুহাতে আপনাকে বিলাতে চায়! —এ সেই মা।"

—(চন্দ্রগুপ্ত—দ্বিতীয় অংক, পঞ্চম দৃশ্য।)

এ প্রসঙ্গে আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—

কৃতঘ্ন পুত্র ঔরংজেবের ছলনায় ও শঠতায় পিতা সাজাহান দিল্লীর সিংহাসনচ্যুত হন এবং বন্দী অবস্থায় দিনাতিপাত করতে থাকেন। পুত্রের এহেন অমানবিক আচরণে সাজাহানের পিতৃসত্তা লাঞ্ছিত হয়। সাজাহান মর্মাহত হয়ে পড়েন। এই দুর্দশায় পিতৃ-অনুরাগী জাহানারার কন্যাসত্তাও বেদনার্ত হয়ে পড়ে। পিতার প্রতি তাঁর যথোচিত কর্তব্য পালনের জন্য তিনি ক্রিয়াশীল হন। পিতাকে পুনরায় সিংহাসনে বসিয়ে তাঁর পিতৃসত্তা ও সাম্রাটসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি ঔরংজেবের রাজদরবারে যান। সেখানে উপস্থিত প্রধান প্রধান রাজকর্মচারিগণের সামনে একদিকে পিতৃদ্রোহী ঔরংজেবের শঠতা, ক্রুরতা ও হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতাকে তুলে ধরেন, অপরদিকে বীর, দয়ালু, প্রজাহিতৈষী সাজাহানের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে সাজাহানকে পুনরায় সিংহাসনে বসাবার জন্য রাজকর্মচারীদেরকে তিনি উদ্বুদ্ধ করেন। এ সময় জাহানারার নিম্নোক্ত পৌরুষ ও ওজঃগুণযুক্ত সংলাপ নাট্যঘটনার ঔৎসুক্য বৃদ্ধি করে নাট্যঘটনায় আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে ও নাট্য ঘটনাকে গতিশীল করে তুলেছে।

(আ) জাহানারা—"দাঁড়াও!···আমি এখানে তোমাদের কাছে নিস্ফল ক্রন্দন করতে আসিনি!···আমি নারীর লজ্জা সংকোচ সম্ভ্রম ত্যাগ করে এসেছি—আমার বৃদ্ধ পিতার জন্য।···আমি একবার মুখোমুখি তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, যে তোমরা তোমাদের সেই বীর, দয়ালু, প্রজাবৎসল সম্রাট সাজাহানকে চাও? না, এই ভণ্ড পিতৃদ্রোহী, পরস্বাপহারী ঔরংজীবকে চাও?···ক্ষমতা কি এত দৃপ্ত হয়েছে, যে তার বিজয় দুন্দুভি তপোবনের পবিত্র শান্তি লুটে নেবে? অধর্মের আস্পর্দ্ধা এত বেশী হয়েছে যে, সে নির্বিরোধে স্নেহ দয়া ভক্তির বক্ষের উপর দিয়ে তার রক্তাক্ত শকট চালিয়ে যাবে? বলো!—তোমরা ঔরংজীবের ভয় করছ? কে ঔরংজীব? তাঁর দুই ভুজে কত শক্তি? তোমরাই তার বল। তোমরা ইচ্ছে করলে তাকে ওখানে রাখতে পারো; ইচ্ছা করলে তাকে ওখান থেকে টেনে এনে পঙ্কে নিক্ষেপ করতে পারো। তোমরা যদি সম্রাট সাজাহানকে এখনও ভালোবাসো, সিংহ স্থবির বলে তাকে পদাঘাত করতে না চাও, তোমরা যদি মানুষ হও তো বলো সমস্বরে "জয় সম্রাট সাজাহানের জয়" দেখবে ঔরংজীবের হাত থেকে রাজদণ্ড খসে পড়েযাবে।"

—('সাজাহান' দ্বিতীয় অংকের পঞ্চম দৃশ্য)।

(১০) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাট্য সংলাপের বাক্‌বৈদগ্ধ্যও সর্বজন বিদিত। 'সাজাহান' নাটকের দিলদারের নিম্নোক্ত সংলাপের মধ্যে এর পরিচয় পাওয়া যায়।

(অ) "দিলদার—কুকুর লেজ নাড়ে কেন এর কারণ কিন্তু খাসা।

মোরাদ—কি কারণ ?

দিলদার—কুকুর লেজ নাড়ে, কারণ লেজের চেয়ে কুকুরের জোর বেশী। যদি কুকুরের চেয়ে লেজের জোর বেশী হোত, তাহলে লেজই কুকুরকে নাড়তো"

(সাজাহান—দ্বিতীয় অংক, প্রথম দৃশ্য)

(১১) নাট্যসংলাপ রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল চরিত্রের গভীর বেদনা, আক্ষেপ, নিবিড় প্রেমবাসনা, মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ব্যথিতচিত্তের ক্ষোভ ও নৈরাশ্য, গর্হিত কর্মের জন্য মানসিক প্রদাহ এবং একাকীত্বের যন্ত্রণা পরিস্ফুট করার জন্য কোথাও কোথাও আত্মগত সংলাপ Soliloquy এবং বিদেহী চরিত্রের মনোভাব প্রকাশ করার জন্য Pseudo-Soliloquy ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টান্ত সহযোগে এ বিষয়ের অবতারণা করা যেতে পারে।

মোগলের হাতে পরাধীনা মেবারের লাঞ্ছনা ও দুর্দশা দেশপ্রেমিক রাণা প্রতাপসিংহের হৃদয়কে ব্যথিত করে তোলে। দেশমাতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য রাণা প্রতাপসিংহ সক্রিয় হয়ে ওঠেন। মেবারের জনগণের উপর তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও তখনও পর্যন্ত রাণা প্রতাপসিংহ মেবারকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে পারেননি। এই না পারার বেদনায় এবং দেশমাতার ধূলি ধূসরিত রুক্ষ-শুষ্ক রূপ দেখে রাণা প্রতাপের অন্তর বেদনায় আপ্লুত হয়। নিম্নের আত্মগত সংলাপের দ্বারা রাণা প্রতাপের এই বেদনামথিত মনোভাব খুবই স্পর্শকাতর রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

(অ) রানা প্রতাপসিংহ—"আকবর! মেবার জয় করেছ বটে! কিন্তু মেবার রাজ্যশাসন করছি আমি!...আকবর! যতদিন আমি আছি, মেবার থেকে এক কপর্দকও তোমার ধনভাণ্ডারে যাবে না।...সমস্ত রাজ্য ধূ-ধূ করছে। শস্যক্ষেত্রে উলুখড় তরঙ্গায়িত।...যেখানে মনুষ্য থাকত সেখানে আজ বন্যপশুদের বাসস্থান হয়েছে। জন্মভূমি! সুন্দর মেবার! বীরপ্রসু মা এখন এই বেশই তোমাকে সাজে মা। তোমাকে আমার বলে আবার ডাকতে পারি ত তোমার পায়ে স্বহস্তে আবার ভূষণ পরিয়ে দেবো নৈলে তোমাকে এই শ্মশানচারিনী তপস্বিনীর বেশই পরিয়ে রেখে দেবো মা।—মা আমার! তোমাকে আজ মোগলের দাসী দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায় মা।"

(রাণা প্রতাপসিংহ—প্রথম অংক, চতুর্থ দৃশ্য।)

দুর্গাদাসের শৌর্য্য, বীর্য্য, সৌন্দর্য্য, উদারতা ও মহানুভবতায় সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার দুর্গাদাসের প্রতি হৃদয়ের গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন। প্রেমবাসনা

ও প্রবৃত্তির তাড়নায় দুর্গাদাসকে দেখার জন্য (Perception) এবং তাঁর সান্নিধ্য লাভ করার বাসনা পূরণের জন্য তিনি দিল্লী থেকে দাক্ষিণাত্যে ছুটে আসেন। দুর্গাদাস তখন দাক্ষিণাত্যের অধিপতি শম্ভুজীর আশ্রিত ছিলেন। নিম্নের আত্মগত সংলাপের মাধ্যমে গুলনেয়ারের সুতীব্র প্রেম বাসনা বাণীরূপ লাভ করেছে।

(আ) গুলনেয়ার—"আমরা এসেছি এই দাক্ষিণাত্যে—কার উদ্দেশে?...... দুর্গাদাস! দুর্গাদাস, তুমি যদি জান্তে আমি তোমায় কি ভালবাসি! যদি জানতে কি মধুরতিক্ত উত্তপ্ত শীতল, তীক্ষ্মকোমল প্রবৃত্তি আমার অন্তরে জাগিয়ে দিয়েছো! যদি জান্তে, তোমার উদ্দেশ্যে সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য মাড়বার থেকে দাক্ষিণাত্যে টেনে এনেছি! —আমায় কি ভালই বাসতে!— ...উঃ কি পিপাসা! দুর্গাদাস! আমি মদিরা পান করেছি কেন জানো? —দুর্গাদাস! তুমি যদি আমায় আজ দেখ, চিন্তে পারো কিনা সন্দেহ!— এত শীর্ণ হয়ে গিয়েছি! এ প্রবৃত্তির কি মহা জ্বালা! কি দুর্দ্দমনীয় বেগ! কি মধুর উৎপীড়ন!"

(দুর্গাদাস—চতুর্থ অঙ্ক, সপ্তম দৃশ্য।)

নিজের পিতৃপরিচয় ও মাতৃপরিচয় জানতে না পারার ফলে এবং নিজের প্রিয়জন বলে কেউ কোথাও না থাকার জন্য গ্রীক সেনাপতি অ্যান্টিগোনসের মধ্যে এক গভীর নৈরাশ্য, বেদনা ও একাকীত্ব বোধ জাগরিত হয়। যুদ্ধ শেষে গ্রীক সৈন্যগণ তাদের প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করলে আন্টি-গোনসের এই একাকীত্বের বেদনা ও নৈরাশ্য প্রকট হয়ে ওঠে। আন্টিগোনসের নিম্নোক্ত আত্মগত সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যকার চরিত্রের এই মনোভাবকে হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছেন।

(ই) আন্টিগোনস্—"এরা গৃহে ফিরে যাচ্ছে। —কি আনন্দ! বহুদিন পরে প্রিয়জনের মুখ দেখবে। আনন্দ হবে না? আর আমি।—দেশে কেউ নাই, যার মুখ আমার উদয়ে উজ্জ্বল হবে। এক বৃদ্ধা মাতা—শৈশবে পালন করেছিলেন বটে—কিন্তু তারপর আমাকে পশুর মত হাটে বিক্রয় করেন। জগতে আমার ভালবাসার পাত্র কেউ নাই, আমায় কেউ ভালবাসে না—আমি দেশে চলেছি তবে কিসের জন্য? হাউইকে যেমন একটা মহাজ্বালা আর্ত্তশ্বাসে উর্দ্ধে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তেমনি—একটা তীব্র ব্যঙ্গ ক্ষিপ্তবেগে আমায় ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। এত মহাব্যাধি অথচ সে আমার নিজের সৃষ্ট নয়, তার জন্য আমি দায়ী নই। অথচ সংসারের এমনই বিচার—না তারই বা অপরাধ কি—স্বয়ং ঈশ্বরের এই বিচার..."

(চন্দ্রগুপ্ত—তৃতীয় অংকের প্রথম দৃশ্য।)

বধূসত্তার লাঞ্ছনার পর মাতৃসত্তার অবমাননার দ্বারা নূরজাহান তাঁর সম্রাজ্ঞী-সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। এমতাবস্থায় কন্যা লায়লার তীব্র ভর্ৎসনার ফলে নূরজাহানের মধ্যে মাতৃসত্তা ও সম্রাজ্ঞীসত্তা তথা চরিত্রের শুভবোধ ও অশুভবোধের মধ্যে তীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। নূরজাহানের আত্মগত সংলাপের মাধ্যমে তাঁর এহেন মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া প্রকাশ লাভ করেছে।

(ঈ) নূরজাহান—"ওঃ—কি লজ্জা! না পালাই। —পালাই। আর না! লায়লার মৃদু ভর্ৎসনার তাড়নায় আমার অন্তরের কুৎসিত ক্ষত টের পেয়েছি। আর বুঝতে পেরেছি যে, সে কি কুৎসিত! না আমি পালাবো, আর কিছুর জন্য না হোক্—পালাবো তোর জন্য লায়লা। আমি তোর কাছেও অবিশ্বাসিনী হব না।···দূরে ঐ সানাই বাজতে আরম্ভ হোল। কি বিশাল এই প্রাসাদ! না, আর না। না এখান থেকে চলে যাওয়াই ঠিক।"

(নূরজাহান—দ্বিতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য।)

দিল্লীর সিংহাসনে নিজের অধিকার করায়ত্ত করার জন্য ঔরংজেব শঠতার দ্বারা সাজাহানকে বন্দী করেন। ফলে সাজাহানের সম্রাটসত্তার বিনষ্টি ঘটে ও পিতৃসত্তা অবমানিত হয়। পুত্রের এই জঘন্য কৃতঘ্নতায় বন্দী অসহায় সাজাহান জগতের দৈনন্দিন অপরিবর্তিত কার্য্যাবলীর মাঝে নিজের পরিবর্তিত এই দুরবস্থার কথা ভেবে ক্ষোভে দুঃখে, হতাশায় ও বেদনায় ভেঙে পড়েন। আত্মগত সংলাপের সাহায্যে নাট্যকার সাজাহানের এই ব্যথিত হৃদয়ের ক্ষোভ, নৈরাশ্য ও গভীর বেদনাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করেছেন। যেমন—

(উ) সাজাহান—"সূর্য্য উঠেছে। যেমন সৃষ্টির আদিম যুগে উঠেছিল, সেই রকম উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ! আকাশ তেমনি নীল। ঐ যমুনা তেমনি ক্রীড়াময়ী কলস্বরা; যমুনার পরপারে বৃক্ষরাজি তেমনি পত্রশ্যাম, পুষ্পোজ্জ্বল; যেমন আমি আশৈশব দেখে এসেছি। সবই সেই। কেবল আমিই বদলিইছি (গাঢ় স্বরে)। আমি আজ আমার পুত্রের হস্তে বন্দী; —নারীর মত অসহায়, শিশুর মত দুর্বল। মাঝে মাঝে ক্রোধে গর্জন করে উঠি, কিন্তু সে শরতের মেঘের গর্জন—একটা নিস্ফল হাহাকার মাত্র। আমার নির্বিষ আস্ফালনে আমি নিজেই ক্ষয় হয়ে যাই। উঃ! ভারত সম্রাট সাজাহানের আজ—এ কি অবস্থা—

(সাজাহান—দ্বিতীয় অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য।)

কপটাচারী ঔরংজেব ধর্মের নাম করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। দিল্লীর সিংহাসন লাভের পথ নিস্কণ্টক করার জন্য তিনি একের পর এক ভ্রাতৃহত্যা করেন। ধর্মের নামে এই নীতি বিরুদ্ধ অমানবিক কাজের ফলে পরিশেষে তাঁর মধ্যে এক তীব্র মানসিক প্রদাহের সৃষ্টি হয়। এরফলে ঔরংজেবের

মধ্যে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষকরণ (Hallucination) ঘটে। চরিত্রের মনস্তত্ত্বের এইরূপ প্রকাশের ক্ষেত্রে ঔরংজেবের নিম্নোক্ত আত্মগত সংলাপের প্রয়োগ নৈপুণ্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়—

(উ) ঔরংজীব—"যা করেছি—ধর্মের জন্য। যদি অন্য উপায়ে সম্ভব হত—(বাহিরের দিকে চাহিয়া) উঃ কি অন্ধকার! কে দায়ী? আমি! এ বিচার, ওকি শব্দ? —না বাতাসের শব্দ! এ-কি! কোন মতেই এ চিন্তাকে মন থেকে দূর কর্তে পারছি না। রাত্রে তন্দ্রায় ঢুলে পড়ি, কিন্তু নিদ্রা আসে না—(দীর্ঘনিশ্বাস)…ও কি! আবার সেই দারার ছিন্ন শির? —সুজার রক্তাক্ত দেহ! মোরাদের কবন্ধ! যাও সব। আমি বিশ্বাস করি না। ঐ তারা আবার। আমায় ঘিরে নাচ্‌ছে! কে তোমরা? জ্যোতির্ম্ময়ী ধূমশিখার মত মাঝে মাঝে আমার জাগ্রত তন্দ্রায় এসে দেখা দিয়ে যাও। —চলে যাও—ঐ মোরাদের কবন্ধ। আমায় ডাকছে; দারার ও মুণ্ড আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে; সুজা হাসছে—এ কি সব! ও! (চক্ষু ঢাকিলেন), পরে চাহিয়া যাক্! চলে গিয়েছে! উঃ! —দেহে দ্রুত রক্তস্রোত বইছে। মাথার উপর যেন পর্বতের ভার।"

(সাজাহান—পঞ্চম অংক, পঞ্চম দৃশ্য।)

ক্ষমতাপ্রিয়া রূপময়ী নূরজাহান তাঁর বধূসত্তার অমর্য্যাদা করলে অসীম বৈরাগ্যে শের আফগান তাঁর মৃত্যুকে ডেকে আনেন। উচ্চাশার প্ররোচনায় নারীত্বের এই অবমাননায় নূরজাহান পরে নিজেই বিস্মিত, লজ্জিত, ও অনুতপ্ত হন। এ সময় তাঁর মধ্যে শুভবোধের জাগরণ ঘটায় নূরজাহান আত্মসমালোচনা করেন। এই পটভূমিকায় মৃত শের আফগানকে উদ্দেশ্য করে তিনি তাঁর মনোগত অবস্থাকে প্রকাশ করতে থাকেন। মৃতব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলা নিম্নের Pseudo-Soliloquy-র দ্বারা নাট্যকার চরিত্রের এই বিশেষ দিকটিকে মূর্ত্ত করে তুলেছেন—

(ঋ) নূরজাহান—"না, আর ভালো লাগে না।…এই চেহারার জন্য এত! —হায় উদার স্বামী! এইরূপই তোমার মৃত্যু সাধন করেছে! —এই রূপ? না আমার অকৃতজ্ঞ কঠিন হৃদয়? ঈশ্বর! ঈশ্বর! কেন আমি কখনও তাঁকে ভালবাসতে পারি নাই? তাঁর চেয়ে ভালবাসার যোগ্য পাত্র আর কে ছিল? দেবতার মত গঠন, সিংহের মত বীর্য্য, মাতার মত স্নেহ, শিশুর মত সারল্য! —তবু তোমায় ভালবাসতে পারি নাই।……স্বামী! তুমি মরেছিলে আমার জন্য, আমিও মরব তোমার জন্য। তুমি মরেছিলে পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে, আমি মরব নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে। তুমি মরেছিলে এক মুহূর্তে; আমি মরব তিলে তিলে! তুমি গিয়েছো—আর আমার জন্য রেখে গিয়েছো এক জীবন্ত কবর!…"

(নূরজাহান—দ্বিতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য।)

(১১) নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্য সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে একের পর এক বিশ্লেষণাত্মক clause দিয়ে বক্তব্যকে বর্ণনামূলক ও দীর্ঘ করে তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।—

মেবার পতন নাটকে ইসলামধর্মী মহাবৎ খাঁ কল্যানীকে পরিত্যাগ করলেও সাধ্বী কল্যানী মহাবৎকে পরিত্যাগ করেননি। কল্যানীর এই মনোভাব গোবিন্দ সিংহের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। সামাজিক কারনে কল্যানীর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি কল্যানীকে এই মনোভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। এর প্রত্যুত্তরে কল্যানীর সংলাপ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

(অ) কল্যাণী—"প্রকৃত সাধ্বী সেই,—স্বামী যে পায়ে পদাঘাত করে, সেই পা দুখানি যে স্ত্রী পূজা করে;—যার পতিভক্তির বিচ্ছেদে ক্ষয় নাই, অবজ্ঞায় সঙ্কোচ নাই, নিষ্ঠুরতায় হ্রাস নাই, নিরাশায় ক্ষোভ নাই —যার পতিভক্তি 'অন্ধকারে চন্দ্রের মত শান্ত, ঝটিকায় পর্বতের মত দৃঢ়, বিবর্ত্তনে ধ্রুবতারার মত স্থির, যার পতিভক্তি সর্বকালে, সর্ব অবস্থায়, বিশ্বাসের মত স্বচ্ছ, করুণার মত অযাচিত, মাতৃস্নেহের মত নিরপেক্ষ—সেই সাধ্বী স্ত্রী।"...

(মেবার পতন—দ্বিতীয় অংক, ষষ্ঠ দৃশ্য।)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনেক নাটকে এ ধরণের সংলাপ বিদ্যমান।

(আ) "সাজাহান" নাটকে যশোবন্তকে স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃত ভালোবাসার স্বরূপের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে "মহামায়ার" সংলাপ ('৩।৬), 'পরপারে' নাটকে 'সরযূর' চারিত্রিক বিশেষত্বের প্রতি আলোকপাত করার সময় বিশ্বেশ্বরের সংলাপ (৪।৪), নারীর রূপ-ঐশ্বর্য্যের মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে 'পরপারে' নাটকের 'শান্তার সংলাপ (১।৪)—ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

এ কথা বলা যেতে পারে যে তৎকালীন নাট্যকারদের মধ্যে সাধারণ ভাবে একটু বেশী বেশী সংলাপ ব্যবহারের রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালীন দর্শকরা এটা পছন্দও করতেন। তাই এ জাতীয় সংলাপ রচনার পিছনে দর্শকদের রুচিবোধ ক্রিয়াশীল ছিল।

(১৩) নাট্যকারের প্রকৃতিপ্রেম তাঁর সংলাপ রচনার ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করেছে। এর ফলে তাঁর নাট্য সংলাপ মাঝে মাঝে গীতিকবি সুলভ হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে 'রাণা প্রতাপ' নাটকে প্রতাপকন্যা ইরার একটি সংলাপ বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে—

(অ) ইরা—"কি গরিমাময় দৃশ্য! সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। —সমস্ত আকাশে আর কেউ না। একা সূর্য্য! চার প্রহর কাল আকাশের জন্মভূমি

বিচরণ করে, এখন অগ্নিময় বর্ণে বিশ্বজগৎ প্লাবিত করে অস্ত যাচ্ছে। —ঐ অস্ত গেল। আকাশের পীতাভ ক্রমে ধূসরে পরিণত হচ্ছে। আর যেন দেবারতির জন্য সন্ধ্যা সেই অস্তগামী সূর্য্যের দিকে শূন্য প্রেক্ষণে চাহিতে চাহিতে ধীরপদ বিক্ষেপে বিশ্বমন্দিরে প্রবেশ করছে! —রম্য সন্ধ্যা! প্রিয় সখি! কি চিন্তা তোমার ও হৃদয়ে! —কি গভীর নৈরাশ্য তোমার অন্তরে? কেন এত মলিন? —এত নীরব—এত কাতর? বল, বল প্রিয় সখি"

(রাণা প্রতাপ—প্রথম অংক, দ্বিতীয় দৃশ্য।)

(১৪) নাটকের মধ্যে সংগীতের সুষ্ঠু প্রয়োগের দ্বারা নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল নানা দিক থেকে নাটককে সমৃদ্ধ করেছেন এবং প্রয়োজন ক্ষেত্রে যুগের আহ্বানে দেশের প্রতি তাঁর দায়িত্বও পালন করেছেন। এদিক থেকে তাঁর নাট্য সঙ্গীতের গুরুত্ব অপরিসীম।

'রাণা প্রতাপ' নাটকের—"ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, গাও উচ্চে রণজয় গাথা!
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে শুন ঐ ডাকে ভারত-মাতা।"

—এই গানের (৪।৭ দৃশ্য) দ্বারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোগলদের বিরুদ্ধে রাজপুতদের যুদ্ধের উন্মাদনাকে উদ্দীপ্ত করা হয়েছে, নাটকের মধ্যে বীররসকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে আবার পরোক্ষভাবে সমসাময়িক দর্শক তথা ভারতবাসীকেও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এই নাটকের দ্বিতীয় অংকের ষষ্ঠ-দৃশ্যে মেহেরের মুখে "বাঁধি যত মন ভাল বাসিব না তায় / ততই এ প্রাণ তাঁর চরণে লুটায়"—এই গানের প্রয়োগের দ্বারা শক্তসিংহের প্রতি মেহেরের প্রণয়াসক্তিকে গভীরভাবে পরিস্ফুট করা হয়েছে।

'মেবার পতন' নাটকের—"মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়—
যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর
বিরাট্ দৈন্য দুঃখে তাহার
শৃঙ্গের সম অটল স্থির।"

—সংগীতটির (১।২) নাট্য গুরুত্ব অপরিসীম। মোগলের আক্রমণের সন্ধিক্ষণে মেবারের রাণা প্রকৃত দেশপ্রেম ও বীরধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন। মোগলদের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষের বদলে তিনি সন্ধি স্থাপনে আগ্রহী হন। রানার এই মনোভাব দেশ ও দেশের সন্তানের পক্ষে কলঙ্কজনক। চারনী সত্যবতী তখন এই গানের দ্বারা দেশের সকল রাজপুতগণকে দেশপ্রেমের ধর্মে ও বীরধর্মে উদ্বুদ্ধ করেন। এর ফলে দেশের পবিত্রতা ও অখণ্ডতা তথা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আপামর রাজপুতগণের মধ্যে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এক প্রবল উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। এই পটভূমিকায় রাণা অমরসিংহ তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। রাণা অমরসিংহের নেতৃত্বে সকল রাজপুতগণ মেবারের স্বাধীনতার

সংগ্রামে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই নাটকের প্রথম অংকের অষ্টম দৃশ্যে চারণদলের কণ্ঠে গীত—

"জাগো জাগো পুরনারী
জিনিয়া সমর আসিছে অমর—
বীরকুল তোমারি—"

—গানের দ্বারাও দেশাত্মবোধকে উদ্দীপ্ত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ গানগুলির মাধ্যমে একদিকে যেমন মেবারবাসীগণের দেশপ্রেমকে নাট্যকার জাগিয়ে রাখতে চেয়েছেন তেমনি সমকালীন স্বদেশবাসীর মধ্যেও তিনি এই ভাবকে জাগাতে চেয়েছেন। একথা মনে রাখা দরকার যে নাটকটি স্বদেশী আন্দোলনের সমসাময়িক কালেই রচিত। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মযজ্ঞে দেশবাসীকে উজ্জীবিত করে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

মোগলের বিরুদ্ধে মেবারের রাণার পরাজয়ে তথা মেবারের পরাধীনতায় চারণীর অন্তরের বেদনা ও নৈরাশ্যকে গভীরভাবে প্রকাশ করে তোলার ক্ষেত্রে চারণীর নিম্নোক্ত সংগীতটি উল্লেখযোগ্য।

"ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর
ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার।
এ মহাশ্মশানে ভগ্ন পরাণে
আজি মা কি গান গাহিব আর…"

—(পঞ্চম অংকের ষষ্ঠ দৃশ্য।)

এই গানটি চারণী চরিত্রের অন্তর্লোককে প্রকাশ করেছে। এই নাটকে মানসীর কণ্ঠে গীত—

"কিসের শোক করিস ভাই
—আবার তোরা মানুষ হ—
গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই
—আবার তোরা মানুষ হ…"

সংগীতটি (৫।৮ দৃশ্য) নাটকের একটি বিশেষ সম্পদ। এ গানটির মাধ্যমে নাট্যকার জাতীয়তাবোধের চেয়েও মনুষ্যত্ববোধকে অধিকভাবে স্থান দিয়েছেন। "এর প্রধান কারণ দ্বিজেন্দ্রলাল বুঝেছিলেন যে দেশবাসীর মনুষ্যত্ববোধ জাগরিত না হলে ভারতের কল্যাণ নেই।"[১৭] তাই তিনি বলেছেন—"জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় ত মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হয়ে যাক" (৫।৭)। নাটকে মানসীর মুখে এই গানের মাধ্যমে নাট্যকার এই ভাবটিকেই তুলে ধরেছেন।

'সাজাহান' নাটকে চারণ বালকগণের—"ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা"—সংগীতটি (৩।৬) দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে। স্বাধীনতা

আন্দোলনের সময় এই গানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং দেশবাসীর মুখে মুখে তা ছড়িয়ে পড়ে জাতিকে সম্মুখ স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা দান করে।

'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের "ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সংগীত ভেসে আসে" ...(৫।২)—গানটির সঙ্গে নাটকটির এক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যমান। দার্শনিক মনোভাব সম্পন্ন এই গানের মধ্য দিয়ে চাণক্যকে কূটরাজনৈতিক কারাগার থেকে মুক্ত হবার আহ্বান জানানো হয়েছে এবং আঘাতে আঘাতে যে ঈশ্বরের প্রতি চাণক্য বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন সেই ঈশ্বরের প্রতি আস্থা স্থাপনের আহ্বানও এই সংগীতের মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে গানের নিম্নোক্ত সংলাপ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

"কেন কারাগৃহে আছিল বন্ধ
ওরে ওরে মূঢ়, ওরে অন্ধ!
ওরে, সেই পরমানন্দ যে আমারে ভালবাসে।
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে
পড়ে আছিস্ পরবাসে।..."

ভিক্ষুকের সঙ্গে চাণক্যের সাক্ষাৎ লাভের ফলে চাণক্য তাঁর হারানো কন্যাকে লাভ করেন এবং ঐ কূটরাজনৈতিক কারাগার থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য কাত্যায়নকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করে তিনি বিদায় গ্রহণ করেন। কন্যাকে নিয়ে তিনি নিজের সংসার জীবনে ফিরে যান।

কাত্যায়নের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে চাণক্যের মনে অতীতের সুখ-স্মৃতি ভেসে উঠেছিল। এমন সময় ভিক্ষুক ও বালিকার কণ্ঠে এই দার্শনিক ভাবসম্পন্ন গানের দ্বারাই নাট্যকার পণ্ডিত চাণক্যের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

নাটকে সংগীত প্রয়োগের দিক থেকে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এ সকল মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া গেলেও, এক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত হতে পারেননি। কোথাও কোথাও তাঁর নাটকে নাট্যসংগীতের প্রয়োগ পর্বটি পুনরাবৃত্তির দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছে। 'দুর্গাদাস' নাটকে মহারাণী মহামায়া সতীধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার পর সতীধর্ম রক্ষার জন্য চিতানলে জীবন বিসর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন (৪।২ দৃশ্য)। চিতানলে আরোহণের সময় মহারাণী ও কুলনারীগণ গাইলেন—"যাও সতি পতি কাছে—পতি বিনা সতীর কি গতি আছে মা!...।" এর ফলে পূর্বে সংলাপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বক্তব্যকেই পুনরায় সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশ করায় নাটকের মধ্যে পুনরাবৃত্তির দোষ ঘটেছে। নাটকে এটা বাঞ্ছনীয় নয়। এই প্রসঙ্গে 'রাণাপ্রতাপ' নাটকে শক্তসিংহের প্রতি প্রেমাসক্ত মেহের কর্তৃক প্রেমের যাতনার স্বরূপ প্রকাশ প্রসঙ্গে তাঁর গান—"প্রেম যে মাখা বিষে, জানিতাম কি তায়..."(৩।২), 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চন্দ্রগুপ্তকে বিবাহ করতে না পারায় প্রেমিকা ছায়ার মনোগত বেদনা ও ভাবনাকে পরিস্ফুট করে তোলার ক্ষেত্রে

ছায়ার গান—"সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই, তুমি হও সব সুখের ভাগী…" (৫।৩ দৃশ্য), এবং 'পরপারে' নাটকে জীবন ও সংসার সম্পর্কে সরযূর দার্শনিক চিন্তাসমম্বিত নিম্নোক্ত গানটি উল্লেখযোগ্য—।

"শুধু দু'দিনেরই খেলা।
ঘুম না ভাঙ্গিতে, আঁখি না মেলিতে,
দেখিতে দেখিতে ফুরায় খেলা—।" (৪।২ দৃশ্য)

এ সকল গানের সংযোজনার ফলে নাটকগুলির অংশবিশেষ পুনরাবৃত্তির দোষে দুষ্ট হয়েছে। এছাড়াও দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকস্থ সমস্ত সংগীতই নাটকের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে এ কথা বলা যায় না। তথাপি নাটকের মধ্যে অধিক সংগীত রচনার দ্বারা নাট্যকার দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য যত্নবান হয়েছিলেন। এটা তৎকালীন পেশাদারী বাঙলা থিয়েটারের একটি বৈশিষ্ট্য।

(খ) ।। নাট্যসংলাপ ও ক্ষীরোদপ্রসাদ ।।

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ নাট্যসংলাপ রচনার ক্ষেত্রে গদ্য ও পদ্য এই উভয় প্রকার সংলাপই ব্যবহার করেছেন।

(১) তাঁর গদ্যময় সংলাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সহজ সরল হলেও কোথাও কোথাও তা সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে। এর ফলে সংলাপের মধ্যে কিছু পরিমাণে হাল্কা ধরনের শব্দ সংগীত মূর্চ্ছনার সৃষ্টি হয়েছে ও সংলাপের দীপ্ততা খানিকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। 'নন্দকুমার' নাটক থেকে এর দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

ফাঁসীকাষ্ঠে ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর নন্দকুমারের গুরু বাসুদেব গভীরভাবে অনুভব করেন যে দেশের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য শক্তির তেজ, বীর্য্য ও সাধনার অভাব ঘটেছে। দেশের সার্বিক মুক্তির জন্য তিনি নন্দকুমারের তেজ ও বীর্য্য-দীপ্ত সাধনার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এই ব্রাহ্মণ্য শক্তিকে পুনরায় জাগরিত করার জন্য জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। সেক্ষেত্রে তাঁর সংলাপ উপরোক্ত গুণে গুণময় হয়ে উঠেছে।—

বাসুদেব—"…এই ভারতবর্ষের উদীয়মান মহানগরীর বায়ু এক সঙ্গে দুটি সামগ্রী নিয়ে খেলা করছে। বামে দুর্গশিরে একটি রক্তবর্ণ পতাকা, আর দক্ষিণে এই রজ্জুলম্বিত ব্রাহ্মণের দোদুল্যমান শব। …নন্দকুমার! দুলুক, দুলুক, তোমার যজ্ঞোপবীত বিভূষিত বপু বায়ুতে আন্দোলিত হোক। দুলতে দুলতে তোমার শব হিন্দুকে শরণ করিয়ে দিক যে, ব্রাহ্মণ শক্তির অবসানে সকল বর্ণের শক্তি লোপ। …যদি কোন সাধক কখনো তোমার শবে আসন কোরে এই মহাশ্মশানে কোন নির্ভীক হৃদয়ে, চৈতন্য-স্বরূপিনী, অসুরনাশিনী, বরাভয়দায়িনী মহাশক্তিকে ডাকতে পারে,

আবার অন্তরস্থ কুলকুণ্ডলিনীকে জাগরিত করে আবার ভারতে বর্ণাশ্রম ধর্ম, ব্রাহ্মণ শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে তবেই—থাক্ আর স্বপ্ন দেখবার অবকাশ নাই।"

(নন্দকুমার—পঞ্চম অংক, নবম দৃশ্য।)

(২) পদ্যময় সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে তিনি কখনো কখনো মাইকেল প্রবর্তিত চৌদ্দমাত্রার পয়ারের উপর প্রতিষ্ঠিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে 'রঘুবীর' নাটকের অংশ-বিশেষের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রভু অনন্তরাওয়ের অন্বেষণে রঘুবীর নর্মদা নদীতীরে উপস্থিত হন। রঘুবীর নর্মদার ভীষণমূর্তি দর্শন করে। নর্মদার এইরূপ দেখার পর এ বিষয়ে তার মনোভাব ও প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ প্রসঙ্গে নিম্নের সংলাপটি উল্লেখযোগ্য।

রঘুবীর—"উত্তাল তরঙ্গময়ী ভীষণা নর্মদা!
ফেনিল রাক্ষসী মুখে তুলিয়া হুঙ্কার
দশদিকে উম্মত্ততা করিয়া প্রসার
কার লোভে ছুটিয়াছ পুনঃ উম্মাদিনী?
জানি না কি অপূর্ব পারিজাত লোভে প্রভঞ্জনে
ধরেছ সহায়, সে আনিয়া দিবে তোরে
পুরিয়া অঞ্জলী। শোণিত নিষিক্ত ধরা
আগে হতে দুরাত্মার নির্মল চরণ—
ভরে, থরথর কাঁপে—কাঁপে প্রাণ, তার
যাতনায়, তবে কেন নর্মদা সুন্দরী!
আবার ভীষণা মূর্তি ধরি, অবিরাম
সহস্র কর্কশ হস্তে ব্যথিত শরীরে
তার করিস প্রহার? ক্ষমা দে নর্মদা।

* * *

(রঘুবীর—প্রথম অংক, পঞ্চম দৃশ্য।)

(৩) আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ বা আভিনয়িক ছন্দও ব্যবহার করেছেন। এরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

কৃষ্ণের পরিকল্পনা অনুসারে অর্জুন কৌশলে ভীষ্মের কাছ থেকে পঞ্চপাণ্ডবকে বধের জন্য রাখা ভীষ্মের 'পঞ্চাস্ত্র বাণ' সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। এর ফলে পঞ্চপাণ্ডবকে বধ করার জন্য ভীষ্মের পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। ভীষ্ম বুঝতে পারেন যে এ সবই সেই ছলনাময় চক্রী কৃষ্ণের কাজ। তখন ভীষ্ম আগামী কুরুক্ষেত্র রণে কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন।

নিম্নের ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ-যুক্ত পদ্যময় সংলাপের সাহায্যে ভীষ্মের এই বাসনা প্রকাশিত হয়েছে।

ভীষ্ম—"কিন্তু বাসুদেব
জীবনে প্রথম মোর ভঙ্গ হল পণ।
জীবনে প্রথম
দেবদত্ত আশীষ বচন
ভীষ্ম নাম আহত আমার! নাম গেল
সঙ্গে সঙ্গে জীবনের গেল প্রয়োজন।
এ প্রতিজ্ঞা বিফল করিলে তুমি।
হে চক্রী তোমারি গর্ব হৃদয় আসনে
এতকাল অতি যত্নে ধরেছিনু আমি।
সে গর্ব ভাঙ্গিয়া
শুভ্র সত্য নীলাঙ্গে ঢাকিয়া
আমারে ছলিয়া যাবে, ভেব নাক মনে।
নির্বাণ উন্মুখ দীপে দীপ্ত প্রজ্জলন!
শুন মোর পণ। কাল রণাঙ্গনে
দেবতা-গন্ধর্ব সিদ্ধ চারণ সম্মুখে
আমিও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব তোমার!"

* * *

(ভীষ্ম—পঞ্চম অংক, ষষ্ঠ দৃশ্য।)

(৪) নাট্যচরিত্রের সংকটময় অবস্থা ও চরিত্রের বিশিষ্ট মনোভাবকে প্রকাশ করার জন্যই তিনি পদ্যময় সংলাপ ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে দুই-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

গুজরাটের সম্রাট জাফর অনন্তরাওকে কৌশলে বন্দী করে। এই ঘটনায় প্রভু অনন্তরাওয়ের জীবন রক্ষার জন্য রঘুবীরের মধ্যে ভীলত্ব ও ব্রাহ্মণত্বের দ্বন্দ্ব ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে। একদিকে ভীলত্বের জন্য রঘুবীর তার আদিম জিঘাংসা প্রবৃত্তি ও শক্তির সাহায্যে প্রভুকে রক্ষা করতে চায়, অপরদিকে ব্রাহ্মণত্ব জাত রঘুবীরের অহিংসা, ক্ষমা ও সংযম শক্তি রঘুবীরের আদিম প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। এই পটভূমিকায় কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় রঘুবীরের সংকটময় অবস্থা পদ্যময় সংলাপের সাহায্যে পরিস্ফুট করা হয়েছে।

রঘুবীর—"...ডুবে গেল বুঝি কৃতজ্ঞতা!
আজীবন বালকত্ব লয়ে, যদি আমি
থাকিতাম চিরমূর্খ বর্ব্বর সন্তান
উদরপূরণ সার ভেবে, যদি আমি

শুধুমাত্র আহার খুঁজিয়া-কভু চৌর্য্যে
কভু প্রাণিবধে, কভু দাসত্বে ভিক্ষায়
যাপিতাম মোর চিরদিন…
কিম্বা যদি করিতাম পশুরে আপন,
সুখ বুঝি থাকিত আমার। কেন আমি
ব্রাহ্মণে ভজিনু? কেন আমি তার কথা
শুনে আত্মপ্রশ্ন করিতে শিখিনু? বাধা
শুধু বাধা—বাধা যেন জীবনে করেছে
ক্রীতদাস।…
হে বিধি সুমতি—
দাও মোরে, অহঙ্কার বিচূর্ণ আমার।
বিপন্ন ব্রাহ্মণ-আমি ভৃত্য। বিধিদত্ত
যে শক্তি আমার, হয়ত কণ্টক তার
মূলসহ উৎপাটিতে পারি। নীচগৃহে
জন্ম মোর—আমার কি কাজ জনার্দ্দন?

(রঘুবীর—তৃতীয় অংক, চতুর্থ দৃশ্য।)

অম্বাকে বীর্য্যশুল্কে গ্রহণ করেও ব্রহ্মচারী ভীষ্ম তাঁকে স্ত্রীরূপে মেনে নিতে পারেননি। নারীত্বের এই লাঞ্ছনায় অম্বা ভীষ্মের উপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য নারীত্বের সকল কোমলতাকে বিসর্জন দিয়ে তিনি ভীষ্মকে বধ করার জন্য মহাদেবের তপস্যায় ব্রতী হন। প্রতিহিংসা-পরায়ণা ভীষণা অম্বার এই বিশিষ্ট মনোভাবটি নিম্নের পদ্যাশ্রয়ী সংলাপের মাধ্যমে দীপ্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

অম্বা—"ভীষ্মের সংহার, একমাত্র উদ্দেশ্য আমার।
যতদিন মৃত ভীষ্মে না করি দর্শন
ততদিন নিদ্রা আমি করেছি বর্জন।

* * *

সূর্য্য যদি পথভ্রষ্ট হয়—
তুঙ্গ গিরিরাজ যদি শির করে নত
সিন্ধু যদি পরিণত বালুকা প্রান্তরে,
তথাপি সঙ্কল্পচ্যুতি হবে না আমার।
ভীষ্মের সংহার-দেবী ভীষ্মের সংহার
চিন্তামাত্র করিয়াছি সার।

* * *

আমি রমণীত্বে দিছি বিসর্জন।

মমতা, মৃদুতা স্নেহ, মায়া
নিক্ষেপ করেছি আমি
প্রতিহিংসা অনল শিখায়
ডুবায়ে দিয়েছি প্রেম লবণাম্বু তলে।

* * *

প্রতিহিংসা মাত্র মোর ধ্যান,
প্রতিহিংসা একমাত্র জ্ঞান,
মান অপমান
সমস্তই প্রতিহিংসা করেছে আশ্রয়।"

(ভীষ্ম—তৃতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য।)

৫। সংলাপের মাধ্যমে দেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে তুলে ধরে নাট্যকার এ বিষয়ে তাঁর সচেতনতার পরিচয়ও দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত-সহযোগে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর আমরণ আপোষহীন সংগ্রাম দাবানলের মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে ইংরেজ সরকার ভীত হয়ে পড়েন। এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে ভাঙার জন্য ইংরেজ সরকার ভারতবাসীর মধ্যে ধর্মগত ও জাতিগত বিচ্ছিন্নতাবাদকে গোপনে প্রশ্রয় দিতে থাকেন এবং এর দ্বারা তাঁদের বিভাজন ও শাসন (Dividation andRule) নীতির বিকাশ ঘটাতে থাকেন। দেশের এই রাজনৈতিক পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা নাট্যকার অনুভব করেছিলেন। দেশের তদানীন্তন এই রাজনৈতিক সচেতনতাই তাঁর "বঙ্গে প্রতাপাদিত্য" নাটকের নিম্নের সংলাপের মধ্য দিয়ে বানীরূপ লাভ করেছে।

(অ) প্রতাপ—"ভাই সব!…হিন্দু মুসলমান এক মায়ের দুই সন্তান। এক অন্নে প্রতিপালিত, এক স্নেহরসে সিঞ্চিত; বাল্যে ক্রীড়ায়, যৌবনে মাতৃসেবা কার্য্যে প্রতিযোগিতায়, বার্দ্ধক্যে আত্মীয়তায়,—এস ভাইসব, আমরা এক প্রাণে এক মনে মায়ের দুঃখ দূর করি।…মাতৃসেবা কার্য্যে আর আমরা ব্রাহ্মণ নই, শূদ্র নই, শিখ নই, পাঠান নাই—বঙ্গ সন্তান।"

(বঙ্গে প্রতাপাদিত্য—তৃতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য।)

ইংরেজরা এদেশ থেকে কাঁচামাল নিজেদের দেশে নিয়ে যেত। এই কাঁচামালের সাহায্যে ইংরেজরা শিল্পজাত দ্রব্য তৈরী করে সেই দ্রব্য ভারতবর্ষে বিক্রি করত। তবুও তারা এদেশের কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের সঙ্গে গুণগত ও মানগত দিক দিয়ে পেরে উঠছিল না। তাই তারা নানাভাবে এদেশের কুটিরশিল্পকে ধ্বংস করছিল। এর ফলে সেই সময়ে দেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছিল।

দেশে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। দেশের তদানীন্তন এই অর্থনৈতিক অবস্থাকে নাট্যসংলাপের মাধ্যমে তুলে ধরে নাট্যকার এ বিষয়ে দেশবাসীকে সচেতন করতে চেয়েছিলেন।

(আ) গুরগন খাঁ—"অত্যাচারে ভাল ভাল তাঁতি সব বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেলেছে। যাতে আর তাঁতে হাত দিতে না হয়। আপনার এই মেদিনীপুরের হুন্দোয় প্রায় লাকো তুঁতিয়া চাষ করতো—রেশমের ব্যবসা উঠে যাচ্ছে…"

(পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত—দ্বিতীয় অংক, চতুর্থ দৃশ্য।)

(ই) কাসিম—"…আমাদের শিল্প গেছে, ব্যবসা গেছে—চাষ গেছে, বাস গেছে—দুনিয়ায় দাঁড়াই এমন স্থান নেই।"

(পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত—পঞ্চম অংক, পঞ্চম দৃশ্য।)

৬। সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে নাট্যকার তৎকালীন প্রচলিত রীতির কিছু কিছু রচনাকৌশল অনুসরণ করেছেন। সেক্ষেত্রে চরিত্রের বিশেষ চিন্তা ও ভাবনাকে গভীরভাবে তুলে ধরার জন্য তিনি আত্মগত সংলাপ (Soliloquy) ব্যবহার করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'নন্দকুমার' নাটকে মীরজাফরের একটি আত্মগত সংলাপের উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে।

সিরাজদ্দৌলার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে মীরজাফর বাংলার নবাবের পদ লাভ করেন। কিন্তু সকলপ্রকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ইংরাজদের হাতে ন্যস্ত থাকায় তাঁর নবাবী অর্থহীন হয়ে পড়ে। উপরন্তু ইংরেজদের স্বার্থ-সিদ্ধিতে তিনি যথোপযুক্তভাবে সকল সময় সহায়তা করতে না পারায় ইংরেজরা তাঁকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন। রাজনৈতিক জীবনের এই তিক্ত অভিজ্ঞতায় দগ্ধ মীরজাফর সিরাজদ্দৌলার প্রতি তাঁর পূর্বকৃত গর্হিত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হন এবং নিজের এই সংকটময় অবস্থা থেকে পরিত্রাণের কোনরূপ আশার আলো দেখতে না পাওয়ায় তিনি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। অনুশোচনা ও হতাশাগ্রস্ত মীরজাফরের এই বিশেষ ভাবনাটি নিম্নের আত্মগত সংলাপের মধ্য দিয়ে গভীরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

(অ) মীরজাফর—"…নবাব শ্মশানে চলেছেন। শ্মশান! ঠিক শ্মশান… একটা বালক তার ওপরে চেপে আহ্লাদে হাত পা নাড়ছিল দেখে আমি তাকে হাত ধরে টেনে ফেলতে গেছলেম, কিন্তু বালককে ফেলতে গিয়ে সিংহাসন শুদ্ধ উলটে ফেলেছি। বালক মাটীর ভেতরে প্রবেশ করে মাটী হয়ে গেছে। সে নিজের আঘাত ভুলে গেছে, কিন্তু অভাগ্য মসনদ আজও তার অপমান লাঞ্ছনা ভোলেনি। সিরাজের শোকে আজও পাথরখানা স্বেদবিন্দুরূপে চোখের জল ফেলছে। আজও হীরে ঝিলে মাটীতে গুঁজড়ে সে কাঁদছে। শ্মশান! শ্মশান! ইংরাজ এ বিশ্বাস-

ঘাতককে শাস্তি দিতে তাকে জীবন্ত শ্মশানে এনে উপস্থিত কোরেছে…এ শ্মশানভূমে আমাকে রক্ষা করবার জন্য কে আছে ?…"

(নন্দকুমার—তৃতীয় অংক, তৃতীয় দৃশ্য ।)

তাঁর রচিত অন্যান্য নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করার জন্যও তিনি 'আত্মগত' সংলাপ ব্যবহার করেছেন। যেমন—

(আ) বৈধ বা অবৈধ উপায়ে মগধের সিংহাসন অধিকার করার চিন্তায় অধীর অশোকের আত্মগত সংলাপ (অশোক ২।২), পাতিব্রত্য ধর্ম প্রচারের জন্য ভগবতী গায়ত্রীই যে সাবিত্রী রূপে মদ্ররাজগৃহে উপস্থিত হয়েছেন সে প্রসঙ্গে ঋষি মাণ্ডব্যের আত্মগত সংলাপ (সাবিত্রী ৩।১), ঘরের মধ্যে কন্যাকে দেখতে না পেয়ে কন্যার অকল্যাণের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন পিতা বাপুদেবের আত্মগত সংলাপ (নন্দকুমার ১।২), প্রতাপাদিত্যকে বিপন্ন করে তোলার জন্য মোগলদের সাহায্য করতে উদ্যোগী বিশ্বাসঘাতক ভবানন্দের আত্মগত সংলাপ (বঙ্গে প্রতাপাদিত্য ৩।৪), প্রভু অনন্তরাও ও পরিবানুকে জাফরের হাত থেকে উদ্ধার করে জাফরকে সমুচিত শাস্তি দেওয়ার প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণত্ব ও ভীলত্বের দ্বন্দ্বে উদ্বেলিত রঘুবীরের আত্মগত সংলাপ (রঘুবীর ৪।১)—ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

(৭) চরিত্রের সামাজিক মর্যাদা ও শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী সংলাপকে চরিত্রানুগ করে তোলার ক্ষেত্রে নাট্যকারের যত্নশীলতা লক্ষ্যণীয়। এ প্রসঙ্গে ভীষ্ম নাটকের দাসরাজা ও দাসরানীর সংলাপ (১।৩), অশোক নাটকে পার্বত্য অঞ্চলের রাজা কনিষ্কের সংলাপ (৩।৪), সাবিত্রী নাটকে কাঠুরিয়াদের সংলাপ (৪।২)—ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

(৮) নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যসংলাপ কোন কোন ক্ষেত্রে অতি বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এতে নাটকের সংহতি ও নাট্যগতির তীব্রতা খানিকটা ব্যাহত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'নন্দকুমার' নাটকে নন্দকুমারের সংলাপ (১।১), প্রতাপাদিত্যকে আগ্রায় পাঠাবার ব্যাপারে বসন্ত রায়কে নিজের মতামত জানাবার প্রসঙ্গে ছোটরানীর সংলাপ (১।৭, বঙ্গে প্রতাপাদিত্য), পূর্ব জীবনের স্মৃতিচারণকালে ভীষ্মের সংলাপ (২।২, ভীষ্ম), শিখণ্ডীর জন্ম বৃত্তান্ত কথন প্রসঙ্গে দ্রুপদের সংলাপ (৪।১ ভীষ্ম), সম্রাট জালালউদ্দীনের হত্যার ঘটনার বিবরণ দান প্রসঙ্গে প্রথম ওমরাহের সংলাপ (১।১, পদ্মিনী), সনাতনকে সতীত্বের মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে মাণ্ডব্যের সংলাপ (৩।২, সাবিত্রী), ছান্দোগ্য উপনিষদের অর্থ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যাদব প্রকাশের সংলাপ (১।২, রামানুজ)—ইত্যাদি স্মরণীয়।

(৯) নাট্যসংলাপ রচনায় নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাকৃত রুচির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সে সব ক্ষেত্রে সংলাপের সাহিত্যিক গুণধর্ম ক্ষুন্ন হয়ে পড়ায় তা উন্নত রুচিশীল নাট্যরসিকদের রসবোধকে পীড়িত করেছে।[১৮]

(১০) ক্ষীরোদপ্রসাদও তাঁর নাটকের মধ্যে অনেক সংগীতের প্রয়োগ করেছেন। তবে সবক্ষেত্রেই তাঁর সংগীত সুপ্রযুক্ত হয়েছে একথা ঠিক বলা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে নাটকের মধ্যে সংগীতের প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি যাত্রার সংগীত প্রয়োগের রীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। কোথাও তিনি নাটকের বিষয়বস্তুকে সংলাপের দ্বারা পরিবেশিত করে ঠিক তার পরেই সেই বিষয় বস্তুকে সংগীতের মাধ্যমে পুনরায় প্রকাশ করেছেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথমে সংগীতের দ্বারা নাটকের বিষয়-বস্তু, চরিত্রের মনোভাব পরিস্ফুট করে ঠিক তার পরে সংলাপের দ্বারা সেই বিষয়-বস্তু ও চরিত্রের মনোভাবকে তুলে ধরেছেন। এই কারণে 'উলূপী' নাটকে শ্মশানের মধ্যে 'উলূপীর' গান ('সাধের হিয়া শূন্য করে শ্মশান করেছি প্রাণ' ২।২), পিতার দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় অধীর 'বভ্রুবাহনের' গান ('বাসনায় বাঁধা এ জীবন' ২।৪), মাতৃত্বের আহ্বানে পুত্র ইলাবন্তকে দর্শন করার ইচ্ছা এবং সতীত্বের পরীক্ষায় সমাসন্ন কঠোর কর্ত্তব্যের আহ্বানে সেই ইচ্ছা দমন করে রাখার প্রসঙ্গে উলূপীর গান ('ঘন চমক চপলা মালিনী' ৩।৫), 'সাবিত্রী' নাটকে পতির অন্বেষণে যাওয়ার মুহূর্তে পুরবাসিনীগণের গান (তবে যাও, তবে যাও আসিতে ১।৩), 'সাবিত্রী ব্রত' উদযাপনের সময় সাবিত্রীর গান ('এস শুভদায়িনী গঙ্গে' ৩।৩), সত্য-বানের মৃত্যুতে বেদনাহতা সাবিত্রীর গান ('অন্ধের নয়ন তুমি একথা কি নাই মনে' ৪।৩), 'বঙ্গে প্রতাপাদিত্য' নাটকে দেশের মুক্তির জন্য শক্তিরূপা মায়ের আরাধনা প্রসঙ্গে সখীগনের গান ('এস শুভদে বরদে শ্যামা' ৩।২), 'নন্দকুমার' নাটকে পিতার অবর্তমানে নানাবিধ সামাজিক বাধাবিঘ্নের মাঝে একাকী জীবন কাটানোর ভয় ও ভাবনার প্রকাশ প্রসঙ্গে বাসুদেবের কন্যা প্রমোদার গান ('পাততে গিয়ে ভেঙে গেল আমার খেলাঘর' ১।২), বহুদিন পরে ভগ্নী রাধিকাকে ফিরে পাবার আশায় আনন্দিত প্রমোদার গান ('এস এস বোন বুক পোরা ধন দিদি বলে এস আদরে' ৩।৩)—ইত্যাদি সংগীতের প্রয়োগের ফলে নাটকের মধ্যে পুনরাবৃত্তির দোষ ঘটেছে।

(১১) কোন কোন ক্ষেত্রে নাট্যকার সংগীতের সুষ্ঠু ব্যবহারের দ্বারা নাটকের আকর্ষণকে বৃদ্ধি করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'ভীষ্ম' নাটকের দ্যুতির গানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

> ঋষি আপবের আশ্রম থেকে কামধেনু চুরি করার জন্য অষ্টবসু আপবের অভিশাপে নররূপে ধরাধামে আসেন। সপ্তবসুর ভূমি স্পর্শেই মুক্তি ঘটে। কিন্তু অষ্টবসু প্রত্যক্ষভাবে এই চৌর্য্যকার্য্যে জড়িত ছিলেন। তাই ইচ্ছামৃত্যুর শক্তি নিয়ে নিজের কর্মফলের অবসান ঘটানো পর্য্যন্ত তাঁকে পৃথিবীতে থাকতে হয়। স্ত্রী দ্যুতির পরামর্শমত অষ্টবসু এ ধরণের হীন কার্য্য করায় তিনি পৃথিবীতে দ্যুতিকে সঙ্গে না নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পৃথিবীতে এসেও ভীষ্মরূপী অষ্টবসু পূর্ব-

জীবনের স্ত্রী দ্যুতিকে ভুলতে পারেনি। স্ত্রী দ্যুতিও স্বামীর বিচ্ছেদে কাতর হয়ে পড়েন। উভয়ের মধ্যে প্রেমের আকর্ষণে এক আত্মিক যোগাযোগ থেকে যায়। এক্ষেত্রে নাট্যকার দ্যুতির মুখে সংগীতের প্রয়োগের দ্বারা ('আমারে কাঁদায়ে চলে গেছে—চলে গেছে সে ওগো আমারি করম দোষে—' ২।২) স্বামীর সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করেছেন এবং ঠিক তারপরে সংলাপের মাধ্যমে দ্যুতির বিরহে বেদনাহত ভীষ্মের মনোগত অবস্থাকে প্রকাশ করে উভয়ের মধ্যে আত্মিক যোগাযোগের মুহূর্তটিকে দীপ্তময় ও হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে সংগীত পিপাসু দর্শকদের কথা মনে রেখেই নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ তাঁর নাটকে অধিক সংখ্যক গানের সংযোজন করেছিলেন। এটা নাট্যকারের উপর যুগধর্মের প্রভাব বিশেষ।

সূত্র-পরিচিতি

১. "If language has a place in theatre it must have a share in the work of manifestation." —Page-111, The Dramatic Event—David Cole, Wesbyan University Press, USA, 1975.

২. ১ম অধ্যায়, নাট্যশাস্ত্র—ভরতমুনি।

২ (ক) "সংলাপ কেবল চরিত্রানুগ রীতির হলেই চলে না। সংলাপ সৃষ্ট হবে চরিত্রের মন থেকে, বুদ্ধি থেকে, আবেগ থেকে, ইচ্ছাশক্তি ও প্রয়োজন থেকে। চরিত্রের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সংলাপেই বুঝতে হবে। জীবনে যেমন অগোছাল কথা হয়, নাট্যকলায় তা চলে না। তাই সব বুঝে প্রয়োজন মেটাবার জন্য সংলাপ বাছাই করতে হয়।"

পৃ. ১৭০, প্রসঙ্গ নাটক, থিয়েটার ও বেতার—
—ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, শারদীয়া অভিযান, ১৩৯১

৩. "It is an activated language, implying constant movement development and changes in the feeling and the relations of persons." —Page-168, The Art of Drama—R. Peacock, London, 1957.

৪. "সংলাপ যেখানে চরিত্রের শুধু মুখের কথা নয়, সমগ্র সত্তার অভিব্যক্তি হয়, সেখানে সংলাপ সার্থক। আর সংলাপ যেখানে শুধু কেবল ভাষার অহেতুক আড়ম্বর মাত্র, সেখানে তা চরিত্রকে কলের পুতুল করে মাত্র, সজীব মানুষে পরিণত করতে পারে না।"

পৃ. ৩০, নাটকের কথা—অজিতকুমার ঘোষ, ১৯৫৯ কলিকাতা।

৫. "The purpose of language are two—we have occasion to mark sensation or idea singly and we have occasion to mark them in trains, in otherwords we have need of contrivances to mark not only sensations and ideas but also the order of them." —Page-157, Analysis of the Phenomena of human mind—J. Mill, Volume-I, London, 1869.

৬. "...avoid poetry which could not stand the test of strict dramatic utility." —Page-32, Poetry and Drama—T. S. Eliot, London, 1950.

৭. "In the use of verse and prose Shakespeare observes very nice distinction according to the ranks of the speakers but still more according to their characters and disposition of mind." —Page-374, Discovering Drama—E. Drew, London, 1937.

৮. "A criterian for good drama is therefore the degree to which the matter serves the purposes of information and preparation is turned into lively dialogue." —Page-3, Shakespear's Dramatic Art—Wolfgrang Clemen, London, .

৯, Page-102, Ebsens Dramatic Technique—P. F. D. Tennant, Cambridge, 1948.

১০. "অশ্রাব্যং খলু যদ্‌বস্তু তদিহ স্বগতং মতম্‌"...

সূত্র ১৩৭, ষষ্ঠঃ পরিচ্ছদঃ, সাহিত্য দর্পণঃ।
বিশ্বনাথ কবিরাজ, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা।

১১. "The pseudo-soliloquy occurs when a character who is not physically alone clearly revealed in his speech that he is not aware of the world surrounding him but is actually engrossed with another reality." —Page-203, A Drama of Souls—Egil Tornqvist, London

১২. "When the addressee is non-human (or dead) and is visible to the audience I term the speeches pseudo-monologues." —Page-203, A Drama of the Souls—Egil Tornqvist, London, 1969.

১৩. "রাজকৃষ্ণ রায়ের আভিনয়িক ছন্দ অথবা ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ রাজকৃষ্ণ বা গিরিশচন্দ্র কেউ-ই উদ্ভাবন করেননি। এই ছন্দটির প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত। রাজকৃষ্ণ তাঁর নাটকে প্রথম সচেতনভাবে এর প্রয়োগ করেন। কিন্তু গিরিশ প্রতিভা এই ছন্দকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে তোলে।" পৃ. ১২৬-১২৯, স্বর ও বাক্‌রীতি

—ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, কলিকাতা,

১৪. "তাঁহার সকল শ্রেণীর লোকের ভাষার সঙ্গে পরিচয় ছিল। ততোধিক সেই ভাষাকে প্রাণবন্ত, গতিবেগসম্পন্ন ভাষায় রূপান্তরিত করিবার ক্ষমতা ছিল। এই ভাষা প্রচলিত কথোপকথনের প্রতিচ্ছবি, আবার ইহা তাঁহার মৌলিক সৃষ্টি।" পৃ. ২৭, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল ও

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, কলিকাতা,

১৫. "গিরিশচন্দ্রের নাটকে বক্তৃতাসমূহ প্রায়ই দীর্ঘ। ইহার কারণ জন-সাধারণের রুচি। দীর্ঘ বক্তৃতা আজিকার যুগে অস্বাভাবিক ঠেকিলেও সে যুগে ইহার অভাবে জনমনে রসসৃষ্টি হইত না।"

পৃ. ৪১৮, ভারতীয় নাট্যবেদ ও বাংলা নাটক,
—সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা।

১৫. (ক) "সংলাপের দ্বারা নাটকীয় চরিত্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সঞ্চারিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের কুশীলবেরা সকলেই এক ধরণের কাব্যময় অলঙ্কার বহুল ভাষা এমনভাবে ব্যবহার করে যে, চরিত্রগুলির সংলাপজনিত স্বাতন্ত্র্য মুছে যায়।"

পৃ. ৫১২, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,
—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৯০, কলিকাতা।

১৬. "কবিত্ব নাটকের একটি অংগ। তাহা উপন্যাসে না থাকিলেও চলে। চরিত্রাঙ্কন নাটকে থাকা চাই।"—নাটকত্ব—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী. দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদক—অজিতকমার ঘোষ.

১৭. 'দ্বিজেন্দ্রলালের আঙ্কাক্ষিত দেশ'—ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য্য, পার্কসার্কাস বেনিয়াপুকুর সংযুক্ত দুর্গোৎসব স্যুভেনির,

১৮. "সংলাপ রচনায়···তিনি প্রাকৃত রুচির বেশী প্রশ্রয় দিতেন বলে মার্জিত মনের দর্শক পাঠক তাঁর অধিকাংশ নাটক থেকে বিশেষ কোন তৃপ্তি খুঁজে পান না।"

পৃ. ৫১৩, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,
—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,

পঞ্চম অধ্যায়

।। নাট্য প্রযোজনার বৈশিষ্ট্য ।।

থিয়েটার বলতে নাটক ও তার প্রযোজনাকে বোঝায়। নাটক একাধারে দৃশ্য ও শ্রব্য। তথাপি নাটক পড়ে যতখানি বোঝা যায় নাটকের সুষ্ঠু প্রযোজনা দেখে তার চেয়ে বেশী বোঝা যায় ও গভীরভাবে অনুভব করা যায়। এই জন্যই নাটক প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। নাটককে সুবোধ্য করে তোলার জন্য দর্শকদের সামনে তাকে উপস্থাপিত করা হয়। এক এক যুগে নাট্যপ্রয়োগের এক এক রকম রীতি প্রচলিত। পূর্বে নাট্যদলের প্রধান অভিনেতা নাটক প্রয়োগেব দায়িত্ব বহন করতেন। নাট্যকার নাটক রচনা করে দলের মালিককে দিতেন এবং মালিক সেটা দলের প্রধান অভিনেতার হাতে ছেড়ে দিতেন। তিনি তাঁর দলের সহযোগী অভিনেতাদের সাহায্যে মঞ্চে তা উপস্থাপিত করতেন। এই প্রয়োগ-রীতিতে প্রয়োগের অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা অভিনয়ের উপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হোত। দর্শকরা বিশেষভাবে প্রধান অভিনেতাকেই দেখতেন। নাটকও তদনুরূপ-ভাবেই প্রযুক্ত হোত। এতে মঞ্চ সজ্জা (set), আলোকসজ্জা (Light) সংগীত (Music), রূপসজ্জা (Costume), অঙ্গরচনা (Make up)—এগুলির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা না হলেও দর্শকদের আনন্দ দানের কথা চিন্তা করে এর কোন কোনটির উপর ক্ষেত্র বিশেষে জোর দেওয়া যে না হোত তা নয়। নাট্যকারদের রচিত নাটক প্রধান অভিনেতা দর্শকদের সামনে সরাসরি উপস্থাপিত করতেন। একে নাট্য প্রযোজনার প্রত্যক্ষ পদ্ধতি (Direct System) বলা হয়। অভিনয়ে Star System—এর অধিক প্রাধান্য ছিল। প্রধান অভিনেতা অন্যান্য অভিনেতাকে Motion দিয়ে অভিনয় শিখিয়ে দিতেন বলে প্রধান অভিনেতা তথা অভিনয় শিক্ষক অনেকদিন পর্য্যন্ত motion master রূপে অভিহিত হতেন। আমাদের দেশে পেশাদারী থিয়েটারে এই রীতি বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্য্যন্ত চলে। বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে এর পরিবর্তন দেখা দেয়।

নাট্য প্রযোজনার আধুনিক রীতি অপ্রত্যক্ষ পদ্ধতি (Indirect System) নামে পরিচিত। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে জার্মানীর Duke of Sximenin-gen (George II) এই রীতির প্রবর্তন করেন। এতে নাট্যকার নাটক রচনা করে দলের মালিকের হাতে দেবার পরে দলের মালিক নাটক প্রয়োগ করার জন্য সেটি একজন পরিচালকের (Director) হাতে তুলে দেন। পরিচালক নাটকটি পাবার পর নাটকের গঠনগত দিককে সচেতনভাবে বিশ্লেষণ করেন এবং এর প্রয়োগ গত দিক সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করেন। নাটককে যুক্তিনিষ্ঠ ও বিশ্বাসযোগ্যতার

সঙ্গে উপস্থাপিত করার জন্য তিনি যত্নশীল হন এবং প্রয়োগের দিক থেকে নাট্যরচনার কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে তা সংশোধন করেন।[১] নাট্যরচনার পরিবর্তন ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রে পরিচালককে খুব সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হয়। নাট্যকারের মূল বক্তব্যকে অক্ষুন্ন রেখেই পরিচালক নাট্যপ্রয়োগের সমৃদ্ধি সাধনের জন্য নাট্যকারের রচনার সংশোধন করতে পারেন। পরিচালকের এই বিশেষ ভূমিকা প্রসঙ্গে John Gasner-এর উক্তি স্মরণযোগ্য—"A Director is only a substitute for an author's executive weakness."[২]

পরিচালককে নাটকটি উপস্থাপনার মাধ্যমে নাটকের আবেগগত ও বুদ্ধিগত দিককে (Emotional and Intellectual auspect) তুলে ধরতে হয়। সমগ্র নাট্যপ্রয়োজনার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য প্রয়োগকারকে নাট্যচরিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অভিনেতাদের শিক্ষাদান করতে হয়। প্রযোজনার সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কারিগরদের (technician) কাজের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাদি দিতে হয়। সমগ্র ব্যবস্থার অধিকর্তারূপে প্রশাসনিক ব্যাপারেও তীক্ষ্ন নজর রাখতে হয়। এইভাবে নাট্য প্রয়োগের প্রতিটি অঙ্গকে সুনিয়ন্ত্রিত করে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারা নাটককে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করার ক্ষেত্রে পরিচালক পথ নির্দেশক হিসাবে কাজ করে থাকেন।[৩] নাটকের বক্তব্যকে সহজবোধ্য করে পরিবেশিত করার জন্য নাট্য প্রয়োগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি অঙ্গের উপর পরিচালক সমান গুরুত্ব আরোপ করেন। এর ফলে নাট্যপ্রয়োগ ব্যবস্থায় কোন অঙ্গই অন্য কোন অঙ্গ অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব লাভ করতে পারে না। নাটকের মূল বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটা পরিমিতি বোধের দ্বারা প্রয়োগকার প্রতিটি অঙ্গের সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্ত অঙ্গের মধ্যে ঐকতান রচনা করে নাট্যপ্রযোজনাকে সার্থক করে তুলতে প্রয়াসী হন।[৪]

আধুনিক নাট্য পরিচালন ব্যবস্থায় পরিচালক মূলত নাট্যকারের বক্তব্যের ব্যাখ্যাকার (Interpreter) হলেও তাঁর শিল্পসত্তাকে অস্বীকার করা যায় না। অনেক সময় তিনি নাট্যকারের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে নিজের কল্পনা ও চিন্তার দ্বারা সেই বক্তব্যকে সমৃদ্ধ করে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি বিশেষ দিককে (Dimension) তুলে ধরেন যা নাট্যকারের সংলাপের দ্বারা আবৃত ঘটনা এবং চরিত্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই বিশেষ ক্ষমতাই পরিচালকের সৃজনী শক্তির পরিচায়ক। বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির এই মৌলিকত্বের গুণেই প্রয়োগকার বা পরিচালক শিল্পী রূপেও বিবেচিত হন।[৫]

নাটকের সুষ্ঠু উপস্থাপনার জন্য প্রয়োগকারকে নাট্য-প্রয়োগের নিম্নোক্ত অঙ্গগুলির সাহায্য নিতে হয়।

ক) মঞ্চসজ্জা (Set)।

নাট্য ঘটনার স্থান ও কালকে পরিস্ফুট করার জন্য এবং নাট্য ঘটনার বিন্যাস সহ

নাট্যচরিত্রের বিকাশের উপযোগী পরিবেশকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত মঞ্চ সজ্জার প্রয়োজন। পরিচালক যেভাবে নাটকের ব্যাখ্যা করতে চান সেভাবেই তিনি মঞ্চ সজ্জার পরিকাঠামো তৈরী করেন। এরফলে দৃশ্যধর্মী নাটকের প্রতি দর্শকের মনোযোগ গভীর হয়ে ওঠে এবং প্রয়োগ চলাকালীন নাটকের সঙ্গে দর্শকের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষিত হয়[৬]। সুষ্ঠু মঞ্চসজ্জা নাট্যকারের বক্তব্যকে অধিকভাবে দীপ্ত করে তুলতে, অভিনেতার চরিত্রায়ণকে বহুল পরিমানে হৃদয়গ্রাহী করতে এবং নাটকের ভাব ও রসকে আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে। আধুনিক নাট্যপ্রয়োগ ব্যবস্থায় নাটকের প্রকাশগত রীতির (Style of presentation) দিকে লক্ষ্য রেখে নাটকের বক্তব্যকে সহজবোধ্য করে পরিবেশিত করার জন্য কখনো Realistic কখনো বা Naturalistic আবার কখনো বা Suggestive ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের মঞ্চ সজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। প্রয়োগ ব্যবস্থার অন্যান্য অঙ্গ যথা আলো, রূপসজ্জা, পোষাক-পরিচ্ছদ ও অভিনয় রীতির সঙ্গে মঞ্চসজ্জা ব্যবস্থার ঐকতান রচনার দিকেও পরিচালককে বিশেষ সচেতনতা অবলম্বন করতে হয়।

খ) **আলোকসজ্জা** (Light)।

নাট্য প্রয়োগ ব্যবস্থায় আলোক সজ্জার একটি বিশেষ অবদান আছে। নাটকের Given condition অনুয়ায়ী আলোর উৎস খুঁজে বার করে বিভিন্ন প্রকারের আলোর ব্যবহারের দ্বারা চরিত্রের মনোগত ভাবাবেগকে (Mood and Emot ion) স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করা হয়। আলোর সাহায্যেই নাট্য ঘটনার পরিবেশকে গড়ে তোলা হয় এবং নাট্য ঘটনা ও চরিত্রের গভীর অর্থবহ মুহূর্তগুলিকে আলোর সাহায্যে অধিকভাবে দীপ্ত করে তোলা হয়। আলোর বিন্যাসের সঙ্গে মঞ্চ সজ্জার সাযুজ্য রচনা করে নানাবিধ মঞ্চ মায়া (Stage Illusion) সৃষ্টির দ্বারা নাট্য আকর্ষণকে বর্দ্ধিত করে তোলা হয়। এ কারণেই আলোক সজ্জা নাট্য প্রয়োগ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গস্বরূপ।[৭]

গ) **অঙ্গ রচনা** (Make up)।

নাট্যপ্রয়োগ ব্যবস্থায় অঙ্গসজ্জার একটি বিশেষ দিক বর্তমান। নাট্যকার তাঁর চিন্তা ও কল্পনার সাহায্যে যে চরিত্র সৃষ্টি করে থাকেন অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে অভিনয়ের মাধ্যমে সে চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করতে হয়। এক্ষেত্রে অভিনেতব্য চরিত্রের দুটি দিক বর্তমান। বাইরের দিক ও ভিতরের দিক। নাট্যকারের দেওয়া সংলাপের সাহায্যে অভিনেতা চরিত্রের ভিতরের দিককে (Internal auspect) উন্মোচিত করেন। কিন্তু অভিনেতব্য চরিত্রের বাইরের দিকের (external auspect) উদ্ঘাটনের জন্য অভিনেতা এবং অভিনেত্রীকে তাদের নিজস্ব বাহ্যিক রূপের পরিবর্তন ঘটাতে হয়। এইজন্য অঙ্গ রচনার (Make

up) সাহায্য নিতে হয়। অঙ্গরচনার কলাকৌশলের সাহায্যে অভিনেতা এবং অভিনেত্রী তাঁদের দৈহিক বাহ্যিক রূপের পরিবর্তন ঘটিয়ে নাট্যকারের পরিকল্পিত চরিত্রের বাহ্যিক কাঠামোর একটা মঞ্চমায়া (Illusion) সৃষ্টি করেন। অঙ্গরচনার সাহায্য ছাড়া অভিনেতা এবং অভিনেত্রীর পক্ষে নাট্যচরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করা এবং নাট্যকারের বক্তব্যকে দর্শকদের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলা সম্ভবপর হয় না। এইজন্যে সুষ্ঠু অঙ্গরচনা নাট্যপ্রয়োগ ব্যবস্থার এক অপরিহার্য্য অঙ্গ স্বরূপ।[৮] চরিত্রের শারীরিক, সামাজিক এবং এই দুয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা চরিত্রের মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী অঙ্গরচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। অঙ্গ রচনার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকার রঙ ব্যবহারের কলাকৌশল, কেশবিন্যাসের নানাবিধ রীতি-নীতি বিষয়ে অভিনেতাকে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। অভিনয়ে চরিত্রের বাহ্যিক রূপ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে অভিনেতাকে প্রয়োজন অনুসারে সরল অঙ্গ রচনা (Straight Make up), সংশোধনমূলক অঙ্গ রচনা (Corrective Make up), এবং বিশেষ অঙ্গ রচনার (Special Make up) সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। অভিনেতব্য চরিত্রের এই বাহ্যিক রূপ রচনার মুনশীয়ানার মধ্যেই অঙ্গ রচনাকারের শিল্প সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।[৯]

ঘ) **অলঙ্করণ** (Costume)

নাট্যপ্রয়োগ ব্যবস্থায় 'অঙ্গসজ্জা' নিজের বিশিষ্টতায় সমুজ্জ্বল। অভিনেতাকে অভিনেতব্য নাট্যচরিত্রের অনুরূপ বাহ্যিক দিককে পরিস্ফুট করার জন্য উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদের মাধ্যমে সুষ্ঠু অঙ্গসজ্জা গ্রহণ করতে হয়। সঠিক পোষাক-পরিচ্ছদ অভিনেতার চরিত্রের অনুভূতি (Feeling) ও মনোভঙ্গীর (attitude) সহায়ক রূপে কাজ করে। চরিত্রোচিত অঙ্গসজ্জা চরিত্রের ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে থাকে। এই অঙ্গসজ্জার মাধ্যমে নাট্য ঘটনার যুগোচিত পরিবেশকেও পরিস্ফুট করা হয়।[১০] এসব দিক বিচার করে নাট্যাভিনয়ে পোষাক পরিচ্ছদের প্রয়োজনীয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অঙ্গসজ্জাকে নাটকের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োগকারকে বিশেষ যত্নশীল হতে হয়। পোষাক পরিচ্ছদের পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে নাট্য ঘটনায় যে যুগের কথা বলা হয়েছে পোষাক পরিচ্ছদ নির্বাচনে সেই যুগের রঙ আরোপ করতে হয়। পরিকল্পিত পোষাক পরিচ্ছদ এবং অঙ্গ-সজ্জার অন্যান্য উপকরণ অভিনেতার অভিনয়ের পক্ষে যাতে ভারবাহী হয়ে না ওঠে সেদিকেও দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। সাবলীলভাবে অভিনেতার চলা, ফেরা, এবং অভিব্যক্তির প্রকাশের দিকে লক্ষ্য রেখেই অঙ্গসজ্জার রূপকল্পনা চিন্তা করা বিধেয়। তদুপরি অভিনেতব্য চরিত্রের মনোগত ভাবের সঙ্গে অঙ্গসজ্জার সামঞ্জস্য থাকাও প্রয়োজন। এর ব্যতিরিকে অভিনেতব্য চরিত্রের বাহ্যিক দিকটির স্বাভাবিকতা ও সুষ্ঠু প্রকাশ ব্যাহত হয়।

(ঙ) **সংগীত ও ধ্বনি** (Music and Sound)

সংগীতের তিনটি ভাগ। নাচ, গান, বাজনা। নাট্যকার নাটকে প্রয়োজনবোধে গানের ব্যবহার করতে পারেন। অপ্রয়োজনে যেখানে সেখানে দর্শকদের খুশী করার জন্য নাটকে গান দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। শেক্‌সপীয়র তাঁর নাটকে কোথাও কোথাও সঙ্গীত ব্যবহার করেছেন। আমাদের সংস্কৃত নাটকেও কোথাও কোথাও গানের ব্যবহার আছে। বাংলা নাটকেও গানের ব্যবহার আছে এবং কিছু বেশী পরিমানেই আছে। যাত্রা নাটকে গান অপরিহার্য্য উপাদান। কিন্তু থিয়েটারী নাটকে গান অপরিহার্য্য উপাদান নয়। তবুও বাংলা নাটকে যে গানের বাহুল্য দেখা যায় তার কারণ দর্শক মনোরঞ্জন। যাত্রার দর্শকেরাই ক্রমে থিয়েটারের দর্শক হয়ে ওঠে। তাই নাট্যকারকে থিয়েটারের দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য নাটকে অধিক সংখ্যক গানের কথা ভাবতে হয়েছে। গান ছাড়াও নাটকে নৃত্যের উপস্থাপনার প্রয়োজন হতে পারে। আবার আবহ রচনায় নানা প্রকারের যন্ত্র সংগীত ও ধ্বনির ব্যবহার প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। ধ্বনিও সংগীতের অন্তর্গত। বস্তুত-পক্ষে বিভিন্ন ধ্বনি থেকেই বিভিন্ন সুরের উদ্ভব। যাই হোক, পরিবেশ সৃষ্টিতে ধ্বনির প্রয়োজন। বর্ষার ব্যাঙের ডাক, বনে শৃগালের ডাক, ঝড়ো হাওয়ার শব্দ, মেঘের গর্জন, জল কল্লোল, বনের বৃক্ষশাখার মর্মর ধ্বনি, পোড়ো বাড়ীতে ঝিঁ ঝিঁর ডাক—ইত্যাদির জন্য নাট্য প্রযোজনায় ধ্বনির প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত সংগীত ও ধ্বনির ব্যবহারে নাটকের প্রয়োগ দীপ্তি বর্দ্ধিত হয়।

(চ) **অভিনয়** (Acting)

অভিনয়ই নাটকের প্রাণস্বরূপ। এর মধ্য দিয়ে নাট্যচরিত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে। অভিনেতা নাট্যচরিত্রের প্রতিরূপ নিজের মনে সৃষ্টি করেন। সেই মানস প্রতিরূপ অনুযায়ী অভিনেতা চরিত্রকে মঞ্চে রূপ দেবার চেষ্টা করেন। এ কাজে অনুকরণই তার প্রধান সহায়ক। "অনুকরণ থেকেই অভিনয়ের সূচনা। অভিনয়ের এই অনুকরণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। যে কোনপ্রকার অনুকরণই অভিনয় নয়। কেবলমাত্র তার রস উদ্বোধক স্বাভাবিক অনুকরণই অভিনয়। অভিনয়ে এই স্বাভাবিক কথাটি একটু বুঝে নওয়া প্রয়োজন। এই স্বাভাবিক মানে বাস্তবের হুবহু অনুকরণ নয়, বাস্তবের ভাবানুকরণ। natural নয়, as if natural."[১১]

মঞ্চে চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলার জন্য অভিনেতাকে empathy-র সাহায্য নিতেই হয়। অঙ্গ রচনা ও অঙ্গসজ্জার মাধ্যমে অভিনেতা নিজের রূপ পরিত্যাগ করে অভিনেতব্য চরিত্রের রূপ গ্রহণ করেন। অভিনেতব্য চরিত্রের কথা ভাবতে ভাবতে অভিনেতা সেই চরিত্রে পরিণত হয়ে যান এবং সেই চরিত্রের মত আচরণ করতে থাকেন। নাট্যশাস্ত্রকার ভরতও অভিনেতাকে পরের দেহ অবলম্বন করে পরের ভাব আচরণ করার কথা বলেছেন।[১২] এই তন্ময়ীভবন (empathy)

ছাড়া অভিনেতার পক্ষে সার্থকভাবে চরিত্রসৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এই তন্ময়ীভাব সত্ত্বেও অভিনেতা তাঁর আত্মসচেতনতা একেবারে হারিয়ে ফেলেন না। অভিনেতার মধ্যে দুটি সত্তা বিরাজমান।[১৩] তার এক সত্তা চরিত্র সৃষ্টি করে আর এক সত্তা তার সৃষ্টি সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করে তাকে ঠিক পথে চলতে সাহায্য করে।

মঞ্চে চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলার জন্য হাব, ভাব, হেলা, সত্ত্ব, কান্তি ও শোভা সহযোগে আটটি স্থায়ীভাব, আটটি সাত্ত্বিক ভাব ও তেত্রিশটি ব্যাভিচারী ভাবের সাহায্য অভিনেতাকে গ্রহণ করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে অভিনেতা অভিনয়ের মাধ্যমে রস সৃষ্টি করেন না। অভিনেতা দর্শকের মনে রস সৃষ্টির সহায়ক মাত্র। কারণ রস সৃষ্টি হয় দর্শকের মনে। অভিনেতা চরিত্রের আবেগ অনুযায়ী কণ্ঠস্বর সহ মুখজ, শারীর ও চেষ্টাকৃত ভঙ্গীর অনুকরণ করেন। তাই দেখে দর্শকের মনে চরিত্রের রূপ গড়ে উঠতে থাকে এবং দর্শকের মনের বিভিন্ন ঘুমন্ত ভাব জাগ্রত হয়ে ওঠে। এরই ফলে দর্শকের মনে রসের উদ্বোধন ঘটে।

অভিনেতব্য চরিত্রের শারীরিক, সামাজিক এবং এই দুয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা মনস্তাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে অভিনেতাকে ওয়াকিবহাল হতে হয়। প্রত্যেক চরিত্রের সঙ্গেই এই তিনটি বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মঞ্চে চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে হোলে চরিত্রের উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের সাহায্যে অভিনেতা নিজের ভাবাবেগ ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে চরিত্রের স্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সৃষ্টিই তাঁর শিল্পসত্তার পরিচায়ক।[১৪]

ছ) **নাট্যদর্শক** (Audience)।

থিয়েটার ও দর্শক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নাটকের দৃশ্য ও শ্রব্যধর্ম্মিতার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে দর্শক। নির্জনে বসে নাটক উপভোগ করা যায় না। নাট্য প্রয়োগের ব্যাপারে প্রয়োগকর্তাকে তাই নাটকের দর্শক সম্বন্ধে বিশেষ ভাবনা চিন্তা করতে হয়। দর্শকের চিন্তা, কল্পনা, বুদ্ধি, বিবেচনা এবং তার সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা নাট্যকারের নাট্য রচনা ও তার প্রয়োগ পরিকল্পনাকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে থাকে। ইউরোপে Lope de vega এবং মলিয়ারের নাট্যরচনা ও তার প্রয়োগ ব্যবস্থা Pit Box এবং Gallery-র দিকে তাকিয়েই অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। এলিজাবেথীয়ান যুগে দর্শকগণ নাট্যচরিত্রের রূপসৃষ্টির মধ্যে যেমন মানবিক গুণের স্ফুরণ দেখতে চাইতেন তেমনি নাট্য প্রয়োজনার সময় মঞ্চের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ভয়ানক ও বীভৎস ঘটনার উপস্থাপনার প্রতিও তাঁদের গভীর আকর্ষণ ছিল। এরই ফলে সেক্‌সপীয়রের নাট্যরচনায় যেমন মানবিক মূল্যবোধে উদ্দীপ্ত চরিত্রের উপস্থাপনা লক্ষ্যনীয় হয়ে ওঠে তেমনি তাঁর নাট্য প্রযোজনার সময় নাট্য ঘটনার অন্তর্গত যুদ্ধবিগ্রহ, হত্যা ইত্যাদি লোমহর্ষক দৃশ্যগুলিকেও মঞ্চের উপর

দেখাবার রীতি গড়ে উঠেছিল। যুগের দর্শকের জনপ্রিয় অভিরুচির (Popular taste) প্রয়োজনে সে সময় এ ভাবেই নাটক ও তার প্রয়োগ ব্যবস্থার সঙ্গে দর্শকের একটা সামঞ্জস্য বিধান করার প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য।[১৫]

বিভিন্ন প্রকার উদ্দেশ্য নিয়ে দর্শকরা নাটক দেখতে আসেন। কেউ দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমিতা থেকে ক্ষনিকের মুক্তির জন্য নাটক দেখতে আসেন। কেউ বা নাটক দেখে তাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাজাত বন্ধ আবেগকে দূরীভূত করে (Purgation of emotion) নতুন উদ্দীপনা সংগ্রহ করার জন্যও রঙ্গমঞ্চে আসেন। আবার অনেকে রঙ্গমঞ্চে উপস্থাপিত নাটকের মধ্য দিয়ে নাট্যকার ও প্রয়োগকারের সুচিন্তিত জীবন দর্শনকে উপলব্ধি করার জন্যও রঙ্গালয়ে উপস্থিত হন। এই প্রত্যেক শ্রেনীর দর্শকের কথা মনে রেখে পেশাদারী থিয়েটারের নাট্যপ্রয়োগকর্ত্তাকে নাটক প্রয়োগ করতে হয়। তাই সৌখিন সম্প্রদায় অথবা অপেশাদারী থিয়েটারের নাট্য প্রয়োগের সঙ্গে পেশাদারী থিয়েটারের নাট্যপ্রয়োগের স্বভাবতই পার্থক্য দেখা যায়।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিবন্ধের আলোচ্য সময় সীমার মধ্যে (১৯০০-১৯২০) বাংলা থিয়েটারের বিভিন্ন নাট্য প্রযোজনার আলোক সজ্জা, দৃশ্যসজ্জা, অঙ্গ রচনা, অঙ্গসজ্জা, সংগীত ও ধ্বনি, এবং অভিনয়ের উপস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

(১) **আলোকসজ্জা** (Lighting)।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে বঙ্গ রঙ্গালয়ের নাটক মঞ্চস্থ করার সময় কোন কোন পেশাদারী থিয়েটার সম্প্রদায় 'পাণ্ড' লাইট ব্যবহার করতেন। এই লাইট গ্যাসে জ্বলত। এর বহির্গঠন লম্বা স্তম্ভাকৃতির বা হ্যাচাকের মতন ছিল। হ্যাচাকের মত এটাও পাম্প করা হোত। কয়েকটি 'পাণ্ড' লাইটের সাহায্যে রঙ্গমঞ্চ আলোকিত করা হোত। এ ছাড়া আর এক ধরণের আলোর ব্যবহার করা হোত। এদের 'চৌদ্দলাইট', 'আঠারো লাইট' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হোত। এই ব্যবস্থায় আলো জ্বালাবার জন্য চিমনির নীচে একটি আধারে গ্যাস বা কেরোসিন বা অনুরূপ কোন পদার্থ রেখে দেওয়া হোত এবং তা দিয়ে আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা করা হোত। আধারটির আয়তন অনুসারে আলো জ্বালাবার উপকরণের মাত্রা স্থির করা হোত।[১৬] তবে সাধারণ রঙ্গালয়ে গ্যাসের আলোই প্রধানত ব্যবহৃত হোত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে কোন কোন রঙ্গালয়ে ডায়নামো যোগে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার করা হলেও বিশ শতকের প্রথম থেকেই সাধারণ রঙ্গালয়ে ধীরে ধীরে বৈদ্যুতিক আলোর প্রচলন হতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে গ্যাস লাইটের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। রঙ্গালয়ে আলোর সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য Foot light, Stand light,

Arch light ইত্যাদি ব্যবস্থার সাহায্যে আলোর প্রয়োগ হতে থাকে। মঞ্চের সামনে Foot light-এর কয়েকটি সারি চিহ্নিত করে রাখা হোত। Foot light-এর আলোর রোশনায় দর্শকগণ যাতে বিব্রত বোধ না করেন সেইজন্য Foot light-এর বিভিন্ন সারির উপরিভাগ মোটা পিসবোর্ড বা শক্ত কাগজ দিয়ে কৌশলে আবৃত করে রাখা হোত। নাট্যঘটনা ও পরিস্থিতি অনুসারে দৃশ্যবিশেষে Foot light-এর উপর বিভিন্ন রঙিন কাগজ ফেলে আলোর বৈচিত্র্য সম্পাদন করা হোত এবং নাট্য-মুহূর্তকে দীপ্ত করে তোলার চেষ্টা হোত। ক্রমে ক্রমে মঞ্চের উপরে দুই তিনটি কক্ষ বিভাগ করে আলোর ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করা হোত। এরপর কাগজের বদলে রঙিন কাঁচ ব্যবহার করে side light ও stand light-এর মাধ্যমে বিভিন্ন রঙের আলোর ব্যবহারের দ্বারা নাট্য প্রযোজনাকে সমৃদ্ধ করে তোলার প্রচেষ্টা কার্যকরী হতে থাকে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিকে মঞ্চের গুপ্ত দ্বারের (Trap Door) সাহায্যে একটা Arch Lamp মঞ্চে এমনভাবে স্থাপন করা হোত যার সাহায্যে অভিনয় চলার সময় নাট্য ঘটনার বিশেষ মুহূর্ত এবং অভিনেতা অভি-নেত্রীর বিশেষ ভাবাভিব্যক্তিকে স্পষ্ট করে তোলা হোত।[১৭] তবে এসব ক্ষেত্রে সব সময় যে আলোর প্রয়োগ সার্থক হয়ে উঠেছে একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। পরিমিত ও পরিশীলিত জ্ঞানের অভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে আলোর দ্বারা লক্ষ্য-বস্তুর বিশিষ্টতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। এর ফলে নাট্য প্রযোজনার সফলতা ব্যাহত হয়েও পড়েছে।[১৮]

(২) **মঞ্চসজ্জা** (Set)।

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে প্রযোজনার দিকে লক্ষ্য রেখে সামগ্রিকভাবে মঞ্চসজ্জার ব্যবস্থা করার দৃষ্টিভঙ্গি তখনও গড়ে ওঠেনি। দৃশ্য সজ্জার জন্য আঁকা সিন ব্যবহার করা হোত। বনাঞ্চল, পর্বত প্রদেশ, রাজবাড়ী, নদীর ধার, শ্মশান ইত্যাদি নানান প্রকারের আঁকা সিনের সাহায্যে নাট্য ঘটনার স্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে প্রকাশ করা হোত। এই দৃশ্য অঙ্কনের ক্ষেত্রে চিত্রশিল্পের বিজ্ঞানধর্মী জ্ঞানের অভাব ছিল। অট্টালিকা, গৃহকক্ষ, রাজদরবার, রাজপথ ইত্যাদি অঙ্কনের ক্ষেত্রে পরি-প্রেক্ষিত বিজ্ঞান (Perspective Drawing) সুষ্ঠুভাবে না মানার জন্য সমগ্র দৃশ্য অঙ্কনের মধ্যে পারস্পরিক সমতা ও সামঞ্জস্য ব্যাহত হোত। এর ফলে সুষ্ঠু দৃশ্য সজ্জার অভাবে নাট্য প্রযোজনার বিশিষ্টতা ক্ষুন্ন হয়ে পড়তো। দর্শকদের পক্ষেও নাট্যদৃশ্যের পরিবেশকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা অনেক সময় কষ্টকর হয়ে উঠত। দৃশ্য অংকনের ক্ষেত্রে রঙের ব্যবহারও সঠিকভাবে করা হোত না। দৃশ্যগুলির ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির জন্য গাঢ় রঙের নীল, সবুজ, সিন্দুর ইত্যাদি রঙের ব্যবহারের ফলে দৃশ্য পটের শৈল্পিক ও নাট্য গুণ নষ্ট হোত।[১৯] এছাড়া উপযুক্ত শিক্ষা ও জ্ঞান ছাড়াই বিদেশী চিত্রের অন্ধ অনুকরণের সাহায্যে দৃশ্যপট

অঙ্কনের কাজ সম্পন্ন করা হোত। এর ফলে দৃশ্যপট রচনার কার্য্য সমৃদ্ধ না হয়ে আরও বিসদৃশ্য ও অনুপযুক্ত হয়ে পড়ত।[২০] এ সকল হাতে আঁকা দৃশ্যের পশ্চাৎপটগুলি দৃশ্য অনুযায়ী মঞ্চের পিছনে ঝুলিয়ে দেওয়া হোত। দৃশ্যপট অঙ্কনের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ বা ম্যানেজার অনেক সময় দৃশ্যপট অঙ্কনে পারদর্শী বিদেশী চিত্রকরের সাহায্যও নিতেন।[২১] মন্মথনাথ দেব, প্রিয়নাথ বসু প্রমুখ চিত্রবিদ্যায় নিপুণ স্বদেশী ব্যক্তিগণও তৎকালীন বেঙ্গল থিয়েটারের দৃশ্যপট অঙ্কণে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে প্রযোজক অমরেন্দ্রনাথ দত্তের তত্ত্বাবধানে দৃশ্যসজ্জার ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়।[২২] "গিরিশচন্দ্রের যুগে তিনিই প্রথম বুঝেছিলেন যে অভিনয়ের সাফল্য নির্ভর করে অভিনয়, দৃশ্য রচনা, আলো এবং রূপসজ্জার সুষ্ঠু সামঞ্জস্যের উপর।"[২২ক]

অভিনয়ের সুবিধার জন্য নাট্য পরিবেশের বিভিন্ন দিককে উন্নত করে তোলার উদ্দেশ্যে এবং নাট্য প্রযোজনায় গতির সৃষ্টির জন্য অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মঞ্চে ঠেলা সিন, কাটা সিন, সেট সিন, কাট আউট—ইত্যাদির প্রচলন করেন। শুধু তাই নয়, নাট্য ঘটনার অবস্থানকে বাস্তবের মত গড়ে তোলার জন্য তিনি দৃশ্য অনুযায়ী মঞ্চে সত্যিকারের টেবিল, চেয়ার, খাট, তাকিয়া ইত্যাদি ব্যবহার করেন। তাঁর সময়কার ক্লাসিক থিয়েটার এ বিষয়ে পথ প্রদর্শকের কাজ করেছে।

নাট্য প্রযোজনার প্রতি দর্শকদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করার জন্য এ সময় আলো ও মঞ্চ ব্যবস্থার সমন্বয়ে মঞ্চের ওপর বিভিন্ন প্রকার মঞ্চ মায়ার (Stage illusion) সৃষ্টি করা হোত। এ ব্যাপারে মঞ্চ সজ্জাকর ধর্মদাস সুরের দক্ষতা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।[২৩] ধর্মদাস সুরের সুযোগ্য সহায়করূপে ইঞ্জিনীয়ার যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।[২৪]

মঞ্চের পিছনে Arch light স্থাপন করে তার উপর রঙিন কাগজ লাগিয়ে সময়ের বিভিন্ন পর্য্যায়কে পরিস্ফুট করা হোত। সূর্যোদয়, সূর্য্যাস্ত, রাত্রি ইত্যাদির মঞ্চমায়া সৃষ্টি করা হোত। মঞ্চের মধ্যে নদীর তরঙ্গ দেখাবার ব্যবস্থাও করা হোত। এরজন্য মঞ্চের পিছনে নদীর তরঙ্গের মত ঢেউ খেলানো পিস বোর্ডের অংশ বিশেষ সারিবদ্ধভাবে রাখার ব্যবস্থা থাকত। এই পিস বোর্ডের সারির মধ্যবর্তী ফাঁকা অংশে কাপড়ের রোল রাখা হোত। এরপর সুতোর সাহায্যে বা তারের মাধ্যমে পিসবোর্ডের অংশগুলোকে আন্দোলিত করে এবং সেই সঙ্গে কাপড়ের রোলের সঞ্চালনের দ্বারা তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ নদী অথবা সমুদ্রের বাস্তবানুগ মঞ্চমায়ার সৃষ্টি করা হোত। এ সময় মঞ্চের পিছনের আলোর সাহায্যে এ দৃশ্যকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হোত।[২৫]

আলো ও মঞ্চ ব্যবস্থার কলাকৌশলের সাহায্যে এ সময় নাট্য প্রযোজনায় যে সকল চমকপ্রদ ও আকর্ষনীয় বাস্তবানুগ মঞ্চমায়ার সৃষ্টি করা হয়েছিল সে প্রসঙ্গে মিনার্ভা,

স্টার, কোহিনুর, ইউনিক, ক্লাসিক, মনোমোহন, অরোরা ইত্যাদি রঙ্গমঞ্চের বিশেষ বিশেষ প্রযোজনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

।। মিনার্ভা থিয়েটার ।।

দুর্গাদাস—(দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—প্রযোজনা—৮. ১২. ১৯০৬)।

এ নাটকে কাটা ও ঠেলা সিনের সাহায্যে রণাঙ্গনে মোগল শিবির তৈরী করা হয়েছিল। শিবিরের বাঁদিকে একটি জানালা ছিল। এই জানালার ভিতর থেকে বাইরের আকাশ দেখা যেত। জানালা দিয়ে আসা বিদ্যুতের ঝিলিক ক্ষণে ক্ষণে মঞ্চকে চকিত আলোকে ভরিয়ে দিয়েছিল। মঞ্চের পিছনে রাখা আলোর দীপ্তিকে কমিয়ে বাড়িয়ে এই বিদ্যুৎপূর্ণ পরিস্থিতিকে প্রকাশ করা হয়েছিল (৩।৪ দৃশ্য)।

অশোক—(ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—প্রযোজনা—৭. ৩. ১৯০৮)।

নাটকের চতুর্থ অংকের পঞ্চম দৃশ্য অনুযায়ী অশোকপুত্র কুণালের চক্ষু উৎপাটন করে সেটি একটি রূপোর বাটিতে করে মঞ্চে আনা হোত। কুণালের অগ্নি-কুন্ডে ঝাঁপ দেবার দৃশ্যটি দেখান হোত। দেখাবার গুণে দৃশ্যটি লোমহর্ষক হয়ে উঠত। এতে মঞ্চের মাঝের একটু ভেতরের দিকে (Down centre) দুইপাশে আগুণ জ্বালানোর ব্যবস্থা থাকত এবং মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় কুণাল ঝাঁপ দিত। আবার কখনো কখনো মঞ্চের খানিকটা পিছনে একধারে (Down left) আগুণ জ্বালানো হোত। কুনাল চরিত্রাভিনেতা Wings-এর পাশ দিয়ে গিয়ে যেখানে আগুণ রাখা হয়েছে তার পিছনে ঝাঁপ দিত। ব্যাপারটা এত ত্বরিৎগতিতে সম্পন্ন হোত যে দর্শকরা মনে করত কুণাল যেন সত্যি সত্যিই আগুণে ঝাঁপ দিচ্ছে।[২৬]

শঙ্করাচার্য্য—(গিরিশচন্দ্র ঘোষ—প্রযোজনা—১৫. ১. ১৯১০)।

মঞ্চ সজ্জাকর ধর্মদাস সুর এ নাটকের মঞ্চ ব্যবস্থায় অসাধারণ কীর্তি স্থাপন করে যান। নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে নাটকের কয়েকটি বিশিষ্ট মুহূর্তকে তিনি বাস্তবের মত করে দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করেন। শঙ্করাচার্য্য তাঁর মায়ের স্নানের কষ্ট দূর করার জন্য মন্ত্রশক্তির সাহায্যে দূরবর্তিনী নদীকে তাঁর গৃহের সম্মুখে নিয়ে আসেন (৩।১ দৃশ্য)। নাট্য প্রযোজনাকালীন শঙ্করের পিছনে পিছনে এই নদীর স্রোত প্রবাহিত হওয়ার দৃশ্য বাস্তবানুগ করে দেখান হয়েছিল। শুধু তাই নয় শঙ্করের আহ্বানে শিষ্য সনন্দনের গঙ্গা অতিক্রম করে আসা এবং তাঁর প্রতি পদক্ষেপে গঙ্গাবক্ষে পদ্মফুল ফুটতে থাকা (১।৩ দৃশ্য), গুরুদেব গোবিন্দের সাধনায় বিঘ্ন ঘটানোর জন্য কল্লোলিত নর্ম্মদাকে শঙ্করের কমণ্ডলুর মধ্যে নিক্ষেপ করা এবং পরে গুরুদেবের আদেশে কমন্ডলু থেকে নর্মদাকে মুক্ত করে দিয়ে শুষ্ক নর্মদাকে আবার জলে প্লাবিত করার দৃশ্যগুলি সকল দর্শকের নিকট বাস্তবের ভ্রমসৃষ্টি করেছিল।[২৭] বস্তুতপক্ষে গিরিশ নাট্যপ্রযোজনার সার্থকতা

বহুলাংশে ধর্মদাস সুরের এই নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি ও শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। স্বয়ং নাট্যকার ও প্রযোজক গিরিশচন্দ্রও রঙ্গমঞ্চে ধর্মদাস সুরের বিশিষ্ট অবদানকে স্বীকার করেছেন।[২৮]

তপোবন—(গিরিশচন্দ্র ঘোষ—প্রযোজনা—১৮. ১০ ১৯১১)।

নাটকের প্রয়োগ ব্যবস্থায় দৃশ্য পটগুলি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। অংকিত দৃশ্যপটের কারিগরী কুশলতা এবং নিপুণতা দর্শককে বিস্ময়াবিষ্ট করে রেখেছিল। বিশ্বামিত্রের রাজপ্রাসাদ, বশিষ্ঠের তপোবন, হিমালয় সন্নিহিত পার্বত্য প্রদেশে বিশ্বামিত্রের সাধন স্থান, মেনকা-বিশ্বামিত্র সংবাদের দৃশ্যপট,—ইত্যাদি দৃশ্যপটগুলির সাহায্যে মঞ্চমায়ার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করা হয়েছিল।

চন্দ্রগুপ্ত—(দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—প্রযোজনা—২২. ৭. ১৯১১)।

এ নাটক প্রযোজনার সময় নাটকের দ্বিতীয় অংকের পঞ্চম দৃশ্যে মঞ্চের পিছনে একটা সেতু তৈরী করা হয়েছিল। চাণক্য এই সেতু পার হয়ে মঞ্চের পিছন থেকে মঞ্চের সামনে (From Down Stage to up stage) আসতে আসতে তাঁর সৈন্যদের নন্দকে বধ না করে বন্দী করার নির্দেশ দেন। এ ধরনের মঞ্চ ব্যবস্থায় চাণক্যের অভিনয় দীপ্তি বহুগুণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল এবং নাট্যমুহূর্তও খুব ঘনীভূত হয়েছিল।

বঙ্গে রাঠোর—(ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—প্রযোজনা—৮.৯. ১৯১৭)।

নাটকের শেষদৃশ্যে (৫।৬) মোটা পিসবোর্ড ও কাঠের সাহায্যে মন্দির ও তার অভ্যন্তরস্থ কক্ষ দেখান হোত। রঙ্গলাল চরিত্রাভিনেতা মন্দিরের ভেঙে পড়া খিলান তুলে কলিবেগমকে বাইরে পার করে দেবার পর নিজেকে আর ভারী খিলানের তলা থেকে মুক্ত করতে পারত না। অভিনয়ের মাধ্যমে তার এই অসহায় অবস্থাকে দেখান হোত। তারপর তার দেহের ওপর ভারী খিলান ভেঙে পড়ছে ও তার তলায় রঙ্গলাল চাপা পড়ে যাচ্ছে এ দৃশ্য দেখে দর্শকগণ শিহরিত হয়ে উঠতেন।[২৯]

॥ স্টার থিয়েটার ॥

বৃন্দাবন বিলাস—(ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ—প্রযোজনা—২৫. ১২. ১৯০৩)।

এই গীতিনাট্যের তৃতীয় অংকের পঞ্চম দৃশ্যের ঘটনা অনুযায়ী মঞ্চের মধ্যে কৃষ্ণের হঠাৎ কালীরূপের পরিবর্তন দেখান হয়েছিল। কৃষ্ণরূপী চরিত্রাভিনেতা মঞ্চে এসে গাছের একটা Cut out-এর সামনে দাঁড়াত। এই cut out-এ পিছনে কালীমূর্তি স্থাপন করা থাকত। কৃষ্ণের

কালীমূর্তি ধারণ করার সময় cut out টা ঘুরে পিছন দিকে চলে যেত এবং cut out-এর পিছনে থাকা কালীমূর্তি সামনে চলে আসত। এমন নিপুণভাবে কাজটা সম্পন্ন করা হোত যে দর্শকরা মোহিত হয়ে ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে পড়ত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯০৪ সালে ১৭ই আগস্ট মিনার্ভা থিয়েটারে 'নন্দদুলাল' নাট্যপ্রযোজনার সময় দৃশ্য-সজ্জার কৌশলের সাহায্যে নিমেষের মধ্যে কৃষ্ণের কালীরূপের পরিবর্তন দেখান হয়েছিল।[৩০]

রাণা প্রতাপসিংহ—(দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—প্রযোজনা—২২. ৭. ১৯০৫)।

আকবরের সঙ্গে হলদিঘাট যুদ্ধে পরাজিত রাণাপ্রতাপ তাঁর চিরদিনের সংগ্রামের সাথী চৈতককে হারিয়ে গভীর বেদনায় ভেঙে পড়েন। মৃত চৈতককে পাশে রেখে তিনি তাঁর মানসিক অবস্থাকে ভাবাভিব্যক্তির দ্বারা প্রকাশ করেছিলেন (২।৯ দৃশ্য)। এ সময় চৈতককে মঞ্চে উপস্থিত করা হয়েছিল। বাঁশের কঞ্চি, খড় ও সাদা কাপড় দিয়ে প্রতাপের প্রিয় ঘোড়া চৈতককে তৈরী করা হয়েছিল। দৃশ্যের মধ্যে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। এর ফলে এই নাট্যঘটনা খুবই ভাব ও রস সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।[৩১]

হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা—(দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—প্রযোজনা—২৫. ১২. ১৯১১)।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আষাঢ়ে' কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত 'হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা' কবিতাটির নাট্যরূপ দিয়ে স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। ট্রেনে করে হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাবার দৃশ্যটি আকর্ষনীয় করে গড়ে তোলার জন্য সে সময় মঞ্চের উপর চলমান ট্রেন দেখান হয়েছিল।[৩২] হুগলী স্টেশনে চলমান ট্রেনটির এসে থামা, ট্রেনের কামরা থেকে যাত্রীদের ওঠানামা এবং গার্ডের নিশানা ও হুইসিলের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় স্টেশন ছেড়ে চলে যাওয়ার পর্য্যায়ক্রমকে এত বাস্তবোচিত করে দেখান হয়েছিল যে দর্শকরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। হরবোলার সাহায্যে এবং কিছু পরিমানে রেকর্ডের সাহায্যে এই দৃশ্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় শব্দ সংগীতের সংযোজনা করে দৃশ্যটিকে সমৃদ্ধ করে তোলা হয়েছিল।[৩৩]
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৮৭৫ সালে ২৫শে ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে অমৃতলালের 'হীরকচূর্ণ' নাটক মঞ্চস্থ করার সময় মঞ্চে ট্রেন দেখান হয়েছিল।[৩৪] সুতরাং মঞ্চে ট্রেন দেখানটা নতুন নয়। কিন্তু আলোচ্য নাটকে এ দৃশ্যটি অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে দেখান হয়েছিল।

মাধব রাও—(মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রযোজনা—১৭.৪.১৯১৫)।

মঞ্চ স্থাপত্যের নৈপুণ্যের দ্বারা এ নাটকে তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ নদীর মাঝখানে 'নন্দী' দুর্গ তৈরী করা হয়েছিল।

বারানসী—(মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রযোজনা—৪. ১১. ১৯১৬)।

এ নাটক প্রযোজনার সময় আলোকসজ্জা, মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যপট চিত্রণ এবং অন্যান্য কারিগরী কুশলতার সাহায্যে অনেক নাট্যঘটনার বাস্তবোচিত মঞ্চমায়ার সৃষ্টি করা হয়েছিল। উন্মুক্ত মঞ্চের মধ্যে কোচ রাজকুমারীর আকস্মিক আবির্ভাব ও অন্তর্ধান, মুহূর্তমধ্যে অবিমুক্তেশ্বর মূর্ত্তির রূপের পরিবর্তন, রণোন্মত্ত মহাদেবের ত্রিশূল থেকে অগ্নি উৎক্ষেপ ইত্যাদি দৃশ্যগুলি দর্শকগণকে বিস্ময়াবিষ্ট করে রেখেছিল।[৩৫]

॥ কোহিনুর থিয়েটার ॥

ময়ূর সিংহাসন—(হরনাথ বসু—প্রযোজনা—৮.৫.১৯০৯)।

এ নাটকে জীহন আলীর বিশ্বাসঘাতকতায় দারার জীবনের শোচনীয় পরিণতি ঘটে। ক্রোধান্ধ জনগনের হাতে নিগৃহীত হয়ে জীহনআলীও মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এ সময় মঞ্চের উপর জীহনআলীকে জীবন্তদগ্ধ করার মত লোমহর্ষক দৃশ্য উপস্থাপিত করা হয়েছিল। মঞ্চের মধ্যে অগ্নিতে দগ্ধ জীহনআলীর কংকালমূর্তি দেখে দর্শকগণ ভয়ে শিউরে উঠতেন। এছাড়া আশ্রয়ের সন্ধানে মরুভূমিতে দারা ও তার পরিবারের দিনাতিপাত করার সময় মঞ্চের মধ্যে মরুভূমির মরুঝড়ের বাস্তব বিভ্রমের সৃষ্টি করা হয়েছিল।[৩৬]

দুর্গাবতী—(হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—প্রযোজনা—২৫.১২.১৯০৯)।

দৃশ্যসজ্জার অত্যাশ্চর্য্যময় কৃতিত্ব স্থাপনে এ নাটকটির প্রযোজনা দর্শককে বহুল পরিমানে আকর্ষণ করেছিল। মঞ্চে গর্জনমুখী জল-প্রপাতের দৃশ্য দেখে লোকে স্তম্ভিত হয়ে যেত। এ নাটকে রানী দুর্গাবতীসহ চারটি চরিত্র একই সঙ্গে মঞ্চে প্রবেশ করেন।[৩৭] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ক্লাসিক রঙ্গালয়ে ১৮৯৯ সালে ১৬ই সেপ্টেম্বর অমরেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলকে নাটকাকারে পরিবর্তিত করে 'ভ্রমর' নাম দিয়ে অভিনয় করেন। এতে তিনি গোবিন্দলালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং মঞ্চে ঘোড়ায় চড়ে দর্শক সমক্ষে উপস্থিত হন।[৩৮]

॥ মনোমোহন থিয়েটার ॥

মোঘল পাঠান—(সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রযোজনা—৮.৭.১৯১৬)।

আলো ও মঞ্চসজ্জার গুণে এ নাটকে শেরশাহের সঙ্গে হুমায়ুনের যুদ্ধে জাহ্নবী গর্ভে হুমায়ুনের নিমজ্জিত হবার দৃশ্যটি আকর্ষনীয় হয়ে উঠত। দুটি কাপড়ের রোলারের সাহায্যে তরঙ্গায়িত জাহ্নবী নদীর মঞ্চমায়া সৃষ্টি করা হোত। দুটি রোলারের যুক্ত স্থানের পাশে কিছু ফাঁকা জায়গা থাকত। দূর থেকে তা বোঝা যেত না। হুমায়ুণ যুদ্ধ করতে করতে সেই ফাঁকা জায়গায় পড়তেন। মনে হোত তিনি নদী গর্ভে ক্রমশ নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছেন। অভিনেতা যাতে আঘাত না পায় সেজন্য ফাঁকা জায়গার তলায় খড় চট রেখে দেওয়া হোত। নাটকের শেষ দৃশ্যে যোধপুর রানীর কন্যা কমলা কর্তৃক শেরশাহের আক্রমনকে প্রতিহত করার জন্য দুর্গের বারুদাগারে আগুণ লাগানোর দৃশ্যটিও মঞ্চসজ্জা ও আলোকসজ্জার কলাকৌশলে বাস্তবানুগ হয়ে উঠত।[৩৯]

দেবলা দেবী—(নিশিকান্ত বসুরায়—প্রযোজনা—১৭.৮. ১৯১৮)।

এ নাট্যপ্রযোজনায় মোগলদের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য লক্ষ্মীবাই চরিত্রাভিনেত্রী অশ্বপৃষ্ঠে মঞ্চে অবতীর্ন হয়ে মোগল সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন। এর ফলে দৃশ্যটি খুবই বীরত্বব্যঞ্জক ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল। এই দৃশ্যের জন্য মনোমোহন থিয়েটারে মাসিক হিসাবে ঘোড়া ভাড়া করতে হোত।

॥ অরোরা থিয়েটার ॥

রিজিয়া—(**মনোমোহন রায়—প্রযোজনা**—১৭. ৫. ১৯০২)।

পিসবোর্ড ও কাঠের সাহায্যে সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গ তৈরী করা হোত (৫।৩ দৃশ্য)। গিরিশৃঙ্গের তলায় কাপড়ের রোলার দিয়ে যমুনা নদীর প্রতিরূপ সৃষ্টি করা হোত। গিরিশৃঙ্গের উপরিস্থিত দুর্গ থেকে ইন্দিরা নদীতে ঝাঁপ দিলে নদীর জল ছিটকে চতুর্দিকে পড়ত। এই অবস্থাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য মঞ্চের নীচের দিক থেকে বড় বড় পিচকারী যোগে জল ছেটান হোত। দৃশ্যটি দর্শকদের প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। নাটকের পঞ্চম অংকের দ্বিতীয় দৃশ্যের ঘটনা অনুযায়ী কালো পোষাক পরে ঘাতক রক্ত রঞ্জিত ছুরিকা হস্তে বীরেন্দ্রের কাটা মুণ্ডু নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হোত। এই দৃশ্য দেখে দর্শকগণ ভয়ে ও আতঙ্কে শিউরে উঠতেন।[৪০]

॥ ন্যাশানাল থিয়েটার ॥

সমাজ—(মনোমোহন গোস্বামী—প্রযোজনা—১১. ৫. ১৯০৭)।

এই নাটকের প্রয়োগ কালীন আগুণে বাড়ী পুড়ে যাওয়ার দৃশ্যটি বাস্তবায়িত করে দেখান হোত।[৪১] সেই সময় এই দৃশ্যটি দর্শকের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। নাট্যপ্রয়োগ ব্যবস্থায় মঞ্চসজ্জা ও আলোক সজ্জা সম্পর্কে এবং নাটকটির প্রযোজনার বিষয়ে দর্শক মনে কৌতুহল বেড়ে গিয়েছিল।

(৩) **অঙ্গ রচনা** (make up)।

বঙ্গ রঙ্গালয়ে অঙ্গরচনার জন্য সুষ্ঠুজ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অঙ্গরচনাকারের অভাব পরিলক্ষিত হয়। তদুপরি অঙ্গরচনার জন্য প্রয়োজনীয় রঙ ও অন্যান্য উৎকর্ষময় উপকরণের ঘাটতিও লক্ষ্যনীয়। বিশ শতকের প্রথমদিকে একপ্রকারের কালো গুড়ো বস্তু জলে ভিজিয়ে তাই দিয়ে চরিত্রোচিত চোখ, ভ্রূ, ইত্যাদি মুখাবয়বের বিভিন্ন অংশ আঁকা হোত। কিন্তু গরমের সময় অভিনয় চলাকালীন শরীরের ঘামের সঙ্গে এ রঙ ধুয়ে যেত। এর ফলে অভিনেতার পক্ষে সুষ্ঠুভাবে অভিনয় কার্য্য চালিয়ে যাওয়া অসুবিধাজনক হয়ে পড়ত। পরবর্তীকালে মুখাবয়বের বিভিন্ন অংশকে পরিস্ফুট করার জন্য Blume of Rose নামক একপ্রকার গোলাপী রঙ, জিঙ্ক অক্সাইড, খড়িমাটি, মেটে সিন্দুর, পেউরি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। মেটে সিঁদুর গুঁড়ো করে তা পাতলা একটুকরো কাপড়ের মধ্যে রেখে টোপলা করা হোত। পরে তাই দিয়ে মুখে পপের কাজ করা হোত। পপের পর অন্য কাপড় দিয়ে মুখের বাড়তি রঙকে ধীরে ধীরে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া হোত।[৪২]

প্রথমদিকে অভিনেতা অভিনেত্রীর গোঁফ, দাড়ি ও চুলের জন্য কোনরকম crape এর কাজের প্রচলন হয়নি। এ সময় চুল, দাড়ি, দড়ির সাহায্যে কানের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হোত। পরে দড়ির বদলে সরু তার ব্যবহৃত হয়। লোহার আংটা দিয়ে লাগানো দুই পাটি গোঁফ অভিনেতাদের নাসারন্ধ্রের দুইপাস দিয়ে আটকে দেওয়া হতো। পরে দাড়ি, গোঁফ, লাগানোর কাজে spirit gum ব্যবহার করা হয়। স্টার থিয়েটারের নাট্য প্রযোজক অমরেন্দ্রনাথ এ বিষয়ের পথপদর্শক। রঙ্গালয়ের অঙ্গরচনার সুবিধার জন্য চিৎপুরে কিছু wig maker তাঁদের ব্যবসা আরম্ভ করেন। এঁদের সাহায্যে রঙ্গালয়ে অভিনেতব্য চরিত্রের চুল, দাড়ি ও কেশ বিন্যাসের ব্যবস্থা করা হয়। চিৎপুরের wig maker রা নাটকের মহলা চলার সময় মহলাকক্ষে উপস্থিত থাকতেন এবং অভিনেতাদের মাথার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় অংশের মাপ নিয়ে চরিত্রানুগ কেশ-দাড়ি ইত্যাদি তৈরীর দিকে যত্নশীল হতেন।[৪৩]

অঙ্গরচনার সময় রঙ মেশানো ও লাগানোর কলাকৌশল সম্বন্ধে অঙ্গরচনাকর এবং অভিনেতাদের জ্ঞান খুবই সীমিত ছিল। এর ফলে অনেক সময় অঙ্গরচনা চরিত্রের পক্ষে অনুপযুক্ত ও ভারবাহী হয়ে উঠত।[৪৪] গিরিশযুগে অঙ্গরচনাকর কার্তিকচন্দ্র পাল অঙ্গরচনা কার্যে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন।

(৪) **অলঙ্করণ** (Costume)।

নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে অঙ্গসজ্জার গুরুত্ব সম্পর্কে এ সময়কার নাট্য-প্রযোজকদের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। নাটকের অভিনেতব্য চরিত্রের জন্য পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরী করা, অভিনয়কালীন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের তা সরবরাহ করা—এ সকল দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করতেন তাদেরও এ সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাব লক্ষ্যনীয়। দৈনন্দিন জীবনে পোষাক পরিচ্ছদের তত্ত্বাবধান সম্পর্কিত স্বল্পজ্ঞানই ছিল তাঁদের একমাত্র মূলধন। তাই নাটক মঞ্চস্থকালীন সুষ্ঠু পোষাক পরিচ্ছদের নির্বাচন দ্বারা অভিনেতার অভিনয় দীপ্তি ও নাট্যপ্রযোজনার প্রয়োগদীপ্তিকে সমৃদ্ধ করে তোলার দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের মধ্যে তখন গড়ে ওঠেনি।[৪৫] এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই পোষাক পরিচ্ছদ চরিত্রোচিত না হবার জন্য সমগ্র নাট্য প্রযোজনার উৎকর্ষ ব্যাহত হয়ে পড়ত। নাট্য ঘটনায় দেশকালের যে পরিচয় থাকত বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পোষাক পরিচ্ছদ তদনুযায়ী হোত না। পোষাক পরিচ্ছদের মধ্য দিয়ে চরিত্রের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিচয় প্রায় ক্ষেত্রেই ফুটে উঠত না। নাট্যাভিনয়ের সময় নাট্য জগতের প্রধান প্রধান ব্যাক্তিগণের ব্যক্তিগত অভিনয় কৌশল প্রদর্শনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হোত। এই জন্য সমগ্র নাটকের অন্যান্য চরিত্র অপেক্ষা এই প্রধান ব্যাক্তিটির অভিনেতব্য চরিত্রের পোষাক যাতে তুলনামূলকভাবে অধিক জমকালো ধরণের হয় এবং যাতে তার পোষাক পরিচ্ছদের দ্বারা অভিনয় কালীন তার হাঁটা, চলা, গতি-ভঙ্গী, অভিব্যাক্তির কোন রকম ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকেই নাট্য প্রযোজক ও অঙ্গসজ্জাকরের অধিক দৃষ্টি দান করতে হোত। বিশেষ ধরনের জমকালো পোষাক তৈরীর দ্বারা তার প্রতি দর্শকের আকর্ষণ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হোত। এরফলে সামগ্রীক নাট্যপ্রযোজনার দিকে লক্ষ্য রেখে সকল অভিনেতার চরিত্রানুগ পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করা এবং এর মাধ্যমে অঙ্গসজ্জার ঐকতান রচনা করা সম্ভবপর হয়ে উঠত না। নাট্যাভিনয়ের পোষাক পরিচ্ছদ ব্যক্তিপ্রধান হয়ে উঠত। অভিনয়ের সময় নাট্যঘটনা ও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যচরিত্রের পোষাক পরিচ্ছদের দিকে প্রায়ই লক্ষ্য রাখা হোত না। বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক—এই বিভিন্ন প্রকার নাটকের বিভিন্ন ধরনের চরিত্রের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করাও খুবই অসুবিধাজনক ছিল। এর ওপর বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের জন্য চরিত্রোপযোগী সঠিক পোষাক

পরিচ্ছদ নির্বাচন করাও সব সময়ে কার্য্যকরী হয়ে উঠত না। এরফলে একই পোষাকে বিভিন্নধর্ম্মী নাটকের বিভিন্ন প্রকার চরিত্রকে অঙ্গসজ্জায় সজ্জিত হয়ে মঞ্চে উপস্থিত করা হোত।[৪৬] এর ফলে বৈচিত্র্যের অভাবে পোষাক পরিচ্ছদ একঘেয়েমি দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ত। চরিত্রানুগ পোষাকের অভাবে দর্শকদের পক্ষে নাট্যচরিত্রের ভাবমূর্তিকে সব সময়ে ধরে রাখা সম্ভব ছিল না। অভিনেতার পক্ষেও চরিত্রের ভাবাবেগকে উপযুক্তভাবে অনুভব করার কাজটি সহজ সাধ্য হয়ে উঠত না। তাই বলে পোষাক পরিচ্ছদের দিক দিয়ে প্রতিটি চরিত্রকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সব সময় বিশেষ দৃষ্টি না দিলেও কখনো কখনো যে এর প্রতি একেবারেই দৃষ্টি দেওয়া হোত না তা নয়।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্রের পোষাক-পরিচ্ছদের একটা [illegible] গড়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিক নাটকে সাধারণ হিন্দু চরিত্রে অভিনেতারা পা পর্য্যন্ত লম্বা ঝোলানো জামা ব্যবহার করতেন। এ পোষাক অনেকটা আলখাল্লার মত দেখতে হোত। এর সঙ্গে শিরস্ত্রাণ হিসাবে পাগড়ী ও কোমরে পট্টী থাকত। জামার বুকের কাছে নকশা করা কাজ যুক্ত আলাদা কাপড় সূক্ষ্ম সুতো বা রঙীন রেশমী দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকত। রাজা মহারাজার চরিত্রের ক্ষেত্রে পোষাকটি দামী সিল্ক বা ভেলভেট দিয়ে তৈরী হোত। জামার বুকের কাজের গভীরতা আরও বেশী হোত। এরসঙ্গে প্রয়োজন বিশেষে একটি কোমরবন্ধ সহ তলোয়ার থাকত।[৪৭] অনেক সময় সিল্কের সুদৃশ্য হাফ হাতা জামা ব্যবহার করা হোত। তাতে কব্জি বন্ধন, বাহু বন্ধন থাকত। গলায় ফুঁকোর কাজ করা নকল মুক্তোর মালাও পরানো হোত। সাধারণ হিন্দু চরিত্রে কখনো ঢিলে পাজামা আবার কখনো ধুতি ব্যবহার করা হোত। ধুতি পরাবার বিভিন্ন রকম কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে তাতে বৈচিত্র্য সম্পাদন করা হোত। হিন্দু নারী চরিত্রে তাঁত ও সিল্কের শাড়ীর প্রচলন সমধিক ছিল।

মুসলমান চরিত্রের অভিনেতারা চোস্ত পাজামার উপর আলখাল্লার মত জামা পরিধান করতেন। জামার উপর সলমা চুমকির কাজকরা একটা ওয়েস্ট কোটও ব্যবহার করা হোত। অনেক সময় পাজামা আগাগোড়া চোস্ত করা হোত না। ওপরের দিকটা ফোলা থাকত এবং তা ক্রমশঃ নীচের দিকে চোস্ত হয়ে আসত। এরজন্য কখনো কখনো প্রয়োজনবোধে পাজামার গোড়ালির অংশ ব্যাণ্ড দিয়ে আটকানো হোত। সাধারণ মুসলমান চরিত্রে সাদা কাপড়ের সাধারণ টুপি ব্যবহার করা হোত। অধিক সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্য্যাদা সম্পন্ন মুসলমান চরিত্রে ভেলভেট দিয়ে মোড়া এবং বিচিত্র ধরনের কাজ করা উন্নত শ্রেণীর নানাবিধ টুপি ব্যবহৃত হোত। মুসলমান নারী চরিত্রে অভিনেত্রীরা পেশোয়াজ জ্যাকেট ও ওড়না ব্যবহার করতেন।

পৌরাণিক নাটকের প্রধান প্রধান চরিত্রের পোষাক প্রায়ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক

নাটকের রাজারাজড়ার মত হোত। তবে পোষাক-পরিচ্ছদে শলমা চুমকির কাজ তুলনামূলকভাবে বেশী থাকত। রবি বর্মার অঙ্কিত রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন ছবি দেখে পৌরাণিক নাটকের দেব-দানব চরিত্রের পোষাক পরিচ্ছদের রূপগত ও গঠনগত দিক নির্ণয় করা হোত। জার্মান থেকে আনা 'কালাবত্তু' নামক একজাতীয় দ্রব্য দিয়ে পোষাকের ভারী কাজগুলি করা হোত। 'কালাবত্তু' রূপোর ওপর সোনার রঙ করা এক বিশেষ ধরনের বস্তু। এর ওপর মঞ্চের আলো পড়লে এর রোশনাই ঠিকরে ঠিকরে বেরুতো। পোষাক পরিচ্ছদে এর ব্যবহারের দ্বারা চরিত্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক আভিজাত্য অধিক গভীরভাবে প্রকাশিত হোত।

চেলীর কাপড় ও বেনারসী জোড় ব্রহ্মার পোষাক হিসাবে ব্যবহার করা হোত। ময়ূরের পালক সংগ্রহ করে তা কৃষ্ণের কৃষ্ণচূড়া হিসাবে কাজে লাগানো হোত। বেনারসী শাড়ী দিয়ে দানব চরিত্রের উপরের ও নীচের অঙ্গাবরণ তৈরী হোত। মানব চরিত্রের অঙ্গাবরণ হাঁটুর ওপর পর্য্যন্ত থাকত। কখনো কখনো মানব চরিত্রের অভিনেতারা হাফ্‌প্যান্ট ধরণের পোষাক পরিধান করতেন, হাঁটুর ঠিক ওপরে তিন আঙ্গুল চওড়া প্লেট থাকত। কখনো কাপড় আবার কখনো মোটা পিসবোর্ডের সাহায্যে প্লেট তৈরী হোত। প্লেটের ওপর গভীর কাজ করা থাকত। হাঁটুর ওপর বেনারসী কাপড়ের অংশটা ফোলা থাকত।[৪৮]

সামাজিক নাটকে পুরুষ চরিত্রে অভিনেতারা প্রয়োজন অনুযায়ী ধুতি, জামা, চাদর, গলাবন্ধ কোট, পাঞ্জাবী ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। নারী চরিত্রে অভিনেতারা শেমিজ, বাটিহাতা, ঘটিহাতা ইত্যাদি নানাপ্রকারের ব্লাউজ, তাঁত ও সিল্কের শাড়ী ব্যবহার করতেন।

পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের জন্য বিভিন্ন প্রকার জুতোর ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। 'কারচোপ' ফেলে জুতো তৈরী করা হোত। 'নাগরাই' ও 'স্লিপার' জাতীয় জুতোর ব্যবহার ছিল সমধিক। নাগরার ওপরের অংশ ভেলভেটের দ্বারা জোড়া থাকত এবং চরিত্রের সামাজিক মর্য্যাদা অনুযায়ী এর উপর সলমা চুমকির কাজ করান হোত। সাদা, খয়েরী, গেরুয়া, নীল ইত্যাদি নানাপ্রকার রঙীন ভেলভেট ব্যবহার করা হোত। প্রধান চরিত্রাভিনেতারা "ল" পেটা জুতো ব্যবহার করতেন। পৌরাণিক দেবচরিত্র যথা ব্রহ্মার জন্য আঙুলে পেতলের গুলো বসানো খড়ম ব্যবহার করা হোত। ঐতিহাসিক নাটকে রাজা, মহারাজা, আমীর, ওমরাহ ইত্যাদি চরিত্রে অভিনেতারা বিভিন্ন ধরনের নাগরাই ব্যবহার করতেন। রাজপুত চরিত্রে অভিনয়ের জন্য চামড়া দিয়ে শক্ত (হার্ড) নাগরাই তৈরী করা হোত। মুসলমান চরিত্রে কাপড়ের তৈরী নরম (সফ্‌ট) নাগরাই ব্যবহার করা হোত। মুসলিম নারী চরিত্রে কাপড়ের তৈরী অন্য ধরণের চটি জুতার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় নগ্নপদেও

অভিনেতারা মঞ্চে অবতীর্ণ হতেন।[৪৯] সামাজিক নাটকে পামশ্যু, গ্রীসিয়ান, স্লিপার, এলবার্ট স্লিপার—ইত্যাদি ব্যবহার করা হোত।

নাটক সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ করার সময় পোষাক-পরিচ্ছদের খুঁটিনাটির বিষয়ে প্রযোজক তাঁর চিন্তা ও জ্ঞান অনুযায়ী যতটা নজর রাখতেন, নাটকটি কিছুদিন মঞ্চস্থ হবার পর এ সম্বন্ধীয় খুঁটিনাটির ব্যপারে ততটা নজর রাখা হোত না। নাটক মঞ্চস্থকালীন ঘটনা ও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের পোষাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপর বেশীর ভাগ নাট্য-প্রযোজকদের সচেতন দৃষ্টি ছিল না বটে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে 'রাণাপ্রতাপ' নাট্যপ্রযোজনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। স্টারে এ নাটকের প্রযোজনার সময় রাণাপ্রতাপের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার পোষাক পরিচ্ছদের পরিবর্তন করা হয়েছিল। প্রথমদিকে রাণাপ্রতাপের সঙ্গে রাজকীয় পোষাক থাকলেও আকবরের সঙ্গে হলদিঘাট যুদ্ধে পরাজিত প্রতাপ যখন আরাবল্লী পর্বত প্রদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন তাঁর অর্থনৈতিক ও মানসিক অবস্থাকে পরিস্ফুট করার জন্য রাণাপ্রতাপ চরিত্রের রূপদানকারী অভিনেতা জীর্ণ ও মলিন পোষাকে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক অপেক্ষা সামাজিক নাটকে পোষাক পরিচ্ছদের আড়ম্বরতা ও আর্থিক দায়দায়িত্ব অনেক কম থাকায় এ নাটক প্রযোজনার সময় নাট্যঘটনা ও সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে চরিত্রের পোষাক পরিচ্ছদের যথোচিত পরিবর্তনের দিকে নজর রাখা হোত। এ ক্ষেত্রে নাট্য-প্রযোজকরা স্বভাবতই অধিক দৃষ্টিদান করার সুযোগ পেতেন ও তাকে মঞ্চে ক্রিয়াশীল করে তুলতে সচেষ্টও হতেন।

গিরিশযুগে নাটকের বেশকারী হিসাবে শ্যামাচরণ রক্ষিত, মণিলাল মিত্র, গয়ারাম ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

(৫) **সংগীত ও ধ্বনি** (Music and Sound)।

নাট্য-প্রযোজনায় কণ্ঠসঙ্গীত প্রয়োগের ক্ষেত্রে উপযুক্ত তালিম ও শিক্ষার অভাব দেখা যেত। অশুদ্ধ ও অস্পষ্টভাবে সংগীতের বাণী উচ্চারণের ফলে সংগীতের মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে পড়তো।[৫০] সংগীতের বিভিন্ন রাগ-রাগিনীগুলি ঠিকভাবে আয়ত্ত করে সংগীত না গাওয়ার ফলে সংগীত প্রয়োগের ভাব ও রস ক্ষুন্ন হয়ে পড়তো। নাট্য-প্রযোজনা রীতিতে যাত্রার দর্শকের প্রভাব ছিল অসামান্য। যাত্রার দর্শকের মত নাটকের দর্শকরাও সংগীতবাহুল্য পছন্দ করতো। তার ফলে নাট্য-সংগীতের সুর সংযোজনায় ও তার প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে যাত্রা সংগীতের প্রভাব এসে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মঞ্চে সংগীতকারের গলার কাজ অপেক্ষা চীৎকার ও গলা কাঁপানোর প্রবণতা লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে। কখনো কখনো নৃত্য শিক্ষক ও

তথাকথিত অপেরা মাস্টার নাট্য-সংগীতের সুর সংযোজন করতেন। গানের অর্থ ও ভাব এবং গান গাইবার সময় ও কাল ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে নাট্য-সংগীতের সুর সংযোজনার ক্ষেত্রে এদের সকলেই যে দক্ষ ছিলেন এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। এঁদের তত্ত্বাবধানে নাট্য সংগীতের সুর সংযোজনার নামে পাঁচমেশালি সুরের মিশ্রণে গানের বিশুদ্ধতা ও সার্থকতা ব্যাহত হোত। কোন কোন নাট্য প্রযোজক নাট্য প্রযোজনায় সুষ্ঠু সংগীতের প্রয়োগ সম্পর্কে যত্নশীল হতেন। এমারেল্ড থিয়েটারে নাট্য-প্রযোজনার সময় অর্ধেন্দুশেখর গায়িকাদের সুষ্ঠু সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। গিরিশযুগে 'ছত্রপতি শিবাজী', 'তপোবন', 'শংকরাচার্য্য', 'অশোক', 'সৎনাম', 'শাস্তি কি শান্তি', 'অভিশাপ'—ইত্যাদি নাটকের সংগীত-সুরকার হিসাবে দেবকণ্ঠ বাগচীর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এছাড়া 'জয়দেব', 'বিশ্বামিত্র' প্রভৃতি নাটকের সুরকার ভূতনাথ বসু, 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকের সংগীতের সহ-সুরকার ও 'মীরকাসিম' নাটকের প্রধান সুরকার তারাপদ রায়, 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের সংগীত শিক্ষক শশীভূষণ বিশ্বাস, 'গোঁসাইজী', 'সাধনা' নাটকের সংগীত শিক্ষক কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'ক্ষত্রবীর' নাটকের সংগীতের যুগ্ম-সুরকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশুতোষ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

এ সময়ের নাট্য প্রযোজনায় নৃত্যও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। তৎকালীন দর্শকদের মানসিক প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রেখে নাট্য ঘটনা ও নাট্যচরিত্রের বিশেষ মুহূর্ত ও ভাবকে শিল্পসম্মত উপায়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ করার জন্য নাটকে বহু নৃত্যের সংযোজন করা হোত। নাট্যপ্রযোজনার সময় এ সকল নৃত্য যাতে নাট্যঘটনার স্থান, কাল এবং নৃত্যকালীন সংগীতের বিশেষ ভাব ও নাট্য-পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শিত হতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নাট্যপ্রযোজনায় নৃত্য প্রয়োগের সময় এ বিষয়ে যত্নশীলতার অভাব পরিলক্ষিত হোত। নৃত্যের তাল-লয়ের সঙ্গে নৃত্য-সংগীতের ভাবধারার সঙ্গতিকে ধরে রাখা হোত না। অনেক সময় নৃত্যশিক্ষকগণ কলকাতায় অবস্থিত পারসী থিয়েটার, এ্যালফ্রেড থিয়েটার, ইত্যাদি বিদেশী রঙ্গালয়ে প্রদর্শিত বিদেশী ধরণের নৃত্য দেখে এসে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ে তার অন্ধ অনুকরণে ব্রতী হোতেন। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে এ ধরণের অন্ধ অনুকরণ সমগ্র নাট্য প্রযোজনার মানকে ব্যাহত করতো। 'সিরাজদ্দৌলা,' 'রাণাপ্রতাপ', 'রিজিয়া' ইত্যাদি নাটকের অনেক নৃত্য-দৃশ্যই এই দোষে দুষ্ট। সমবেত নৃত্যের সময় নর্তকীদের মধ্যে তাল, লয়, অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদর্শন—ইত্যাদির নিরীখে নিজেদের মধ্যে ঐকতান গড়ে উঠত না। নর্তকীদের মধ্যে শিল্পসৌন্দর্য্যবোধের অভাব ছিল। তাঁদের দ্রুতলয়ে চলাফেরার সময় নৃত্যদৃশ্যটি সুষ্ঠুভাবে উপভোগ করা দর্শকের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে পড়ত।[৫১] তবে বঙ্গীয় নাট্যপ্রযোজনার সমস্ত নৃত্যদৃশ্যই ত্রুটি যুক্ত ছিল এবং

নৃত্য শিক্ষকগণের প্রত্যেকের মধ্যে নৃত্য জ্ঞানের অভাব ছিল—তা নয়। গিরিশ যুগের নৃত্যশিক্ষক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসুর নৃত্য শিক্ষাদান ব্যবস্থায় এবং তাঁর নৃত্য দৃশ্যের প্রয়োগ পরিকল্পনায় তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধকর আঙ্গীকগত সৌষ্ঠব এবং নতুন শৈল্পিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।[৫২] গিরিশ যুগে নৃত্য শিক্ষিকা হিসাবে অভিনেত্রী কুসুমকুমারীর কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫৩] মূলত গায়িকা অভিনেত্রী হলেও নৃত্যকলায় তাঁর পারদর্শিতা পরবর্তীকালে নাট্যাচার্য্য শিশির-কুমারকেও অভিভূত করেছিল।[৫৪] ক্লাসিক থিয়েটারে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসুর অবর্তমানে তাঁর পরিচালনায় 'অভিশাপ' গীতিনাট্যটি ২৮. ৯. ১৯০১ সালে মঞ্চস্থ হয়। এই গীতিনাট্যের নৃত্যকলা খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র তাঁর নৃত্যকলা দর্শনে প্রীত হয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করেন।[৫৫] তাঁর তত্ত্বাবধানে 'শাস্তি' 'ভ্রান্তি' ইত্যাদি নাটকের নৃত্য দৃশ্যগুলি নাট্য প্রযোজনায় বিশেষ মাত্রার যোগ করেছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে কুসুমকুমারীই প্রথম নৃত্য শিক্ষিকার আসন গ্রহণ করেন। এতদব্যাতীত 'তপোবল', 'বাপ্পারাও,' 'হরগৌরী,' সিরাজদ্দৌলা ইত্যাদি নাটকের নৃত্যশিক্ষক সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় নৃত্য পরিচালনার ব্যাপারে মুনশীয়ানার পরিচয় দিয়েছিলেন।

নাট্য প্রযোজনায় প্রয়োজনীয় শব্দ ও ধ্বনি সংগীতের দায়িত্ব প্রায়ক্ষেত্রেই ঐকতান বাদন যন্ত্রীদের উপর ন্যস্ত করা থাকত। দুটি দৃশ্যের মধ্যবর্তী বিরাম মুহূর্তে ও দৃশ্যমধ্যস্থ নাট্যপরিবেশের পরিমণ্ডল গড়ে তোলার জন্য এবং অভিনয়ের সময় বিশেষ নাট্যমুহূর্ত ও ভাবকে উদ্দীপ্ত করার জন্য ঐকতান বাদন যন্ত্রীরা তাঁদের যন্ত্রসংগীতের ব্যবহার করতেন। চেলো, ড্রাম, বাঁশী, ক্লেরিওনেট, বেহালা, হারমোনিয়াম, পিয়ানো, ডুগী তবলা, লোহার এক প্রকার বিশেষ যন্ত্র (খঞ্জনীর মত দেখতে) ইত্যাদি যন্ত্র এঁরা ব্যবহার করতেন। ঐকতানবাদন যন্ত্রীরা সব সময় শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে নাটকে শব্দ ও ধ্বনি সংগীতের প্রয়োগ করতে পারতেন না। এরফলে অনেক সময় এঁদের সাহায্যে নাট্যপ্রযোজনায় শব্দ সংগীতের প্রয়োগ নাট্য-প্রয়োগ ব্যবস্থার পক্ষে ভারবাহী হয়ে উঠত।[৫৬]

প্রেক্ষাগৃহের সামনে মঞ্চের সংলগ্ন জায়গার একপাশে ঐকতানবাদন শিল্পীদের বসবার ব্যবস্থা করা হোত। তাঁদের বসবার জায়গাটি শালুক দিয়ে ঘিরে রাখা হোত। এর ফলে প্রেক্ষাগৃহ থেকে তাদেরকে সহজে দেখা যেত না। নাটক মঞ্চস্থ-কালীন এক একটি দৃশ্যের শেষে এবং বিরাম মুহূর্তে ঐকতানবাদন ছাড়াও নাটকের সময়, কাল ও পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য বিশেষ শব্দ সংযোজনার (Sound effect) প্রয়োজন হোত। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐকতানবাদনের শিল্পীরা সেই শব্দ সংযোজনার দায়িত্ব পালন করতেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের বসাবার জন্য নির্দিষ্ট ঘেরা জায়গার একপ্রান্তে wicked gate থাকত। ঐকতানবাদনের পর দৃশ্যের প্রয়োজনে বিশেষ শব্দ সংযোজনার জন্য এই wicked gate দিয়ে ঐকতানবাদনের

কোন যন্ত্রী বা যন্ত্রীরা wings এর ধারে চলে যেতেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের কর্তৃত্বাধীনে স্টার থিয়েটারে এই wicked gate-এর পরিবর্তে মঞ্চের তলা দিয়ে wings-এর পাশে যাবার জন্য একটি বিশেষ গোপন পথের ব্যবস্থা করা হয়। গিরিশযুগে বংশীবাদক অমৃতলাল ঘোষ, বিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হারমোনিয়াম বাদক সুরেশচন্দ্র রায় (পচুবাবু) এবং অন্যান্য বাদকের মধ্যে ভুতনাথ দাস, ললিত মোহন দাস বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

ঐকতানবাদন যন্ত্রীরা যেমন প্রয়োজন ক্ষেত্রে তাঁদের যন্ত্রদ্বারা নাট্যপ্রয়োগ ব্যবস্থায় বিশেষ বিশেষ শব্দ সংগীতের দায়িত্ব পালন করতেন তেমনি কখনো কখনো হরবোলার সাহায্যে, আবার কখনো কখনো প্রয়োগ-পদ্ধতির নানাবিধ কলাকৌশলের সাহায্যে এই বিশেষ শব্দ সংগীতের ব্যবস্থা করা হোত। দুহাত লম্বা বিশেষ ভেঁপুর সাহায্যে সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার পশু ও নানাবিধ পক্ষীর আওয়াজ করা হোত। টিনের চালুনী ও লোহার বলের মাধ্যমে মেঘের গুড়ু গুড়ু আওয়াজ সৃষ্টি করা হোত।[৫৭] টিনের চালুনীর উপর ছোট ছোট লোহার বল রেখে তা মৃদু মৃদু ভাবে সঞ্চালনের মাধ্যমে গুঁড়ি গুঁড়ি আওয়াজ এবং নদীর কুলকুল শব্দ সৃষ্টির দ্বারা বৃষ্টিপাত ও ধীরে ধীরে বয়ে যাওয়া নদীর পরিবেশকে মূর্ত্ত করে তোলা হোত। বেশী জোরে বৃষ্টিপাতের আওয়াজ সৃষ্টির জন্য চালুনীর ওপর অপেক্ষাকৃত বড় বড় লোহার বল রেখে তা আন্দোলিত করা হোত। ঢেউ খেলানো টিনের পাতের সঙ্গে লম্বা লোহার ঘর্ষণের সাহায্যে বজ্রপাতের শব্দের প্রতিরূপ শব্দ সংযোজিত করা হোত। ঝড়ের সময় বাঁশী ও বেহালার শব্দের সঙ্গে একটি পাতলা টিনের পাত হাত দিয়ে কৌশলমত নেড়ে চেড়ে ঝড়ে কিছু ভেঙে পড়ার সময়কার মড়্-মড়্ আওয়াজের সৃষ্টি করা হোত। পিঠের ওপর হাতের তালুর থাবা মারার বিশিষ্ট কৌশলের সাহায্যে চলমান ঘোড়ার খুরের আওয়াজ তৈরী করা হোত। অনেক সময় মাটির ওপর নারিকেলের দুটি মালা বা মাটির ছোট ভাঁড় কায়দা মতন ঠুকে ঠুকেও এ আওয়াজ সৃষ্টি করা হোত।[৫৮] এইভাবে এ সময়কার নাট্য প্রযোজকরা তাঁদের সাধারণ ও বিশিষ্ট বুদ্ধির সাহায্যে সে সময়কার অনায়াসলভ্য যন্ত্র ও অন্যান্য উপকরণের মাধ্যমে নাট্যপ্রযোজনার শব্দ ও ধ্বনি সংগীতকে (Sound effect) নাট্যে-প্রয়োগের উপযোগী করে তোলার জন্য বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

(৬) আলোচ্য সময়সীমায় বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের উল্লেখযোগ্য অভিনেতা-অভিনেত্রী।

।। মঞ্চে গিরিশ চন্দ্র ঘোষ ।।

ক) প্রযোজক গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

প্রত্যেক শিল্পীরই তাঁর যুগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকে। তাই শিল্পীকে বুঝতে হলে তাঁর যুগকেও বুঝতে হয়। গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখদের নাটকাবলী এবং বঙ্কিম উপন্যাসের নাট্যরূপ ও সংস্কৃত নাটকই ছিল বঙ্গরঙ্গমঞ্চকে বাঁচিয়ে

রাখার মূল উপাদান। কিন্তু এর দ্বারা বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে নাট্য রচনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তদুপরি একই নাটকের একাধিকবার মঞ্চায়ণের ফলে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে বৈচিত্র্যের অভাব দেখা দেয়। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রতি দর্শকের আকর্ষনও ধীরে ধীরে কমতে থাকে। রঙ্গালয়ের অর্থনৈতিক অবস্থাও সংকট জনক হয়ে আসে। এই পটভূমিকায় বঙ্গরঙ্গমঞ্চকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই অভিনেতা গিরিশচন্দ্রকে নাটক রচনা ও প্রযোজনার যুগপৎ দায়িত্ব বহন করতে হয়।[৫৯] সে সময় থিয়েটারী দর্শকের উপর যাত্রার অভিনয় ধারা ও প্রযোজনা-রীতির প্রভাব ছিল অপরিসীম। নাটক প্রযোজনার সময় রঙ্গালয়ের ব্যবসায়িক দিককে উন্নত করে তোলার জন্য গিরিশচন্দ্রকে দর্শকের মনোভাব, অভিরুচি ও তাদের বিশেষ আকাঙ্খার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়েছিল। তাই নাট্যপ্রযোজনার মধ্য দিয়ে গিরিশচন্দ্র থিয়েটারী দর্শক ও যাত্রার দর্শকের মধ্যে সেতু বন্ধন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।[৬০] এর ফলে নাট্যপ্রযোজনার শৈল্পিক সুষমা সর্বদা বজায় রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। এতে তাঁর শিল্প সত্তা আহত হয়ে পড়লেও যুগের প্রয়োজনে তাঁকে তা মানিয়ে নিতে হয়েছে।

শৈশব অবস্থা থেকেই অভিনয় দেখা ও অভিনয় করার যোগসূত্রের মাধ্যমে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। তদুপরি সারাজীবন তিনি একধারে নট, নাট্যকারও প্রযোজক রূপে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাই নাট্যপ্রযোজনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সকল প্রকার খুঁটিনাটি বিষয়ে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।[৬১] নাট্যপ্রযোজনার সময় তিনি তাঁর এই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রযোজনাকে সার্থক করে তোলার জন্য ব্রতী হয়েছিলেন।

গিরিশ যুগের নাট্য প্রযোজনা মূলত অভিনয় ভিত্তিক ছিল। তাই প্রযোজনার অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা অভিনয়ের উপরই অধিক গুরুত্ব দান করা হোত। অভিনয় কালীন সংলাপ সুর সহযোগে বলা হোত। এ ধরনের অভিনয়ের সুবিধার জন্য প্রযোজক গিরিশচন্দ্র, মধুসূদন প্রবর্তিত ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের বহুল প্রচলন করেন। সংলাপের অর্থবুঝে চরিত্রের ভাবাবেগ অনুযায়ী সুরের উত্থান-পতনের সাহায্যে চরিত্র সম্পর্কে দর্শকদের মধ্যে ভাবের সৃষ্টি করা হোত। অভিনয়ের এই ছন্দোময় সুরেলা ধারাকে প্রযোজক গিরিশচন্দ্র স্বাভাবিক বলেই বিশ্বাস করতেন।[৬২] এ ধরনের অভিনেতা চরিত্রের ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করার জন্য অনেক সময় কণ্ঠস্বরের অতিশয় উত্থান পতন ও অভিব্যক্তির আতিশয্যের দ্বারা অভিনয়ের মধ্যে অতিরিক্ত নাটকীয়তার আশ্রয়ও গ্রহণ করতেন। এ সময় অঙ্গ সঞ্চালনের পরিমিতিবোধেরও অভাব ঘটতে দেখা যায়। হৃদয়বৃত্তির প্রচণ্ড প্রাবল্যে অভিনেতার অভিনয় ধারা আচ্ছন্ন থাকত। এর ফলে অভিনয়ের সময় কখনো কখনো অভিনেতার বুদ্ধিমত্তা ও বিচারশক্তির অভাবে সুষ্ঠু চরিত্রায়ণ সম্ভবপর হয়ে উঠত না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে তৎকালীন অভিনেতারা ও অভিনেত্রীরা

অভিনয় কালীন সংলাপকে যথাসম্ভব উচ্চগ্রামে তুলে দর্শক মহলে চমক সৃষ্টি করতেন। আবেগকে অধিক প্রাধান্য দিয়ে নিজের প্রতি দর্শকের আকর্ষণ বৃদ্ধি করতেন। এই রীতি অনুসরণ করার মূলে অভিনয়ের উপর তৎকালীন যাত্রাভিনয়ের প্রভাব বিশেষভাবে স্মরনযোগ্য। কখনো কখনো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সংলাপের আবৃত্তিমূলক অভিনয় করা হোত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে অভিনয় চলাকালীন কোন অভিনেতার বক্তব্য ও তার অভিব্যক্তির প্রতিক্রিয়ায় সহ-অভিনেতাদেরও মনোগত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তাঁর ভাবাভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে হয়। একে 'co-acting' বলা হয়। এই co-acting-এর ক্ষেত্রে অভিনেতার আঙ্গীক ও সাত্ত্বিক অভিনয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। নাট্য প্রযোজনায় সংশ্লিষ্ট অভিনেতাদের মধ্যে এই co-acting-এর জ্ঞান না থাকায় নাট্য প্রযোজনার সামগ্রিক অভিনয়ের মান ব্যাহত হয়ে পড়ত এবং ব্যক্তিগত অভিনয় ধারা কৃত্রিম ও একঘেয়েমিকর বলে মনে হোত। বস্তুতপক্ষে তৎকালীন নাট্য প্রযোজনায় সমবেত অভিনয় অপেক্ষা একক অভিনয় নৈপুণ্যের প্রতি অভিনেতাও যেমন অধিক যত্নশীল হোতেন তেমনি দর্শকরাও ব্যক্তিগত অভিনয় কুশলতা দেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন।

প্রযোজক গিরিশচন্দ্রের নাট্য উপস্থাপনায় মঞ্চ ব্যবস্থা, আলোকসজ্জা, অঙ্গরচনা ও অঙ্গসজ্জা সর্বদাই যে নাটকের যুগ ও কালের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল একথা জোর দিয়ে বলা যায় না। তবে নাট্য প্রযোজনায় তাঁর গভীর সুরজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত সংগীতের প্রয়োগ দর্শকের মনে নাট্যরসকে ঘনীভূত করে তুলতে সাহায্য করত। নাট্য প্রযোজনায় চরিত্রোচিত অঙ্গরচনা ও অঙ্গসজ্জার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে ওয়াকিবহাল ছিলেন।[৬৩] কিন্তু সে সময় নাট্য প্রযোজক গিরিশচন্দ্রকে একাধারে নাট্যরচনা, অভিনয় শিক্ষাদান, অভিনয় পরিচালনা, রঙ্গালয়ের অর্থনৈতিক দিক ইত্যাদি সকল দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে কাজ করতে হোত। এরজন্যই সময়ের অভাবে ও অধিক ব্যস্ততার জন্য নাট্য প্রযোজনার সময় এর সকল অঙ্গের মধ্যে সুষ্ঠু ঐকতান রচনা করা তাঁর পক্ষে সর্বদা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

খ) শিক্ষক গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

অভিনয় শিক্ষাদানকালে শিক্ষক গিরিশচন্দ্র তাঁর সকল প্রকার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফল দান করে অভিনেতাকে গড়ে তুলতে চাইতেন। সেক্ষেত্রে তিনি প্রথমেই অভি-নেতার শিক্ষাগ্রহণ করার যোগ্যতার পরিমাপ করে নিতেন এবং অভিনেতার যোগ্যতা অনুসারে তিনি তাঁকে শিক্ষা দিতেন।[৬৪] সকল অভিনেতার সম্মুখে তিনি নাটকটি পড়তেন। পড়ার সময় নাটকে সন্নিবেশিত প্রতিটি চরিত্রের নাট্যগুরুত্ব, এক চরিত্রের সঙ্গে অন্য চরিত্রের সম্পর্ক, চরিত্রের ভাব, রস ইত্যাদি বুঝিয়ে দিতেন।

এই বোঝানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে তিনি নাট্যঘটনা ও চরিত্রের পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক পটভূমিকার ব্যাখ্যাও করে দিতেন। চরিত্রের গভীর ভাবকে সহজ করে বুঝিয়ে দেবার জন্য তিনি সময়বিশেষে এ সম্পর্কে 'শেক্‌সপীয়র', 'মিলটন,' 'বায়রণ' প্রমুখ কবিদের বাণীও উদ্ধৃত করতেন। এরফলে অভিনেতাদের পক্ষে চরিত্রের স্বরূপ সহজে উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয়ে উঠত এবং মঞ্চে চরিত্রের ব্যাখ্যা করার সময় অভিনেতার ব্যক্তিসত্তা অপেক্ষা চরিত্রসত্তা অধিক ক্রিয়াশীল হয়ে উঠত।[৬৫] প্রয়োজনবোধে তিনি চরিত্রের অভিনয় বিভিন্নভাবে অভিনয় করে দেখিয়েও দিতেন। আবার কখনও কখনও তিনি মহলা কক্ষে উপস্থিত তাঁর শিষ্য বা অভিজ্ঞ পুরাতন অভিনেতাদের সাহায্যেও মহলার কার্য্য পরিচালনা করতেন।[৬৬] কোন অভিনেতাই যাতে তাঁকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করে সেদিকেও তিনি সচেতন দৃষ্টি রাখতেন। তিনি অভিনেতাকে তার নিজের অভিনয় ক্ষমতার সাহায্যেই তার মত করে চরিত্র চিত্রণের জন্য উৎসাহিত করে তুলতেন। এর মাধ্যমেই নাট্য-শিক্ষক গিরিশচন্দ্র অভিনেতার সৃজনী স্বত্তাকে বজায় রাখতে প্রয়াসী হতেন।[৬৭]

(গ) অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

অভিনেতা হিসাবে গিরিশচন্দ্রের কণ্ঠস্বর তাঁর অনন্য সম্পদস্বরূপ। কণ্ঠস্বর ছিল বজ্রের মত গম্ভীর। অভিনয়ের সময় তিনি প্রয়োজন মত কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতনকে সুনিপুণভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারতেন। সংলাপের অন্তর্নিহিত অর্থকে পরিস্ফুট করার জন্য তাঁর নিয়ন্ত্রিত কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য খুবই কার্য্যকরী হয়ে উঠত। কণ্ঠস্বরের গভীরতা ও তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার এই গুণের জন্য প্রেক্ষাগৃহের সকল দর্শকই তাঁর কণ্ঠস্বর সহজেই শুনতে পেতেন।[৬৮] সংলাপের অন্তর্গত প্রতিটি শব্দের সুষ্ঠু উচ্চারণে তাঁর যত্নশীলতা এবং দক্ষতাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে মাঝে মাঝে কয়েকটি বিশেষ শব্দের উচ্চারণের ক্ষেত্রে তাঁকে বিশেষ বেগ পেতে হোত।[৬৯] অভিনয়কালে তিনি সংলাপ বলার সময় সুর ব্যবহার করতেন। কিন্তু কখনই তিনি একভাবে উত্থান-পতনহীন সুরের বিস্তার করে অভিনয়কে ক্লান্তিদায়ক করে তুলতেন না। নাট্যঘটনার বিশেষত্ব, চরিত্রের ভাব, আবেগ, রস ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে তিনি সুরকে নানাভাবে পরিবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত করতেন। এরজন্য তিনি নাট্যসংলাপে দেওয়া ভাবযতি ও অর্থযতিকেও মেনে চলতেন। চরিত্রের বহির্লোক (External auspect) এবং অন্তর্লোককে (Internal auspect) প্রকাশিত করে তোলার জন্য তিনি গভীরভাবে চরিত্রের সামাজিক, শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করতেন। চরিত্রের ধ্যান করতে করতে তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে চরিত্রসত্তায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে তিনি তন্ময় হয়ে যেতেন। যুক্তির বাঁধনে চরিত্রের ক্রমোন্নত অবস্থাকে (growth) ফুটিয়ে তুলে তিনি বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে চরিত্রটিকে দর্শকের সম্মুখে তুলে ধরতেন।

দর্শকরাও তাঁর অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করত।[৭০] 'মীরকাসিম' নাটকে মীরজাফর চরিত্রাভিনয়ের সময় তিনি মুসলমান রীতি অনুসারে ডানদিক থেকে বাঁদিকে কলম টেনে আদেশ পত্রে স্বাক্ষর দান করতেন। নিজে হিন্দু হয়েও চরিত্র রূপায়নের সময় তিনি তাঁর ব্যক্তিসত্তার অভ্যাসকে ত্যাগ করে অভিনেতব্য চরিত্রসত্তার স্বাভাবিক বাহ্যিক বৈশিষ্টগুলিকে এইভাবে আয়ত্ত করে নিয়ে তার দ্বারা চরিত্রের বাহ্যিক দিককে প্রানবন্ত করে তুলতেন। চরিত্রের অন্তর্নিহিত মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র ঘোষ সৃজনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে তাঁর অভিনয়ের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। ইংরেজ দের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত সিরাজদ্দৌলা কলকাতা ত্যাগ করেন। এই দৃশ্যে সিরাজদ্দৌলা করিমচাচার সঙ্গে তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ বদল করে নিতেন। রাজকীয় পোষাকে সিরাজদ্দৌলাকে সকলেই চিনে ফেলবে। তাই করিমচাচার পরামর্শে সিরাজদ্দৌলা পোষাক পরিচ্ছদের এই পরিবর্তনকে মেনে নিয়েছিলেন। করিম-চাচার পোষাক পরে সিরাজদ্দৌলা মঞ্চ ত্যাগ করতেন। আর সিরাজদ্দৌলার পোষাক পড়ে করিমচাচা মঞ্চে উপস্থিত থাকত। করিমচাচা ছিল স্বদেশ বৎসল। সিরাজদ্দৌলার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও সহানুভূতি ছিল। যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় তাই তাঁর কাছে বেদনার কারণ হয়ে উঠেছিল। এই নাট্য মুহূর্তে সিরাজদ্দৌলার অবর্তমানে শূন্য সিংহাসনের দিকে তাকিয়ে করিমচাচার হৃদয়ের অব্যক্ত যন্ত্রনাকে নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মুখজ, শারীর ও চেষ্টাকৃত অভিনয়ের মাধ্যমে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলতেন যে দর্শকগণের হৃদয়েও সিরাজদ্দৌলার এই শোচনীয় ভাগ্য বিপর্যয়ের কারুণ্য এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি করত। এই ভাবে তিনি নাটকের এই অংশের নাট্য মুহূর্তের অন্তর্লোককে পরিস্ফুট করে দর্শকগনকে ভাবাবেগে আপ্লুত ও বিস্মিত করে তুলেছিলেন।[৭১]

আবেগদীপ্ত অভিনয়ে তিনি কখনই অতিনাটকীয়তাকে প্রশ্রয় দেননি। চরিত্রের সার্বিক রূপের কথা চিন্তা করে তিনি বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বারা তাঁর আবেগকে নিপুণ হস্তে পরিশীলিত করে তুলতেন।[৭২] এর ফলে তাঁর অভিনীত চরিত্র ভাবের রসরূপ লাভ করত। এই ভাবাভিনয়ের ক্ষেত্রে তাঁর মুখজ অভিব্যক্তি অতীব সুন্দর ছিল। মুখের সকল প্রকার পেশীকে নিজের ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রিত করে তিনি তাঁর সাহায্যে চরিত্রোচিত বিশেষ বিশেষ ভাবকে জাগ্রত করে তুলতেন। "শুধু চোখের চাহনিতেও গিরিশবাবু চমৎকার চরিত্র বিশ্লষণ করতে পারতেন।"[৭৩] এ প্রসঙ্গে 'তপোবল' নাটকের বিশ্বামিত্রের ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ের কথা স্মরণীয়। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বশিষ্ঠের দ্বন্দ্বের রূপ চিত্রণে রাজশক্তিতে গর্ব্বীত বিশ্বামিত্র, অভিমানী বিশ্বামিত্র, কামার্ত্ত বিশ্বামিত্র, সাধক বিশ্বামিত্র, অনুতপ্ত ও উদার বিশ্বামিত্র—ইত্যাদি বিশ্বামিত্র চরিত্রের বিভিন্ন দিককে পরিস্ফুট করার জন্য তিনি তাঁর বলিষ্ঠ অভিব্যক্তিকে ক্রিয়াশীল করে তুলেছিলেন। "ছত্রপতি শিবাজী"

নাটকে ঔরংজেবের ভূমিকায় ঔরংজেবের শঠতা, ক্রূরতা, এবং নিষ্ঠুরতাকে তিনি শুধু মাত্র মুখজ অভিব্যক্তির দ্বারা প্রকাশ করেছিলেন।[৭৪]

গম্ভীর ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ চরিত্র চিত্রণে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এ প্রসঙ্গে 'বলিদান' নাটকে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা করুণাময়ের ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ের কথা স্মরণযোগ্য। নিজের জীবন ও ধনসম্পত্তির বিনিময়েও পণসর্বস্ব বিবাহ ব্যবস্থার অত্যাচার থেকে কন্যাকে বাঁচাতে না পারার জন্য পিতা হিসাবে করুণাময়ের মধ্যে এক গভীর বেদনা এবং সমাজের উপর প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ ও অভিমান ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। হিরন্ময়ীর আত্মহত্যার ঘটনায় মর্মাহত পিতা করুণাময় রূপী গিরিশচন্দ্র সংযত অভিনয়ের দ্বারা কণ্ঠস্বরের উত্থান পতন ও ভাবাভিনয়ের মাধ্যমে পিতৃহৃদয়ের বুকফাটা আর্তনাদকে গভীর ভাবে প্রকাশ করেন। এতে দর্শকগণের হৃদয় প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়ে উঠত।[৭৫] কন্যার মৃত্যুতে মানসিক দিক দিয়ে বিপর্য্যস্ত করুণাময় কন্যার আত্মার সঙ্গে মিলনের জন্য আত্মহত্যায় উদযোগী হন। এই দৃশ্যে কোন সংলাপ না বলে আত্মহত্যায় উদগ্রীব করুণাময়ের মানসিক অবস্থাকে নির্বাক আঙ্গিক ও ভাবাভিনয়ের মাধ্যমে তিনি প্রাণস্পর্শী করে তোলেন।[৭৬] করুণাময়ের চরিত্র চিত্রণে তাঁর এই অনবদ্য অভিনয়শৈলী অভিনয় জগতের একটি বিশিষ্ট সম্পদ বিশেষ। এ প্রসঙ্গে রসরাজ অমৃতলাল বসুর মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে—"করুণাময়ের ভূমিকাভিনয়ে নটগুরু গিরিশচন্দ্র···যেরূপ মুখভঙ্গী ও হাব-ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ফটো তুলিয়া রাখিলে একটা আর্ট রক্ষিত হইত। একটা জিনিসের মত জিনিস রক্ষিত হইত।"[৭৭] বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সম্পাদকগণও গিরিশ চন্দ্র ঘোষের করুণাময়ের ভূমিকার অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হয়ে যান।[৭৮]

॥ মঞ্চে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী ॥

ক) শিক্ষক অর্ধেন্দুশেখর।

অভিনয় শিক্ষক হিসাবে অর্দ্ধেন্দুশেখর নাট্য জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। অভিনয়-শিক্ষা দানকালে তিনি প্রথমেই অভিনেতাদের সুষ্ঠু উচ্চারণের দিকে বিশেষ নজর দিতেন। শব্দের ব্যকরণগত দিক এবং লঘু, দীর্ঘ ও প্লুতস্বরযুক্ত শব্দের বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দিয়ে তার উচ্চারণগত পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষার্থী-দের তিনি ওয়াকিবহাল করে তুলতেন। সংলাপ বলার সময় স্বর-প্রক্ষেপণের কৌশলকে আয়ত্ত করার জন্য শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করা, দম বৃদ্ধি করা, ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষিত করে তুলতেন। জিহ্বার জড়তা দূর করার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ লেখকদের কঠিন কঠিন শব্দযুক্ত কবিতা ও প্রবন্ধাদি বারংবার পড়ার নির্দেশ দিতেন। বিভিন্ন দেবদেবীর উদ্দেশ্যে

রচিত সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করে তা নিয়মিতভাবে পাঠ করার জন্য শিক্ষার্থী অভিনেতাদের যত্নশীল হতে বলতেন। এর ফলে শিক্ষার্থীদের জিহ্বার জড়তা ক্রমে ক্রমে দূর হয়ে যেত। তাদের কঠিন শব্দ উচ্চারণের ভয় কেটে যেত এবং উচ্চারণ শুদ্ধ হয়ে আসত। সংযমের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে অভিনয়ের মাধ্যমে অভিনীত চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি অভিনেতাদের বিশেষভাবে গড়ে তুলতেন। শিক্ষার্থীদের সুরসহযোগে সংলাপ না বলে সংলাপের অর্থ অনুসারে তা বলার পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি অভিনেতাদের সচেতন করে তুলতেন। চরিত্রের অন্যান্য দিক সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবার পূর্বে তিনি নাটকস্থ প্রতিটি ঘটনা ও প্রতিটি চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের গুরুত্ব, বিশেষত্ব,—ইত্যাদি বিষয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতেন। এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী তিনি চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে চরিত্রের ভাবরূপ ও তার রসরূপ কি হবে তাও ঠিক করে দিতেন এবং তদনুযায়ী অভিনেতাকে শিক্ষা দিতেন।[৭৯] অর্দ্ধেন্দুশেখরের এই শিক্ষার গুণে "অনেক অভিনেতার অভিনয় কিছুটা ভাবোচ্ছ্বাস মুক্ত স্বাভাবিক ও বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছিল।"[৮০] শিক্ষাদান কালে তাঁর কোনরূপ ক্লান্তিবোধ ছিল না। শিক্ষার্থী অভিনেতা যতক্ষণ না পর্য্যন্ত চরিত্রটি সম্যকভাবে বুঝে চরিত্রোচিত অভিনয় করতে সমর্থ হচ্ছেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি তাঁকে এ বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন। প্রয়োজন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য তিনি তাঁকে এ বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন। প্রয়োজন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য তিনি চরিত্রের সামাজিক ও মনস্তাত্বিক দিককেও সহজভাবে বুঝিয়ে দিতেন।[৮১] মঞ্চে চরিত্রের সঠিক ব্যাখ্যা দানের জন্য তিনি অভিনেতাকে চরিত্রানুসারি হাব, ভাব, অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করার বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ ও নির্দেশ দিতেন। অভিনয়ের সময় কোন একজন অভিনেতার অভিনয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মঞ্চে উপস্থিত অপরাপর অভিনেতা যাতে তদনুসারী ভাব ও ক্রিয়াকে মুখর করে তুলতে পারে সেদিকেও তিনি সকল অভিনেতাকে সচেতন করে দিতেন।[৮২] এইভাবে তাঁর অসীম ধৈর্য্য, অধ্যবসায় অভিনয় সম্পর্কে প্রখর জ্ঞান ও শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধের দ্বারা লালিত হয়ে অতি সাধারণ শিক্ষার্থী অভিনেতাও মঞ্চে চরিত্র রূপায়ণের ক্ষমতা অর্জন করতে পারতেন। তাঁর শিক্ষার গুনে তারা চরিত্রটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হতেন এবং অভিনয়ও যে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্পকলা সে সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করতেন।[৮৩]

খ) অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখর।

অর্দ্ধেন্দুশেখর অত্যন্ত উচ্চমার্গের অভিনেতা ছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরের ঐশ্বর্য্য তাঁর অভিনয় জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। বিভিন্ন ধরণের চরিত্রের জন্য তিনি কণ্ঠস্বরকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারতেন এবং ব্যবহারের প্রতিটি

বিশিষ্টতাকে তিনি শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত একভাবে ধরে রাখতে পারতেন।[৮৪] চরিত্রের ভাব ও রস অনুযায়ী কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতনকে নিয়ন্ত্রিত করে তাকে চরিত্রানুগ করে প্রকাশ করতেন। প্রত্যেকটি শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থকে পরিস্ফুট করে তোলার জন্য তিনি শব্দের সুষ্ঠু উচ্চারণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন প্রকার লোকায়ত ভাষা সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। অর্থ ও উচ্চারণের দিক দিয়ে বিভিন্ন ভাষার মধ্যেকার সুক্ষ্ম পার্থক্যও তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করতেন। বিভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয়-কালে উচ্চারণ ভঙ্গিমার বিশিষ্টতার দ্বারা চরিত্রের দেশগত স্বরূপকে পরিস্ফুট করে তুলতেন।[৮৫]

তাঁর সময়কার সুরেলাধর্মী অভিনয়ধারাকে তিনি বর্জন করেন। কি গদ্যময় বা পদ্যময় সংলাপে অভিনয়কালে তিনি সমগ্র নাটক, নাট্যঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে সংলাপের তাৎপর্য্য নির্ধারণ করে তা সুরবর্জিত ভাবে অর্থ ও ভাব অনুসারে স্বাভাবিকভাবে বলতেন। গিরিশ যুগের প্রচলিত সুরেলা অভিনয় ধারার প্রচণ্ড প্রভাবের মধ্যে থেকেও তাঁর এই স্বকীয়তা অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুশেখরকে বিশিষ্টতা দান করেছে। অভিনয়কালে তিনি চরিত্রের শারীরিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিককে বিচার বিশ্লেষণ করে তদনুযায়ী চরিত্রায়ণের জন্য সচেষ্ট হতেন। নাট্য-চরিত্রের বাহ্যিক দিককে পরিস্ফুট করে তোলার জন্য তিনি নাট্যঘটনার সময় ও কালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চরিত্রানুযায়ী পোষাক পরিচ্ছদ নির্বাচন করতেন এবং এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তিনি অঙ্গরচনার নির্দেশ দিতেন। মঞ্চে চরিত্র রূপায়ণের জন্য তিনি চরিত্রোচিত ধ্যানের সাহায্যে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে চরিত্রসত্তায় রূপান্তরিত করতেন। চরিত্রানুগ হাব, ভাব, অভিব্যক্তির সাহায্যে চরিত্রটিকে বিশ্বাসযোগ্য ও বাস্তবানুগ করে গড়ে তুলতেন।[৮৬] চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে তিনি চরিত্রের রসরূপ গড়ে তোলার দিকেও যত্নশীল ছিলেন। চরিত্র রূপায়ণের জন্য তিনি ভাবাবেগের আতিশয্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিতেন না। অভিনয় কালে তিনি তাঁর অভিনয়সত্তা ও বিচারক সত্তাকে জাগ্রত করে রাখতেন।[৮৭] এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই তাঁর অভিনীত ছোট বড় সকল চরিত্রই রসময় হয়ে উঠে সৃষ্টিলোকে এক একটি অনিন্দ্য সুন্দর মৌলিকত্ব নিয়ে বিরাজ করত। 'রিজিয়া' নাটকের ছোট চরিত্র 'ঘাতক' এবং 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের 'দানশা ফকির' তাঁর অভিনয়গুণে উজ্জ্বল। একই সঙ্গে একটি নাটকের একাধিক চরিত্রে তিনি খুবই দক্ষতার সঙ্গে রূপদান করতে পারতেন। এ প্রসঙ্গে 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে 'বিক্রমাদিত্য' ও 'রডা' চরিত্রে তাঁর অভিনয় স্মরণ-যোগ্য। সিরাজদ্দৌলার ত্রয়োদশ অভিনয় রজনীতে তিনি একই সঙ্গে 'শওকতজঙ্গ', 'মীরকাসিম', 'ড্রেক', 'সেরেফটন' ও 'মুন্সালা' এই পাঁচটি বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দান করে দর্শকগণকে বিস্ময়াবিষ্ট করে তুলেছিলেন।[৮৮] সাহেবের ভূমিকায় অভিনয়ের ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রতাপাদিত্য নাটকের

'রডা' চরিত্রে তাঁর অভিনয় খুবই উল্লেখযোগ্য। '[illegible]' নাটকে তিনি একাই 'হলওয়েল', 'হে,' এবং 'মেজর অ্যাডামস'-এর ভূমিকায় সার্থক রূপদান করেছিলেন।[৮৯]

হাস্যরসাত্মক চরিত্র চিত্রণে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কৌতুকময় চরিত্রের ব্যাখ্যাদানে তাঁর প্রতিভার বিস্ময়কর স্ফুরণ দেখে সকলে বিস্মিত হয়ে যেতেন। অঙ্গরচনা ও রূপসজ্জার বৈচিত্র্যের দ্বারা, ভাবাভিনয়ের সাহায্যে এবং বিচিত্র রকম আঙ্গিক অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি নাটকের চরিত্রকে উপজীব্য করে হাস্যরস পরিবেশন করতেন।[৯০] এতে হাস্যরস উপভোগের মাধ্যমে দর্শকগণ যেমন পরিতৃপ্ত হতেন তেমনি অর্দ্ধেন্দুশেখরও এতে পরম তৃপ্তি লাভ করতেন। তাঁর হাস্যরস পরিবেশনে সাধারণ কৌতুক (Humour) ও বুদ্ধি দীপ্ত কৌতুক (wit) উভয়ই যুগপৎভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠত। তবে গম্ভীর ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ চরিত্রাভিনয়েও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় রেখে গেছেন। 'বলিদান' নাটকের 'করুণাময়' চরিত্রাভিনয়ে তাঁর নতুন ব্যাখ্যাদান দর্শকের মনে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছিল। তবে হাস্যরসাত্মক চরিত্রাভিনয়ে তাঁর জনপ্রিয়তা অধিক ছিল। এ প্রসঙ্গে নটগুরু গিরিশচন্দ্রের একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে—"গম্ভীর ভূমিকাতেও তাঁহার সমদক্ষতা ছিল। কিন্তু গম্ভীর ভূমিকা লইয়া তিনি বাহির হইলে দর্শক প্রথমে সে অংশের গাম্ভীর্য্য ধরিতে পারিত না। অবশ্যই পরিশেষে সে ভূমিকার প্রকৃত পরিচয় পাইত এবং যেরূপ হাস্য রসাত্মক অংশে হাসিত, করুণ রসাত্মক অংশেও কাঁদিত।"[৯১]

সকল প্রকার চরিত্র চিত্রণে তাঁর এই অসাধারণ নৈপুণ্যের গুণেই তিনি বঙ্গ সংস্কৃতির যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ সমগ্র ঠাকুর পরিবারে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।[৯২]

॥ মঞ্চে অমৃতলাল মিত্র ॥

অভিনেতা অমৃতলাল মিত্রের কণ্ঠস্বর গম্ভীর ও শ্রুতিমধুর ছিল। কিন্তু তাতে ব্যাঞ্জনা কম ছিল। সুরেলা ধর্মী ও আবৃত্তিমূলক অভিনয়েই তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর দৈহিক গঠনও ছিল অভিনয়োপযোগী। এ সকলের জন্য গিরিশযুগে তিনি দর্শকের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে গিরিশ-নাট্যের তিনিই ছিলেন সর্বজন স্বীকৃত নায়ক। অভিনয় কালে তিনি সহ-অভিনেতাদের সঙ্গে আভিনয়িক সাযুজ্য (co-acting) রক্ষা করার ব্যাপারে যত্নশীল ছিলেন না।

॥ মঞ্চে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ॥

ক) প্রযোজক অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রযোজক অমরেন্দ্রনাথ নাট্যপ্রযোজনার দৃশ্যসজ্জা, আলোকসজ্জা এবং এর ব্যবসায়িক রীতির বিভিন্ন দিককে অনেক উন্নত করে তোলেন। দৃশ্যসজ্জার

বিষয়ে গিরিশ যুগের যে সাবেকী রীতি প্রচলিত হয়ে আসছিল তিনি তার পরিবর্তন সাধন করেন। তাঁর সময়কার ক্লাসিক থিয়েটার দৃশ্যসজ্জা ও আলোক সজ্জার প্রয়োগের ব্যাপারে পরীক্ষা নিরীক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। চিরা-চরিত অংকিত দৃশ্যাবলীর বদলে তিনি 'ঠেলা সিন', 'কাটা সিন,' 'বক্স সিন' ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন। মঞ্চে নাটকের প্রয়োজনে বাস্তবানুগ পরিবেশ রচনার জন্য তিনিই সর্বপ্রথম সত্যিকারের টেবিল, চেয়ার, খাট, আলমারী ইত্যাদি ব্যবহার করেন। আলোক ও মঞ্চ সজ্জার সমন্বয়ে তিনি মঞ্চে নিত্যনতুন অভিনব নাট্য-দৃশ্যের মঞ্চমায়ার সৃষ্টি করেন। প্রযোজক হিসাবে নাট্য দর্শকের মনোভাব ও অভিরুচির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতেন। রঙ্গালয়ের ব্যবসায়িক দিককে উন্নত করে তোলার জন্য তিনি খুবই যত্নশীল হন। রঙ্গালয়ের প্রতি দর্শকের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য তিনি নাটকের প্রচার ব্যবস্থার উপর খুব গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অভিনীত নাটকের বিজ্ঞাপন যেমন দিতেন তেমনি কখনো কখনো নাটকের প্রধান প্রধান নট-নটীদের সুদৃশ্য রঙীন ছবি, আবার নাট্য প্রযোজনার বিশিষ্ট ছবিসহ রঙীন হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে তা প্রচার করতেন। অনেক সময় নাট্য-প্রযোজনার প্রতি দর্শকের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য তিনি প্রযোজনার শেষে বিভিন্ন ধরনের পুস্তক দর্শকদের মধ্যে উপহারস্বরূপ দান করতেন। সামগ্রিক ভাবে নাট্য প্রযোজনার প্রতি অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মমত্ববোধকে অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি করার জন্য তিনি তাঁদের মাসিক মাহিনাও বৃদ্ধি করে দেন। এর ফলে অভিনয় জীবন ও রঙ্গালয়ের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এ সমস্তই প্রযোজক অমরেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব।

খ) অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

অভিনেতা হিসাবে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের কন্দর্পকান্তি চেহারা তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। এই বিশিষ্টতার জন্য তিনি যেমন সহজেই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন তেমনি যে কোন চরিত্রেই দেহাকৃতির দিক থেকে মানিয়েও যেতেন।[৯৩] তিনি সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। কণ্ঠস্বর ছিল জোরালো, গম্ভীর ও লালিত্যপূর্ণ। তিনি সহজেই উদারা-মুদারা ও তারা এই তিনটি গ্রামে কণ্ঠস্বরকে সুনিয়ন্ত্রিত করতে পারতেন। তাঁর উচ্চারণভঙ্গিও ছিল মার্জিত।

অভিনয় কালে তিনি গিরিশ যুগের অভিনয় ধারাকেই মেনে চলতেন। সুরসহ আবৃত্তিমূলক অভিনয়ে তিনি বিশিষ্টতা অর্জন করেন। আবৃত্তিমূলক অভিনয়ে তাঁর ভরাট কণ্ঠস্বরের বিভিন্ন কাজ যথা গমক, মীড় ইত্যাদি দেখিয়ে তিনি চরিত্রের বিশিষ্ট ভাবাবেগকে প্রাণস্পন্দিত করে তুলতেন।[৯৪] অভিনয়ের সময় সুরেলা কণ্ঠস্বরের ধারাবাহিক প্রবাহমানতার মাধুর্য্য দর্শকের চিত্তকে আবেগের ভারে স্বপ্নাচ্ছাদিত করে তুলত। নাট্যচরিত্রের মান, অভিমান, ক্রোধ, প্রেম ইত্যাদি

বিভিন্ন প্রকারের ভাব ও আবেগকে তিনি তাঁর সহজাত অভিনয়ের গুণে মূর্ত্ত করে তুলতেন। তবে চরিত্রের বিশিষ্ট মনোভাবকে পরিস্ফুট করার সময় তাঁর মধ্যে মুখজ অভিব্যক্তির অভাব দেখা যেত। তাই কণ্ঠস্বরের সম্পদ দিয়েই তিনি দর্শকদের দৃষ্টি অধিকভাবে আকর্ষণ করতে সচেষ্ট হতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মাঝে মাঝে অযৌক্তিক ভাবেও কণ্ঠস্বরকে হঠাৎ উচ্চগ্রামে তুলে দিয়ে দর্শকদের মধ্যে ভাবাবেগজাত আন্দোলনকে বাড়িয়ে তুলতেন। 'রঘুবীর' নাটকে 'রঘুবীর' চরিত্রের ভীলত্ব ও ব্রাহ্মণত্বের দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তোলার সময় তাঁর আঙ্গিক অভিনয়, ভীল রঘুবীরের পাশব বৃত্তিকে জাগিয়ে তোলার সময় তাঁর বাচিক অভিনয়, দর্শকগণকে অভিভূত করেছিল।[২৫] 'পরপারে' নাটকের 'বিশ্বনাথ' চরিত্রের দুঃখ-বেদনাকে তিনি তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ করতেন যে তা দেখে দর্শকগণ চোখের জল সম্বরণ করতে পারতেন না। তবে চরিত্র চিত্রণে তিনি খুঁটিনাটির প্রতি তেমন লক্ষ্য রাখতেন না। ক্লাসিক থিয়েটারের—'প্রতাপাদিত্য' নাটকে 'প্রতাপ' চরিত্রের অভিনয়ে এটা বিশেষভাবে অনুভূত হয়। হাস্যরসাত্মক চরিত্রাভিনয়েও তিনি সাবলীল অভিনয় করতে পারতেন।[২৬] এ প্রসঙ্গে রঙ্গনাট্য 'চাবুকের' 'প্রিয়লাল' চরিত্রে তাঁর অভিনয়সহ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের 'মিঃ চম্পটি', 'ফটিকজল' নাটকের 'প্রভাত' ইত্যাদি চরিত্র চিত্রণের কথা উল্লেখযোগ্য।

।। মঞ্চে রসরাজ অমৃতলাল বসু ।।

ক) প্রযোজক অমৃতলাল বসু।

নাট্য প্রযোজনার সময় তিনি নাটকের সময় ও কালকে পরিস্ফুট করে তোলার জন্য নাটকের দৃশ্যসজ্জা, আলোকসজ্জা, অঙ্গরচনা, অঙ্গসজ্জা সংগীত ইত্যাদি সকল প্রকার উপকরণের প্রতি সমান গুরুত্ব দিতেন এবং এ সকল বিষয়ের খুঁটি-নাটির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। প্রযোজক হিসাবে তাঁর এই বিশেষত্বই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করছে।[২৭]

খ) শিক্ষক অমৃতলাল বসু।

শিক্ষাদানকালে তিনি খুব সহৃদয়তার সঙ্গে অভিনেতাদের শিক্ষা দিতেন। এর ফলে তাঁর সঙ্গে শিক্ষার্থী অভিনেতাদের একাত্ম ভাব সহজেই গড়ে উঠত। শিক্ষার্থী অভিনেতাগণ এর ফলে মানসিক দিক দিয়েও নতুন শক্তি লাভ করতেন। মূলত তিনি তাঁর দেহ ও কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে প্রতিটি চরিত্রের মুখভঙ্গী, অঙ্গভঙ্গী, স্বরক্ষেপণ প্রণালী, উচ্চারণ পদ্ধতি ইত্যাদি বিশদভাবে দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিতেন। মঞ্চে সকল প্রকার অঙ্গভঙ্গীর যে একটি গুরুত্ব আছে, এমনকি আঙুল নাড়ারও যে একটি বিশেষত্ব আছে সে সম্বন্ধে তিনি শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলতেন। এক নাগাড়ে শিক্ষাদান করার সময় তিনি মাঝে মাঝে রঙ্গ-রসিকতার দ্বারা অভিনেতার

মনের জড়তা দূর করতে সচেষ্ট হতেন। এর ফলে শিক্ষার্থী অভিনেতাদের মধ্যে শিক্ষাগ্রহণ ব্যাপারে উৎসাহ ও উদ্দীপনা অধিকভাবে জাগরূক হয়ে উঠত। অভিনয় শিক্ষাদানকালে তিনি অভিনেতাদের চরিত্রানুগ অঙ্গরচনা ও অঙ্গসজ্জার প্রতি যত্নশীল হবার জন্যও সচেতন করে দিতেন। শিক্ষক অমৃতলালের উপর নটগুরু গিরিশচন্দ্রেরও গভীর আস্থা ছিল। তাই মহলাকক্ষে উপস্থিত থেকেও প্রযোজক গিরিশচন্দ্র মহলা পরিচালনার ভার অমৃতলাল বসুর উপর ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত হতেন।

গ) অভিনেতা অমৃতলাল।

অভিনেতা অমৃতলাল অর্দ্ধেন্দুশেখরের ভাব-শিষ্য ছিলেন। তাই তাঁর অভিনয় শৈলীতে অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রভাব লক্ষ্যনীয় হয়ে উঠেছিল। তাঁর সুঠাম ও সুন্দর দেহাকৃতি, বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, তাঁকে অভিনয় জগতে বিশেষভাবে আকর্ষনীয় করে তোলে। চরিত্র চিত্রণের সময় তিনি মুখ, শারীর ও চেষ্টাকৃত অভিব্যক্তির দ্বারা চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতেন। চরিত্রোপযোগী অঙ্গরচনা ও অঙ্গসজ্জার দ্বারা তিনি চরিত্রেব বাহ্যিক কাঠামোকে দীপ্ত ও আকর্ষণীয় করে তুলতেন। মূলত হাস্যরসাত্মক চরিত্রাভিনয়ে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। শ্লেষযুক্ত সংলাপ-এর বাচনিক অভিনয়েও তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। তাঁর 'খাসদখলের' 'নিতাই'[১৮], এবং 'নবযৌবনের' 'বসন্তকুমারের' চরিত্রাভিনয় দর্শককে মোহিত করেছিল।

।। মঞ্চে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) ।।

ক) অভিনেতা দানীবাবু।

গিরিশযুগে অভিনেতা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) রঙ্গালয়ে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরের ভরাট গাম্ভীর্য্য এবং গভীরতা দর্শককে সম্মোহিত করে তুলত। অবলীলাক্রমে তিনি কণ্ঠস্বরকে উদারা, মুদারা ও তারা এই তিন স্তরে নিয়ে যেতে পারতেন। কণ্ঠস্বরের এই ঐশ্বর্য্য থাকলেও তাঁর কণ্ঠস্বর অনেক সময় ভাঙ্গা ভাঙ্গা, আধো আধো শোনাত। শব্দের সুষ্ঠু উচ্চারণ রীতিকেও তিনি অনেক সময় আয়ত্ত করতে পারতেন না। তাঁর এই জড়তাপূর্ণ আধো-আধো ভাব যুক্ত স্বরক্ষেপণ এবং বিকৃতশব্দ উচ্চারণ পদ্ধতি 'বলিদান' নাটকে ধনীগৃহের মদ ও বেশ্যাসক্ত 'দুলাল' চরিত্র চিত্রণে খুব কার্য্যকরী হয়ে ছিল। হাস্যরসাত্মক চরিত্র চিত্রণে তাঁর এই রীতি কোন কোন ক্ষেত্রে মানিয়ে গেলেও গাম্ভীর্য্য পূর্ণ চরিত্রাভিনয়ের ক্ষেত্রে তাঁর এ ধরনের বাক্‌রীতি ও কণ্ঠস্বরভঙ্গী বিশুদ্ধ অভিনয়শৈলীকে ব্যাহত করত। বস্তুতপক্ষে তাঁর চেহারা ও বাচনভঙ্গী হাস্যরসাত্মক চরিত্রাভিনয়ের পক্ষেই উপযুক্ত ছিল। পিতা গিরিশচন্দ্রের কাছ থেকে অভিনয় শিক্ষা লাভ করে তিনি ক্রমে ক্রমে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ চরিত্রাভিনয়ে দক্ষতা

অর্জন করেন।[৯৯] খুব সহজেই তিনি চরিত্রের ভাবকে বুঝতে পারতেন এবং মুখজ, শারীর ও চেষ্টাকৃত অভিব্যক্তির সাহায্যে সেই ভাবকে দক্ষতার সঙ্গে বাস্তবানুগ করে প্রকাশ করতেন।[১০০] এ প্রসঙ্গে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের 'চাণক্য' চরিত্র চিত্রণের কথা স্মরনীয়। নন্দ কর্তৃক অপমানিত চাণক্যের ক্রোধ, প্রতিহিংসা, চাণক্যের পিতৃ-হৃদয়ের হাহাকার ও অন্তর্জ্বালা ইত্যাদি ভাবকে তিনি বাচিক অভিনয় ও ভাবাভিব্যক্তির সাহায্যে প্রাণস্পর্শী করে তুলতেন। তাঁর অভিনয়ের মধ্য দিয়ে চাণক্যের কূটনৈতিক দিক যেমন ফুটে উঠত তেমনি আত্রেয়ীকে ফিরে পাবার দৃশ্যে চাণক্যের পিতৃ-হৃদয়ের কোমল ভাবের রূপ সন্দর্শনে দর্শকগণ আবেগে আপ্লুত হয়ে যেতেন।[১০১] চাণক্য চরিত্রে তাঁর অসাধারণ অভিনয় দেখে স্বয়ং নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল মহাশয়ও মোহিত হয়ে যেতেন।[১০২] আবার 'সাজাহান' নাটকে ঔরংজেব চরিত্রের শঠতা, ক্রূরতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদির রূপচিত্রণেও তিনি আঙ্গিক, বাচিক ও ভাবাভিনয়ের বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। সিরাজদ্দৌলা নাটকে 'সিরাজদ্দৌলা' চরিত্রের মহত্ত্ব, উদারতা, দেশপ্রেম ও সংগ্রামশীলতা এবং যুদ্ধে পরাজিত অসহায় নবাবের করুণ অবস্থা তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছিল। এই চরিত্রে তাঁর অনবদ্য অভিনয়ই তাঁকে বঙ্গরঙ্গ মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করে।

গিরিশ যুগের সুরেলা অভিনয় ধারাকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সুরেলা অভিনয়ে কান্না কান্না ভাবের আধিক্য সময় বিশেষে প্রকট হয়ে উঠত।[১০৩] 'তপোবন' নাটকের 'বিশ্বামিত্র' চরিত্রের ভূমিকায় এবং 'শঙ্করাচার্য্য' নাটকের 'শঙ্করাচার্য্য' চরিত্রের ভূমিকায় তিনি তাঁর ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত কণ্ঠস্বরের সাহায্যে সুরেলা অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকগণকে ভক্তিরসে আপ্লুত করে দিতেন। অভিনয়ের সময় চমক সৃষ্টির জন্য তিনি অনেক সময় কোন একটি বিশেষ শব্দের উপর সুরের বিশেষ ঝোঁক দিয়ে সুরকে ঊর্ধ্বমুখী করে তুলতেন। মঞ্চে উপস্থিত থেকে অভিনয় করার সময় তিনি পার্শ্ব অভিনেতাদের সঙ্গে হাব ভাব ইত্যাদি সম্পর্কিত পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে চলতেন না। এর ফলে তাঁর একক অভিনয় অনেক সময় আড়ষ্ট ও একঘেয়েমি দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ত।

॥ মঞ্চে তারাসুন্দরী ॥

সুশ্রাব্য গাম্ভীর্য্যপূর্ণ কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী[১০৪] তারাসুন্দরী তাঁর শুদ্ধ উচ্চারণ ক্ষমতা, কণ্ঠস্বরের বিভিন্ন প্রকার কাজের বৈচিত্র্য এবং স্বর প্রক্ষেপণের নৈপুণ্যে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের অভিনয় জগতকে আলোকিত করে তুলেছিলেন। অমৃতলাল মিত্রের কাছে তিনি অভিনয় শিক্ষা লাভ করেন। সঙ্গীতাচার্য্য রামতারণ স্যান্যাল এবং নৃত্য শিক্ষক কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে তিনি সংগীত ও নৃত্যবিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। অভিনেতব্য চরিত্র সম্পর্কে নাট্যকারের দেওয়া তথ্যকে ভিত্তি করে তিনি কল্পনার সাহায্যে চরিত্রের অন্তর্লোককে

খুঁজে বার করতে সচেষ্ট হতেন। মননশীলতা ও যুক্তির সাহায্যে চরিত্রের বহির্দ্বন্দ্বকে অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরতেন।[১০৫] তাঁর অভিনয়ে আঙ্গিক, বাচিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের সুষ্ঠু ব্যবহার খুবই প্রশংসনীয় হয়ে উঠেছিল। গাম্ভীর্য্যপূর্ণ চরিত্রের রসনিষ্পত্তিতে তিনি অদ্বিতীয়া ছিলেন।

'রিজিয়া' নাটকের 'রিজিয়া' চরিত্রের প্রেম, প্রতিহিংসা, সম্রাজ্ঞীসুলভ আত্মমর্য্যাদাবোধ ইত্যাদি ভাবকে তিনি যেমন মূর্ত্ত করে তুলেছিলেন তেমনি শত্রুর হস্তে পরাজিত অবস্থায় পূর্বকৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত 'রিজিয়ার' আত্মহত্যার মত হৃদয়বিদারক ঘটনাকে তিনি তাঁর অভিনয়ের গুণে মর্ম্মস্পর্শী করে তুলেছিলেন।[১০৬] এ ছাড়া 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে 'কল্যানী', 'রাণাপ্রতাপ' নাটকে 'যোশীবাঈ', 'বলিদান' নাটকে 'সরস্বতী', 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে 'জহুরা', 'খাসদখল' নাটকে 'মোক্ষদা' ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের রসের সমন্বয়ে গঠিত চরিত্র চিত্রণে তাঁর নৈপুণ্য দর্শককে মুগ্ধ করেছিল।

।। মঞ্চে সুশীলাবালা ।।

অভিনেত্রী সুশীলাবালা সুগায়িকা ও সুঅভিনেত্রী ছিলেন। গিরিশযুগের সুরেলা অভিনয়ধারাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। অভিনয়কালে পরিমিতিবোধের দ্বারা সুরকে নিয়ন্ত্রিত করতেন। চরিত্রানুযায়ী অঙ্গরচনা ও অঙ্গসজ্জা গ্রহণের ক্ষেত্রেও তিনি সচেতন ছিলেন। চরিত্র ব্যাখ্যার জন্য চরিত্রের ভাব ও রসকে পরিস্ফুট করতে তিনি অধিক সচেষ্ট হতেন। এর ফলে তাঁর অভিনীত প্রতিটি চরিত্রই দর্শকদের মনে নতুন দিকের উন্মোচন করত। 'রাণাপ্রতাপ' নাটকের 'মেহেরুন্নিসার' ভূমিকায় তাঁর অভিনয় ও সংগীত দর্শকদের হৃদয়কে গভীর ভাবে আকর্ষণ করেছিল।[১০৭] বস্তুতপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকের প্রযোজনার অন্যতম আকর্ষণ ছিল নৃত্য-গীত পটীয়সী সুশীলাবালার অতুলনীয় প্রাণস্পর্শী অভিনয়। 'খাসদখল' নাটকের 'গিরিবালা' চরিত্র চিত্রণেও তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের বঙ্গরঙ্গমঞ্চের দর্শকগণ যাত্রাপালার রচনা ও তার প্রয়োগ পদ্ধতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হতেন। তাই নাট্যরচনা ও তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে যাত্রাপালার রচনা ও প্রয়োগের প্রভাব লক্ষ্যণীয় হয়। এই সময় দর্শকগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন আজকের মত এত ভীষণ সমস্যাসংকুল ও কর্মমুখর ছিল না। তাঁদের অবকাশ যাপনের সময়ও ছিল প্রচুর। তাই তাঁরা দীর্ঘক্ষণ ধরে নাটক দেখতেও চাইতেন। এর ফলে নাট্যরচনার ক্ষেত্রে নাটকের মূলঘটনার সঙ্গে অনেক প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় উপকাহিনী সংযুক্ত করে নাটকের কলেবরকে দীর্ঘ করে তোলা হোত। অনেক সময় এর ফলে নাট্যসংহতি ব্যাহত হয়ে পড়ত। কিন্তু দর্শকদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে নাট্যকারদের

এটা মেনে নিয়েই নাটক লিখতে হোত। মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম যে হোত না তা নয়। তবে এটাই ছিল এ যুগের রীতি। দর্শকগণ নাটকের মধ্যে যাত্রাসুলভ নাচ-গানের আধিক্য পছন্দ করতেন। দর্শকদের এই অভিরুচির দিকে তাকিয়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মনোমোহন গোস্বামী, অমৃতলাল বসু প্রমুখ নাট্যকারগণকে নাটকের মধ্যে বহুল পরিমাণে নৃত্যগীতের সংযোজন করতে হয়েছিল।

নাট্যপ্রয়োগ পদ্ধতিতে আলো ও মঞ্চমায়ার সাহায্যে চমক সৃষ্টির প্রতিও দর্শকের আকর্ষণ ছিল সমধিক। তাই এ সময় বিভিন্ন নাটকের প্রযোজনায় এ ধরনের চমক সৃষ্টি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। যাত্রাধর্মী মোটা দাগের অভিনয় দর্শকদের মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিত। তাই গিরিশযুগের অভিনয় ধারায় ভাবাবেগমন্ডিত স্থূল অভিনয়, কণ্ঠস্বরকে হঠাৎ নীচু পর্দা থেকে উঁচু পর্দায় নিয়ে যাওয়া, সুর প্রক্ষেপণে অযথা ঝোঁক সৃষ্টি করা, দ্রুতলয়ে সংলাপ বলা ও অপ্রয়োজনীয় অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা চমক সৃষ্টি করা ইত্যাদি যাত্রাসুলভ বিশিষ্টতা বিশেষ ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল। দর্শকগণ তাঁদের খ্যাতনামা অভিনেতাদের অভিনয় কুশলতা দেখার জন্যই অধিক আগ্রহ প্রকাশ করতেন। তাই ব্যক্তিগত অভিনয়ের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য নাট্যকাররা বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রধান প্রধান অভিনেতাদের অভিনয় ক্ষমতার দিকে তাকিয়ে নাট্যসংলাপ রচনা ও তার পরিসর বৃদ্ধি করতেন। অভিনয়ের ক্ষেত্রেও এর প্রভাবে সমবেত অভিনয় অপেক্ষা ব্যক্তিগত অভিনয় কুশলতা দেখাবার জন্য অভিনেতারা মানসিক দিক থেকে নিজেদের প্রস্তুত করে রাখতেন। এতে সামগ্রিকভাবে নাট্যপ্রযোজনার মান কখনো কখনো নিম্নাভিমুখী হয়ে পড়ত। তবুও প্রযোজকদের এটা মেনে না চলে উপায় ছিল না। কারণ রঙ্গমঞ্চের অর্থনীতির কথা চিন্তা করতে হলে নাটককে জনপ্রিয় করে তোলার দিকে বিশেষ দৃষ্টি নাট্যপ্রযোজকদের দিতে হোত। তাই দর্শকের রুচিকে বাদ দিয়ে নাট্যপ্রযোজকরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নাট্যপ্রযোজনার কথা চিন্তা করতেন না।

সূত্র-পরিচিতি

১. "It is to give play a life on the stage that the written text can uot possess to enhance its virtues, disguise its faults and limitations ; and to help a company of actors to cloth it with meaning and feeling which exist only as an idea till expressed by the performence."

—Page-1, Directing in the Theatre—Huge Morrison, New York,

২. Page—217, Producing the Play—John Gassner, Newyork, 1941.

৩. "...he is the conductor of a dramatic orchestra."—Page—158, The Stage in action—Samuel Selden, London,

৪. "the Art of the theatre...is divided up into so many crafts : acting, costume, lighting, carpentering, singing, dancing etc.. that it must be realized at the commencement that the Entire, not Part reform is needed, and it must be realized that one part, one craft in the theatre, and that no result can come from fitful, uneven reform, but only from a systematic progression." ...Page—177, On the Art of the Theatre —Edward Gordon Craig, London, 1957.

৫. —"the director's task therefore as interpretive artist is to study the projection of the qualities of a play. This does not deny the director his function as creative artist to whatever degree his talents or his concept permits,"—Page-20, Fundamental of Play Directing—A. Dean and L. Carra, New York,

৬. "It is also a focus for the audience affording a dynamic link throughout the Performence."—Page-291, Acting and Stage Craft—D. Bowskill, London,

৭. "Light is the life of the Theatre, the good fairy of the decor, the soul of a standing. Light alone intelligently handled,

gives atmosphere and color to a set, depth and perspective." —Page-98, Directors on Directing—T. Cole and H. K. Chinoy, London,

৮. "Right kind of make-up can, as an integral part of the characterization, illuminate the character for the actor as well as for the audience and provide a believable character portrait."—Page-3, Stage Make up—Richard Corson, New Jersey,

৯. "রূপারোপ কলা তখনই শিল্প পর্য্যায়ে উন্নীত হবে যখন এর মধ্যে বাস্তব চিন্তা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং শৈল্পিক মনোভঙ্গির একত্র সমাবেশে চরিত্রটি সার্থকভাবে রূপায়িত হবে"।—পৃষ্ঠা-২২, অঙ্গরচনার রূপরীতি ও প্রয়োগ—ডঃ রঞ্জিত মিত্র, কলিকাতা, ১৩৭৯।

১০. "Every period…has every definite outline and silhouett…stage costume should give its period flavour."—Page-14, Dressing the Play—N. Lambourne, London,

১১. "চরিত্র ও অভিনয়"—ডক্টর গৌরীশংকর ভট্টাচার্য্য। স্বজন স্মারকগ্রন্থ, ১৯৮৩, কলিকাতা।

১২. "যথা জীব স্বভাবস্য পরিত্যজ্যান্য দৈহিকম্।
পরভাবং প্রকুরুতে পরদেহং সমাশ্রিত ॥
এবং বুধঃ পরং ভাবং সোহস্মীতি মনসা স্মরণ।
বেশবাগাঙ্গ লীলাভিশ্চেষ্টাভিশ্চ সমাচরেৎ" ॥

শ্লোক—৭-৮, ২৬ অধ্যায়, নাট্যশাস্ত্র—ভারত।

১৩. "The characteristic gift of the actor is…dualism."—Page-25 The Art of the Actor,—C. Coquelin—London, 1968.

১৪. "The actor creates the whole length of a human souls life on the stage. Every time he creates a part."—Page-77, Acting the first six lessons—Richard Boleslavsky, London,

১৫. "the theatre was a point of closet contact between humanisim and popular taste. A number of plays were specially prepared for select audience of 'the judicious' at the Court, the Universities or the legal Inns. But great majority were

written for the commercial theatre whose repertory thc court shared, and in which the judicious were outnumbered and often outweighted by "the groundings" who paid there penny for standing rooms."—Page-54, The Age of Shakespeare-Boris Ford, 1955, London.

১৬. সাক্ষাৎকার : সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পরিশিষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

১৭. সাক্ষাৎকার : হরীন্দ্রনাথ দত্ত। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

১৮. "স্পটলাইট, ফুটলাইট প্রভৃতির প্রয়োগের কার্যকারিতা সম্পর্কে তাদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তাই তীব্রভাবে অভিনেতা অভিনেত্রীর মুখে আলো ফেললেই সব কাজ ফুরিয়ে যেত। সে আলো যে কত সময়ে ঝোলানো পৃষ্ঠপটে আঁকা ছবির ওপর অভিনেতার অবয়বের অথবা মঞ্চের ওপরকার আসবাবের ছায়া ফেলে দৃশ্যপটের স্বাভাবিকতা বিঘ্নিত করত সেদিকে কারুর খেয়াল ছিল না।"—পৃষ্ঠা-৪১, গিরিশ রচনাবলী (৫ম খণ্ড) সম্পাদক : ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, কলিকাতা-১৯৭৫।

১৯. "চিত্রের বাহার, রঙের ঔজ্জ্বল্যের দিকেই তখন যেন বেশি দৃষ্টি দেওয়া হোত। সংযম, পরিমিতি এবং অল্পের মধ্য দিয়ে অনেকখানি বোঝাবার শৈল্পিক প্রয়াস তখনও অনুপস্থিত।" —পৃষ্ঠা-১৪৫, শতবর্ষে নাট্যশালা, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, কলিকাতা-১৯৭৩।

২০. "মঞ্চাধ্যক্ষেরা অনেক সময় ইউরোপীয় ষ্টীল এনগ্রেভিং ও ফটো হইতে দৃশ্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকেন, কাজেই দুর্গের পরিবর্তে 'কাসল' (castle), বাগানের পরিবর্তে 'ভিলা' (villa), বারান্দার পরিবর্তে 'করিডোর' (corridor), রাজসভার পরিবর্তে 'ড্রইং রুম'—প্রভৃতির অবাধ অনুকরণ দেখতে পাই।" —পৃষ্ঠা-৬২, বঙ্গীয় নাট্যশালা, —ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা-১৩৮৪।

২১. "ডেভিড গ্যারিক বলে একজন চিত্রকর কলকাতায় ছিলেন।…তিনি ৮০ টাকা করে প্রত্যেকখানির মজুরি নিয়ে চারখানি ফ্ল্যাটসিন আমাদের এঁকে দেন… একখানি গৃহাভ্যন্তর, একখানি রাজসভা, একখানি উদ্যান, একখানি পর্বত ও বন। কাশীর গঙ্গাতীরস্থ দৃশ্য নিয়ে আইরিশ ড্রপ কাপড়ের উপর তিনি একখানি ড্রপসিনও এঁকেছেন…"

পৃষ্ঠা—২১৯-২২০, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা-১৩৬৮।

২২. "অমরেন্দ্রনাথ সাজসজ্জা, দৃশ্যপট বিষয়ে রঙ্গমঞ্চে নতুন যুগের প্রবর্তন করেন।" পৃষ্ঠা—১৪৯, রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ —রমাপতি দত্ত, কলিকাতা-১৩৪৮।

২২ক. পৃষ্ঠা—৪৩৫, বাংলা নাটকে লোকপ্রভাব—ডঃ মীরা গাঙ্গুলী, কলিকাতা-১৩৮৯।

২৩. "একাল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় নাট্যশালার যে সকল দৃষ্টিবিভ্রমকারী দৃশ্যের যোজনা করা হইয়াছে, তাহার প্রধান প্রধান দৃশ্যগুলিই ধর্মদাসবাবুর উদ্ভাবিত।...ধর্মদাসবাবুর কৃতিত্বে বঙ্গীয় নাট্যশালার মঞ্চ ও নেপথ্যবিধানের এতটা উন্নত হইয়া দর্শকের তৃপ্তিবিধানে, বিভ্রম এবং বিস্ময় উৎপাদনে সক্ষম হইয়াছে।" পৃষ্ঠা—৯৩, অভিনেত্রী কাহিনী, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা-১৩২১।

২৪. "যোগেন্দ্রনাথ মিত্র...সিভিল ইঞ্জিনিয়ার...মঞ্চ সম্বন্ধীয় নেপথ্যাচার কার্য্যে তিনি ধর্মদাস সুরের সুদক্ষ সহায়ক ছিলেন।"... স্মৃতিচারণ—অমৃতলাল বসু, মাসিক বসুমতী, জ্যৈষ্ঠ, কলিকাতা-১৩৩৪।

২৫. সাক্ষাৎকার ঃ হরীন্দ্রনাথ দত্ত। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

২৬. সাক্ষাৎকার ঃ ঐ ঐ

২৭. "ধর্মদাস সুরের শেষ কীর্তি শঙ্করাচার্য্যের দৃশ্যাবলী। শঙ্করের পিছনে নদীর স্রোত প্রবাহিত হওয়া, সনন্দনের প্রতিটি পাদস্পর্শে গঙ্গাবক্ষে পদ্ম প্রস্ফুটিত হওয়া, শঙ্করের কমণ্ডলু মধ্যে নর্মদা নদীর প্রবেশ ইত্যাদি অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্যাবলী তাঁহার শেষ অক্ষয় কীর্তি।" পৃষ্ঠা—১৩, বঙ্গদর্শন, সম্পাদক—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, ২৩শে কার্তিক, ১৩৩২।

২৮. "আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে ধর্মদাস আমাকে কৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ করিয়াছে এবং পূর্ব পূর্ব সকল অভিনেতা রঙ্গমঞ্চ হইতে দর্শকের প্রশংসা-ভাজন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বর্গগত এবং যাঁহারা জীবিত সকলেই সেই ঋণপাশে আবদ্ধ।" নাট্যশিল্পী—ধর্মদাস ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নাট্যমন্দির, ভাদ্র ১৩১৭, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

২৯. সাক্ষাৎকার ঃ হরীন্দ্রনাথ দত্ত, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৩০. "the mechanical contrivance which converts Krishna into Kali does credit to the scenic Arts..."—Indian Mirror, 21st August, 1900.

৩১. সাক্ষাৎকার ঃ হরীন্দ্রনাথ দত্ত, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৩২. Here you Are
Your desire fulfilled !
Your Command—obeyed to the Letter !

STAR THEATRE

Mr. D. L. Roy's Highly successful society sketch

HARINATHER SASURBAREE JATTRA

or

Harinath starts for his Father in Law's House.

Train in motion—on the stage !

Really a sight to be seen !

—Indian Daily News—9. 12.1911.

৩৩. সাক্ষাৎকার : হরীন্দ্রনাথ দত্ত, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৩৪. GREAT NATIONAL THEATRE

Sensational Attractions !

Saturday, 25th December 1875

হীরক চূর্ণ নাটক

THE DEPOSED GAEKWAR

Railway train on the stage !

... ...

—Amrita Bazar Patrika, 23rd December, 1875.

৩৫. পরিশিষ্ট : 'থিয়েটারের প্রচার বৈশিষ্ট্য' নিবন্ধের 'বারানসী' নাটকের হ্যান্ড বিল (নং ৩) দ্রষ্টব্য।

৩৬. ঐ 'থিয়েটারে প্রচার বৈশিষ্ট্য' নিবন্ধের '"ময়ূর সিংহাসন' নাটকের হ্যান্ড বিল (নং ৪) দ্রষ্টব্য"।

৩৭. SENSATION PILED ON SENSATION

KOHINOOR THEATRE

Saturday the 8th January at 8.30 p. m.

Third Performence of the most successful

Historic Drama

D U R G A B A T I

* * * * *

The piece is gorgeously mounted, extensively millinered, and intelligently played. Four characters on horse back is one scene, a thing yet unattempted on the Bengalee stage···
Statesman—8th January, 1910.

৩৮. ভ্রমরকে বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চের এক যুগান্তকারী নাটক বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না।……গোবিন্দলাল ঘোড়ায় চড়িয়া স্টেজে অবতীর্ণ হইতেন। পৃ.-২১৫, রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ—রমাপতি দত্ত, ১৩৪৮, অগ্রহায়ণ, কলিকাতা।

৩৯. সাক্ষাৎকার ঃ হরীন্দ্রনাথ দত্ত, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৪০. ঐ " " "

৪১. NATIONAL THEATRE

6, Bedon Street.

Nextday, Wednesday 1st January, 1908

New year's day at Candle light.

Baboo Monomohan Goswammy's Highly

Successful Social Drama………S A M A J

Grand garden party : A House on fire !

The harrowing scenes of famine !

—Hindoo Patriot—1st January, 1908.

৪২. সাক্ষাৎকার ঃ সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৪৩. সাক্ষাৎকার ঃ হরীন্দ্রনাথ দত্ত, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৪৪. "দুই একটি অভিনেত্রী ব্যতীত কেহই বর্ণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে জানে না। প্রায় সকলেই কতকগুলো রং চাপড়ে বর্ণটাকে অস্বাভাবিক কদর্য করিয়া ফেলে।" পৃ. ৩২, কলাবিদ্যার বিপর্যয়—মনোমোহন গোস্বামী, নাট্যমন্দির, শ্রাবণ—ভাদ্র, ১৩১৯।

৪৫. "বঙ্গীয় নাট্যালয়ের পোষাক নির্বাচনের ভার সাধারণত একজন সামান্য ব্যক্তির উপর থাকে। দেশ কাল পাত্র ভেদে পোষাকের বিভিন্নতার প্রয়োজনীয়তার জ্ঞান সে সকল ব্যক্তির কাহারও নাই। যাঁহারা পোষাক পরিচ্ছদ তুলিতে, পাড়িতে, ভাঁজ করিতে, শুকাইতে ও কোন পুস্তকের কোন অভিনেতার কি পোষাক ইহা মনে করিয়া বাছিয়া নিতে পারেন এবং দ্রব্যাদির উপর একটু যত্ন লয়েন তাঁহারাই আমাদের নাট্যশালাগুলিতে উপযুক্ত বেশকারি।" পৃ. ৫৪, বঙ্গীয় নাট্যশালা—ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৩৬৬।

৪৬. "আজ যে অভিনেতাকে যে পরিচ্ছদে শ্রীরামচন্দ্র, কাল তাঁহাকে সেই সজ্জায় জাহাঙ্গীর এবং পরশু সেই মূর্তিকেই সেইভাবে যশোবন্ত দেখিলাম…।" —পৃ. ২৭, কলাবিদ্যার বিপর্যয়—মনোমোহন গোস্বামী, নাট্যমন্দির, শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩১৯।

৪৭. সাক্ষাৎকার : হরীন্দ্রনাথ দত্ত, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৪৮. সাক্ষাৎকার : সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৪৯. সাক্ষাৎকার : হরীন্দ্রনাথ দত্ত, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৫০. "আজকাল নাট্যশালায় যে রীতিতে গান গাওয়া হয় তাহা বড়ই অপ্রীতিকর। কি সমবেত গান, কি একক গান কিছুই স্পষ্ট করিয়া গাওয়াইবার দিকে সঙ্গীতাচার্য্যগনের দৃষ্টি থাকে না।...গায়িকার বাণীশুদ্ধির দিকে আদৌ তাঁহাদের দৃষ্টি নাই।" —পৃ. ৭৫, বঙ্গীয় নাট্যশালা—ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা,

৫১. "তাঁহাদের পদভারে স্টেজ কম্পিত ও শব্দিত হইতে থাকে, রঙ্গস্থল ধূলায় অন্ধকার হইয়া ওঠে, এমন কি পূজার দালানে আরতির সময়ের ধূনার ন্যায় ফুটলাইটের আলো ঢাকিয়া ফেলে। অনেক সময় সম্মুখের আসনে ধূলার জন্য বসা দায় হয়।" —পৃ. ৭০, বঙ্গীয় নাট্যশালা—ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা,

৫২. "কত প্রকার নৃত্য ইতিপূর্বে চলিয়া আসিতেছিল, নেপেনের নৃত্যের প্রথা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। ...নেপেনের উদ্যমে...প্রতিবারই কোন না কোন নূতন ঢং দর্শক দেখিতে পাইতেন।" —রঙ্গালয়ে নেপেন—গিরিশচন্দ্র ঘোষ,

৫৩. "তাঁর বিশেষনই ছিল 'নৃত্যগীত পটীয়সী।" —পৃ. ৩৫২৩, মিনার্ভার মনি কুসুমকুমারী—হরীন্দ্রনাথ দত্ত। অভিনয় পত্রিকা (শারদ সংকলন) অক্টোবর, ১৯৭৮, সম্পাদক—দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫৪. "কুসুম কিন্তু নাচত খুব ভালো। শেষের দিকে দেখেছি ঐ অতবড় শরীরটা নাড়ছে কিন্তু পা ফেলার আওয়াজ হচ্ছে না মোটে।"—পৃঃ-১২১। শিশির সান্নিধ্যে—রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু। প্রথম প্রকাশ, কলিকাতা।

৫৫. "শ্রীমতী কুসুমকুমারীর নৃত্য শিক্ষা কৌশল দর্শনে প্রীত হইয়া গিরিশচন্দ্র এই গীতিনাট্যের দ্বিতীয়াভিনয় রজনীতে কুসুমকুমারীকে একখানি স্বর্ণপদক দান করেন।"—পৃঃ-৩৩১, গিরিশচন্দ্র—অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা,

৫৬. "অতিশয় অসহনীয় ছিল তখনকার ঐক্যতানের ভয়াবহ উপদ্রব। একেবারে জলো হয়ে যেত নাটকের সমস্ত ঘনীভূত রস।"—পৃঃ-২৫, বাঙ্গলা রঙ্গালয় ও শিশির কুমার—হেমেন্দ্রকুমার রায়, কলিকাতা

৫৭. "একটি টিনের ওপর কতকগুলি লোহার অথবা গোল পাথরের নুড়ির সাহায্যে গড়িয়ে গড়িয়ে মেঘের ডাক সৃষ্টি করা হোত।"—পৃঃ ১৩৫, একশো বছরের নাট্য প্রসঙ্গ—দেবনারায়ণ গুপ্ত, কলিকাতা,

৫৮. সাক্ষাৎকার ঃ হরীন্দ্রনাথ দত্ত, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৫৯, "দায়ে পড়ে out of sheer necessity. যখন মাইকেল, বঙ্কিম প্রায় dramatised করা শেষ হলো, স্টেজে আর কোনও অভিনয়োপযোগী নাটক মিলল না তখন বাধ্য হয়ে নাটক রচনা করতে হলো।" পৃষ্ঠা—৩২৬ গিরিশচন্দ্রের স্মৃতি—কুমুদবন্ধু সেন। বঙ্গবাণী, ৫ম বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৩৩, কলিকাতা।

৬০. "In Girish Chandra the old yatra and the new Theatre Combined to produce a marvellous effect."—P-138, Indian stage (Vol. 1)—Hemendranath Dasgupta, Calcutta, 1934.

৬১. বাংলাদেশে একমাত্র গিরিশচন্দ্র···ছাড়া রঙ্গমঞ্চের ভেতরদিককার অভিজ্ঞতা বিশেষ কোন নাট্যকারের নেই।" পৃষ্ঠা—৮ক, রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ—শিশিরকুমার ভাদুড়ী। গল্পভারতী (বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ সংখ্যা) ফাল্গুন সম্পাদক—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

৬২. "ছন্দোবন্ধেই আমরা কথা কহি, সুতরাং ছন্দোবন্ধই স্বাভাবিক। সুরে আমরা ভাব প্রকাশ করি। অতএব সুরই স্বাভাবিক।" অভিনয় ও অভিনেতা—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্চনা পত্রিকা, আষাঢ়-শ্রাবণ (ষষ্ঠ বর্ষ) ১৩১৫, কলিকাতা।

৬৩. "···কেবল ভূমিকা বুঝিয়া নয়, কেবল মানসিক ধ্যানে নয়, ধ্যানস্থ ছবি দেহে পরিণত করিয়া অভিনেতাকে অভিনয় করিতে হয়।" —বহুমখী বিদ্যা —গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নাট্যমন্দির, ১ম বর্ষ, পৌষ ১৩১৭, কলিকাতা।

৬৪, গিরিশচন্দ্র আক্ষেপ করিয়া বলিতেন—"সবটুকু গ্রহণ করা সকলের শক্তিতে কুলোয় না। তাই আমাকে কে কতটুকু ধারণাক্ষম সে কথা ভেবে নিয়ে তবে শিক্ষা দিতে হয়"। পৃষ্ঠা—২৬, গিরিশচন্দ্র—কিরণচন্দ্র দত্ত, কলিকাতা, ১৯৫৪।

৬৫. "গিরিশবাবু মহাশয়ের শিক্ষা ও সতত নানারূপ সৎ উপদেশ শুনিয়া যখন স্টেজে অভিনয়ের জন্য দাঁড়াতাম, তখন আমার মনে হইত না যে আমি অন্য কেহ। আমি যে চরিত্র লইয়াছি, আমি যেন নিজেই সেই চরিত্র।" পৃষ্ঠা—২৫৫, অভিনেত্রীর আত্মকথা—বিনোদিনী দাসী। নাট্যমন্দির, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩১৭।

৬৬. "নটগুরু গিরিশচন্দ্রই মহলা দেওয়াতেন এবং প্রায়শঃ তাঁহার শিষ্য, সহকর্মী এবং বন্ধু অমৃত[illegible] যে কেহ উপস্থিত থাকিতেন, তাঁকেই ওহে অমৃত

বল বল বলে স্বয়ং নিবৃত্ত হতেন।" পৃষ্ঠা—৫, মহলা—হীরালাল দত্ত, নাচঘর, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২৯শ সংখ্যা।

৬৭. "কাহারও মৌলিকতা নষ্ট করিয়া কেবলমাত্র অনুকরণ পটু করিতে তিনি চাহিতেন না।" পৃষ্ঠা—৪২৩, গিরিশচন্দ্র—অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা,

৬৮. "গলায় খুব জোর ছিল...সুর নিক্ষেপের কায়দা তিনি এমন চমৎকার রূপে আয়ত্ত করেছিলেন যে অসাধারণভাবে কথা কইলেও গ্যালারির শেষ সারির শ্রোতাদের কাছে বাণী প্রেরণ করতে পারতেন।" পৃষ্ঠা—৩, গিরিশচন্দ্র—হেমেন্দ্রকুমার রায়। নাচঘর, ২৩শ সংখ্যা, ১৪ই কার্তিক, ১৩৩১।

৬৯. "গিরিশবাবুর উচ্চারণ মোটামুটি ভালই ছিল। দু-একটা উচ্চারণের ভুল এখন মনে আছে। একটা হোল মুন্ত্রী। মন্ত্রী উনি কিছুতেই বলতে পারতেন না, বলতেন মুন্ত্রী। আর একটা হোল কুহুক।..." পৃষ্ঠা—১৪৩, গিরিশ সান্নিধ্যে—দেবকুমার বসু ও রবি মিত্র, কলিকাতা, ১৩৭০।

৭০. "তিনি যখন কোন ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন, তখন সে ভূমিকার ছবি দর্শকের মনের কষ্টিপাথরে একেবারে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হইয়া যাইত।" পৃষ্ঠা—১৬, গিরিশচন্দ্রের অভিনয় প্রতিভা—প্রকাশচন্দ্র গুপ্ত, বঙ্গদর্শন (সম্পাদক অমরেন্দ্রনাথ রায়) ৯ই পৌষ, ১৩৩২।

৭১. "পোষাক পরিবর্তনের পর সিরাজের উদ্দেশ্যে সিংহাসনকে গিরিশবাবু যখন তিনবার কুর্নিশ করতেন, সে নির্বাক অভিনয়ে কোন দর্শকই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।" পৃষ্ঠা—১৮৭, ভারতীয় নাট্যমঞ্চ—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (২য় খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৪৭।

৭২. "যাহা প্রকৃত ভাবাভিনয়...যে অভিনয়ে মস্তিষ্ক ও হৃদয় উভয়ের চালনা হয় ...তিনি এদেশীয় রঙ্গমঞ্চে সেইরূপ অভিনয়ের প্রবর্তন করেন।" পৃষ্ঠা-২৪, গিরিশচন্দ্র—কিরণচন্দ্র দত্ত, কলিকাতা, ১৯৫৪।

৭৩. পৃষ্ঠা—২৮, আমায় কথা ও আমার দেখা থিয়েটারী অভিনেতা—সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বদেশ (বিনোদন সংখ্যা), কলিকাতা.

৭৪. "ঔরংজেবের ভূমিকায় কেবলমাত্র চোখ, মুখ ও কণ্ঠস্বরের দ্বারা গিরিশচন্দ্র উপবিষ্ট অবস্থায় যে অভিনয় কৌশল দেখাতেন তা অতুলনীয় এবং আদর্শ স্থান হবার যোগ্য।" পৃষ্ঠা—৫, গিরিশচন্দ্র—হেমেন্দ্রকুমার রায়। নাচঘর। ১৪ই কার্তিক (২৩শ সংখ্যা), ১৩৩১।

৭৫. "যে দৃশ্যে হিরন্ময়ী পুকুরে ডুবিয়া মরে সেই দৃশ্যে তাহার মৃতদেহ দেখিয়া গিরিশচন্দ্র যখন এই কথা বলিতেন "এই যে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে।

তাই তো বলি আমার শান্ত মেয়ে রাস্তায় যাবে না।" তখন তাঁহার চোখে জল কোথায়; দেহের সমস্ত রস যেন শুকাইয়া গিয়াছে, শোণিত প্রবাহ স্তব্ধ, নিষ্পলক নেত্রে জমাটবাঁধা মেঘ, কণ্ঠস্বর শুষ্ক, ভগ্ন, গভীর। এ চিত্র দেখিয়া দর্শকের অন্তরের অন্তর হইতে কে যেন হাহাকার করিয়া উঠিত।" পৃষ্ঠা-৫৬, রঙ্গালয়ে ত্রিশ বছর—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা,

৭৭. "যেখানে আত্মহত্যায় উদ্যত করুণাময় শূন্যে হাত বাড়িয়ে গলায় দেবার দড়ি খুঁজছে, গিরিশবাবুর সেখানকার অভিনয়ের তুলনা হয় না।" পৃ-৩৬ বাংলা থিয়েটারে অভিনয়—শঙ্কর ভট্টাচার্য, কলিকাতা।

৭৭. পৃষ্ঠা—৬, গিরিশচন্দ্রের অভিনয় প্রসঙ্গ—অমৃতলাল বসু, নাট্যপ্রতিভা।

৭৮. (ক) "···The acting is worthy of the story. Babu Girish chandra Ghose; the talented author of the play, plays the part of Karunamoy, to perfection···"

Indian Nation—14th August, 1905.

(খ) "Karunamoy was personated by old Girishchandra himself and he played to perfection. The quiet and subdued manner of his acting was highly touching and from start to finish he well sustained his part. Korunamoy's last address to his dead daughter was full of pathos and the whole audience wept with him······"

—The Hindu Patriot, 12th August, 1905.

৭৯. "সমস্ত চরিত্রগুলি মনে মনে বিশ্লেষণ করিতেন···যে ভাবটা তাঁহার মনঃপূত হইত তিনি সেইভাবে সে চরিত্রটি শিক্ষা দিতেন।"—পৃ ৭১, অর্দ্ধেন্দুশেখর—উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, কলিকাতা, ১৩২৭।

৮০. পৃ ১৬২, 'গিরিশ অর্দ্ধেন্দু যুগের অভিনয় রীতি,—ডঃ অজিত কুমার ঘোষ, শারদীয়া অভিযান—

৮১. "তিনি কাহাকেও শিখাইবার পূর্বে তাহার উক্তির মর্ম্ম সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন। আবশ্যক হইলে চরিত্রের মানসিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন।"—পৃ ২১১, অর্দ্ধেন্দু কথা—ললিতচন্দ্র মিত্র। মানসী ও মর্ম্মবানী, কার্তিক ১৩২৭, ১২শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা।

৮২. "কলের পুতুলের মত একস্থানে গজপীর হইয়া দাঁড়াইয়া অভিনয় করাকে তিনি পছন্দ করিতেন না"—পৃ ১১৪, শিক্ষাদানে অর্দ্ধেন্দু—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রূপ ও রঙ্গ। ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩১।

৮৩. "অর্ধেন্দুবাবুর শিক্ষাদান কৌশলে প্রথম বুঝি, আমরা রঙ্গালয়ে হাত পা ছুঁড়িয়া, চীৎকার করিয়া যে অভিনয় করি তাহার একটা ব্যাকরণ আছে, একটা শাসন আছে, একটা সংযম আছে...।" পৃ. ১। স্বর্গীয় অর্ধেন্দুশেখরের নটজীবন—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কলিকাতা। (১৭ নং নন্দ কুমার চৌধুরী দ্বিতীয় লেন, কলিকাতা,)—শ্রী শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত। প্রকাশকাল-নাই।

৮৪, "কোন নাটকে একাই যখন তিন চারটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন তখন তাঁর কন্ঠস্বরের মধ্যেও তিনচার রকমের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেত"—পৃ. ১৬৪, সাজঘর। মাঘ ১৩৬৭।

৮৫. "বাঙ্গলার বিভিন্ন প্রদেশের উচ্চারণ বৈচিত্র্য তাঁহার সম্পূর্ণ অধিগত ছিল। বর্ধমান হইতে চট্টগ্রাম, মৈমনসিংহ হইতে মেদিনীপুর কোথাকারও কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না।"—পৃ. ১২৩। বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী—উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। ১৩২৬, কলিকাতা।

৮৬. "অর্ধেন্দুবাবুর অভিনয় যা দেখেছি...তাতে...আমার মনে গোটা কয়েক মূর্তিই সাজান আছে। সেটা কি তাঁর প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক ভঙ্গী, সূক্ষ্মতম ভাব পরিবর্তনের আদেশবাহী ছিল বলেই? যদি তাই হয় তবে তিনিই আমাদের শুদ্ধ অভিনেতা এবং তাঁর অভিনয় নৃত্যাঙ্গের"—পৃ. ৩৩৯। অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয় ক্ষমতা প্রসঙ্গে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পরিচয় পত্রিকা। বৈশাখ, ১৩৪৯।

৮৭. "অভিনেতা আছে দুইরকম। এক যিনি নিজের ভূমিকার মধ্যে তন্ময় হয়ে ডুবে যান। আর এক যিনি থাকেন সচেতন, ভূমিকার মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে ডুবিয়ে দিতে চান না। ...দ্বিতীয় দলে দেখি অর্ধেন্দুশেখর।" পৃ. ৮২। যাঁদের দেখেছি। হেমেন্দ্রকুমার রায়। কলিকাতা ১৩৬১।

৮৮. MINERVA THEATRE

6, Bedon Street

Saturday, the 9th December at 9 p.m.

The Thirteenth grand performence of Girish Chandra Ghose's New Historical Drama.

SIRAJ-UD-DOWLA

* * *

Babu Ardhendu S. Mustafee will appear in five different Characters :—

Suokutjung, Meer Kasem, Mr. Drake,
Mr. Serafton, Mushla.
—Amrita Bazar Patrika, 9th Dec. 1905.

৮৯. "গিরিশচন্দ্রের মীরকাসিম নাটকে মেজর অ্যাডামস্-এর ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দু শেখরের অভিনয়ে তখনকার ইংরাজ দর্প মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল।" সচিত্র শিশির—চৈত্র, ১৩৬৩।

৯০. "অর্দ্ধেন্দুবাবু হাসির ফোয়ারা ছুটাইতেন। তাঁহার ভাবভঙ্গী, পোষাক-পরিচ্ছদ, সুর—লয় সব জিনিসেই হাস্যরস···ফুটিয়া পড়িত।" পৃ. ২০১। অর্দ্ধেন্দু কথা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। মানসী ও মর্মবানী, কার্তিক, ১৩২৭।

৯১. "বঙ্গীয় নাট্যশালার নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী"—গিরিশ চন্দ্র ঘোষ। ১০ই আশ্বিন, ১৩২৫। মিনার্ভা থিয়েটার হইতে মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক।

৯২. "রবিবাবু, অবনীবাবু, ঠাকুরবাড়ীর মতে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা —'এমনটি আর হয় না' কবি বলতেন।" পৃ. ১০৫, মনে এলো, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৩৬৩।

৯৩. "তাঁর মত সুপুরুষ ও দর্শকদের নয়নরঞ্জক নায়ক সেই সময়ে আর কেউ ছিলেন না।" —পৃ. ২৩৪। চিরনায়ক অমরেন্দ্রনাথ—ডঃ অজিত ঘোষ। রবীন্দ্র ভারতী পত্রিকা। বর্ষ ১৫। সংখ্যা ৩।

৯৪. "কণ্ঠের flow ছিল ভরা গঙ্গার মতন। যাকে জোয়ারী বলে।······আরো ছিল গমক, মীড়। অর্থাৎ ধ্রুপদী Recitation··· ।" অমরেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটি থেকে হরীন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত পত্রের অংশবিশেষ। —পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৯৫. "···Babu A. H. Dutta, who undertakes the hero's role, (Raghubir) lives it with every fibre of his being. He does not spares his brains nor his lung either. In the softer moments however, he is as cool as ice itself. In the struggle between the Brahmin and the Bhil in the character, the player shows himself in one of his most brilliant moods···" —Indian Mirror, 15. 11. 1903.

৯৬. "তিনি দর্শকদিগকে যেমন কাঁদাতে পারিতেন, তেমনি হাসাইতেও পারিতেন।"—পৃ. ৯০। অমরেন্দ্রনাথ—উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। ১লা মাঘ, কলিকাতা, ১৩২৬।

৯৭. "এই বিষয়ে তিনি গিরিশচন্দ্রকে অনেকটা অতিক্রম করে গেছেন। গিরিশচন্দ্র খ্যাতিমান নাট্যপ্রযোজক হলেও এই সকল খুঁটিনাটি বিষয়ে অনেক সময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করেননি।" —পৃ. ১০৯। বাংলা নাট্যবিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র—অহীন্দ্র চৌধুরী, কলিকাতা, ১৩৬৫।

৯৮. "নিজে অবতীর্ণ হইলেন তরুণ 'নিতাই'-এর ভূমিকায়। যেমন তাঁহার অভিনয়ের সুখ্যাতি, তেমনই নাটকের জনপ্রিয়তা। কথায় কথায় মুদ্রাদোষ 'ইজ্ দি' বলা শহরে বেশ আন্দোলন জাগিয়েছিল।" —পৃ. ৮৬। অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য—ডঃ অরুণকুমার মিত্র। কলিকাতা. ১৯৭০।

৯৯. "পুত্র একজন Comic Actor হইবে ইহা গিরিশচন্দ্র পছন্দ করিলেন না। তাহার পর হইতে গিরিশচন্দ্র নিজে পুত্রের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন ও গুরু গম্ভীর ভূমিকার অভিনয়ে দানীবাবুকে তৈরী করতে থাকেন।" —পৃ. ১১৪। শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার—মণি বাগচী। কলিকাতা, ১৯৬০।

১০০. "চোখের চাহনী, অঙ্গভঙ্গী ও ভাবাভিব্যক্তিতে তিনি গুরুকেও অতিক্রম করিয়া উঠিলেন।" —পৃ. ৩৪। বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও দানীবাবু—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কলিকাতা, ১৩৪৪।

১০১. "দানীবাবুর চাণক্য…একটা নিষ্ঠুর কঠোর প্রতিহিংসা পরায়ণ কূট চরিত্রের লোক বলে মনে হোত। মেয়ে পাবার দৃশ্যে উদ্দাম সেণ্টিমেণ্টের বন্যায় তিনি দর্শকদের আকুল হয়ে তাঁর সঙ্গে কাঁদতে বাধ্য করতেন।" —পৃ. ৮৪। নাটক ও নাট্য আন্দোলন—গঙ্গাপদ বসু। কলিকাতা, ১৩৭৮।

১০২. "দেখ দানীবাবু ভেবেছিলুম যে তোমাকে কিছু শেখাতে পারি। কিন্তু তোমার যে পরিচয় পেলুম তাতে এইমাত্র বলতে পারি যে তুমি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা কোর।" —পৃ. ২৭। রঙ্গমঞ্চের রূপতৃষ্ণা—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা, ১৩৬৮।

১০৩. "স্বীয় পিতা গিরিশবাবুর শিক্ষাতেও তাঁহার এই সর্বত্র করুণ (যেন কান্নার মত) সুরে অভিনয়ের ঢঙ বদলায় নাই।" —পৃ. ২৬৪, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও বাংলা থিয়েটা—শঙ্কর ভট্টাচার্য্য।

১০৪. "তারা সুন্দরীর…সুগম্ভীর কণ্ঠস্বর ছিল। …অথচ পুরুষালী নয়।" —পৃ. ১১০। মনে এলো—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা। ১৩৬৩।

১০৫. "তারাসুন্দরীর আর্টের মধ্যে আমরা লাভ করতুম আন্তরিকতার সঙ্গে পরিকল্পনা ও ক্রিয়াশীল মনীষার প্রভাব।" —পৃ. ১৪২। যাঁদের দেখেছি —হেমেন্দ্রকুমার রায়, কলিকাতা, ১৩৬১।

১০৬. "রিজিয়া আরম্ভ হল। শুরু হতেই সকলে অবাক হয়ে গেল। এমন অভিনয় কেউ কল্পনা করেনি। প্রথম দৃশ্য হতেই দর্শকরা যে রিজিয়ার ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয়ে পড়েছে তা লক্ষ্য করে গিরিশচন্দ্র নাকি বসতে পারেননি, উঠে গিয়েছিলেন, অসূয়াতে নয়, বাজী হেরে যাবার লজ্জায়।" —পৃ. ৭০, অথ নট ঘটিত—সূত্রধর, কলিকাতা, ১৩৬৭।

১০৭. "রাণা প্রতাপ নাটকে···মেহেরউন্নিসার ভূমিকার অভিনয় কত সুন্দর ও কত স্বাভাবিক হইয়াছিল তাহা যিনি না দেখিয়াছেন তাহাকে বুঝান কঠিন। ···'বসিয়া বিজন বনে'—এই প্রথম গানেই তিনি দর্শকগণকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন···।" —পৃ. ৮৮৫। সুশীলাবালা—যতীন্দ্রনাথ পাল। রঙ্গমঞ্চ—২য় বর্ষ, ২৮শ সপ্তাহ, ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২।

॥ পরিশিষ্ট ॥

(ক) ১৯০০—১৯২০ পর্যন্ত থিয়েটারের প্রচার বৈশিষ্ট্য

রঙ্গমঞ্চের ব্যবসায়িক প্রয়োজন সাধনের জন্য নাটক ও নাট্য প্রযোজনার প্রতি দর্শকের আকর্ষণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট মঞ্চাধ্যক্ষ বা নাট্যপ্রযোজক বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে নাটকের প্রচারের ব্যবস্থা করতেন। কখনো তাঁরা নতুন নাট্য প্রযোজনা বিষয়ে দৈনিক পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতেন আবার কখনো কখনো এ বিষয়ে সুদৃশ্য ও রঙিন হ্যান্ডবিল রচনা করে তা জনসাধারণের মধ্যে বিলি করতেন। বিশিষ্ট রীতিতে এ সকল বিজ্ঞাপন ও হ্যান্ডবিলের বিষয়বস্তু রচনা করা হোত। কয়েকটি দৃষ্টান্তযোগে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

দৈনিক পত্রিকায় প্রদর্শিত নাটকের বিজ্ঞাপন দেওয়া হোত। নাটকের মূল বিষয়বস্তুর প্রতি ঐ বিজ্ঞাপনে আলোকপাত করা হোত। সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে নাটক রচিত হলে, বিজ্ঞাপনে ঐ সমস্যার ভয়াবহ পরিণামের উল্লেখ করা হোত। এইভাবে বিজ্ঞাপনের বিশেষ পরিকাঠামোর বিন্যাসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নাটক দেখার জন্য দর্শকের মনে আগ্রহ ও উদ্দীপনাকে বাড়িয়ে তোলা হোত। নাটক দেখার প্রতি আগ্রহকে জাগিয়ে তোলা হোত। যেমন ঃ—

Grand Success   Sensational Tragedy

MINERVA THEATER

Saturday the 15th April at 9 p.m.

The Second Grand Performance of Babu G.C.

Ghose's New Grime Tragedy

BALIDAN

— — — —

In which the Master Artist has attempted to point in dark and gruesome colours the evil effects of the commercial transaction which now goes as under the sacred name of

MARRIAGE

Karunamaya·············Babu G. C. Ghose.

(The Author himself)

Rupchand ···   ···Mr. A. Mustaphi

Vivid representation of a genuine Drama

by really veteran Artists.

—Statesman—April 15th, Saturday 1905.

দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটকে প্রধান চরিত্রের দেশপ্রেম, বীরত্ব এবং তাঁর শৌর্য্যের গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্যের কথা নাটকের বিজ্ঞাপনে তুলে ধরে একদিকে যেমন দেশবাসীর দেশপ্রেমকে উদ্দীপ্ত করে তোলা হোত তেমনি অপরদিকে নাটকের প্রতিও দর্শকের আকর্ষণ বৃদ্ধি করা হোত। যেমন ঃ—

MINERVA THEATER
6 Bedon Street

Director—Babu GIRISH CHANDRA GHOSH
Saturday—The 29th July at 9 p.m.
The Grand Opening performence of Mr. D. L. Roy's new Historical Drama

RANA PRATAP

— — —

The mighty prince the most distinguished seion of the most ancient familly in Hindustan who single handed, for more than a quarter of a century, withstood the combined efforts of the then most powerful empire in the world, at one time carrying destruction into the plains and at another, flying from rock to rock and feeding his family from the fruits of his native hills.

New Scenery—Splendid dresses suited to the .time and occasion.

We are not aware of a more illustrious personages in the history of the whole world nor could we have presented to our countrymen a brighter and nobler example than that of the life and exploits of the Rajput Prince whose whole career was one long and uninterupted struggle for the independence of his country.

—Statesman—Saturday, July 29th, 1905.

ইতিহাসের ঘটনাকে অবলম্বন করে ঐতিহাসিক নাটক রচিত হোত। সেক্ষেত্রে ঐতিহাসিক নাটকের নাট্যবৃত্ত রচনা এবং নাট্য-চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে নাট্যকার

ইতিহাস এর কাছে কতখানি দায়বদ্ধ থেকেছেন, অনৈতিহাসিক কোন ঘটনা নাটকে স্থান পেয়েছে কিনা—ইত্যাদি বিষয়ে ইতিহাসের প্রতি নাট্যকারের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার বিচার প্রসঙ্গে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দর্শকদের মতামতকে আহ্বান করা হোত। এর ফলে বিজ্ঞাপিত নাটকটি দেখার জন্য শিক্ষিত সমাজেও আলোড়ন পড়ত। যেমন ঃ—

Fourth Performance of Mirkasim.

A New Historical Drama

MINERVA THEATRE

6 Bedon Street

Proprietor—Babu Manomohan Pande.
Saturday, the 7th July at 9 p.m. Sharp.
The grand Fourth Performence of G. C. Ghose's highly admired new historical drama.

MIRKASIM

On a scale unprecedented in the annals of the Indian Stage.
MIRJAFAR—G. C. Ghosh (my humble self)
The year which followed the accession of Mirkasim to the Throne of Bengal form the most eventful stiring period in the history of our country. I have spared no pains to do full justice to the characters and achievements of the great personages who played such prominent parts on the political stage on the period. I leave it to my countrymen Hindus and Mussolmans to judge how far I have succeeded in my attempt.

—Hindu Patriot, Thursday, 5.7. 1906.

ঐতিহাসিক নাটকের প্রধান চরিত্র ও নাট্য-ঘটনার প্রতি দর্শকদের বিশেষ অনুরাগ সৃষ্টির জন্য ঐ নাটকের প্রধান চরিত্রের স্বদেশপ্রেম ও সংগ্রামশীলতা সম্পর্কে বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের মন্তব্য বিজ্ঞাপনে উদ্ধৃত করা হোত। এ প্রসঙ্গে Hindu Patriot পত্রিকায় 'মীরকাশিম" নাটকের বিজ্ঞাপনের কথা উল্লেখযোগ্য।

MINERVA THEATRE

6 Bedon Street

Proprietor—Babu Monomohan Pande.

Saturday, the 21st July at 9 p.m. sharp.

The sixth grand performance of G. C. Ghose's new historical drama.

MIRKASIM

On a scale unprecedented in the annals of the Indian Stage.

Mirjafar—Girish Chandra Ghose (my humble self)
In introducing this drama before the public, we can do no better than quote the following lines from the pen of that impartial and eminent historian—Colonel Marlesn : "The cheek of every honest Englishman burn in shame as he reads the account of the policy adopted by the leading men amongst this countrymen in India ; a hundred and twenty years ago towards the native Ruler··· only subsequent fault in this eyes was his endeavour to protest his subject from European extortion."

—Hindu Patriot, Saturday, July 21st, 1906.

স্বদেশাত্মক ঐতিহাসিক নাটকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে জাতীয় সংগ্রামশীলতার ঐতিহ্য ও গৌরবকে রক্ষা করার জন্য প্রধান চরিত্রের দীপ্ত প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে, কখনো বা ইংরেজদের রাজনৈতিক কূট চক্রান্তে দেশবরেণ্য চরিত্রের জীবনসংশয় সম্পর্কিত বিশেষ ঘটনার প্রতি আলোকপাত করে, এবং এ সকল চরিত্র ও ঘটনাকে বিশ্বাসযোগ্য ও প্রাণবন্ত করে ফুটিয়ে তোলার জন্য নাট্যপ্রযোজনায় আলো ও মঞ্চ ব্যবস্থার বিশেষ দিকের প্রসঙ্গ তুলে ধরে, নাটক ও নাট্য প্রযোজনা সম্পর্কে দর্শকের মনে নতুন আবেদনের সৃষ্টি করা হোত। যেমন ঃ—

(1) Saturday—the Second performence of Durgadas.

Proprietor—Babu Monomohan Pande.

Minerva Theatre.
6, Bedon Street
Saturday, the 15th December, at 9 p.m.
Sharp
The grand second performance of Mr. D.L.
Roy's new historical Drama.

DURGADAS
or
The Hero of Rajasthan.

Let those who deem the Hindu warriors void of patriotism listen to the simple chronicles of the Thirty year's war described with masterly skill in this beautiful Drama. Let them compare it with that of any other country and do justice to the magnanimons Rajput what a splendid example in the heroic Durgadas of all that constitutes the glory of the Rajput. Splendid scenery, Magnificient dressess ; Soul stirring songs and graceful Dances.

—Hindu Patriot, Dec. 13th Thursday, 1906.

(2) NANDA KUMAR NANDA KUMAR
Kherode Babu's New Drama

NANDA KUMAR !!!
STAR THEATRE

To night at 9 p.m. sharp.
The long Expected and Anxiously
Waited for Historical play

NANDA KUMAR

By Pundit Kherode Prosad Bidya Benode—M.A.
The life of Nanda Kumar, hls trial and execution fill such an interesting and eventful page in the

History of Bengal, that even after a lapse of more than a century and a quarter eminent scholars like the Jurist James Stephens and Judge Beveridge have employed their brain and pen to review in big volumes and subject which the eloquence of the Great Burke first made famous Through the World.

* * *

Patriotic Sentiments !

Throughout which runs a vein of occuetism. A gift in composition which is peculiarly Kherode Babu's own.

—Statesman, Saturday, August 21, 1907

(3) MINERVA THEATRE

6, Bedon Street

Saturday, the 14th September, at 9 p.m. Sharp.

The fifth grand performence of Babu G. C. Ghose's splendid patriotic Drama.

CHHATRAPATI

Sivaji—Amarendra Nath Dutta.

Chhatrapati is the history of the formation of a mighty nation by the Wonderful genius of a single soul. In the darkest days of every nation occasions will surely rise when the scenes painted with such masterly skill in this national Drama will find a responsive echo in the heart of every true lover of his country. It is no wonder, therefore that our performence has evoked such an Unbounded enthusiam and created such stirring sensation throughout the length and breadth of the leading daily and weekly papers of the town

should have considered it to be their duty to appreciate our humble efforts in highly flattering terms.

Bengalee—3. 9. 1907

নাটক প্রযোজনার আগে প্রযোজক বা নাট্যাধ্যক্ষ বিশেষ যত্নের সঙ্গে নাটকের মহলা পর্বের ব্যবস্থা করতেন। দর্শকদের সামনে নাটকটি উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে এই মহলার গুরুত্বকে কৌশলে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তুলে ধরা হোত। প্রদীপ জ্বালবার আগে সলতে পাকানোর কাজে তাঁদের আন্তরিকতার যে অভাব নেই, সে বিষয়ে দর্শক-মানসে একটি ইতিবাচক ধারণার সৃষ্টি করে নাটকটি দেখার জন্য অনেক আগে থেকেই দর্শকদের মানসিক প্রস্তুতিকে ধীরে ধীরে গড়ে তোলা হোত। যেমন ঃ—

SPECIAL ADVERTISEMENT
STAR THEATRE

Owing to speed the rehearsal of new plays and recast some of the old ones our wednesday performence will only be occasionally given for sometime of which regular advertisement will appear in proper time.

A. N. Dutta, Asst. Manager.

Amritalal Bose, Manager.

Hindu Patriot—20. 5. 1908.

প্রযোজিত নাটক সকল প্রকার দর্শকের মনে কিভাবে সাড়া জাগিয়েছে তার কথাও বিজ্ঞাপনে তুলে ধরা হোত। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নাট্যপ্রযোজনাকে সার্থক করে তোলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নাট্যাধ্যক্ষের নিরলস শিক্ষাদান ব্যবস্থা, নাট্যসংগীতের সুর রচনায় বিদগ্ধ সুরকারের অবদান, নৃত্যশিক্ষায় নৃত্যশিক্ষকের অনলস প্রচেষ্টা ইত্যাদির কথাও বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হোত। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নাটকটি দেখার জন্য দর্শকের মনে আকাঙ্খাকে জাগিয়ে তোলা এবং দর্শকের মনের সুপ্ত বাসনাকে ক্রিয়াশীল করার জন্যই নাটকের বিজ্ঞাপনকে এইভাবে সাজানো হোত। যেমন ঃ—

(1) MINERVA THEATRE
6, Bedon Street.

Saturday, the 11th April, at 9 p.m. sharp.
The fifth grand performence of Mr. D. L. Roy's sensational Drama.

NURJAHAN
or
The Light of the World.

A monument of historical grandeur. Artistically designed. Artistically executed and artistically finished. No Wonder, therefore that our performence of this powerful drama has taken the whole city as it were by storm. No Wonder, that it has become the one all engrossing topic of conversation through out the town and that the rich and the poor, the old and the young, the educated and the illiterate are alike anxious to witness the thrilling performence of which they have heard so much. A nation that can truly appreciate its drama is bound to progress.

A.N. Dutta	A.S. Mustafee	M.M. Pandey
Manager	Master	Propietor

—Hindu Patriot—10. 4. 1908.

(2) A memorable day—was last Saturday

The 15th August 1915

For, it made

Great Sensation In the Dramatic World !!

Ahalya Bai

GAINED THE VICTORY

A red letter day in the annals of the stage !!

গত শনিবার বঙ্গ নাট্যশালার এক স্মরণীয় দিন !!

নূতন নাটক অহল্যাবাঈ এর

আশাতীত সাফল্য ও সর্ব্ববাদীসম্মত সুখ্যাত কাহিনী নাট্যশালার

ইতিহাসে লোহিতাক্ষরে দেদীপ্যমান থাকিবে !!

ইহা আমাদের কথা নহে,

যাঁহারা গত শনিবার 'অহল্যাবাঈ' নাটকের অভিনয় দেখিয়াছেন, দেখিয়া বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়াছেন, প্রত্যেক দৃশ্যটি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত কণ্ঠে প্রাণের

অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, অভিনয় সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কৌতুহল কম্পোলিত অন্তরে চিত্রার্পিতের ন্যায় স্ব স্ব আসনে আসীন থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অভিনয়ান্তে যবনিকা পতনের সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র কণ্ঠে উন্মত্ত আবেগে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন—ইহা তাঁহাদেরি উক্তি—হৃদয়ের অভিব্যক্তি !! বিপুল জনসঙ্ঘের একবাক্যে এমন হৃদয়োন্মাদকারী প্রশংসাধ্বনী শ্রবণে আমরাও আনন্দে অভিভূত হইয়াছি—আমাদের আয়াস ও অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে দেখিয়া আমাদের হৃদয় আশা ও উৎসাহে উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। তাই আমরা উপসংহারে কেবল এই মাত্র বলিতেছি—

THE SUCCSS IS YOURS AND THE FAILURE IS OURS.

আমাদের গুরুস্থানীয় নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের দীর্ঘকাল-ব্যাপী এক নটোপযোগী পরিশ্রম ও শিক্ষাপ্রদানে যে নাটক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পূর্ণ নূতন বিধানে যে নাটকের গীত-সমূহে সুরসংযোগ করিয়া দিয়াছেন এবং সুপ্রসিদ্ধ নৃত্যশিক্ষক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু এবারে নৃত্য-শাস্ত্র মন্থন করিয়া নৃত্যকলার যে বিশেষত্ব, যে নূতনত্ব, যে অভিনবত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বঙ্গদেশের নাট্যশালায় এই প্রথম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নাটক 'অহল্যাবাই' এ অভিনয় নৃত্য-গীত ও পোষাক-পরিচ্ছদের নিখুঁত সমন্বয় সংঘটিত হইয়াছে কিনা—নাট্যামোদী দর্শকগণই তাহার সাক্ষী। আমাদের বলিবার কিছু নাই।

—থিয়েটার—৪ঠা ভাদ্র, ১৩২১

নাট্যপ্রয়োজনায় প্রদর্শিত দেশীয় অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় দক্ষতা যে পাশ্চাত্যের যে কোন প্রথম সারির অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় দক্ষতার সঙ্গে তুলনীয়—তার কথা দৈনিক পত্রিকায় প্রচারিত বিজ্ঞাপনে তুলে ধরা হোত এবং তার প্রতি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংশ্লিষ্ট নাটকের নাট্যাভিনয়ের প্রতি দর্শকদের কৌতুহল ও উৎসাহ বৃদ্ধি করা হোত এবং নাটকটি দেখার জন্য তাদের মধ্যে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করা হোত। যেমন ঃ—

MINERVA THEATRE

6, Beadon Street

Thursday, the 11th January at 8.30 p.m.

Special performence in aid of Sreemati

Tarasundari, the Divine Sarah of Bengal

1. SHAJAHAN
2. PAULINE
3. ROYAL BIOSCOPE

We have heard of the triumphant progress of Sarah Barnharde, we have heard of the stage Jubilee of Ellen Terry, and we hope confidently that Bengal will not lack behind, but will rise to the full height of the occasion and give her favourite actress a magnificient reception such as will be long remembered in the annals of our stage.

G. C. Ghose

—Indian Daily News, Thursday, January 11, 1912.

এ ছাড়া কখনো কখনো প্রযোজিত নাটকের নাট্যবৃত্ত রচনা, আবেগদীপ্ত নাট্যমুহূর্ত ও পরিবেশ সৃষ্টি, নাট্য সংলাপের উৎকর্ষ সাধন ইত্যাদি ব্যাপারে নাট্যকারের রচনাশক্তির পরিচয়ের উল্লেখসহ এ বিষয়ে তাঁর মনশীয়ানার পরিচয় বিজ্ঞাপনে তুলে ধরা হোত। এইভাবে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নাটক ও নাট্যকার সম্বন্ধে দর্শকদের জানবার আগ্রহ ও কৌতুহল সৃষ্টি করা হোত।

NEW PLAY ! NEW PLAY ! NEW PLAY !

Firsr Night ! Look up Please.
Magnificient change of
our
Saturday's Programme.
The first opening night of
Mr. D. L. Roy's sensational society
Play in Fine Acts entitled

PARA PAREY

PARAPAREY—a novelty. PARAPAREY—an originality
PAPAPAREY—a thing of Beauty

STAR THEATRE

Hony. Dramatic Director Sj. Amritalal Bose
Saturday the 17th Angust 1912 at 8.30 p.m.
the first perfermence of
Mr. D. L. Roy's New and Original Social Drama
in Fine Acts.

"Parapary" "Paraparay" "Papaparay"

Imgenious in Plot, Interestingly
Emotional in situation—Pure and Dramatic
in Diction—Rich in its tragic grandeur !!
Ah ! Come and see the old Grandsire.

... ...

—Indian Daily News—Friday, 16.8.1912

দৈনিক পত্র পত্রিকা ছাড়াও সুদৃশ্য হ্যাণ্ডবিলে নাটক সম্বন্ধে প্রচার করা হোত। হ্যাণ্ডবিল কখনো রঙিন কখনো বা সাদা কাগজে হোত। প্রচারের উদ্দেশ্যে ছোট ছোট হ্যাণ্ডবিল যেমন ছাড়া হোত তেমনি অনেক সময় বড় বড় হ্যাণ্ডবিল বিভিন্ন রঙের কালিতে লিখে এবং সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত করে নাট্যমঞ্চের সামনের রাস্তায় এবং শহরাঞ্চলের বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে, দেওয়ালে, প্রাচীরের গায়ে বা ল্যাম্পপোস্টে আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হোত। ঐ হ্যাণ্ডবিলে প্রদর্শিত নাটকের বস্তুরচনা, চরিত্র চিত্রণ ও নাট্যরস সৃষ্টিতে নাট্যকারের মুনশীয়ানার কথা সংক্ষিপ্ত অথচ গভীরভাবে লেখা থাকত। নাট্য প্রয়োজনায় আলো ও মঞ্চ-সজ্জার বিশেষত্বের উল্লেখসহ প্রযোজিত নাটকের কৃতিত্ব প্রসঙ্গে পত্র-পত্রিকার মন্তব্য তুলে ধরা হোত। এইভাবে হ্যাণ্ডবিলের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট নাটক ও তার প্রযোজনা সম্পর্কে দর্শকের মনে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করা হোত। এর ফলে নাটক দেখার জন্য দর্শকের মধ্যে সুতীব্র বাসনার (wish) সৃষ্টি হোত। রঙ্গমঞ্চ দর্শকে-পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। এ বিষয়ে নিম্নে একাধিক হ্যাণ্ডবিলের দৃষ্টান্ত দেওয়া হোল।

(১) নাট্যজগতের একচ্ছত্র সম্রাট শ্রী গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখনীপ্রসূত

পঞ্চাঙ্ক নূতন নাটক।

শঙ্করাচার্য্য ঃ শঙ্করাচার্য্য ঃ শঙ্করাচার্য্য ঃ শঙ্করাচার্য্য ঃ

নিজেদের কথায় কিছু বলিতে চাহি না

বাঙ্গলার মুখপাত্র 'বঙ্গবাসী' কি বলিতেছেন ঃ—

অধুনা গিরিশচন্দ্র শঙ্করাচার্য্যের চরিত্র চিত্র অঙ্কিত করিয়া নতুন নাট্যকাব্য রচনা করিয়াছেন। কলিকাতার বিখ্যাত মিনার্ভা নাট্যমঞ্চে তাহার অভিনয় হইতেছে।

যিনি জ্ঞানযোগী শঙ্করাচার্য্যের চরিত্রাবলম্বনে নাট্য রচনা করিতে পারেন আর সেই নাট্যরচনার অভিনয়ে যিনি বঙ্গের লক্ষ লক্ষ লোককে মুগ্ধোন্মত্ত করিয়া তুলিতে পারেন ধন্য তাঁহার লেখনী। জ্ঞানযোগীর জ্ঞান কথা সাধারণে কয়জনে বুঝিতে পারে?—কিন্তু গিরিশবাবু সে সব জ্ঞান কথার যেরূপ সহজ বিশ্লেষণ

করিয়াছেন তাহা সাধারণে বোধগম্য হইয়াছে। তাই শত সহস্র অভিনয়দর্শী চিত্রার্পিতার ন্যায় বসিয়া অভিনয় সৌন্দর্য্যের সুখোপভোগ করিয়া থাকেন।

যিনি এমন জ্ঞানী চরিত্র এমন করিয়া ফুটাইতে পারেন, আর যিনি অভিনয়ে সে চরিত্রের পূর্ণবিকাশ করিতে পারেন, তিনি সমগ্র বঙ্গবাসীর ধন্যবাদ পাত্র নহে কি?

ইতিহাসে শঙ্কর চরিত্রের বৈচিত্র্য কোথায়?

কিন্তু গিরিশচন্দ্র নানাচরিত্রের সৃষ্টি করিয়া, প্রাসঙ্গিক ক্রমে নাট্যকাব্যের যেরূপ বৈচিত্র্য সাধন করিয়াছেন, তাহা তিনি ভিন্ন আর কেহ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ।

বৌদ্ধতান্ত্রিক কাপালিকের দুষ্কৃতি চিত্র এ নাটকে যেমন প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহা বোধহয় আর কোন নাট্যকাব্যে হয় নাই। নাটকে নব রস দরকার। শঙ্করাচার্য্যের মাতা বিশিষ্টার করুণচিত্ত মর্ম্মে মর্ম্মে অঙ্কিত হইয়া যায়। শঙ্করাচার্য্যের কৃষক ভৃত্য মমতার সাকার সৃষ্টি। মহামায়ার মহাচিত্রে নাট্য-কাব্য সৌন্দর্য্যের পূর্ণোচ্ছ্বাস। গীতিভাবের প্রস্রবণ খুলিয়া দিয়া উচ্ছ্বাসে প্রাণকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়।

কত চরিত্রের কথা, রসের কথা, কত বলিব?

যেমন চরিত্র বৈচিত্র্য, তেমনই দৃশ্যবৈচিত্র্য। তাহার উপর নৃত্য গীতের নূতনত্ব। তাই প্রতি সপ্তাহে শত শত লোক স্থানাভাবে ফিরিয়া যায়।

দৃশ্য পটের মধ্যে এমন অনেক দৃশ্য আছে যে, তাহা আর দেখি নাই বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। নর্ম্মদার জলে পদ্ম প্রস্ফুটিত, আর সেই পদ্মের উপর দিয়া শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য সনন্দন আসিল। পূর্ণতোয়া নর্ম্মদা। শঙ্কর নর্ম্মদার জল কমণ্ডলুতে পুরিয়া ফেলিলেন। জল নাই। নদীর জীবিত মৎস্যাদি লাফাইয়া উঠিল। আবার শঙ্কর জল ছাড়িয়া দিলেন। কল কল শব্দে জল বাহিল। আহা কি অপূর্ব সে দৃশ্য।

অভিনয় সুন্দর। একবার মিনার্ভায় অভিনয় দেখিয়া এস।

—(শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত)—

(২) নূতন ঐতিহাসিক নাটক

রানী—

দুর্গাবতী—

দুর্গাবতী শুধু রাজস্থানের নয়,

দুর্গাবতী সমস্ত ভারতবর্ষের আদর্শ, আসুন আজ এই

শুভ রজনীতে সে আদর্শ

কতদূর তাহা প্রত্যক্ষ করুণ।

গিরিশিখরবাহী গম্ভীরনদী জলপ্রপাত ?
এতকাল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চ যে দৃশ্যপ্রদর্শন সম্ভব বলিয়া ধারণ করেন নাই
তাহা আমরা সর্ব্ব সমক্ষে
উপস্থাপিত করিয়া যুগান্তরের সূচনা করিব। আরাবল্লীর অত্যুচ্চশিখরমালায়
দণ্ডায়মান চারণগণের পদধৌত
করি ভীম কল্লোল জলপ্রপাত উচ্চতম শিখর হইতে গিরিশপদমুখে ধাবিত
হইবে।
এ জলপ্রপাতের জলরাশি রঙ্গমঞ্চে অলীক জল নহে—
প্রকৃত জলের বেগে গম্ভীর নিনাদ উত্থিত হইয়া রঙ্গমঞ্চ প্রতিধ্বনিত করিবে।
এতদ্ভিন্ন নর্ম্মদা বক্ষে যে সমুদয়—
অদ্ভুত হৃৎস্পন্দী দৃশ্যের সমাবেশ হইয়াছে তাহার বর্ণনা এ সংকীর্ণ স্থানে
অসম্ভব।

দুর্গাবতী নাটকে কে কোন অংশ লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবেন দেখুন।
বজ বাহাদুর—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মিত্র ঃ জগন্নাথ-শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল
আমেদান- ,, কালীপ্রসন্ন দাস ঃ দুর্জন- ,, অটলবিহারী দাস
মতিবিবি—শ্রীমতী ভূষণ কুমারী ঃ দুর্গাবতী-শ্রীমতী প্রমদা সুন্দরী
বীরনারায়ণ-শ্রীমতী চারুবালা—ইত্যাদি। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

কুসুমিকা প্রেস এস. কে. রায়
৮০নং বিডন স্ট্রীট প্রোপ্রাইটর

—(শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত)—

(৩) শ্রী শ্রী দুর্গা সহায়।

নূতন নাটক! বারানসী নূতন নাটক!

কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহ, বরেণ্য অভিজাতবর্গ, পদস্থ সুধীবৃন্দ, জনসাধারণ
এবং মাননীয়া
মহিলাগণ যে নাটকেব অভিনয়দর্শণ করিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন, বকস হইতে গ্যালারী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র একবাক্যে যে নাটকের প্রশংসা ঘোষিত হইয়াছে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজে যে নাটক সমভাবে সমাদৃত হইয়াছে সেই নাটকের সহিত এ সপ্তাহে আবার অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার।

'বারানসীর' সহিত 'সাজাহান'।
ষ্টার থিয়েটার
Telephone no 1139
নাট্যাচার্য্য—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ঃ
শনিবার ১৪ই আশ্বিন, ১৩২৩, রাত্রি ৮।। টায়

শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ঘটনাসংকুল পঞ্চাঙ্ক দেব নাটক।

বারানসী

মহাদেব—মিঃ পালিত (এ্যামেচার) উমা—শ্রীযুক্ত কুসুম কুমারী
দিবোদাস—শ্রী কুঞ্জলাল চক্রবর্তী নিকুম্ভ—শ্রী প্রবোধচন্দ্র বসু
গিরিরাজ—শ্রী হীরালাল দত্ত ভক্তি—আশ্চর্যময়ী
লীলাবতী—মৃণালিনী মায়া—নারায়নী

হীরাবতী—চারুবালা

দীপাবলী তেজে উজ্জ্বলিত রঙ্গপীঠে সহস্র সহস্র দর্শকের চক্ষুর উপর অবিমুক্তেশ্বরের বিপুল মূর্ত্তির অদ্ভুত পরিবর্তন।

উজ্জ্বল আলোকে এরূপ পরিবর্তন দেশীয় নাট্যশালায় এই প্রথম !!

কোচ রাজকুমারী হিরাবতীর আকস্মিক প্রকাশ ও অন্তর্দ্ধান দৃশ্য দর্শকবৃন্দকে স্তম্ভিত চমকিত বিমোহিত করিয়া তুলিবে।

বৈকুণ্ঠধামের বিচিত্রদৃশ্য লক্ষ্মীর নেত্রমুগ্ধকারী ব্রহ্মাণ্ড বিসারী অন্নকোট !

আবার অকস্মাৎ দৃশ্যে পরিবর্তনে বীভৎস শূন্যতার বিকাশ !

অন্নপূর্ণার মন্দিরে নেত্র বিভ্রমকারী মনোহর মহাদৃশ্য !

রণোন্মত্ত রুদ্রমূর্তি মহাদেবের ত্রিশূল হইতে ধক্ ধক্ অগ্নি নিঃসৃত হইয়া কৌতূহলী দর্শকবৃন্দকে বিস্ময় বিমুগ্ধ করিবে।

এইরূপ বহুদৃশ্য বহুবিচিত্র চমকপ্রদ দৃশ্য দর্শণ করিবেন।

—(শ্রীযুক্ত হরিন্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত)—

(৪) কোহিনুর থিয়েটার

৬৮ নং বিডন স্ট্রীট

রবিবার সন্ধ্যার সময়

শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু প্রণীত নূতন পঞ্চাঙ্ক বিয়োগান্ত ঐতিহাসিক নাটক

ময়ূর সিংহাসন

দশম অভিনয় রজনী

রঙ্গালয়ে অভিনব ব্যপার ! যাহা এ পর্য্যন্ত কোন রঙ্গালয়ে অনুষ্ঠিত হয় নাই

রাজপথে জীবন্ত জিহনের জ্বলন্ত দেহ !

ভীষন দৃশ্য !! লোমহর্ষণ দৃশ্য !!

রঙ্গালয়ে সর্বজন সমক্ষে অকৃতজ্ঞ পিশাচতুল্য জীহন আলির সর্বাঙ্গে অগ্নি জ্বালিয়া দেওয়া হইবে। দেখিতে দেখিতে জীবন্ত জীহন আলির দেহ পুড়িয়া ছাই হইবে। কেবল কঙ্কালমাত্র থাকিবে। মরুভূমির মধ্যে ঝটিকাবর্ত্তে নাদিরা ! এ দৃশ্য দেখিতে দেখিতে প্রাণ শিহরিয়া উঠিবে।

ক্ষণিকের জন্য অস্তিত্ব ভুলিতে হইবে

গান সুন্দর—নৃত্য মনোহর—পোষাক পরিচ্ছদ বহুমূল্য, সময়োপযোগী

কুসুমিকা প্রেস
৮০ বিডন স্ট্রীট

এ. সি. মীথাজী
অফিঃ ম্যানেজার

—(শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত)—

(৫) ওঁ ভাবতে বাসুদেবায় নম ঃ

New Drama ! নূতন নাটক !!

রাণী দুর্গাবতী—

রঙ্গমঞ্চে যুগান্তর ! রঙ্গমঞ্চে যুগান্তর !

অশ্বপৃষ্ঠে রানী দুর্গাবতী—অশ্বপৃষ্ঠে মতিবিবি, অশ্বপৃষ্ঠে বীরনারায়ণ—অশ্বপৃষ্ঠে বজ্‌বাহাদুর—অশ্বপৃষ্ঠে জগন্নাথ—অশ্বপৃষ্ঠে পীর মহম্মদ

রঙ্গমঞ্চে সর্বসমক্ষে একদৃশ্যে

একেবারে চারটি অশ্বারোহীর আর্বিভাব !!

এরূপ দৃশ্যাবলীর একত্রে সমাবেশ এই প্রথম। বাস্তবিকই নাট্যজগতে যুগান্তরের সূচনা ! এইবারে কি হইবে দেখুন। একটা নয় দুইটী নয়। একদৃশ্যে একেবারে চারিটি অশ্বের আবির্ভাব ! কি ভয়ানক দৃশ্য ! সম্মুখে অসংখ্য নরকপাল ! বিক্ষিপ্ত মরুভূমি। সে ভীষণ শ্মশানে অশ্বারোহণে মহাবীর পীর মহম্মদ—সম্মুখে অশ্বারোহনে জগন্নাথ, পশ্চাতে অশ্বারোহনে বজ্‌ বাহাদুর কর্তৃক এককালে আক্রান্ত !

তুমুল সংগ্রাম ! পরাজিত পীর মহম্মদ প্রাণপণে পলায়নে উদ্যত, কিন্তু কি ভয়ানক সম্মুখে অশ্বারোহিনী আলুলায়িতা কুন্তলা ভৈরবী মতির অশ্বপৃষ্ঠে আবির্ভাব ! মুহূর্তমধ্যে ভৈরবী চালিত গুলির আঘাতে পীর মহম্মদের পতন।

কি ভীষণ প্রতিহিংসা ! কি হৃদকম্পকারী দৃশ্য !!

Kohinoor Theatre

কোহিনুর থিয়েটার

৮ নং বিডন স্ট্রীট

শনিবার ২৪শে পৌষ। রাত্রি ৮॥ টায়।

—(শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত)—

(খ) নিবন্ধের আলোচ্য সময় সীমায় সৌখিন থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথ।

১৯00 থেকে ১৯২০'র সময় সীমার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশিষ্ট রীতিতে শান্তিনিকেতন ও জোড়াসাঁকোর সৌখিন থিয়েটারে অনেক নাটক প্রযোজনা করেন। এর মধ্যে শান্তিনিকেতনে প্রযোজিত 'শারদোৎসব' (১৯০৮, ১৯১১, ১৯১৯), 'মুকুট' (১৯০৯), 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯), 'রাজা' (১৯১১), 'রাজা ও রানী' (১৯১২), 'অচলায়তন' (১৯১৪, ১৯১৭), ফাল্গুনী (১৯১৬), ডাকঘর (১৯১৭), গুরু (১৯১৮) এবং জোড়াসাঁকোয় 'ফাল্গুনী' ও 'বৈরাগ্য সাধন' (১৯১৬), বৈকুন্ঠের খাতা (১৯১৭ বিচিত্রা ভবনে), ডাকঘর (১৯১৭, ১৯১৮—বিচিত্রা ভবনে), ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ সকল নাটক প্রযোর্জনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাট্য-প্রযোজনার বিভিন্ন উপকরণগুলিকে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ব্যবহার করতেন। তাঁর সৃজনীশক্তির গুণে এবং মৌলিক চিন্তার স্পর্শে তাঁর নাট্য-প্রযোজনাগুলি নতুন ধারাপথের সৃষ্টি করেছিল। আলো, মঞ্চ-সজ্জা, অঙ্গ-রচনা, অলঙ্করণ, অভিনয় সব কিছু মিলিয়ে তাঁর নাট্যপ্রযোজনায় সার্বিকভাবে এক নান্দনিক সৌন্দর্য্য—নারীর দেহের লাবণ্যের মত খেলা করত। রামধনুর সাতটি রঙের মত নাট্যপ্রযোজনার এক একটি উপকরণ, প্রতিটি উপকরণের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যেত। কোন উপকরণকেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হ'ত না অথচ সার্বিক-ভাবে প্রতিটি উপকরণের নিজস্ব গুরুত্ব বজায় থাকত। এর পিছনে তাঁর পরিবারের সাংস্কৃতিক প্রজ্ঞা কাজ করত। তাঁর নাট্য-প্রযোজনার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।

।। রবীন্দ্র-নাট্য প্রযোজনায় আলোর অবস্থান ।।

প্রথম দিকে বৈদ্যুতিক আলো না থাকায় কেরোসিনের আলো ও গ্যাসের আলোর সাহায্যে শুধুমাত্র মঞ্চকে আলোকিত করার ব্যবস্থা হ'ত। কেরোসিনের আলো ব্যবহারের জন্য সাধারণত লণ্ঠন ও বিশেষ এক প্রকারের ল্যাম্প ব্যবহার করা হ'ত। শান্তিনিকেতনের উপাসনা গৃহে এই ল্যাম্প থাকত। নাটক মঞ্চায়নের সময় তা মঞ্চে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে উপাসনা গৃহ থেকে নিয়ে আসা হ'ত[১]। এই ল্যাম্পগুলির দ্বারা কখনো নাটকের ফুট লাইট-এর কাজও সম্পন্ন করা হ'ত। ১৯১৭ সাল থেকে শান্তিনিকেতনে ডায়নামোর সাহায্যে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার করা হয়।[২] এর ফলে নাটক প্রযোজনায় আলোর ব্যবহারের গুণগত ও মানগত উৎকর্ষ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে চরিত্রের এবং ঘটনার বিশেষ দিকগুলিকে পরিস্ফুট করে তোলার জন্য আলোর বিশেষ ব্যবহার তখনও কার্য্যকর হয়নি।

।। রবীন্দ্র নাট্য প্রযোজনায় মঞ্চ-সজ্জার পরিকাঠামো ।।

মঞ্চসজ্জার ব্যাপারে তাঁর যত্নশীলতা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। শান্তিনিকেতন এবং জোড়াসাঁকো এই উভয়ক্ষেত্রেই 'প্রসেনিয়াম' মঞ্চে নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা হ'ত। সাধারণত প্রেক্ষাগৃহ থেকে দুইফুট উঁচুতে রঙ্গমঞ্চের প্ল্যাটফরম তৈরী হ'ত। কখনো কাপড় কখনো বা দেবদারু পাতা দিয়ে উইংস্ তৈরী হ'ত। শান্তিনিকেতনের ছাত্র মুকুলদে-র অংকিত ড্রপ সিনও মঞ্চে ব্যবহার করা হয়। এই ড্রপসীন-এর মাঝখানে শিবের তাণ্ডব নৃত্য আঁকা থাকত। মঞ্চের পিছনে একটা কালো চাদর টানিয়ে দেওয়া হ'ত। প্রায়শ ক্ষেত্রেই দৃশ্য পটবিহীন এই ধরনের মঞ্চের উপর অভিনয় হ'ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাট্য প্রযোজনায় দৃশ্যপটের ভারবাহীতা পছন্দ করতেন না। অভিনয়ের মাধ্যমে চিত্তপটকে দৃশ্যপট করে তোলাই তাঁর নাট্য প্রযোজনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা 'ভরত' তাঁর নাট্যশাস্ত্রে দৃশ্যপট ছাড়াই নাট্য প্রযোজনার নির্দেশ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রয়োগ ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।[৩] তথাপি দৃশ্যপট যে একেবারেই তিনি ব্যবহার করতেন না এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। নদ-নদী, প্রান্তর, রাজগৃহ ইত্যাদি বোঝানোর জন্য প্রথমদিকে হরিশচন্দ্র হালদার দৃশ্যপট আঁকার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন।[৪] পরে শান্তিনিকেতনের ছাত্র নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর—প্রমুখ ছাত্রদের আঁকা দৃশ্যপট ব্যবহার করা হ'ত। অংকিত দৃশ্যপট ছাড়াও নাট্যঘটনার স্থান ও পরিবেশকে ফুটিয়ে তোলার জন্য নানাভাবে মঞ্চ সজ্জাকে সমৃদ্ধ করে তোলা হ'ত। এ প্রসঙ্গে 'প্রযোজিত কয়েকটি নাটকের মঞ্চ সজ্জার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

শান্তিনিকেতনে 'ফাল্গুনী' নাটকের প্রয়োজনায় মঞ্চে সত্যিকারের ফুলের বাগান সৃষ্টি করা হয়েছিল।[৫] মঞ্চের ওপর তৈরী দোলনায় বসে দুটি ছেলেকে "ওগো দখিন হাওয়া" গানের সময় সুরের তালে তালে দোল খেতেও দেখা গিয়েছিল। অর্থাৎ এই নাটকের মঞ্চব্যবস্থার বিন্যাসে বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গি অধিক ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল। বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্যকল্পে জোড়াসাঁকোতে এই 'ফাল্গুনী' নাটকের প্রযোজনার ব্যবস্থা করা হয়। এ সময় গগনেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর,—মঞ্চ ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় মঞ্চ ব্যবস্থাকে আরও বাস্তবানুগ করে তোলা হয়। প্রেক্ষাপটের কালো চাদর সরিয়ে নীল পর্দা লাগাবার ব্যবস্থা করে তার দ্বারা নীলাকাশের মঞ্চ মায়াকে পরিস্ফুট করে তোলা হয়েছিল। সেই নীলকাশের বুকে চাঁদ ও গুটিকয়েক তারা শোভা পেত।[৬] নীলপর্দার উপর কিঞ্চিত মাত্রায় সবুজ আলো ফেলে নীলাকাশের দিকবলয় ও দূরের সবুজ বনাঞ্চলের সীমারেখার মধ্যে একটা সংযোগ রচনা করা হ'ত। এই নাটকেই 'নদী আপন বেগে' গানের সময় মঞ্চের পিছনে একটি নীলচাদরকে দুইজনে দুইপাশ থেকে ধরে তাতে ঢেউ খেলিয়ে নদীর

বেগময়তাকে প্রকাশ করা হ'ত। শান্তিনিকেতনে 'শারদোৎসব' নাটকের প্রযোজনার সময় ছাত্ররা মাটির সাহায্যে মঞ্চের পিছন দিকে বেতসিনী নদীর মঞ্চ মায়া সৃষ্টি করেছিল।[৭] জোড়াসাঁকোয় 'ডাকঘরের' মঞ্চ ব্যবস্থাও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। 'বিচিত্রা' ঘরের শেষের একপ্রান্তের খালি জায়গায় 'ডাকঘরের' নাট্যানুষ্ঠানের জন্য মঞ্চ তৈরী করা হ'ত। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর মুখ্য দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। এ ব্যাপারে শিল্পী নন্দলাল, শান্তিনিকেতনের ছাত্র আশামুকুল ও অসিতকুমার হালদার তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন। মঞ্চ সজ্জায় যতদূর সম্ভব বাস্তবের মায়া সৃষ্টির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। মঞ্চের উপর দরমা ও ছিটে বাঁশের বেড়া ও খড়ের চাল দেওয়া একটি কুটির নির্মাণ করা হয়েছিল। কুটিরের চালের খড় মঞ্চের সামনে থেকে কিছুটা বের করে দেওয়া হ'ত। ঘরের মধ্যে কুলঙ্গী, তক্তা ও একটা জানালা তৈরী করা হয়েছিল। ঘরের বারান্দায় ও দরমার উপর আলপনা আঁকা থাকত। ঘরের চৌকাঠের মাথার ওপরটা লতাপাতার সাহায্যে আবৃত করে রাখা হ'ত। ঘরের চালের উপর এককোণে একটা বাবুই পাখীর বাসা থাকত। আর ঘরের এক ধারে 'অগ্রের টাসেল দেওয়া সিকেতে রং করা মাটির হাঁড়ি ঝুলিয়ে মাটির পিলসুজে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ত।"[৮] এছাড়া মঞ্চের পিছনে নীল চাদরের উপর রুপালী কাগজের সাহায্যে চাঁদ ও তারা তৈরী করে এঁটে দেওয়া হ'ত। ঘরের জানালা থেকে তা দেখা যেত। মনে হ'ত নীলাকাশে চাঁদ যেন জ্বল জ্বল করছে।[৯] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে নাট্য প্রয়োজনায় অভিনেতা ও দর্শকের সঙ্গে যাতে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেদিকেও তাঁর সচেতন দৃষ্টি ছিল। তাই যাত্রার মুক্ত আসরকেই তিনি এক্ষেত্রে খুব উপযুক্ত বলে মনে করেছিলেন।[১০] তথাপি তিনি নাট্য প্রয়োজনায় প্রসেনিয়াম মঞ্চ ব্যবহার করেছিলেন। এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে জোড়াসাঁকোয় স্থানাভাবের জন্য তিনি মুক্ত আসর ব্যবহার করতে পারেননি। শান্তিনিকেতনে প্রসেনিয়াম মঞ্চ ব্যবহার করলেও আম্রকুঞ্জের মুক্ত অঞ্চলে তিনি সময় ও সুযোগমত অনেক নাট্যানুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলেন।[১১]

।। রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনায় অঙ্গরচনা ও রূপসজ্জার বিন্যাস ।।

খড়িমাটি, মেটে সিঁদুর, পেউরি ইত্যাদির সাহায্যে চরিত্রানুগ অঙ্গরচনার ব্যবস্থা করা হ'ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে এসে ঠিকমত অঙ্গরচনা হচ্ছে কিনা তা দেখে নিতেন। চরিত্র অনুযায়ী যথোচিত পোষাক পরিচ্ছদের দিকেও তাঁর তীক্ষ্ন দৃষ্টি ছিল। প্রথমদিকে চিৎপুরের পোষাকের দোকান থেকে পোষাক ভাড়া করে শান্তিনিকেতন ও জোড়াসাঁকোয় নিয়ে আসা হ'ত। কিন্তু পরবর্তীকালে অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, প্রতিমা ঠাকুর ও হেমলতা দেবীর তত্ত্বাবধানে চরিত্রোচিত পোষাক পরিচ্ছদের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং প্রয়োজনক্ষেত্রে তাঁরা কাপড় কিনে এনে নিজেরাই পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী করে নিতে থাকেন। অনেক সময়

নাট্য প্রযোজনার সমৃদ্ধির জন্য ঠাকুরবাড়ীর নিজস্ব পোষাক পরিচ্ছদ ও অলংকার ব্যবহার করা হ'ত।[১২] পোষাক পরিচ্ছদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে পোষাকের আড়ম্বর অপেক্ষা তার শিল্পরুচি সম্মত রূপদানের দৃষ্টিভঙ্গির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হ'ত।[১৩] প্রসঙ্গক্রমে তাঁর প্রযোজিত কয়েকটি নাটকে ব্যবহৃত পোষাক পরিচ্ছদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 'রাজা' নাটকে ঠাকুর্দার চরিত্রে তিনি প্রায় ক্ষেত্রেই গেরুয়া রঙের পোষাক ও গলায় ফুলের মালা ব্যবহার করতেন। তবে নাট্য ঘটনা ও চরিত্রের বিভিন্ন দিকের পরিবর্তনের সঙ্গে যোগ রেখে চরিত্রের পোষাক পরিচ্ছদের যথোচিত পরিবর্তন তিনি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতেন। তাই 'রাজা' নাটকে ঠাকুর্দা মঞ্চে যখন রাজসেনাপতি রূপে উপস্থিত হতেন তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গেরুয়া পোষাকের পরিবর্তে সাদা রেশমের পোষাকের উপর চওড়া লাল কোমর বন্ধ ব্যবহার করতেন। 'রাজা' নাটকে দীনেন্দ্রনাথ 'পাগোল' চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করতেন। এ চরিত্রে রূপদানের জন্য তিনি ভুষো কালি ও অনান্য কালো রঙের সাহায্যে চোখে মুখে চরিত্রোচিত অঙ্গরচনা করতেন। একটা লম্বা আলখাল্লার উপর কতকগুলি ন্যাকড়ার ছোট বড় টুকরে ঝুলিয়ে দিয়ে তা পরিধান করতেন।

'শারদোৎসব' নাটকেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সন্ন্যাসী চরিত্রে মাথায় গেরুয়া রঙের পাগড়ী যুক্ত গেরুয়া পোষাক ব্যবহার করতেন। 'অচলায়তন' নাটকে 'আচার্য্য অদীনপুণ্য' চরিত্রে তিনি নতুন কায়দায় পোষাক পরিধান করতেন। একটি সাদা রেশমের চাদরকে বুকের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে পিছনে গ্রন্হী বেঁধে দিয়েছিলেন। 'বৈরাগ্য সাধন' নাটকে কবিশেখরের ভূমিকায় তাঁর চরিত্রোচিত অঙ্গরচনা ও পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবহারে চরিত্রের বাহ্যিক-দিক এত সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল যে তা দেখে সকল বিদগ্ধ গুণীজনই তাতে বিস্ময়বোধ করেছিলেন।[১৪] 'ফাল্গুনী' নাটকেও চরিত্রের পোষাক পরিচ্ছদ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে চরিত্রের বাহ্যিক দিককে ফুটিয়ে তোলার আত্যন্তিক প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয় হয়েছিল। এ প্রচেষ্টার মধ্যে কোনরকম কৃত্রিমতা ও আড়ম্বর ছিল না।[১৫] এই নাটকে শ্রুতিভূষণ চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গায়ে নামাবলী, গরদের ধুতি ও শুঁড়তোলা চটি পরে যথার্থ পণ্ডিতের সাজে মঞ্চে অবতীর্ন হতেন। মনিগুপ্ত নামে আশ্রমের একটি ছাত্রকে তাঁর চেলা সাজিয়ে মঞ্চে উপস্থিত করা হ'ত। মনিগুপ্ত গলায় পৈতে দিয়ে ও লাল চেলি পড়ে শ্রুতিভূষণের পুঁথি ও নস্যের ডিবে হাতে নিয়ে যখন মঞ্চে উপস্থিত হ'ত তখন চরিত্রটি পোষাক পরিচ্ছদের দিক দিয়ে খুব আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য হয়ে উঠত। 'ডাকঘরে' দইওয়ালার ভূমিকার চরিত্রাভিনেতার জন্য কাঁচ বসানো কাঠিওয়ারী কাপড়ের সাহায্যে গ্রাম্য ধরণের 'বাণ্ডি' জামা তৈরী করা হয়েছিল। চেলির জোড় ধুতি দইওয়ালার পাগড়ী হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত। তাঁর দই রাখার বাঁকটিকে লাল শালু দিয়ে মুড়িয়ে দিয়ে তাতে অভ্র আর জরির কাজ করা

দুটো সিকে লাগানো হ'ত। সেই সিকের মধ্যে মোরাদাবাদ থেকে আনা পালিশ করা দুটো ঘড়া বসিয়ে দেওয়া হ'ত।

॥ রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনায় শব্দ ও ধ্বনি সংগীতের প্রকৃতি ॥

নাট্য ঘটনার পরিবেশ ও পরিস্থিতি বোঝানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন প্রকার আবহসংগীতের ব্যবহার পছন্দ করতেন না। কণ্ঠসংগীত প্রয়োগের সময় তিনি প্রয়োজন বোধে হারমোনিয়াম, এসরাজ ও বাঁশী ব্যবহার করতেন। তবে অনেক নাটকে রবীন্দ্রনাথ খালি গলায়ও গান গাইতেন। কোন কোন নাটকের প্রযোজনায় তিনি ঐকতান বাদনের সাহায্যও নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে 'বৈকুণ্ঠের খাতা'—নাট্য প্রযোজনার কথা স্মরণযোগ্য।

॥ নাট্যশিক্ষক রবীন্দ্রনাথ ॥

নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অভিনয়কেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। নাট্যঘটনার পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং চরিত্রের বিশেষ বিশেষ দিককে তিনি কেবলমাত্র অভিনয়ের সাহায্যেই দীপ্তভাবে পরিস্ফুট করে তোলার মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। সেজন্য তিনি সকল অভিনেতা অভিনেত্রীদের বিশেষভাবে শিক্ষা দিতেন।

প্রথমেই তিনি নাটক লেখার পর তা সকলের সামনে পাঠ করতেন।[১৬] পাঠের মধ্যবর্তী সময়ে মহলাকক্ষে কেউ উপস্থিত হলে তিনি আবার গোড়া থেকেই তা পাঠ করতেন। এই পাঠের দ্বারা তিনি প্রাথমিকভাবে বিষয়বস্তু, নাট্যগঠন প্রকৃতি, নাট্যচরিত্র চিত্রণ ইত্যাদি সম্পর্কে সকলকে ওয়াকিবহাল করে তুলতেন। এরপর তিনি নাট্যচরিত্র অনুযায়ী অভিনেতা নির্বাচনের কার্য্য সম্পন্ন করতেন। এ বিষয়ে তিনি চরিত্রোচিত দেহাকৃতি, কণ্ঠস্বর, স্বর প্রক্ষেপণ ক্ষমতা, উচ্চারণ যোগ্যতা, অভিনয় দক্ষতা ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রেখে নির্বাচন কার্য্য শেষ করতেন। এ বিষয়ে তিনি কারোর সঙ্গে আপোষ করতেন না।[১৭] এরপর নির্বাচিত অভিনেতাদেরকে তাদের নাট্যচরিত্রের অভিনয়ের অংশ লিখে দেবার ব্যবস্থা করতেন এবং অভিনেতাকে অভিনয়ের অংশটি মুখস্থ করে আসার নির্দেশ দিতেন। অভিনয়কে বিশ্বাসযোগ্য করে ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি প্রাথমিক পর্বে এই মুখস্থ করার উপর বেশী গুরুত্ব দিতেন। এরপর মহলাকক্ষে তিনি প্রত্যেককে অভিনয়ের অংশটি বলার নির্দেশ দিতেন। সে সময় তিনি শব্দের উচ্চারণগত দিক, স্বর প্রক্ষেপণ ইত্যাদি ব্যাপারে অভিনেতার কোন ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করে দিতেন। কেউ নাট্যচরিত্রটি বুঝে ঠিকমত প্রকাশ করতে না পারলে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের সার্বিক তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে তার প্রকাশভঙ্গী কিভাবে করতে হবে তাও দেখিয়ে দিতেন।[১৮] অভিনয়ের সময় তিনি অভিনেতাকে চরিত্রোচিত ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকতে শিক্ষা দিতেন।[১৯] নাট্যাভিনয়ে নৃত্যদৃশ্যের সংযোজন থাকলে তিনি সেই নৃত্যদৃশ্যের

পরিকল্পনাকে সার্থকভাবে রূপায়িত করার জন্য নিজে নৃত্য করে সংশ্লিষ্ট অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বিশেষভাবে তামিল দিতেন।[২০] শুধু অভিনয় বা নৃত্য নয়, অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গরচনা, রূপসজ্জা, ইত্যাদি বিষয়েও তিনি অভিনেতাদের প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতেন। নাটক মঞ্চস্থ হবার আগে অভিনেতারা তাদের অঙ্গরচনা ও রূপসজ্জার কাজ যথাযথভাবে করতে পারছে কিনা সে বিষয়টি তিনি নিজে এসে পর্যবেক্ষণ করতেন। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগত অভিনয় অপেক্ষা সমষ্টিগত অভিনয়ধারার উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতেন। তাঁর নাটকে সন্নিবেশিত সংগীত শিক্ষাদানের ব্যাপারে তিনি নিজে যেমন গান গেয়ে অভিনেতাদের তামিল দিতেন তেমনি অবার অনেক সময় গান রচনার পর তার শিক্ষাদানের ভার দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর ন্যস্ত করতেন। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিনয় ক্ষমতার উপর রবীন্দ্রনাথের গভীর আস্থা ছিল।[২১] তাই অভিনয় শিক্ষা-দানের ভারও তিনি সময় বিশেষে তাঁর উপর ন্যস্ত করতেন। নাটক মহলার সময় আবশ্যকমত তিনি সমগ্র নাট্যপ্রযোজনার দিকে তাকিয়ে তাঁর নাট্যরচনার পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। নাটক মঞ্চস্থ হবার প্রাক্ মুহূর্তেও তিনি এ বিষয়ে সচেষ্ট হতেন।[২২]

॥ অভিনেতা রবীন্দ্রনাথ ॥

নানাবিধ শিল্প, কলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সৃজনশীল পরিবেশে সমৃদ্ধ ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক পটভূমিকা অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের অভিনয় প্রতিভার স্ফুরণে বিশেষ ক্রিয়াশীল হয়ে উঠে ছিল। তদুপরি অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের দেহগত সৌন্দর্য[২৩] সুস্পষ্ট উচ্চারণ ক্ষমতা, সুসংগত স্বরপ্রক্ষেপণ নৈপুণ্য, বাক্ ভাষায় গভীর ব্যুৎপত্তি, অসাধারণ শিল্পরুচিজ্ঞান, সংগীত ও নৃত্য শাস্ত্রের তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক জ্ঞান তাঁকে অভিনয় জগতে চিরবরেণ্য করে তুলেছে। তাঁর কণ্ঠস্বর বাঁশীর মত সুমিষ্ট ও তীক্ষ্ম ছিল এবং সেই কণ্ঠস্বর প্রেক্ষাগৃহের শেষতম স্থান পর্যন্ত শোনা যেত।[২৪] শুধু তাই নয়, ঘটনার গভীরতা এবং চরিত্রের মনোভাবের বিভিন্ন পর্যায়কে ব্যক্ত করার জন্য তিনি তাঁর কণ্ঠস্বরকে নিপুণ হস্তে নিয়ন্ত্রিত করতেও পারতেন।[২৫]

চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে তিনি চরিত্রের শারীরিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলির বিশদভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে চরিত্রটিকে প্রতিষ্ঠিত করতেন। চরিত্রাভিনয়ের সময় তিনি চরিত্রের চিন্তায় তন্ময় হয়ে যেতেন বটে, তবে কখনই তিনি তাঁর আত্ম-সচেতনতাকে হারিয়ে ফেলতেন না।[২৬] অভিনয়ের সময় তাঁর পর্যবেক্ষকসত্তা ও সৃষ্টিসত্তা একই সঙ্গে জাগরূক থাকত। তাঁর অভিনয় ধারায় সুর থাকলেও নাট্যসংলাপের ভাষা ও ছন্দ অনুযায়ী তিনি সেই সুরকে স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করতেন। স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম অভিনয়ই তাঁর অভিনয় ধারার বৈশিষ্ট্য।[২৭]

সে সময়কার পেশাদারী থিয়েটারের প্রযোজকগণ রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনার সময় তাঁর নাট্যাভিনয় ও প্রযোজনা রীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়তেন।[২৮]

'রাজা' নাটকে 'ঠাকুর্দার' ভূমিকায় তাঁর আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয় ও নৃত্য দর্শনে দর্শক মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে পড়ত। 'ফাল্গুনী' নাটকের অন্ধ বাউল চরিত্রে তাঁর গাওয়া দুটি গান "ধীরে বন্ধু গো ধীরে" এবং "ও চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে"—শ্রোতাদের অন্তরে এক বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। কলকাতার জোড়াসাঁকোতে 'ফাল্গুনী' অভিনয়েও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। জোড়াসাঁকোয় "ডাকঘর" নাটকে তিনি একইসঙ্গে 'ঠাকুরদা' ও 'প্রহরীর' ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ঠাকুর্দারূপী রবীন্দ্রনাথ যখন মঞ্চে নেচে নেচে 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' গেয়ে চলে যেতেন তখন সকলে সে অভিনয় দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেতেন। এই নাটক দেখার জন্য টিকিট বিক্রীর ব্যবস্থা হলে সেই টিকিট কেনার জন্য দর্শকদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল।[২৯] 'শারদোৎসবে' সন্ন্যাসীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের অভিনয় সহজ ও স্বাভাবিক অভিনয় ধারার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত বিশেষ। কলকাতা থেকে আসা অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এ অভিনয় দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন। তাঁর অভিনয় ধারা ও অভিনেতব্য চরিত্র চিত্রণ তাঁর অনন্য ব্যক্তিত্বের স্পর্শে এইভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠত।[৩০]

(গ) নিবন্ধের আলোচ্য সময় সীমায় সৌখিন থিয়েটারে শিশিরকুমার

বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে সৌখিন থিয়েটারে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাট্য প্রতিভা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে সময়কার বঙ্গসংস্কৃতির পীঠভূমি ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে শিশির প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে শিশিরকুমার ইন্‌স্টিট্যুটের 'মেরিগোল্ড ক্লাবের' সদস্য পদ লাভ করেন। এই ইন্‌স্টিট্যুটের "উর্বর নাট্য ক্ষেত্রে স্যার গুরুদাসের সজাগ তত্ত্বাবধানে এবং অধ্যাপক মন্মথমোহন বসুর নিয়মিত জলসেচনে শিশির প্রতিভার এই অঙ্কুর ধীরে ধীরে পুষ্টিলাভ করতে থাকে।"[৩১]

ইউনিভারসিটি ইনস্টিট্যুটে শিশির কুমার ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ শেকস্‌পীয়রের হ্যামলেট নাটকে একাদিক্রমে 'ক্লডিয়াস' ও 'হ্যামলেটে'র পিতার 'প্রেতাত্মা', এই বছর ২৭শে সেপ্টেম্বর নবীনচন্দ্র সেনের কুরুক্ষেত্র কাব্যের অভিনয়ে 'অভিমন্যু', 'মার্চেন্ট-অব্ ভেনিস' নাটকে 'অ্যান্টোনিও', ১৯১০ সালে গিরিশচন্দ্রের বুদ্ধদেব নাটকে 'বুদ্ধদেব', ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে 'চাণক্য', ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের 'জনা' নাটকে 'প্রবীর' ও ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে 'অশোক' নাটকে 'অশোকের' ভূমিকায় এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ইনস্টিট্যুটে প্রযোজিত 'রঘুবীর' নাটকে 'রঘুবীরের' ভূমিকায় অভিনয় করেন।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক

টাউন হলে তাঁর সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে ইন্‌স্টিট্যুটের জুনিয়র সদস্যগণ ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে 'বৈকুন্ঠের খাতা' নাট্যাভিনয় করেন। এই নাট্যাভিনয়ে তিনি 'কেদার' চরিত্রে অভিনয় করেন। প্রতিটি ভূমিকাভিনয়ে তিনি তাঁর সৃজন শক্তির উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে যান। তাঁর অনন্য সুন্দর ঋজু দার্ঢ্য দেহাকৃতি, সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ উচ্চারণ, অভিনেতব্য চরিত্র বিশ্লেষণে অসাধারণ নৈপুণ্য, উদাত্ত ও গভীর ব্যাঞ্জনাময় কণ্ঠস্বরের লীলায়িত ভঙ্গী, কণ্ঠস্বরের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, সুরহীন ও স্বাভাবিক অভিনয় কুশলতা, সর্বপ্রকার রসাশ্রিত চরিত্র্যের অভিব্যক্তি প্রকাশের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা, সবরকম মুদ্রাজ্ঞান—ইত্যাদি গুণে তিনি এই সময় থেকেই নাট্য জগতের বিদগ্ধ মহলে সকলের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষন করেন।[৩২] প্রথম থেকেই তিনি দিগ্বিজয়ীর আত্মপ্রত্যয় ও জয়গৌরব নিয়ে রঙ্গজগতের সম্মুখে উপস্থিত হন। নাট্য জগতের উত্তরসূরীদের সামনে নাট্যাভিনয়ের নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেন। এ প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। "শিশিরের অভিনয় ছিল চরিত্রের শুধু যথাযথ রূপায়ণ নয়, তাদের প্রানশিক্ষার নিগূঢ় দীপ্তি, আন্তর রহস্যের গূঢ়তম স্পন্দন, স্রষ্টার অসংজ্ঞান অভিপ্রায় তাঁর অভিনয়ে এমন নির্ধারিতভাবে ফুটে উঠত যে আমরা বিস্মিত, মুগ্ধ, রোমাঞ্চিত হয়ে যেতাম। সৃষ্টি যবনিকার অন্তরালে স্রষ্টার যে গোপন রহস্য প্রচ্ছন্ন থাকে, আমরা যেন হঠাৎ সেই প্রাণ নিকেতনের অন্তঃপুরে নীত হয়ে এই রহস্যের অংশীদার হয়ে যেতাম। সৃষ্টিলীলার তত্ত্ব যেন আমাদের সামনে রূপ নিয়ে অপরূপ ছন্দে প্রকাশিত হয়ে উঠত। শিশিরকুমার যখন যে চরিত্র অভিনয় করতেন তখন তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন, তাঁর সমস্ত চিন্তা, কর্ম, অবচেতন মনের ভাবপ্রবাহ যেন তাঁর সহজ সংস্কারের নিকট ধরা পড়ে যেত। এ যেন আন্তর প্রকটনের জন্য দিব্য অনুভূতির X-Ray (এক্স-রে)র অপরূপ প্রয়োগ।"[৩৩]

'বুদ্ধদেব' নাটকের বুদ্ধদেব চরিত্রের পদ্য ধর্ম্মী আভিনয়িক সংলাপের ভাব ও রসকে মূর্ত্ত করে তোলার জন্য তাঁর সুসংহত আবৃত্তি সকলকে মুগ্ধ করেছিল। 'অশোক' নাটকে কলিঙ্গ যুদ্ধের বিভীষিকা দর্শনে বেদনাহত ও অনুতপ্ত অশোক চরিত্রে তাঁর আঙ্গিক অভিনয় ও মুখজ অভিব্যক্তির নিপুণতা এক কথায় অনবদ্য। এ প্রসঙ্গে নট ও নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্তর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।

> "আরম্ভ হোল কলিঙ্গ যুদ্ধজয়ের দৃশ্য। কলিঙ্গ যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নিহত মানুষের ভয়াবহ স্মৃতি অনুতপ্ত চণ্ডাশোককে ধর্মাশোকে পরিণত করে। অশোক ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠেন। চারিদিক হতে আগুন এসে তাঁকে যেন গ্রাস করছে। 'আগুন আগুন জ্বলে গেলুম পুড়ে গেলুম বলে আর্ত্তনাদ করে ওঠেন অশোক……। অগ্নিকুন্ডের মধ্যে পড়ে মানুষ যেমন শেষ মরণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে, উন্মত্তের মত দুহাত দিয়ে লোলিহান অগ্নিশিখাকে নিজের দাহ্যমান অঙ্গবস্ত্র থেকে ছিটকে ফেলে দেবার

চেষ্টা করে, শিশিরকুমার ঠিক তেমনিভাবে নিজেকে অগ্নিজ্বালা হতে মুক্ত করবার প্রয়াস করতে থাকেন। শুধু আঙ্গিক অভিনয়, মুখে ওই এক কথা, জ্বলে গেলুম, পুড়ে গেলুম। প্রেক্ষাগারের উৎকণ্ঠিত মানুষগুলি দারুণ উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায়। তারপর উচ্ছ্বসিত সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে অপরাজেয় শিশিরকুমারের জয়ধ্বনি"।[৩৪]

চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্য চরিত্রে তিনি বিশ্লেষণমূলক বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয়ের দ্বারা চরিত্রের ত্রৈমানিক স্তরকে পরিস্ফুট করে তোলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের অংকিত চাণক্যের প্রেয়সী যে চাণক্যের অসাধারণ মনীষার প্রতীক, শিশিরকুমার চাণক্য চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন।[৩৫] চাণক্য চরিত্রে শিশিরকুমারের অভিনয় প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত লক্ষ্যণীয়।

"শিশিরের চাণক্য'র অভিনয়—তাহার অভিনয় প্রতিভার একটা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন-রূপে সর্বসম্মত স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। আত্রেয়ীর পুনঃপ্রাপ্তির দৃশ্যে নাট্যকার চাণক্যের অন্তর্জগতে যে তুমুল ভূমিকম্প স্বরূপ বিপর্যয়ের কল্পনা করিয়াছেন, আবেগের শ্বাসরোধী আতিশয্যে তাহাকে যে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দোলায়িত করিয়াছেন, তাহার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে যে স্খলিত উক্তির সমাবেশ তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের বিপুলতার ইঙ্গিত দিয়াছেন, শিশিরের অপূর্ব অভিনয়ে তাহা সমস্ত প্রত্যক্ষরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কবি কল্পনায় সুদূর নভোচারী ধূমকেতু যেন মাটির জগতে নামিয়া আসিয়া, মানুষের ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া নিজ নিখুঁত প্রতিচ্ছবি নিক্ষেপ করিয়াছে। কিন্তু আমি আর একটি দৃশ্যের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। নন্দের হত্যার পর যখন রক্তরঞ্জিত হস্তে তাহার অসংবদ্ধ শিখাকে বাঁধিতেছে, তখন তাহার মুখে অস্বাভাবিক উল্লাসের কি একটা বিকৃত, কুঞ্চিত কুটিল ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ আনন্দ যেন ফেলিবার নয়, পূর্ণ-ভাবে গ্রহণ করিবারও নয়—চাণক্য প্রকৃতির এক অংশ যাহা গভীর তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিতেছে, অপর অংশ তাহার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ জানাইতেছে। বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণ প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যে বিষামৃতের সংমিশ্রণ, তপ্ত ইক্ষু-চর্বণবৎ যে অস্বস্তিকর আনন্দের কথা বলিয়াছেন, চাণক্যের মুখে যেন তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর এই দৃশ্যের চরম অভিব্যক্তিরূপে শিশির নাট্যকারের অপরিকল্পিত আর একটি অঙ্গ সঞ্চালনের আশ্রয় লইয়াছে। বৃদ্ধ, জরাজীর্ন চাণক্য, পৃথিবীর সকল আনন্দ হইতে নির্বাসিত চাণক্য, কূটনীতির পাকে সমগ্র প্রাণশক্তিকে গুটাইয়া রাখা চাণক্য, ঠিক আনন্দ বিহ্বল স্কুলের ছেলের ন্যায় তিনটি লম্ফ প্রদানের দ্বারা তাহার অন্তর নিরুদ্ধ উদ্বৃত্ত আবেগকে মুক্তি দিয়াছে। এই তিনটি লাফ চাণক্যের স্বাভাবিক চরিত্রে কত বিসদৃশ, অথচ বর্তমান মুহূর্তে কত

অ[illegible] সুসঙ্গত। অঘটন ঘটন পটীয়সী, রঞ্জনরশ্মির ন্যায় অস্থিচর্মভেদী নট প্রতিভাই শিশিরকে এই আঙ্গিক প্রচেষ্টার রহস্যটি শিখাইয়াছে”—[৩৬]

চাণক্য চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলার ক্ষেত্রে নন্দ হত্যার দৃশ্যে তিনি যেভাবে অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকের মনে বীভৎস রস সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিলেন সে সম্পর্কে ‘শনিবারের চিঠি’র সম্পাদকীয় মন্তব্য উল্লেখযোগ্য।

> “আর একরকম চরিত্রাভিনয়ে শিশিরকুমার ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’। উহাকে বীভৎস রসানুযায়ী চরিত্র বলা যাইতে পারে···শিশিরকুমার ভিন্ন আর কোন নটের মধ্যে ওই রসের সার্থক অভিনয় দেখি নাই।···দৃষ্টান্তস্বরূপ চন্দ্রগুপ্ত নাটকের তৃতীয় অংকের শেষ দৃশ্যটির উল্লেখ করিতেছি। নন্দের বলির পর তাহার রক্ত-রঞ্জিত হস্তে চাণক্য যখন মঞ্চে প্রবেশ করতঃ শিখা বাঁধিয়া অট্টহাস্য করিতে করিতে প্রস্থান করেন, দৃশ্যের সেই অংশটুকুর কথাই আপনাদিগকে স্মরণ করিতে বলি ···সে দৃশ্যে শিশিরকুমার যে পৈশাচিক উল্লাসে নৃত্য করেন সেরূপ নৃত্যের তুলনা খুঁজিতে হইলে গ্যারিক—আর্ভিং-এর দেশে যাইতে হইবে।”[৩৭]

চাণক্য চরিত্রাভিনয়ে শিশিরকুমারের এই অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় লাভ করে, স্বয়ং নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় শিশিরকুমারের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন,

> “শিশিরকুমারের চাণক্য বুদ্ধিদীপ্ত এক অসাধারণ অভিনয়। আমি কল্পনায় যে চিত্র এঁকেছি এই অভিনয় তার চেয়েও এগিয়ে গিয়েছে। ইতিহাসের চাণক্য আমার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।”[৩৮]

‘বৈকুণ্ঠের খাতা’য় কেদার চরিত্রে শিশিরকুমারের অভিনয় দেখে স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।[৩৯]

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনস্টিট্যুটে ক্ষীরোদবাবুর ‘ভীষ্ম’ নাটকে তিনি চরিত্রাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেননি। এ নাটকে তিনি সদস্যদের অভিনয় শিক্ষা দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় থেকেই শিশির কুমারের অভিনয় শিক্ষাদানের ক্ষমতা বিকাশ লাভ করতে থাকে। নাট্য শিক্ষাদানের সময় তিনি সদস্যদের স্বরপ্রক্ষেপণ, উচ্চারণ রীতি, বাগ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে যেমন শিক্ষা দিতেন তেমনি চরিত্রের শারীরিক, সামাজিক ও এই দুইয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলি বিশ্লেষণ করে চরিত্রকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করার জন্য ও মঞ্চে শুধুমাত্র হৃদয়ানুভূতির দ্বারা চালিত না হয়ে সেই চরিত্রকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও তিনি প্রয়োজনীয় উপদেশ নির্দেশ দিতেন। পদ্যাশ্রিত সংলাপের ছন্দ, সুর ও ধ্বনি বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে অভিনয় করার প্রক্রিয়া সম্বন্ধেও তিনি সদস্যদের সচেতন করে তুলতেন। শিশিরকুমারের এই শিক্ষাদান ক্ষমতার উপর ইনষ্টিট্যুটের মূল নাট্য শিক্ষক মন্মথ মোহন বসুর গভীর আস্থা ছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

"ইনস্টিটিউটের সব নাটকেই আমি ছিলাম মোশান মাষ্টার বা নাট্যশিক্ষক। 'ভীষ্ম' নাটক ছেলেদের খুব শক্ত মনে হ'ল, তারা এসে আমাকে বললে, স্যার এ বই তৈরী করা শক্ত, আপনি একটু ভাল করে দেখিয়ে দিন। আমি বল্লাম, আমি তো আছিই, তবে তোমরা শিশিরের কাছ থেকে ট্রেনিং নাও। তাই হ'ল। শিশিরের শিক্ষা পদ্ধতি দেখে আমি মুগ্ধ হই। নাটকের প্রত্যেকটি ভূমিকা সে বিশ্লেষণ করে ছেলেদের বুঝিয়ে দিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে সমগ্র নাটকের বাতাবরণ সে এমনভাবে তাদের সামনে তুলে ধরেছিল যে নাট্যকার ক্ষীরোদবাবু পর্যন্ত তা শুনে পরম বিস্ময়বোধ করেছিলেন। অভিনেয় নাটকের এমন বিচার বিশ্লেষণ তিনি পেশাদার রঙ্গমঞ্চেও নাকি কখনো দেখেননি। এর ফলে প্রত্যেকেই স্ব স্ব ভূমিকা ঠিকমতো আয়ত্ত করতে পেরেছিল"[৪০]

নাট্যপ্রযোজক হিসাবে শিশিরকুমার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সৌখিন নাট্য-প্রযোজনায় অভিনবত্ব প্রদর্শন করেন। সংঘবদ্ধ অভিনয় (unsemble Acting), নাট্য ঘটনার যুগোপযোগী পোষাক পরিচ্ছদ এবং দৃশ্য রচনার ক্ষেত্রে আধুনিক নাট্য প্রযোজনার দিকগুলি তাঁর নাট্য প্রয়োগ ব্যবস্থার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিশিরকুমারের পরিচালনায় ১৯১১ সালে, ইনস্টিটিউটের চন্দ্রগুপ্ত নাটকে এই আধুনিকতার প্রথম শুরু হয়।

প্রযোজনায় তিনি গিরিশ যুগের ব্যক্তিগত অভিনয় ধারার পরিবর্তে সমষ্টিগত অভিনয়ের উপর জোর দেন। নাট্যপ্রযোজনায় নাটকের ছোট বড় প্রতিটি চরিত্রের সার্বিক গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি সকল অভিনেতাদের সচেতন করতেন এবং তাদেরকে সেইভাবে তিনি তালিম দিতেন। এরফলে নাট্যপ্রযোজনার সময় সংঘশক্তি (Team works) খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠত।[৪১]

নাট্য প্রযোজনায় নাটকের ঘটনা ও পরিবেশ অনুযায়ী পোষাক পরিচ্ছদ নির্বাচন ও মঞ্চসজ্জা নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর নতুন দৃষ্টিভঙ্গী বাংলা তথা ভারতের নাট্য প্রযোজনার ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এ বিষয়ে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য স্মরণীয়।

"শিশিরের প্রযোজনার ফলেই বাঙলা রঙ্গমঞ্চে হিন্দুযুগের পোষাক পরিচ্ছদ, স্টেজ ডেকর বা মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি বিষয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টির আধারে একটা যুগান্তর এসে গেল। শলমা চুমকির সাজে, কটকটে লাল নীল সবুজ কালো হলদে ভেলভেটের কোট চাপকান, ফুলপ্যাণ্ট বা হাফপ্যাণ্ট, আর পালক লাগানো শামলা বা জরীর টুপির রেওয়াজ ধীরে ধীরে উঠে গেল—ইনষ্টিটিউটে আর পরে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শিশিরের পরিচালিত অভিনয় দেখে। হিন্দুরাজার পোষাক বেনারসী জোড়, খালিগায়ে প্রচুর গয়না, পায়ে চপ্পল, মেয়েদের পোষাকে জরির কাজ করা বা ছাপা রঙীন শাড়ী, আর তদনুরূপ ওড়না এসে

গেল। নাট্যাভিনয়ের পোষাক পরিচ্ছদ বিষয়ে এই নতুন হাওয়া ক্রমে উত্তর ভারতে আর ভারতের অন্যত্রও ছড়িয়ে গেল।"[৪২]

নাটকের উপযোগী পোষাক পরিচ্ছদ নির্বাচনে চন্দ্রগুপ্ত নাটকের প্রযোজনা বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রেখেছিল। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে,—

"১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর ইনষ্টিট্যুটের ইতিহাসে আর একটি স্মরণীয় দিন। অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ডি. এল. রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' অভিনয়ের আয়োজন করা হয়। জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীত কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন ইন্‌স্টিট্যুটের একজন অতি উৎসাহী সভ্য। তিনি প্রস্তাব করেন গ্রীক সৈন্যের পোষাক পরিচ্ছদ ঐতিহাসিক ভিত্তিতে তাঁরা নিজেরাই তৈরী করবেন। সভ্যগণের মধ্যে যেন উৎসাহের বন্যা বয়ে চললো। সুনীতবাবু ছুটলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পুরানো নথিপত্র ঘাঁটতে। তাঁর সহকর্মীগণ নীহার দত্ত, আনন্দকৃষ্ণ সিংহ অঘোরনাথ ঘোষ, গিরীন্দ্র সেন প্রভৃতির সহায়তায় এই অভিনব প্রস্তাব কার্য্যকর হতে বিলম্ব হল না। গ্রীক সৈন্যের বিচিত্র সাজসজ্জা প্রস্তুত হল, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য। তিনি চন্দ্রগুপ্তের নবরূপায়ণ দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। সেদিন চাণক্যের ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় কলা প্রদর্শন করে শিশিরকুমার ভাদুড়ী রাতারাতি খ্যাতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেন। কলকাতার নাট্যমোদী দর্শকের ভিতর আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। এইভাবে ইন্‌স্টিট্যুট থেকে ভবিষ্যৎ বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চে পথ নির্দেশের ইঙ্গিত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।"[৪৩]

এ বিষয়ে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

"......on our own readings of Ancient Indian as well as Greek antiquities and of mediaeval Hindu and Muslim costumes, We started work for appropriate dresses whenever there was a play to be staged in the Calcutta University Institute. Our great triumph was in preparing the costumes for D. L. Roy's 'Chandragupta' and Girish Ghose's 'Asoka. We flattered ourselves that we are able to set a standard there which was immediately accepted by the professional stage as well as by amature actor's in Bengal and then it spread to other parts of India."[৪৪]

ইউনিভারসিটি ইনস্টিট্যুট ছাড়া শিশিরকুমার 'ওল্ডক্লাবে'ও সৌখিন নাট্যাভিনয় ও নাট্যপ্রযোজনা করতেন।[৪৫] ১৯২১ সালে গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকের অভিনয় ও প্রযোজনার পর তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করেন।

ঘ) সাক্ষাৎকার

(১) গিরিশযুগে পেশাদারী থিয়েটারের অন্যতম অভিনেতা গিরিশ-শিষ্য এবং অমৃতলালের শিষ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (জন্ম—১৮৮৯ সাল

. . . . . .

প্রশ্ন : অঙ্গরচনা ও অঙ্গসজ্জার স্বরূপ কি ছিল ?

উত্তর : থিয়েটার ও যাত্রার পোষাক ছেঁড়া ন্যাকড়া ছিল না। অঙ্গরচনা ও অঙ্গসজ্জার ব্যাপারে যাত্রা ও থিয়েটারের মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব ছিল। ভেলভেটের উপর চুমকির কাজ হ'ত। 'কালাবত্তু' নামক একপ্রকার জিনিস জার্মান থেকে আসত। ওটা রুপোর ওপর সোনার রঙ। আলো পড়লে চোখ রাখা যেত না। মহাভারতের ছবি দেখে পৌরাণিক নাটকের চরিত্রের জন্য পোষাক তৈরী করা হ'ত। দেবতাদের পোষাকে যতটা সম্ভব পৌরাণিক ভাব আনা হ'ত। যেমন ব্রহ্মার পোষাক হ'ত চেলীর কাপড়, বেনারসী জোড়, চাদরে সাচ্চা কাজ করা থাকত। আঙুলে পেতলের গুলো বসানো খড়ম পাদুকা হিসেবে ব্যবহৃত হ'ত। গলায় মালা। কৃষ্ণের কৃষ্ণচূড়ায় ময়ূরের পালক পরানো হ'ত।

বেনারসী শাড়ী পরে অসুর সাজা হ'ত। হাফ্-প্যাণ্ট ধরনের একপ্রকার পোষাকও তৈরী করা হ'ত। হাঁটুর উপর দিয়ে তিন আঙুল চওড়া প্লেট থাকত। তার উপর কাজ করা হ'ত। হাঁটুর উপরের দিকটা থাকত ফোলা। হাঁটু ঢাকবার জন্য আলাদা একটা কাঠ লাগান হ'ত। লেগ-গার্ড থাকত এবং তাতেও সাচ্চা কাজ করা হ'ত।

কারচোপ ফেলে জুতো তৈরী করা হ'ত। ওপরটা ভেলভেটের তৈরী। তাতে সাচ্চা কাজ করা থাকত। চরিত্র অনুযায়ী জুতোর রকমফের ছিল। কারুর হয়ত গেরুয়া ধরণের ভেলভেট দিয়ে মাথা ওলটানো জুতো হ'ত।

জামার মধ্যে সার্টিন সিল্ক জাতীয় হাফ-হাতা জামাও ব্যবহার করা হ'ত। এ সময় কব্জি বন্ধন, বাজু বন্ধন এ সবও ব্যবহৃত হ'ত। গলায় ফুঁকোর কাজ করা নকল মুক্তোর মালা থাকত।

অঙ্গরচনাও চরিত্রানুগ করার চেষ্টা হ'ত। প্রথমদিকে একরকম কালো গুঁড়ো জলে ভিজিয়ে তাই দিয়ে চরিত্রের ভুরু, চোখ আঁকা হ'ত। কিন্তু গরমের সময় অভিনয় করতে গিয়ে সেই রঙ ঘামের সঙ্গে ধুয়ে যাওয়ায় একটা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হ'ত। পরবর্তীকালে Blume of Rose বলে একপ্রকার গোলাপী রঙ, জিঙ্ক অক্সাইড, খড়িমাটি আর মেটে সিঁদুরের সাহায্যে অঙ্গরচনা করা হ'ত। মেটে সিঁদুর গুঁড়ো করে পাতলা ন্যাকড়া দিয়ে টোপলা করে পপের কাজ করা হ'ত। তখন ক্রেপ (Crape)-এর কাজ ছিল না। বাধা দাঁড়ি গোঁফ ছিল। গোঁফ আংটার তারের সাহায্যে নাকের মাঝখানে টিপে রাখা হ'ত।

প্রশ্নঃ বৈদ্যুতিক আলো রঙ্গমঞ্চে আসার আগে নাট্য প্রযোজনায় আলোর ব্যবস্থা কি ছিল ?

গ্যাস লাইটের প্রচলন ছিল বেশী। তবে কোন কোন পেশাদারী থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ যাত্রা আসরে ব্যবহৃত 'পাণ্ড লাইট', 'চৌদ্দ লাইট'-এর সাহায্যে থিয়েটারের আলোর ব্যবস্থা করতেন। 'পাণ্ড লাইট' হ্যাচাকের মতন লম্বা স্তম্ভাকৃতির ছিল। হ্যাচাকের মত এটাও পাম্প করা যেত। এ লাইটও গ্যাসে জ্বলত। চৌদ্দ লাইটের ব্যবস্থাগত পদ্ধতি অন্যরূপ ছিল। এতে চিমনির তলায় একটা আধার থাকত। সেই আধারে দাহ্যবস্তু থাকত। আধারের আয়তন অনুসারে একে 'চৌদ্দ লাইট' 'আঠারো লাইট' ইত্যাদি বলা হোত।

সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
(স্বাক্ষর)
১৫.৮.৮১

২। প্রবীন থিয়েটারবিদ্ শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ দত্ত (জন্ম—১২.৯.১৯০৪) ১৯০০ থেকে ১৯২০ সালের বাংলা পেশাদারী থিয়েটারের নাট্যপ্রযোজনার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব।

শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট ৬.৫.১৯৭৯ এবং ২৭.১১.৮১ তারিখে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে আমার আলোচ্য সময়-সীমার বিভিন্ন নাটকের প্রযোজনার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করি। তদুত্তরে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ মতামত জ্ঞাপন করেন। সেই মূল্যবান মতামত নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।

প্রশ্নঃ বিশ শতকের প্রথম দুই দশকের নাটপ্রযোজনার সময় নাট্যঘটনার বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও নাট্য-পরিবেশকে সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য ধ্বনি সংগীতের (Sound effect) গতি প্রকৃতি কি ধরণের ছিল ?

উত্তরঃ তখনকার দিনেও নাটকীয় মুহূর্ত ও তার পরিবেশের ভাব ও রূপ ব্যক্ত করার জন্য সেই সময়কার উপযোগী মাধ্যমগুলির সাহায্যে ধ্বনি সংগীতের (Sound effect) প্রয়োগ করা হ'ত।

লম্বা (প্রায় দুই হাত) ভেঁপুর সাহায্যে সিংহ এবং অন্যান্য পশুপক্ষীর আওয়াজ সৃষ্টি করা হ'ত। একটা টিনের চালুনীর উপর ছোট ছোট লোহার বল রেখে সেগুলির সঞ্চালনের মাধ্যমে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিপাত এবং নদীর কুলকুল ধ্বনির প্রতিরূপ সৃষ্টি করা হ'ত। বেশী বৃষ্টিপাত হলে সেইস্থলে বড় বড় লোহার বল রাখা হ'ত। ঢেউ খেলানো টিনের পাতের উপর মাঝারি ধরণের লম্বা লোহার দন্ড-এর ঘর্ষণের সাহায্যে বজ্রপাত বা মেঘের আওয়াজ-এর প্রতিরূপ গড়ে তোলা হ'ত। বাঁশী ও বেহালাযোগে ঝড়ের আওয়াজের সৃষ্টি করা হ'ত এবং তার সঙ্গে পাতলা টিনের পাতের ঘড়ঘড় শব্দের যোগ থাকত। পিঠের উপর

হাতের তালু দিয়ে আওয়াজের মাধ্যমে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ করা হ'ত। ধ্বনি-সংগীতের জন্য হরবোলার সাহায্যও নেওয়া হ'ত।

চেলো, ড্রাম, বাঁশী, ক্লেরিওনেট, বেহালা, হারমোনিয়াম, পিয়ানো, ডুগী, খোল, লোহার একপ্রকার বিশিষ্ট যন্ত্র (অনেকটা খঞ্জনীর মত দেখতে) ব্যবহার করা হ'ত।

অডিটোরিয়ামের একপ্রান্তে (adjoining the stage···) এই অর্কেস্ট্রা দলের বসাবার ব্যবস্থা করা হ'ত। ঐ জায়গাটুকু একটা শালু দিয়ে আবৃত করা থাকত যাতে Auditorium থেকে দর্শকরা তাঁদের দেখতে না পায়। তবুও 'চেলো' বাদ্যযন্ত্রের মাথা দেখা যেত। Between the Acts—ঐ অর্কেস্ট্রার দল ঐকতানবাদন করত। ঐ ঘেরা জায়গার একদম প্রান্তে 'wiked gate' ছিল। ঐকতান বাদনের পর দৃশ্য অনুযায়ী ধ্বনি-সংগীতের প্রয়োগের জন্য ঐ wiked gate দিয়ে প্রয়োজন অনুসারে অর্কেস্ট্রা দলেব বাদকেরা wings-এর পাশে চলে যেতেন। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সময়ে ঐ wiked gate-এর পরিবর্তে স্টার থিয়েটারে Auditorium floor থেকে stage label-এর যে উচ্চতা তার উচ্চতার মধ্যবর্তী অংশে ছোট দরজা থাকত। সেই দরজা দিয়ে স্টেজের তলা দিয়ে ঐকতানবৃন্দের বাদকেরা wings-এর ধারে চলে যেত।

প্রশ্ন ঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা'র প্রযোজনার বিশেষত্ব কি ছিল ?

উত্তর ঃ এই প্রযোজনার প্রধান আকর্ষণ ছিল মঞ্চের উপর চলমান রেলগাড়ীর অভূতপূর্ব দৃশ্য। সমস্ত রেলগাড়ীটাই দেখান হয়েছিল। প্রথমে রেলগাড়ীর ইঞ্জিন এলো। স্টেশনে থামল। রেলগাড়ীর কামরা থেকে যাত্রীরা ওঠা-নামা করলেন। তারপর গার্ডের নিশানার সঙ্গে সঙ্গে হুইসেল দিতে দিতে ট্রেন চলে গেল। হরবোলার ব্যবহার, রেকর্ডের ব্যবহার এবং ঐকতানবাদনের সহায়তায় রেলগাড়ীর যাওয়া আসার বিভিন্ন রকম শব্দকে পরিস্ফুট করা হয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং নাটকের সময় ও কাল অনুসারে বিভিন্ন চরিত্রের পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থার রীতি কি ছিল ?

উত্তর ঃ ঐতিহাসিক নাটকে হিন্দু ও মুসলমান চরিত্র ভেদে পোষাক পরিচ্ছদের বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যেত। হিন্দু চরিত্রে অভিনেতারা পা পর্য্যন্ত ঝোলানো ঢিলে পাজামা ব্যবহার করতেন। এটা অনেকটা আলখাল্লার মত দেখতে হ'ত। জামার বুকের দিকে নকশা করা কাজযুক্ত কাপড় দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকত। মাথায় পাগড়ী, কোমরপট্টিও ব্যবহার করা হ'ত। মুসলমান চরিত্রে চোস্ত পাজামার উপর আলখাল্লার মত জামা পরিধান করা হ'ত। মুসলমান চরিত্রে অভিনয় করার সময় জামার উপর ওয়েস্ট কোট পরানো হ'ত। মুসলমান চরিত্রের অভিনেতা যে পাজামা পরতেন তার গোড়ালীর দিকটা ব্যাণ্ড দিয়ে আটকান থাকত এবং ওপরটা ফোলা ফোলা রাখা হ'ত।

হিন্দু রাজা মহারাজার চরিত্রে অভিনয়ের সময় কখনো সিল্কের আবার কখনো ভেলভেটের জামা ব্যবহার করা হ'ত। এই পোষাক পরিচ্ছদে শলমা চুমকির কাজ বেশী থাকত। হিন্দু নারী চরিত্রে সিল্ক এবং তাঁতের শাড়ীই বেশী ব্যবহার করা হ'ত। মুসলমান-নারী চরিত্রে পেশোয়াজ, জ্যাকেট এবং ওড়না পরিধান করা হ'ত।

কোন নাটক যখন সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ করা হ'ত তখন পোষাক পরিচ্ছদের খুঁটিনাটির প্রতি খুব নজর রাখা হ'ত। পরে ঐ নাটক দশ পনেরো রজনী অতিক্রান্ত হয়ে গেলে ততটা যত্ন বা দৃষ্টিদান করা হ'ত না। নাটকে প্রদর্শিত ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে সময়ের যে পরিবর্তন সূচিত হ'ত, সেই পরিবর্তনের সঙ্গে পোষাক পরিচ্ছদের পরিবর্তনের গুরুত্ব সর্বদা রাখা হ'ত না। একই পোষাক পরিধান করে অভিনেতা অভিনেত্রীরা নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অভিনয়ের কার্য্য সম্পাদন করতেন। তথাপি 'রাণাপ্রতাপ' নাটকে নাট্যঘটনার সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সমতা রেখে পোষাক পরিচ্ছদের পরিবর্তনের কথা মনে পড়ে। রাণাপ্রতাপের চরম দুঃখ দুর্দশার দিনে আরাবল্লীর পর্বতে পর্বতে যখন তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা কঠোর ব্রত পালন করছিলেন তখন তাঁর অঙ্গে জীর্ণ, মলিন পোষাক পরিধান করানো হয়েছিলো।

পৌরাণিক চরিত্রের পোষাক অনেকটাই ঐতিহাসিক রাজা-মহারাজার মত হ'ত, তবে পোষাকে শল্মা চুমকি এবং জরির কাজ অপেক্ষাকৃত বেশী থাকত। রবি বর্মার অঙ্কিত রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রের পোষাক দেখে প্রযোজনার সময় তাই রিপ্রডিউস (Reproduce) করার প্রচেষ্টা হ'ত।

প্রশ্ন ঃ চরিত্রের বাহ্যিক দিককে তুলে ধরার জন্য তখন অভিনেতারা কি জুতোর ব্যবহার করতেন না নগ্নপদে মঞ্চে আসতেন ?

উত্তর ঃ চরিত্রের অঙ্গসজ্জার মধ্যে পাদুকা ব্যবহারের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হ'ত। প্রধানত নায়কদের জন্য 'ল-পেটা' জুতো ব্যবহৃত হ'ত। ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক চরিত্রের নায়করা 'নাগরাই' ধরনের বিশেষ জুতো ব্যবহার করুতন। নাগরাইগুলি ভেলভেটের দ্বারা মোড়া থাকত। তার ওপর শলমা চুমকির কাজ করা হ'ত। রাজপুতদের থাকত চামড়ার তৈরী শক্ত নাগরাই। মুসলমানদের জন্য কাপড়ের তৈরী নরম (soft) নাগরাই ব্যবহার করা হ'ত। মুসলমান নারী চরিত্রে অভিনেত্রীরা নানা রকমের কাজ করা চটি জুতো ব্যবহার করতেন। কেউ কেউ নগ্নপদেও অভিনয় করতেন। রাণাপ্রতাপ নাটকে আরাবল্লী, পার্বত্যপ্রদেশে রাণাপ্রতাপের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়ানোর অবস্থায় তাঁর অনুচরেরা নগ্নপদেই মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন।

সামাজিক নাটকে অভিনেতারা পামশু, গ্রীসিয়ান স্লিপার, এলবার্ট স্লিপার ব্যবহার করতেন। এছাড়া প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের জুতোও ব্যবহার করা হ'ত।

প্রশ্ন ঃ অঙ্গ রচনার জন্য অভিনেতারা কিরূপ যত্নবান ছিলেন ? এ বিষয়ে তাঁরা কি কি ধরনের উপকরণ ব্যবহার করতেন ?

উত্তর ঃ সুষ্ঠু অঙ্গরচনার জন্য তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। তখনকার দিনে প্রচলিত উপাদান যথা রঙ, পেউরি ব্যবহার করা হ'ত। প্রথমদিকে কালো ভুষি, কাজল ইত্যাদি দিয়ে চোখ-মুখের বিভিন্ন অংশকে চরিত্রোপযোগী করে গড়ে তোলা হ'ত। যুদ্ধ বা খুনের দৃশ্যে রক্তাপ্লুত অবস্থায় আহত হবার ঘটনাকে বাস্তবের মত করে দেখানোর জন্য গোলা সিঁদুর এবং আলতা ব্যবহার করা হ'ত। রক্তপাতের দৃশ্যে পোষাকের অন্তরালে কোনো পাতলা ব্যাগ বা ঐ জাতীয় আধারে আলতা রাখা হ'ত। সেইস্থলে ছুরি বা অস্ত্রের আঘাত করা হলে ঐ আধারের কর্তিত অংশ দিয়ে আলতা পড়তে থাকলে মনে হ'ত যেন রক্ত পড়ছে।

নাটকের গোড়ার দিকে অভিনেতা, অভিনেত্রীদের চুল, দাড়ি ইত্যাদি দড়ির সাহায্যে কানের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হ'ত। পরে দড়ির বদলে সরু তারের ব্যবহার প্রচলিত হয়। অভিনেতাদের গোঁফের ক্ষেত্রে দুই পাটি গোঁফের সঙ্গে যুক্ত লোহার আংটা অভিনেতাদের নাসারন্ধ্রের দুইপাশ দিয়ে আটকে দেওয়া হ'ত। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সময় থেকে স্টার থিয়েটারে Spirit-gum-এর সাহায্যে চুল ও দাড়ির কাজ করা হ'ত। চীৎপুরের wig maker-রা নাটকের মহলা চলার সময় উপস্থিত থেকে অভিনেতাদের মাথার মাপ নিয়ে গিয়ে wig তৈরী করতেন। চরিত্র অনুসারে wig-এর বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য রাখা হ'ত।

প্রশ্ন ঃ আলোর সাহায্যে নাটকীয় মুহূর্তগুলি কিভাবে পরিস্ফুট করা হ'ত ?

উত্তর ঃ নাট্যপ্রযোজনায় আলোর ব্যাপক প্রয়োগ সম্পর্কে চিন্তা, ভাবনার উন্নতি অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সময় থেকেই সূচিত হয়। বৈদ্যুতিক আলো সহজলভ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই চিন্তা ভাবনা সম্বলিত নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরও সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হতে থাকে।

মঞ্চে ফুট লাইটের দুই তিনটি সারি থাকত। এই অলোগুলি বিভিন্ন রঙিন কাগজে মোড়া থাকত। আলোর সারির ওপরে মোটা পিসবোর্ড বা মোটা কাগজের আস্তরণ দিয়ে তা ঢেকে রাখা হ'ত। দৃশ্যের ঘটনা অনুসারে রঙিন কাগজ-এর সাহায্যে রঙিন আলোরও ব্যবহার করা হয়। পরে এরজন্য রঙিন কাগজের বদলে রঙিন কাঁচের ব্যবহার হতে থাকে। ১৯১০-১৯১১ সাল নাগাদ মঞ্চের গোপন দ্বারে Arch Lamp বসিয়ে এর সাহায্যে নাটকীয় বিশেষ মুহূর্ত ও অভিনেতা অভিনেত্রীর বিশেষ অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করা হ'ত। মঞ্চের পিছনে রঙিন কাপড় ও আলোর সাহায্যে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক পরিবেশকে ফুটিয়ে তোলা হ'ত। নদীর তরঙ্গ দেখানোর সময় মঞ্চের পিছনে নদীর তরঙ্গের মত ঢেউ খেলানো পিসবোর্ডের সারি রাখা হ'ত এবং সেই সারির মধ্যবর্তী ফাঁকা অংশে কাপড়ের রোল রাখা হ'ত। সুতো বা তারের সাহায্যে পিসবোর্ডের অংশগুলি

এবং সেইসঙ্গে কাপড়ের রোলের আন্দোলনের দ্বারা তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ নদী বা সমুদ্র দেখানো হ'ত। এই নদীগর্ভের মাঝখানে পিসবোর্ড বা মোটা কাপড়ের সাহায্যে পর্বতের সৃষ্টি করা হ'ত। এত দূর থেকে মনে হ'ত যে মাঝখানে পর্বত এবং তার পাশ দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ এ সময় আলোর ব্যবস্থা ও মঞ্চ ব্যবস্থার সাহায্যে বিভিন্ন নাট্যপ্রযোজনায় মঞ্চের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রকার মঞ্চ-মায়ার (stage-illusion) সৃষ্টি করা হ'ত সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন নাট্যপ্রযোজনার বিষয়ে জানতে চাই।

উত্তর ঃ সবকিছু মনে নেই। তবে কোন কোন নাটকের বিশেষ মঞ্চমায়ার কথা আমার স্মরণে এখনও জাগ্রত অবস্থায় আছে।

'রিজিয়া' নাটকে পিসবোর্ড ও কাঁচের সাহায্যে গিরিশৃঙ্গ প্রস্তুত করা হয়েছিল (৫।৩ দৃশ্য)। সেই গিরিখাতের সান্নিহিত স্থানে কাপড়ের রোল ও মোটা কাপড়ের সাহায্যে প্রবাহিত যমুনা নদীর মঞ্চমায়া সৃষ্টি করা হয়েছিল। দুর্গের ওপর থেকে ইন্দিরা এই যমুনা নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল। সে সময় পিচকারীর সাহায্যে নীচ থেকে জল ছেটানো হয়েছিল। কাটা, ঝোলা, অংকিত দৃশ্যের সাহায্যে নাটকের যুদ্ধের শিবির, উদ্যান দেখান হ'ত। কালো পোষাক পরে ঘাতক বীরেন্দ্রের কাটামুণ্ডু নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হতেন। দর্শকদের মধ্যে একটা শিহরণ জেগে উঠত।

'মাধব রাও' নাট্যপ্রযোজনার সময় ঐ একই প্রক্রিয়ার সাহায্যে নন্দী দুর্গ এবং দুর্গের উভয় পার্শ্বস্থ গিরিনদী দেখান হয়েছিল।

'অশোক' নাটকের চতুর্থ অংকের পঞ্চম দৃশ্যে কুণালের চক্ষুদ্বয় উৎপাটনের পর একটা রুপোর পাত্রে কুণালের উৎপাটিত চক্ষুদ্বয়কে মঞ্চে আনা হ'ত। কুণালকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের দৃশ্যে মঞ্চের দুইপাশে আগুন জ্বালানো হ'ত এবং মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় কুণাল ঝাঁপ দিয়ে পড়তো। অনেক সময় wings-এর পাশ দিয়ে সামনে রাখা আগুনের পিছন দিকে কুণাল ঝাঁপ দিত।

'বঙ্গে রাঠোর' নাটকের শেষ দৃশ্যে মোটা পিসবোর্ড ও কাঠের ফ্রেম দিয়ে মন্দির বানানো হ'ত। 'রঙ্গলাল' চরিত্রের অভিনেতা কাঁধ দিয়ে ভেঙে পড়া খিলান তুলে 'কলি বেগমকে' বাইরে নিয়ে আসত। কিন্তু নিজে বেরোবার সময় রঙ্গলাল ভারী খিলান আর তুলতে না পেরে আস্তে আস্তে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা পড়ে যেত। দৃশ্যটি খুব আকর্ষণীয় হয়ে উঠত।

'বৃন্দাবন বিলাস' নাটকে কৃষ্ণের কালী মূর্তিতে পরিবর্তন দেখানো হয়েছিল। কৃষ্ণ একটা গাছের কাট আউটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। গাছের কাট আউটের পিছনে কালীমূর্তি স্থাপন করা থাকত। কৃষ্ণের কালীমূর্তিতে পরিবর্তনের সময় কাট আউটের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ ঘুরে পিছন দিকে চলে যেত এবং কাট আউটের পিছনে থাকা কালীমূর্তি সামনে চলে আসত। কাপড়ের রোলারের সাহায্যে মেঘদল পাঠান

নাটকের (৩।৬ দৃশ্যে) জাহ্নবী নদী দেখান হ'ত। সে সময় একটি কাপড়ের রোলারের সঙ্গে আর একটি কাপড়ের রোলার যুক্ত করার সময় মাঝখানে কিছু ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করা হ'ত। সেট দূর থেকে বোঝা যেত না। হুমায়ুন যুদ্ধ করতে করতে সেই ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পড়তো। প্রেক্ষাগৃহ থেকে মনে হ'ত হুমায়ুন তরঙ্গায়িত জাহ্নবী নদীতে ডুবে যাচ্ছেন। ফাঁকা জায়গার তলায় কিছু খড় ও চট রাখা হ'ত। যাতে করে হুমায়ুন চরিত্রের অভিনেতা পড়ে গিয়ে আঘাত না পায়। এ নাটকের শেষ দৃশ্যে কমলা চরিত্রাভিনেত্রী ছোট বাঁশের মাথায় পাট জড়িয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করতেন। এটা মশাল হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত।

'দেবলাদেবী' নাটকে মঞ্চের মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে লক্ষ্মীবাঈকে দেখান হয়েছিল। 'লক্ষ্মীবাঈ' অশ্বপৃষ্ঠে সৈন্যদের যুদ্ধে উৎসাহিত করতেন। এরজন্য মনোমোহন থিয়েটারে মাসিক হিসেবে ঘোড়া ভাড়া করা হয়েছিল।

[এই সাক্ষাৎকারটি ৬.৫.৭৯ এবং ২৭.১১.৮১-তে নেওয়া হয়েছিল]

হরীন্দ্রনাথ দত্ত
(স্বাক্ষর)
২৭.১১.৮১

২। (আ) শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে আর একটি সাক্ষাৎকার।

প্রশ্ন : বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের একাধিক নাটকের নাট্যপ্রযোজনা বঙ্গ রঙ্গালয়ের দর্শকগণের মনে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এই আলোড়ন সৃষ্টির কারণ কি?

উত্তর : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকগুলির মঞ্চসাফল্য খুবই উল্লেখযোগ্য। মূলত তাঁর নাট্যসংলাপের সাহিত্যিক ও আভিনয়িক গুণ এবং সুললিত ও ওজঃগুণযুক্ত ভাষার প্রয়োগদীপ্ততা অভিনেতাদের খুব উদ্দীপ্ত করত। নাটকের গঠন ভঙ্গিমার বলিষ্ঠতায় চরিত্রগুলি খুবই প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। এছাড়া অভিনেত্রী সুশীলার কণ্ঠস্বরের ঐশ্বর্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাট্যসংগীতগুলিকে মঞ্চে প্রাণমুখর করে তুলত। নাট্যপ্রযোজনার দিক দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকের এ এক উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব।

প্রশ্ন : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক প্রযোজনার সময় আলো ও মঞ্চ ব্যবস্থার সাহায্যে নাট্যঘটনার পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য বা অভিনয়কে দীপ্ত করে তোলার জন্য কিভাবে মঞ্চমায়ার সৃষ্টি করা হ'ত?

উত্তর : তাঁর নাট্যপ্রযোজনার কিছু কিছু দিক আজও আমার মনকে ভরিয়ে রেখেছে। দৃশ্যসজ্জা, রূপসজ্জা ও নাটকে দর্শকদের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমার স্মরণে আসছে। তবে বয়স হয়েছে তো। তাই একটু সময় লাগবে বলতে।

'রাণাপ্রতাপ' নাটকে হলদিঘাট যুদ্ধে পরাজিত রাণাপ্রতাপ তাঁর প্রিয়সঙ্গী চৈতক-এর মৃতদেহের উপর মাথা রেখে দুঃখে, বেদনায় ভেঙ্গে পড়েন। সে সময় মঞ্চে চৈতককে দেখান হয়েছিল। বাঁশের কঞ্চি, খড় ও সাদা কাপড় দিয়ে ঘোড়া তৈরী করা হয়েছিল। ঐ দৃশ্যে মঞ্চে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। মৃত চৈতককে নিয়ে রাণাপ্রতাপের শোকোচ্ছ্বাস খুবই মর্ম্মস্পর্শী হয়ে উঠেছিল। প্রতাপ সিংহকে বাঁচানোর জন্য শক্তসিংহ দুই মোঘল সৈন্য 'খোরাসান' ও 'মুলতানকে' হত্যা করে প্রতাপকে 'দাদা' 'দাদা' বলে জড়িয়ে ধরতে যায়। সম্বিত ফিরে পাবার পর শক্তসিংহ যে মোঘল রাজের প্রতিনিধি হয়ে তাঁকে বন্দী করতে না এসে ভাই-এর মতই তাঁর কাছে এসেছে রাণাপ্রতাপ তা বুঝতে পারেন। তখন রাণাপ্রতাপ শক্তসিংহকে ভাই ভাই বলে আলিঙ্গন করেন। সে সময় পূর্বকৃত কর্মের জন্য ক্ষোভ, লজ্জা আর বর্তমানে দাদার সঙ্গে মিলিত হবার আনন্দে উদ্বেল শক্তসিংহের মনোগত ও হৃদয়গত অবস্থা অমৃতলাল বসু মুখজ অভিব্যক্তির দ্বারা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করেন। এ অভিব্যক্তি দেখে আমার মত অনেক ব্যক্তি বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

'দুর্গাদাস' নাটকে রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় 'রাজিয়া' শিবিরের মধ্যে বসে গান গাইছিলেন। বাইরে ঝড়, বৃষ্টি ও বিদ্যুতের দাপটে প্রাকৃতিক অবস্থা দুর্যোগপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এ অবস্থাকে দেখানোর জন্য কাটা ও ঠেলা সিনের সাহায্যে শিবিরের বাঁদিকে একটা জানালা তৈরী করা হয়েছিল। যন্ত্রসংগীতের সাহায্যে ঝড়, বৃষ্টির আওয়াজ এবং জানালার পিছন দিক দিয়ে মঞ্চের আলোকে বাড়িয়ে কমিয়ে বিদ্যুতের বাস্তব বিভ্রমকে দৃশ্যায়িত করা হয়েছিল।

'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের দ্বিতীয় অংকের পঞ্চম দৃশ্যে চন্দ্রগুপ্ত অধিক ভ্রাতৃস্নেহের জন্য নন্দকে বধ না করে তাকে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরেন। সে সময় নন্দের অন্যান্য সৈনিকগণ চন্দ্রগুপ্তকে মারতে উদ্যত হলে চন্দ্রগুপ্তকে বাচানোর জন্য ছায়া ও চন্দ্রকেতুর নেতৃত্বে অন্যান্য সৈন্যগণ তখন নন্দকে বধ করতে উদ্যত হয়। এই দৃশ্যে মঞ্চের পিছনের দিক থেকে সামনে আসার জন্য একটা সেতু তৈরী করা হয়। চাণক্য সেই সেতু দিয়ে মঞ্চের সামনে আসতে আসতে চন্দ্রকেতুকে নির্দেশ দেন—"বধ করো না বন্দী করো"। দৃশ্যটি খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। এ নাটকে চাণক্যের ভূমিকায় [illegible] অভিনয় খুব উল্লেখযোগ্য। তিনিই এ নাটকে চাণক্যের অভিনয়ের দ্বারা সমগ্র নাটকটিকে Pervade করেছিলেন। নাটকের ১।৩ দৃশ্যে নন্দের মাতামহের শ্রাদ্ধে পৌরহিত্য করতে চাণক্য নন্দের রাজদরবারে উপস্থিত হন। সেখানে রাজা নন্দ ও বাচাল চাণক্যকে অন্যায়ভাবে অপমানিত করে। সেই অপমানিত হবার দৃশ্যে তাঁর অভিব্যক্তি অতুলনীয়। অপমানিত হবার পর তিনি

মহারাজ নন্দকে অভিসম্পাত করেন। ব্রাহ্মণ হিসাবে শূদ্রের এই আচরণের সমুচিত জবাব দেবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। সে সময় তিনি ক্রোধে সর্বশরীর থর থর করে কাঁপাতেন ও নন্দকে উদ্দেশ্য করে তাঁর সংলাপ বলতে বলতে মঞ্চ থেকে চলে যেতেন। এটা এত সাবলীল ও প্রাণস্পর্শী হ'ত যে তিনি কখন বেরিয়ে গেলেন তা বোঝা যেত না।

এ নাটকের তৃতীয় অংকের ষষ্ঠদৃশ্যে নন্দকে বধ করার দৃশ্যে সত্য সত্যই নন্দকে হাড়িকাঠে ফেলে খড়্গাঘাত করা হ'ত। নন্দের মাথা ছাড়া শরীরের অংশটি দর্শকদের সামনে থাকত। মাথা থাকত Back stage-এর দিকে। তাই খড়্গাঘাত করা হোলে মনে হ'ত বুঝি সত্য সত্যই মাথা কেটে গেছে। যূপকাষ্ঠের পিছনে লাল রং গোলা থাকত। চাণক্য সেই রঙকে নন্দের রক্তরূপে ব্যবহার করে তাঁর শিখা বন্ধন করতেন।

মেয়ে আত্রেয়ীকে ফিরে পেয়ে চাণক্যরূপী দানীবাবু কাত্যায়ণের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে বলতেন "কাত্যায়ণ, নাড়ী দেখতে জানো? দেখত আমি বেঁচে আছি কিনা।" এ দৃশ্যে আনন্দের আতিশয্যে বাষ্পরুদ্ধ চাণক্যের মনোগত অবস্থাকে দানীবাবু যেভাবে মূর্ত করে তুলেছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পরবর্তীকালে চাণক্যের চরিত্রাভিনয়ে শিশিরবাবুও দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। দানীবাবুর তুলনায় তাঁর কণ্ঠস্বর খুব মধুর ছিল। কণ্ঠে ভাবের ব্যাপ্তি ও গভীরতা ভালো প্রকাশ পেত। এই দৃশ্যে মেয়েকে ফিরে পেয়ে চাণক্যের সংলাপ— "কাত্যায়ণ! শোন, কুঞ্জবনে একটা সামস্তোত্র উঠছে না···আমায় ঘরে নিয়ে চল" —শিশিরবাবুর এই অংশের অভিনয় অধিকভাবে হৃদয়কে নাড়া দিত। চন্দ্রগুপ্তকে যুদ্ধে উদ্দীপ্ত করার জন্য তাঁর সম্মুখে মায়ের প্রকৃতি বর্ণনার কালেও শিশিরবাবুর অভিনয় দক্ষতা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

পোষাকের দিক থেকেও যতখানি পারা যেত চরিত্রানুগ করে তোলার চেষ্টা হ'ত। তবে এ যুগের চিন্তাধারা দিয়ে সে যুগের প্রযোজনাকে বিচার করলে ভুল করা হবে। মেবার পতনে চারণীরা কখন লাল আবার কখন সবুজ চওড়া পাড়-যুক্ত গেরুয়া রঙের শাড়ী পড়তো। একে তখনকার দিনে 'হাতীপাড় শাড়ী' বলা হ'ত।

মেবার পতন নাটকের মূল ভাবের আকর্ষণই দর্শককে টানতো। অভিনয় এবং প্রযোজনার দিক থেকে সে রকম উল্লেখযোগ্য কিছু মনে পড়ছে না।

হরীন্দ্রনাথ দত্ত
(স্বাক্ষর)
২৪·১·৮৪

শ্রীযুক্ত হরীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট নাট্যসমালোচক শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লেখা পত্র।

The University
Lucknow

মেজবাবু,

আমি যুবা বয়সে অমরবাবুর একপ্রকার অন্ধভক্ত ছিলাম। যেটা আমাকে মোহিত করত সেটা তার personality—স্টেজে নামলেই গম্ গম্ করত। তাছাড়া কণ্ঠস্বর ও আবৃত্তির ভঙ্গী ছিল অনবদ্য। বোধহয় অমৃত মিত্রের কণ্ঠ বেশী সুমিষ্ট ছিল। কিন্তু অতটা উদাত্ত ছিল না। সেই কণ্ঠের flow ছিল ভরা নদীর মতন। যাকে জোয়ারি বলে। তা তো ছিলই আরো ছিল গমক, মীড়। অর্থাৎ ধ্রুপদী recitation. অঙ্গভঙ্গী ছিল ঐ ধরনের, অর্থাৎ dignified—কেবল মুখের মাংসপেশী চালু ছিল না। Serio comic part-এ যেমন 'অঘোরে' তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

এক রাত্রে তাঁর প্রদত্ত ছাতা নিয়ে বাড়ি ফিরি মনে পড়ে। He was a genius —এই কথাটি সত্যি। কি জানি কেন, কেবলই Byron-এর সঙ্গে তাঁর চরিত্রের তুলনা করতে ইচ্ছা হয়।। অমন vitality খুব কম লোকের মধ্যে আছে।

প্রণাম নিও—

ইতি—
ধূর্জটি
শনিবার।

৩। জোড়াসাঁকো এবং শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর (জন্ম—১১ই জুন, ১৯০১। প্রয়াণ—১০ই মে, ১৯৮৫) সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

প্রশ্ন ঃ রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনায় আলোর প্রয়োগ ব্যবস্থা কিরূপ ছিল ?

উত্তর ঃ প্রথমাবস্থায় একপ্রকার কেরোসিনের আলোর ব্যবহার করা হ'ত। পরে গ্যাস-এর আলো আসে। ১৯১৭ সাল থেকে শান্তিনিকেতনে বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহৃত হয়। শিলাইদহে জমিদারী কার্য্যের তত্ত্বাবধানের জন্য একটা ডায়নামো ক্রয় করা হয়েছিল। পরে সেই ডায়নামোটা শান্তিনিকেতনে এনে সেখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সমগ্র শান্তিনিকেতনে আলোর ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমদিকে কেরোসিনের আলো থাকার ফলে মঞ্চকেই শুধুমাত্র আলোকিত করা হ'ত। এর অতিরিক্ত কিছু করা সম্ভবপর হয়ে উঠত না। গ্যাসের আলোর সেই আলোর অবস্থাকে কিছু পরিমাণে উজ্জ্বল করে তোলার সুবিধা হ'ত। ১৯১৭ সাল থেকে

ডায়নামোর সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের দ্বারা যে আলোর ব্যবস্থার সৃষ্টি হ'ল, তার দ্বারা নাট্যপ্রযোজনায় আলোর মান গুণগত এবং পরিমাণগত ভাবে উৎকৃষ্ট হ'ল। তবে বিভিন্ন দৃশ্যের বিশিষ্ট মুহূর্ত বা চরিত্রের বিশিষ্ট দিকগুলি পরিস্ফুট করে তোলার জন্য, মুড লাইট-এর ব্যবহার বা আলোর কোন বিশিষ্ট প্রয়োগ পদ্ধতি তখনো পর্য্যন্ত গড়ে ওঠেনি।

প্রশ্ন ঃ নাট্যপ্রযোজনায় মঞ্চসজ্জাকে কিভাবে কাজে লাগান হ'ত ?

উত্তর ঃ মঞ্চের প্ল্যাটফরম তৈরী হ'ত অডিটোরিয়াম থেকে দুই ফুট উঁচুতে। দেবদারু পাতা দিয়ে উইংস তৈরী হ'ত। ড্রপ সীন একটা ছিল এবং বহুদিন ধরে তা ব্যবহৃত হ'ত। সেই ড্রপসীনটি মুকুলদেবের অংকিত ছিল। ড্রপসীনের মাঝখানে শিবের তাণ্ডব নৃত্য আঁকা থাকত। পরবর্তীকালে এই ড্রপসিন-এর প্রচলনও রবীন্দ্রনাথ অপ্রয়োজনীয় মনে করতেন বলে সেটা ব্যবহার করতেন না। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বোস, সুরেন্দ্রনাথ কর প্রমুখ শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের দ্বারা অংকিত রাজপথ, নদীতীর, প্রাসাদ ইত্যাদি সম্পর্কিত দৃশ্যগুলি মঞ্চে ব্যবহৃত হ'ত। পরবর্তীকালে তিনি এ সকল দৃশ্যপটকে নাট্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভারস্বরূপ বলে মনে করেছিলেন। নাট্যপ্রযোজনায় তাঁর লক্ষ্য ছিল চিত্তপটকে অভিনয়ের মাধ্যমে দৃশ্যপটে রূপান্তরিত করা। এক্ষেত্রে তিনি নাট্যসংলাপ বলার ধরণ এবং অভিনয়ের অভিব্যক্তিকে জোর দিয়েছিলেন। এর সাহায্যেই তিনি দর্শকমনে স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে তুলতেন। 'শারদোৎসব' নাটকে বেতসিনী নদীর রূপকল্প গড়ে তোলার জন্য মাটির সাহায্যে নদীর একটা মঞ্চমায়া তৈরী করা হয়েছিল। তাতে জল দেখা যায় নি, তবে নদীর এপার এবং ওপার দেখা গিয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ চরিত্রাভিনয়ের জন্য রূপসজ্জা ও অঙ্গসজ্জার প্রয়োগ পদ্ধতির স্বরূপ কি ছিল ?

উত্তর ঃ ঠাকুর পরিবারের দিনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ- গগনেন্দ্রনাথ সকলেই এক একেকজন যথার্থগুণী শিল্পী। যে কোন শিল্প প্রচেষ্টায় তাঁদের সৃজনশীল প্রতিভার স্পর্শ লাগতো। নাটকের রূপসজ্জা এবং অঙ্গসজ্জাও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রথমাবস্থায় চিৎপুরে অবস্থিত পোষাকের দোকান থেকে পোষাক ভাড়া করে নিয়ে যাওয়া হ'ত শান্তিনিকেতনে। রাজা, রাণী, প্রতিহারী, সৈন্য ইত্যাদি চরিত্রের পোষাক এইভাবেই সংগ্রহ করা হ'ত। কিন্তু প্রথম দুই এক বৎসর এইভাবে চললেও পরবর্তীকালে এ ধরনের পোষাক আর ব্যবহার করা হত না। উপরের উল্লিখিত চরিত্র এবং অন্যান্য নাট্যচরিত্রের পোষাক কি হবে তা দিনেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে সেখানকার ছাত্র এবং অধ্যাপকেরা স্থির করতেন এবং নিজেরাই সেই পোষাক তৈরী করতেন। ঠাকুরবাড়ীর পোষাকও কিছু কিছু ব্যবহৃত হ'ত।

অঙ্কন শিল্পে ঠাকুর পরিবারের সকলেই পারদর্শী ছিলেন। তাই চরিত্রের

অঙ্গরচনার কাজটি খুব [illegible] সম্পন্ন হ'ত। অঙ্গসজ্জার জন্য সে সময় যে সব উপকরণ পাওয়া যেত তাই দিয়েই অঙ্গসজ্জার কাজ সম্পন্ন করা হ'ত।

প্রশ্ন : নাট্যপ্রযোজনায় ধ্বনি ও শব্দসংগীতের প্রয়োগ পদ্ধতির বিশেষত্ব কি ছিল ?

উত্তর : নাটকের বিভিন্ন বিশিষ্ট মুহূর্তের জন্য নেপথ্যে কোন প্রকার আবহ-সংগীতের প্রচলন ছিল না। তবে নাটকে সংগীত চলার সময় প্রথমদিকে হারমোনিয়ামের ব্যবহার করা হ'ত। উইংস-এর ভেতর থেকে এই হারমোনিয়ামের শব্দ সংগীতের প্রয়োগ করা হ'ত। কিন্তু এই হারমোনিয়ামে সংগীতের 'শ্রুতির' যে ভাগ আছে তার ভাব পরিস্ফুট হ'ত না। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তী-কালে নাটকে হারমোনিয়ামের ব্যবহার করতেন না। সেই স্থলে তারের যন্ত্র বিশেষত এসরাজ ব্যবহার করতেন। অবশ্য প্রথম থেকেই 'বায়া তবলা, খোল' ইত্যাদির প্রচলন ছিল। সংগতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা যে সর্বদাই উইংসের ধারে বসতেন তা নয়। মঞ্চের পিছনে একটা কালো বা নীল কাপড়ের আড়ালেও অবস্থান করতেন। তাতে সংগতকারীদের দেখা যেত না, তবে যন্ত্রাদির কিছু অংশ দেখা যেত। বর্তমানে গীতিনাট্যের ভাষ্যকার এবং সংগতকারীরা যেভাবে মঞ্চের পিছনে বসে নাটকে অংশগ্রহণ করেন—এই ধারাই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সেই সময় প্রচলিত হয়েছিল।

প্রশ্ন : কিভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকের পরিচালনার কাজ সম্পন্ন করতেন ? তাঁর নিজস্ব অভিনয় ধারার বিশেষত্ব কি ছিল ?

উত্তর : তাঁর অভিনয় ধারা ছিল খুবই স্বাভাবিক রকমের। সংলাপ বলার ধরণ ছিল দৈনন্দিন কথোপকথন প্রচেষ্টার শৈল্পিক রূপ। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি নাট্যকারদের সংলাপে ভাব, ভাষা, অলঙ্কারের আতিশয্য আছে। এর ফলে অতিরিক্ত আবেগের সাহায্যে কিছুটা কৃত্রিমভাবে সংলাপ বলার ধরন সে সময়কার নাট্য প্রযোজনায় লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংলাপের গঠনে এই আতিশয্য নেই। তাই অভিনয়ের সময় সংলাপ প্রক্ষেপণে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। তবে পদ্যে রচিত সংলাপে স্বভাবতই সুর ও ছন্দের সাম্য বজায় রাখার জন্য গদ্য সংলাপ অপেক্ষা কিছু অধিক আবেগের ব্যবহার করতেন, তবে খুব Flourish ভাবে সংলাপ তিনি বলতেন না বা বলতে শেখাতেনও না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ব ভ্রমণ করেছেন। বিশ্বের অনেক মহান শিল্পী ও পরিচালকদের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে পরিচিতি লাভও করেছিলেন। কিন্তু তাঁর নাট্য পরিচালনায় কোন বিদেশী পরিচালকদের প্রভাব পড়েনি। ভারতীয় সংস্কৃতির সাধক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজস্ব শৈল্পিক চিন্তার ছাপ তাঁর নাট্য-পরিচালন কার্যেও মূর্ত হয়ে উঠত। জাভা-বালিদ্বীপের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা এবং সেখানকার [illegible] সুষমা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল এবং তাঁর নাটকের নৃত্যাদির

সংযোজনার প্রেরণা দান করেছিল। তবুও তাঁর নৃত্যপরিকল্পনা তাঁর বিশাল প্রতিভার আলোকে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠত।

প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাট্যপ্রযোজনার ক্ষেত্রে যাত্রার মত মুক্ত আসর (open stage) ব্যবহার করেন নি। অথচ প্রয়োগ পরিকল্পনার দিক থেকে তিনি যাত্রার মুক্ত আসরের প্রতি তাঁর হৃদয়ের আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। এর কারণ কি ?

উত্তর : এটা সর্বৈব সত্য যে তিনি যাত্রার মুক্ত আসরকে নাট্যপ্রয়োগ পরিকল্পনার দিক থেকে আদর্শ স্থানীয় বলে মনে করতেন। জোড়াসাঁকোতে স্থানাভাবের জন্য সেটা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদালানে নাটক হ'ত। ঐ দালানের স্থাপত্যগত গঠনভঙ্গী প্রসেনিয়াম মঞ্চের মত। শান্তি-নিকেতনেও তিনি প্রসেনিয়াম মঞ্চ ব্যবহার করেছিলেন। তবে মাঝে মাঝে ছোট ছোট নাট্যানুষ্ঠানগুলি তিনি আম্রকুঞ্জের মুক্ত অঞ্চলে অনুষ্ঠিত করতেন। মুক্ত আসরের প্রতি তাঁর হৃদয়ের আনুগত্যের এটা একটা পরিচয় বিশেষ। তবে যাত্রার আদর্শেই তিনি নাটকের দৃশ্যপটাদি ব্যবহারের আতিশয্য বর্জন করেছিলেন। অভিনয়কে নাটকের প্রাণ বলে গ্রহণ করে চিত্তপটকে দৃশ্যপটে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন।

প্রশ্ন : তৎকালীন পাবলিক স্টেজের প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা কি ছিল ?

উত্তর : ঠাকুর পরিবারে কেউই পাবলিক স্টেজের অভিনয় দেখতে যেতেন না। একমাত্র শিশিরবাবুর নাট্যপ্রযোজনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাই তাঁর প্রযোজনা দেখতে তিনি গিয়েছিলেন। শিশির ভাদুড়ীও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, শিল্প ও রবীন্দ্র প্রতিভার অন্যান্য দিকের একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন।

শান্তিনিকেতনে প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যানুষ্ঠানের প্রয়োগ পরিকল্পনা সম্পর্কে রবীন্দ্র জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের (জন্ম—২৫·৭·১৮৯২। প্রয়াণ—৮·১১·১৯৮৫) সহিত সাক্ষাৎকার—

☐ আলোর ব্যবস্থা কি ধরণের ছিল ?

আমাদের সে যুগে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার ছিল না। তাই নাটকে আলোর প্রয়োজনীয়তা লণ্ঠণ এবং ল্যাম্পের সাহায্যে পূরণ করা হ'ত। ল্যাম্প হচ্ছে একটা কাঁচের বাটি। তার মধ্যে কেরোসিন তেল ভর্তি করে তার ওপর একটা সলতে দেওয়া থাকত। আর সবার ওপর থাকত কাঁচের চিমনি। এই ধরণের ল্যাম্প Foot light হিসাবে ব্যবহৃত হোত। এই ল্যাম্পগুলি থাকত শান্তি-

নিকেতনের বাড়িতে (বর্তমানে অতিথিশালায় রূপান্তরিত)। আগে শান্তিনিকেতন বলতে শুধুমাত্র এই বাড়িটিকে বোঝাত, সমগ্র অঞ্চলটিকে নয়। এই শান্তিনিকেতনের তত্ত্বাবধায়ক (care taker) ছিলেন দিপু ঠাকুর। ল্যাম্পগুলি শান্তিনিকেতনের মন্দিরে উপাসনার সময় ব্যবহার করা হ'ত। নাটকের সময় এই ল্যাম্পগুলি Foot light হিসাবে ব্যবহার করার জন্য মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হ'ত। Foot light এর পিছনে একটা পর্দা লাগান হ'ত যাতে শুধুমাত্র ল্যাম্পগুলি ঢাকা পড়ে এবং ল্যাম্পের আলো দর্শকের চোখে না পড়ে। নাটকের কোন বিশিষ্ট মুহূর্তের সময় বা চরিত্রের বিভিন্ন Perspective বোঝানোর জন্য আলোর কোন আঙ্গিকগত প্রক্রিয়া ছিল না।

☐ মঞ্চ সজ্জার বিশেষত্ব কি ছিল ?

প্রসেনিয়াম মঞ্চের ব্যবস্থা ছিল। তবে বর্তমান মঞ্চের উন্নত অবস্থা তখন ছিল না। সামনের দিকে দুই একটা wings থাকত। আর মঞ্চের পিছনে থাকত কালো চাদর। নদ-নদী, প্রান্তর, রাজগৃহ, যুদ্ধক্ষেত্র প্রভৃতি দৃশ্যাবলীর ব্যবস্থাও ছিল না। কালো পর্দার উপর অভিনয় হ'ত। সংলাপ থেকে নাট্যগত পরিস্থিতি, পরিবেশ, অবস্থান বুঝে নিতে হ'ত। যেমন যাত্রায় হয়। পিছনে Green Room এর ব্যবস্থা ছিল। আর থাকত Drop sceen। শান্তিনিকেতনের ছাত্র মুকুল দে Drop Sceen তৈরী করেন। Drop Sceen এর উপর শিবের তাণ্ডব নৃত্য আঁকা থাকত। মঞ্চসজ্জা, অঙ্গরচনা, এসব কিছুই তখন আশ্রমের ছেলেরা নিজেরাই করত।

☐ শব্দ ও ধ্বনি সংগীতের প্রয়োগ ব্যবস্থা কিরূপ ছিল ?

নাটকে গানের সময় বাজনা বাজত। এর মধ্যে এসরাজের প্রাধাণ্য ছিল বেশী। তবে অন্য কোন প্রকার শব্দ ও ধ্বনী সংগীতের সাহায্যে নাট্যাভিনয়ের বিশেষ মুহূর্ত্তকে অধিক প্রাণময় ও গতিময় করে তোলা হ'ত না। নাটকে শুধুমাত্র খালি গলায় গান করা হ'ত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রায় ক্ষেত্রেই খালি গলায় গান করেছেন।

☐ অভিনেতা রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব কি ছিল ?

অভিনয় প্রসঙ্গে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় He is a born Artist, Dramatist and also an Actor. খুব ছোট বেলা থেকেই তিনি অভিনয় করতে শুরু করেন। অভিনয় তাঁকে কেউ-ই শেখায়নি। তিনি নিজের নাটকেই অভিনয় করতেন। ফলে চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে, চরিত্রের মর্ম্ম এবং ধর্ম্ম তিনি অভিনয়ের বহু পূর্ব্বেই অনুধাবন করতে পারতেন। এসবের দিকে লক্ষ্য রেখেই (অর্থাৎ চরিত্রের আদর্শ, প্রতিপাদ্য বিষয়) তিনি অভিনয় করতেন। গিরিশবাবু, [illegible] মত সুরেলা অভিনয় তাঁর ছিল না। উচ্চারণ ছিল স্পষ্ট। অভিনয় ছিল স্বাভাবিক। চরিত্রের বিশিষ্ট আবেগের উৎস ছিল স্বতঃসারিত। গদ্য বা

পদ্য যেভাবেই সংলাপ রচনা হোক না কেন, তাঁর অভিনয়ে কোন সুর থাকত না। খুবই Natural ধরনের অভিনয় ছিল তাঁর। তৎকালীন দিনে থিয়েটারে বা যাত্রায় যে কৃত্রিমতা ছিল, তিনি ছিলেন সেই কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত। 'রাজা', 'শারদোৎসব', 'ডাকঘর', 'অচলায়তন'—এ তাঁর অভিনয় এ কথাই স্মরণ করায়। মনে রাখা প্রয়োজন সুরবিহীন এবং কৃত্রিমতা বিহীন স্বাভাবিক অভিনয় শান্তিনিকেতনের অভিনয়-ধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

☐ নাট্যপ্রযোজনায় অঙ্গরচনা ও রূপসজ্জার কাজে তাঁর স্বাতন্ত্রের কি পরিচয় আপনি পেয়েছেন ?

অঙ্গরচনার ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। অভিনেতারা খড়িমাটি ইত্যাদি সহকারে নিজের নিজের যতটা প্রয়োজন অঙ্গরচনা করতেন। এসব ঠিকমত হচ্ছে কিনা তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার দেখে নিতেন।

পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে সিল্কের জামা কাপড় ব্যবহার করা হ'ত। পরিচ্ছদ চরিত্রানুগ করার চেষ্টা করা হ'ত। পুরুষেরা যখন স্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন তখন সে সকল পোষাক দিনু-ঠাকুরের স্ত্রী কমলাদেবীর কাছ থেকে (শাড়ী, গহনা, ইত্যাদি) নিয়ে আসা হ'ত। সৈনিক, রাজা ইত্যাদির অস্ত্র-শস্ত্র বলতে তেমন কিছু দেখান হ'ত না। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে প্রতাপের ভূমিকায় জ্ঞানবাবু সিল্কের জামা সহ একটা ইজের পড়েছিলেন।

☐ নাটক পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী কি ধরণের ছিল ?

পরিচালনার ক্ষেত্রে চরিত্র নির্ব্বাচন, নাটকের মহড়া, অভিনয় শৃঙ্খলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন খুবই কড়া প্রকৃতির। চরিত্র নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি দেখতেন অভিনেতার দৈহিক এবং চারিত্রীক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অভিনেতব্য চরিত্রের এসব দিকের মিল আছে কিনা। উচ্চারণের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করতেন। উচ্চারণে বাঙালপনা তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না এবং উচ্চারণে স্বর আছে কিনা তাও লক্ষ্য করতেন। কোন ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করে দিতেন।

চরিত্র নির্ব্বাচনের পর মূল নাটকের সঙ্গে এর সংযোগ কোথায় তা বুঝিয়ে দিতেন। বারবার চরিত্র পাঠ করিয়ে, বারবার বুঝিয়ে দিয়ে তিনি তাদের গড়ে তুলতেন। বারবার পাঠের ফলে জিহ্বার আড়ষ্টতা কেটে যেত। এর ফলে অভিনয় শৈলী খুব Perfect হ'ত। এ সকল বিষয়ে শেষের দিকে তাঁকে খুবই সহায়তা করেছিলেন তাঁর পুত্রবধূ প্রতিমা ঠাকুর বিশেষত নৃত্যনাটকের ক্ষেত্রে। যে নাটকই তিনি অভিনয় করাতেন তা ভালোভাবে মহড়া দিতেন। দর্শক সমক্ষে উপস্থিত করার আগে সেই নাটক তিনি কয়েকবার শান্তিনিকেতনে করে নিয়ে তারপর চূড়ান্ত-ভাবে উপস্থিত করতেন। অনেক সময় নাটক চলাকালীন নাট্যচরিত্রের সঙ্গীতের পরিবর্তনও করতেন। দুইদিন নাটক অভিনীত হবার পর, নূতন চিন্তা, চেতনার

সঙ্গে সঙ্গে তিনি তৃতীয় দিনে কোন নূতন গান সংযোজন করতেন বা চরিত্র এদিক থেকে ওদিকে সরিয়ে নিতেন।

পরিচালনার ক্ষেত্রে রীতির দিক থেকে তিনি বিদেশের কোন নাট্যকার বা পরিচালকের কাছে ঋণী ছিলেন না। নিজের চিন্তার মেরুবৃত্তে তিনি নিজেই ভ্রমণ করতেন। কারণ তিনি ছিলেন Born Artist। মঞ্চে অভিনয়ের সময় সংলাপ বলা ও পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে যাতে সকল চরিত্রই তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেদিকেও তিনি দৃষ্টি দিতেন।

'শারদোৎসব' নাটকে কোরাস গানের সময় গানের সঙ্গে সঙ্গে কোন নাচ হ'ত না। নাচ তখন আসেনি। এ সকল গান ছিল Action Songs। গানের সময় প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাভাবিক ভাবে movement সহকারে গান হ'ত। 'শারদোৎসব' নাটকের বেদমন্ত্র শিখিয়েছিলেন বিধুশেখর শাস্ত্রী। প্রথমে মন্ত্রের অর্থের সঙ্গে অভিনেতাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে তারপর কিভাবে পাঠ করতে হবে তাই শিখিয়েছিলেন। অনেক সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কোন কারণবশত সংলাপ ভুলে গিয়ে wings এর পাশ দিয়ে চলে যেতেন। শারদোৎসব নাটকে এইরকম ঘটনা ঘটেছিলো। তখন বালকদের মধ্যে কয়েকজন ঠাকুর্দার হাত ধরে এনে বল্লে "ঠাকুর্দা তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে"—তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আবার ফিরে এলেন।



॥ সূত্র-পরিচিতি ॥

১. সাক্ষাৎকার ঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা-৪৩৩

২. সাক্ষাৎকার ঃ প্রমথনাথ বিশী, পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা-৪৩০

৩. "ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে। তাহাতে দৃশ্যপটের কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল এরূপ আমি বোধ করি না। কলাবিদ্যা যেখানে একেশ্বরী সেইখানেই তাহার পূর্ণ গৌরব। সতীনের সঙ্গে ঘর করিতে গেলে তাহাকে খাটো হইতেই হইবে। বিশেষত সতীন যদি প্রবল হয়।" পৃষ্ঠা-৭৩। বিচিত্র প্রবন্ধ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৮২, কলিকাতা।

৪. "আমাদের রূপসজ্জা, মঞ্চসজ্জা অনেকটা বিলিতী অনুকরণে হত। হ, চ, হ, হরিশচন্দ্র হালদার আমাদের দৃশ্য পটগুলি অতি নিকৃষ্ট বিলিতী অনুকরণে আঁকতেন।" পৃষ্ঠা-৩৪। রবীন্দ্রস্মৃতি—ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী, কলিকাতা, ১৯৬২।

৫. "ফাল্গুনীতে···স্টেজের উপর তৈরী হোল প্রায় একটা আস্ত বাগান—গাছে ফুল ফুটে আছে, গাছের ডালে বাঁধা রয়েছে দোলনা···।" পৃষ্ঠা-১৩৫। পিতৃস্মৃতি—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৬৬, কলিকাতা।

৬. "নন্দলালকে বললুম, নন্দলাল নীল রঙের বনাতের উপরে চাঁদ দিতে হবে। ···সত্যিকারের চাঁদ চাই। ···বললুম যাও মালীর দোকান থেকে রুপোলি কাগজ নিয়ে এসো। নন্দলাল তখুনি দু-সিট রুপোলি কাগজ নিয়ে এল। বললুম কাটো, বেশ বড়ো করে একটি প্রতিপদের চাঁদ কাঁচি দিয়ে কাটো, আর গুটি দুই তিন তারা। নন্দলাল বেশ বড়ো করে চাঁদ ও গুটি দুই-তিন তারা রুপোলি কাগজের সিট থেকে কেটে নিয়ে এল। আমি বললুম যাও বেশ ভালো করে আঠা লাগিয়ে আকাশের গায়ে সেঁটে দাও। ···তারপর স্টেজেতে নীল পর্দার উপরে যখন লাইট পড়ল, যেন সত্যিকার আকাশটি।" —পৃষ্ঠা-১৪২—১৪৩। ঘরোয়া—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী,

৭. সাক্ষাৎকার ঃ প্রথমনাথ বিশী, পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা—৪৩১

৮. পৃষ্ঠা-১০৬, রবিতীর্থে—অসিতকুমার হালদার, কলিকাতা, ১৩৬৫।

৯. "শেষের দৃশ্য দুইটি এখনও যেন চোখের উপর ভাসিতেছে। রঙ্গমঞ্চের চন্দ্রতারকাখচিত আকাশ ও চাঁদের আলো যেন সত্যকার আকাশ ও চাঁদকেও

সৌন্দর্য্যে হার মানাইয়াছে।" —পৃষ্ঠা-১২৭, পুণ্যস্মৃতি—সীতাদেবী। কলিকাতা, '

১০. আমাদের দেশের যাত্রা আমার এজন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে।" পৃ, ৭৫-৭৬। বিচিত্র প্রবন্ধ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, -

১১. সাক্ষাৎকার ঃ প্রমথনাথ বিশী, পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৩৩

১২. সাক্ষাৎকার ঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পরিশিষ্ট, পৃ. ৪৩৫

১৩. "···চোখ ভোলানো বিসদৃশ জাঁকজমক ছেড়ে সাজসজ্জায় দেখা দিল সত্যিকারের মন ভোলানো শিল্পরুচির অভিব্যক্তি"—পৃ. ৮৯। রবি-চ্ছবি প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত।

১৪. "কোন মন্ত্র বলে যে তিনি নিজের বয়স হইতে ত্রিশটা বৎসর খসাইয়া ফেলিয়া দিলেন তাহা বুঝিতে পারা গেল না···বিচিত্র মহার্ঘ্য সজ্জায় সজ্জিত কবিশেখরের ভিতর আমাদের সুপরিচিত রবীন্দ্রনাথকে খুঁজিয়া পাইতেই অনেক সময় কাটিয়া গেল···"। পৃ. ৭৪। পুণ্যস্মৃতি——সীতাদেবী, কলিকাতা

১৫. "প্রথমেই ইহার সাজসজ্জার মধ্যে এমন একটি অকৃত্রিমতা আড়ম্বর শূন্যতা নিরাভরণ সৌন্দর্য্য ছিল যাহা অচিরে বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চের উপর নীরবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।"···পৃষ্ঠা-৫০৬। রবীন্দ্র জীবনী (দ্বিতীয় খণ্ড) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৩৮৩।

১৬. "নূতন নাটক লেখা হলে আমাদের সকলকে ডাকিয়ে এনে সে লেখা শোনানো—এ ছিল তাঁর রীতি"—পৃষ্ঠা-১৩১। রবীন্দ্রস্মৃতি—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা।

১৭. "অভিনয়ের জন্য লোক বাছাবাছির ব্যাপারে বাবা খুবই সতর্ক ছিলেন, বেজায় কড়া ছিল তাঁর মানদণ্ড।" পৃ. ১৩৩। পিতৃস্মৃতি—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৬৬, কলিকাতা।

১৮. "আমাদের অভিনয় শেখাতে গুরুদেব খুব বেশী পরিশ্রম করেছিলেন। এক এক দৃশ্য কতবার অভ্যাস করতে হয়েছিল। মহড়ার সময় গুরুদেব বলতেন"—ওরে সুধীরঞ্জন বেশ হচ্ছে কিন্তু আর একটু দরদ দিয়ে বল—বলে নিজেই সেই কথাগুলি আবৃত্তি করতেন" পৃ. ৮৭। আমাদের শান্তিনিকেতন—সুধীরঞ্জন দাস। ১৩৬৬, কলিকাতা।

১৯. অভিনয় করার রীতির বিষয় উপদেশ দিয়ে বললেন "স্টেজের সামনে চেনাশুনা শুধু লোক বসে থাকবে। তুই তাদের দিকে চাইবিনে। কেবল ভাববি তোর সামনে একটা অরণ্য। Self Conscious না হলে অভিনয় হয় না। কোন আর্টই হয় না। নিজেকে ভুলে যেতে হবে অভিনয়ের সময়ে।" পৃ. ৯১-৯২। রবিতীর্থে—অসিতকুমার হালদার। কলিকাতা ১৩৬১।

২০. "গুরুদেব এত সুন্দরভাবে নিজে করে দেখাতেন যে তাঁর নটকুশলতায় আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেতাম—পৃ. ৭৬। মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ—অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, ১৯৬৪।

২১. "দ্বিজেন্দ্রনাথ…যে শুধু ভালো গাইতে পারতেন তা নয়, তাঁর অভিনয় ক্ষমতা ছিল অপূর্ব" পৃ. ৩১-৩২। স্মৃতিকথা—মীরাদেবী। প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা।

২২. "কবির নাটকে যাঁহারা অভিনয় করিতেন তাঁহাদিগকে বড়ই বিপদে পড়িতে হইত। যে পর্যন্ত অভিনেতা মঞ্চে গিয়া না দাঁড়াইতেন, সে পর্য্যন্ত তাঁর ভূমিকার পরিবর্তন হইতে থাকিত।" পৃ. ১১। ঠাকুরবাড়ির আঙ্গিনায় —জসীমউদ্দীন, প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা।

২৩. "রবীন্দ্রনাথের মত সুপুরুষ কখনোও দেখিনি। তাঁর বর্ণ ছিল গৌর, আকৃতি দীর্ঘ। কেশ আপৃষ্ঠ লম্বিত ও কৃষ্ণবর্ণ, দেহ বলিষ্ঠ, চর্ম মসৃণ ও চিক্কন, চোখ-নাক অতি সুন্দর…রূপের যদি প্রসাদগুণ থাকে তো সে গুণ তাঁর দেহে ছিল।" পৃ. ২৩। রবীন্দ্রনাথ—প্রমথ চৌধুরী, ১৯৬১. কলিকাতা।

২৪. "রবীন্দ্রনাথের খুব তীব্র, তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বর ছিল, যা বাঁশির মতো একদম গ্যালারীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত চলে যেত"—পৃ. ৩৪। রবীন্দ্রনাথ ও সাধারণ নাট্যশালা—হরীন্দ্রনাথ দত্ত। কলিকাতা

২৫. "নানা প্রবন্ধে ও নানা কবিতায় বিভিন্ন ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে ও বিভিন্ন শব্দার্থ ব্যাঞ্জনার জন্যে তাঁর কন্ঠস্বরের মধ্যে যে বিচিত্র পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি তা যে কোন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার উপযোগী" পৃ. ১১৮। সৌখীন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ—হেমেন্দ্রকুমার রায়। প্রথম সংস্করণ, কলিকাতা।

২৬. …"রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত সচেতন সত্তা বিলীন হোতে পারতো না যে চরিত্র অভিনয় করতেন তারমধ্যে" পৃ. ১৪১। (অভিনয়ের স্মৃতি—সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর) রবীন্দ্র স্মৃতি—বিশ্বনাথ দে।

২৭. "…অভিনেতাদের চলা ফেরা, উচ্চারণ ও বাক্যে কোথাও কোনরকম অতিরঞ্জন থাকবে না। রবীন্দ্রনাথের অভিনয় 'আমাকে এই কথার সত্যতা স্মরণ করিয়ে দেয়।…তাঁর অভিনয় সমগ্রভাবে শিল্পীর মিতব্যয়িতার এক আদর্শ কেতাব বললেই হয়।" পৃ. ৯০, বাঙালীর নাট্য চর্চা—অহীন্দ্র চৌধুরী,

২৮. "প্রত্যক্ষদর্শী অবনীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন পাবলিক স্টেজে 'রাজা ও রাণী' অভিনয় দেখার নিমন্ত্রণ পেয়ে তাঁরা গিয়েছিলেন সেখানে। গিয়ে একেবারে তাজ্জব বনে গেলেন। 'রাণী সুমিত্রা' স্টেজে এল একেবারে মেজো জ্যাঠাইমা। গলায় সুর, অভিনয় সাজসজ্জা, ধরন ধারণ হুবহু মেজো জ্যাঠাইমার নকল করেছে। পৃ. ৩৪। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল—চিত্রা সেন।

২৯. "আর একবার 'ডাকঘর'…সেবারেও টিকট করা হয়েছিল।…টিকিটের জন্য মারামারি করে লোকে দাঁড়িয়ে দেখেছে। শেষ মুহূর্তেও একশো টাকা দিয়ে টিকিট কিনেছে…" পৃ. ৮৭। ঠাকুরবাড়ির গগনঠাকুর—পূর্ণিমাদেবী।

৩০. "রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে যেমন সাহিত্যের শ্রেণীবিশেষে ফেলা যায় না, তাঁহার অভিনয়কলা সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে।…সমস্ত ভূমিকাই তাঁহার ব্যক্তিত্বের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পাইত।" পৃ. ৭৭। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন—প্রমথনাথ বিশী।

৩১. পৃষ্ঠা ১৬, শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার—মণি বাগচি, কলিকাতা,

৩২. "…তাঁর অভিনয়ে, তাঁর বাচনভঙ্গীতে, তাঁর উচ্চারণে আমি নিজে প্রথম বুদ্ধির দীপ্তি স্পষ্ট অনুভব করলাম। একমাত্র তাঁর কণ্ঠেই কাব্যের কথা যেন স্পষ্ট রূপ পেতো।…আর কারোর অভিনয়েই সে উপলব্ধি আমার হ'ত না।" পৃ. ১৩৫, প্রসঙ্গ নাট্য—শম্ভু মিত্র, কলিকাতা

৩৩. পৃষ্ঠা ১৩-১৪। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা। শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার—মণি বাগচি। ১৯৬০, কলিকাতা।

৩৪. শিশিরকুমারের অশোক চরিত্রাভিনয় প্রসঙ্গে মহেন্দ্রগুপ্ত। পৃ. ৩০। নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার—শঙ্কর ভট্টাচার্য্য।

৩৫. "যাঁহারা শিশিরকুমারের চাণক্য দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন চাণক্যের অভিনয়ে শিশিরকুমার বুদ্ধিকেই প্রধান সূত্ররূপে অবলম্বন করিয়া থাকেন। এমন কি স্থূল দর্শককে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবার নিমিত্ত স্থূল অভিনয়-কলার আশ্রয় পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া হস্তদ্বারা মস্তিষ্কের প্রতি ইঙ্গিত করেন।

আকারে, ভঙ্গীতে, চলায় ফেরায় এক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত আত্মানবকে পাদপ্রদীপের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন শিশিরকুমার”—‘দানীবাবুর চাণক্য ও শিশিরবাবুর চাণক্য’—নরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী, ভগ্নদূত পত্রিকা।

৩৬. নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার স্মৃতি তর্পন—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৫-২৬, নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার—শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, ১৩৭৭, কলিকাতা।

৩৭. সম্পাদকীয় ঃ শনিবারের চিঠি, ৩১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৬৬।

৩৮. পৃষ্ঠা ১৮-১৯। নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার—শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা

৩৯. কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি পেলাম।

তোমার ইনষ্টিটিউটের বন্ধুদের জানিও তাঁদের অভিনয় আমার খুব ভালো লেগেছিল। ‘বৈকুন্ঠের খাতা’র এমন সুনিপুণ অভিনয় এক আমাদের বাড়িতে গগন অবনদের ছাড়া আর কারুরই পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেদার আমার ঈর্ষার পাত্র। একদা ঐ পার্টে আমার যশ ছিল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৩শে মাঘ, ১৩১৮

পৃষ্ঠা ১। অমল হোমকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র।
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ শিশিরকুমার—অমল মিত্র। কলিকাতা।

৪০. পৃষ্ঠা ১০৯। শিশিরকুমারের অভিনয় শিক্ষাদান প্রসঙ্গে—অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু। শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার—মণি বাগচী, ১৯৬০-কলিকাতা।

৪১. “এর জন্যই টিম ওয়ার্ক অমন সুন্দর হ’ত। দর্শকচিত্তে নাটকের আবেদন সামগ্রিক হয়ে উঠত। অভিনয় কার্য্যটি যে একটা সম্পূর্ণ ব্যাপার এই বোধটি তখন থেকেই শিশিরকুমারের শিল্পচেতনায় ধরা দিয়েছে।” পৃ. ৯৬। শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার—মণি বাগচী।

৪২. পৃষ্ঠা ৬। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা। নাট্যাচার্য্য শিশির কুমার—শঙ্কর ভট্টাচার্য্য, ১৩৭৭, কলিকাতা।

৪৩. ধীরেন্দ্রনাথ বিশী, পঁচাত্তর বছরের প্লাটিনাম জুবিলী স্মারক গ্রন্থ

৪৪. Page-85, Some Memories Half a Century Back—Suniti Kumar Chatterjee, Platinum Jubilee Souvenir (1891-1966) Calcutta University Institute.

৪৫. "ইনস্টিটিট্যুট ছাড়া শিশিরকুমার তখন ওল্ড ক্লাবের প্রাণস্বরূপ। কৃতবিদ্যা এবং কলাকুশলী কজন সদস্যকে নিয়ে ক্লাবে যে নাট্য সম্প্রদায় গঠিত ছিল, সে সম্প্রদায় শিশিরকুমারের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে করেছিলেন নাট্যশিক্ষক।" পৃ. ৪৩। সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের বিবরণ। নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার—শঙ্কর ভট্টাচার্য্য। কলিকাতা

গ্রন্থপঞ্জী

ইংরাজী

A

১. Aristotles Theory of Poetry and Fine Arts.—S. H. Butcher.
২. The Art of Dramatic Writing.—Lajos Egri.
৩. The Analysis of Play constructions and dramatic principles. W. T. Price.
৪. Asoka—the Buddhist Emperor of India.—V. A. Smith
৫. Ancient India.—R. C. Majumder.
৬. Annals and antiquities of Rajashthan.—Col. J. Tod
৭. Akbarnama—Sheikh Abul Fazal
৮. A-In-I-Akbari—Abul Fazal Allami
৯. Akbar—the great Moghul—V. A. Smith
১০. The Art of Dramatist—J. B. Priestly
১১. The Anatomy of Satire—G. Highet
১২. The Anatomy of Drama—M. Boulton
১৩. The Art of Drama—R. Peacock
১৪. Acting and stage craft—D. Bowskill
১৫. Acting the First Six lessons—R. Boleslavsky
১৬. The Age of Shakespeare—Boris Ford
১৭. Akbar the Great (Vol 1)—A. L. Srivastav
১৮. The Analysis of the Phenomena of human mind.—J. Mill
১৯. The Art of the Actor—C. Coquelin.

B

২০. Baji Rao I, the great Peshwa—C. K. Srinivasan.

C

২১. The Collected works of William Hazlit—A. R. Walter and Arnold Glover.
২২. Complete Stories of great Ballets—G. Balanchine

২৩. Character and Conduct of life—W. Mcdugal
২৪. Clue to Suicide—E. S. Shnciduman and N. L. Farberow
২৫. Complete works of Shakespeare—Odhams Press Ltd, Publication, London, 1923

D

২৬. The Dasarupa—Dhannanjaya. (edt. by George. C. O. Haas)
২৭. The Drama and its law and its techniques—E. Woodbridge.
২৮. The Duality of human existence—David Baker
২৯. Drama in Performence—R. William
৩০. Dramatic structure—J. G. Barry
৩১. The Death of Tragedy—G. Steiner
৩২. The Development of Personality—C. G. Jung
৩৩. The Dramatic Event—David Cole
৩৪. Discovering Drama—E. Drew
৩৫. A Drama of Souls—E. Tornqvist
৩৬. Directing in the theatre—H. Morrison
৩৭. Directors on Directing—T. Cole and H. K. Chinoy
৩৮. Dressing the Play—N. Lambourne
৩৯. The Development of the Theatre—A. Nicol

E

৪০. Elite Conflict in a plural Society—J. H. Broomfield
৪১. The Economic History of India in the Victorian age—Ramesh Dutta.
৪২. Elements of Drama—J. L. Styan
৪৩. Early History of India—V. A. Smith
৪৪. Elements of Tragedy—D. Krook
৪৫. Ebsen's dramatic technique—P. F. D. Tennant
৪৬. The Ego and the Id—S. Freud

F

৪৭. Form of Drama—J. L. Calderwood
৪৮. Fundamentals of Play Directing—A. Dean and L. Carra

G

৪৯. Glory That was Gurjaradesh—K. M. Munshi

H

৫০. Hagel on Tragedy—Anne and H. Paolucce
৫১. The History of Bengal (Vol-2) J. N. Sarker
৫২. The History of Muslim Rules—Iswari Prasad
৫৩. History of Mediaeval Bengal—R. C. Majumder
৫৪. History of India (Vol II) V. A. Smith
৫৫. History of India—Elphinstone
৫৬. History of Aurangzib (Vol-2)—J. N. Sarker
৫৭. History of Aurangzib (Vol-3)—J. N. Sarker
৫৮. History of Aurangzib (Vol-5)—J. N. Sarker
৫৯. History of India—S. L. Poole
৬০. History of Bengal—Charles Stuwart
৬১. History of Jahangir—Beniprasad
৬২. History of Maratha (Vol-2) G. S. Sardesai
৬৩. History of India (Vol-1) A. L. Srivastav

I

৬৪. Indian National Congress (Vol 1)—P. C. Ghosh
৬৫. India's fight for freedom—H. Mukherjee and U. Mukherjee
৬৬. India Today and Tomorrow—R. P. Dutta
৬৭. India Since 1526—V. D. Mahajan and S. Mahajan
৬৮. India in Muhamadan Period—V. A. Smith
৬৯. An Introduction to Psychology—C. T. Morgam
৭০. The Individual Psychology of Alfred Adler—H. Ansbacher and R. Ansbacher
৭১. The Individual and his religion—G. W. Alport
৭২. Introduction to Psychology—N. L Munn
৭৩. An Introduction to the Study of literature—W. H. Hudson
৭৪. An Introduction to sociai Psychology—W. Mcdugal.
৭৫. Indian stage (Vol 1)—H Dasgupta

J

৭৬. Julius Caesar—W. Shakespeare

K

৭৭. King Lear—W. Shakespeare

L

৭৮. Life of Subheder Malhar Rao—M. W. Burway and R. G. Burway

৭৯. Laughter—H. Bergson

৮০. Leviathan—T. Hobbes

M

৮১. Memories of my life and time—Bipinchandra Pal

৮২. The Mughul Empire—A. L. Srivastav

৮৩. Mind in action—C. H. Whitely

৮৪. Mourring and Melancholia—S. Freud

৮৫. Macbeth—W. Shakespeare

৮৬. Motivation and Emotion—P. T. Young

৮৭. The Multiple Plot in English Renaissance Drama—R. Lavin

N

৮৮. Notes on Indian History—Karl Marx

৮৯. The Nature of Human Conflicts—A. R. Luria

৯০. New History of Marratha (Vol-2)—G. S. Sardesai

O

৯১. On Plot in Tragedy—D. H. Sius

৯২. On Literature and Art—V. I. Lenin

৯৩. The Oxford Student's History of India—V. A. Smith

৯৪. An Outline of Psycho-Analysis—S. Freud

৯৫. On Dream—S. Freud

৯৬. Oppression—a study in social and criminal Psychology—T. Grygier and H. Mannheim

৯৭. An Outline of abnormal Psychology—G. Murphy
৯৮. On the Art of the Theatre—E. G. Craig
৯৯. An outline of Psychology—W. Mcdugal
১০০. Opera Companion—G. Martine

P

১০১. The Problem of India—K. S. Shelvankar
১০২. Play writing—a manual craftmanship—W. Archer
১০৩ Play wright at Work—John. Van Druthen
১০৪. Political History of Ancient India—H. Roychowdhury
১০৫. Pattern in Shakespearen Tragedy—I. Ribner
১০৬. Psychological foundation of Personality—P. L. Thrope
১০৭. Psychology and the Mental health—J. A. Hadfield
১০৮. Psychological Reflections—C. G. Young
১০৯. Psychotic Conflict and Reality—S. Freud
১১০. Psychology of insanity—B. Hart
১১১. The Plays the Thing—L. Langner
১১২. Psychology the study of behaviour—W. Mcdugal
১১৩. Poetry and Drama—T. S. Eliot
১১৪. Producing the Play—John Gassner
১১৫. The Paradox of Tragedy—D. D. Raphall
১১৬. The Poems of A. L. Tennyson—Ed. by C. Ricks

R

১১৭. Romeo and Juliet—W. Shakespeare
১১৮. Reading a Play—L. W. Cor
১১৯. The Rise and fall of Muslim Power in Gujrat—S. C. Mishra
১২০. Rise and fall of Mughal Empire (Vol 1)—R. R. Tripathi

S

১২১. Satish Chandra Mukherjee and the Dawn Magazin—H. Mukherjee
১২২. Shakespeare—H. Flucher
১২৩. Shakesperean Tragedy—A. C. Bradley
১২৪. A Structural approach to the analysis of Drama—P. M. Levitt

১২৫. The Sultanate of Delhi—V. D. Mahajan and S. Mahajan
১২৬. Shivaji and his times—J. N. Sarker
১২৭. Shakespeare's Men and Women—L. Mohan
১২৮. Shakespeare's Comic Theory—A. T. Nelson
১২৯. Shakesperean Comedy—H. B. Charlton
১৩০. Social interest a challenge to mankind—A. Adler
১৩১. Social Psychology—K. Young
১৩২. Silas Marner (The Weaver of Raveloe)—G. Eliot
১৩৩. Shakespeare's Tragic heroes—L. B. Campbell
১৩৪. Social status and Psychological disorder—B. P. Dohrenwend and B. S. Dohrenwend
১৩৫. Shakespeare's Dramatic Art—W. Clemen
১৩৬. Stage Makeup—R. Corson
১৩৭. The stage in Action—S. Seldon

T

১৩৮. Theatre and Dramatic Theory—A. Nicol
১৩৯. The Theory and technique of Playwriting and Screen writing —J. H. Lawson
১৪০. Tragedy and Theory of drama—E. Olson
১৪১. Themes and Conventions of Elizabethan Tragedy—M. C. Bradbook
১৪২. Tragic Drama in Aeschylus, Sophocles and Shakespeare—L. Campbell
১৪৩. The technique of drama—G. Freytag
১৪৪. Tragedy—F. L. Lucas
১৪৫. Theatre—D. Maccarthy
১৪৬. The Theory of Comedy—E. Olson
১৪৭. Theory of Dram—A. Nicol

U

১৪৮. Understanding Drama—C. Brooks and R. B. Heilman

V

১৪৯. Vir-Vinod (Vol III)—
১৫০. The vision of Tragedy—R. B. Selwall

W

১৫১. Wit and its relation to the unconsious—S. Freud
১৫২. What happens in Hamlet—J. Doverwilson
১৫৩. World Drama—A. Nicol

বাংলা

অ

১। অথ-নট-ঘটিত—সূত্রধর
২। অমরেন্দ্র—উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
৩। অঙ্গরচনার রূপ ও রীতি—রঞ্জিত মিত্র
৪। অগ্নিযুগের কথা—সতীশ পাকড়াশী
৫। অভিনয় দর্পণ—নন্দীকেশ্বর
৬। অভিনেতৃ কাহিনী—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত
৭। অমৃতলাল বসুর জীবনী ও সাহিত্য—ডঃ অরুণকুমার মিত্র
৮। অর্দ্ধেন্দুশেখর—উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
৯। অর্দ্ধেন্দুশেখরের নটজীবন—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১০। অর্দ্ধেন্দুশেখর ও বাংলা থিয়েটার—শংকর ভট্টাচার্য্য

আ

১১। আত্মজীবনী—কৃষ্ণকুমার মিত্র
১২। আত্মকথা—প্রমথ চৌধুরী
১৩। আমাদের শান্তিনিকেতন—সুধীরঞ্জন দাস

এ

১৪। একশো বছরের নাট্য প্রসঙ্গ—দেবনারায়ণ গুপ্ত

ক

১৫। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নটরাজ শিশির কুমার—অমল মিত্র

গ

১৬। গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য—কুমুদবন্ধু সেন
১৭। গিরিশচন্দ্র—অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়
১৮। গিরিশচন্দ্র—উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
১৯। গিরিশচন্দ্র—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

২০। গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প—মহেন্দ্রনাথ দত্ত
২১। গিরিশচন্দ্র—দেবেন্দ্রনাথ বসু
২২। গিরিশচন্দ্র—কিরণ দত্ত
২৩। গিরিশ রচনাবলী (৫ম ভাগ)—দেবীপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সম্পাদিত।
২৪। গীতবিতান—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঘ

২৫। ঘরোয়া—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ

২৬। জাগৃতি ও জাতীয়তা—যোগেশচন্দ্র বাগল

ঠ

২৭। ঠাকুরবাড়ীর আঙ্গীনায়—জসিমউদ্দীন
২৮। ঠাকুরবাড়ীর অন্দরমহল—চিত্রাদেব
২৯। ঠাকুরবাড়ীর গগনঠাকুর—পূর্ণিমা দেবী

ড

৩০। ড্রাইডেন ও ডি· এল রায়—মুনীর চৌধুরী

দ

৩১। দ্বিজেন্দ্রলাল—উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
৩২। দ্বিজেন্দ্রলাল—দেবকুমার রায়চৌধুরী
৩৩। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—নবকৃষ্ণ ঘোষ
৩৪। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—কবি ও নাট্যকার—রথীন্দ্রনাথ রায়
৩৫। দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী—ডঃ অজিত কুমার ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত
৩৬। দৃশ্যকাব্য পরিচয়—সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়
৩৭। দেশাত্মবোধক ও ঐতিহাসিক বাংলা নাটক—প্রভাতকুমার গোস্বামী

ন

৩৮। নাট্যশাস্ত্র—ভরত
৩৯। নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার—সাধনকুমার ভট্টাচার্য্য
৪০। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
৪১। নাটক ও নাট্য আন্দোলন—গঙ্গাপদ বসু
৪২। নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার—শঙ্কর ভট্টাচার্য্য
৪৩। নাটকের কথা—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ

প

৪৪। পঞ্চভূত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪৫। পিতৃস্মৃতি—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪৬। পুন্যস্মৃতি—সীতাদেবী
৪৭। প্রসঙ্গ নাট্য—শম্ভু মিত্র

ব

৪৮। বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
৪৯। বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ
৫০। বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও দানীবাবু—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
৫১। বাংলা লোকনাট্য সমীক্ষা—ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য্য
৫২। বাংলাদেশের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
৫৩। বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস (১ম ভাগ)—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
৫৪। বাংলা সাহিত্যে পৌরানিক নাটক—ডঃ রথীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৫। বাংলা নাটকের ইতিহাস—ডঃ অজিত ঘোষ
৫৬। বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার—হেমেন্দ্রকুমার রায়
৫৭। বাংলা থিয়েটারে অভিনয়—শংকর ভট্টাচার্য্য
৫৮। বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র—অহীন্দ্র চৌধুরী
৫৯। বাঙালীর নাট্যচর্চা—অহীন্দ্র চৌধুরী
৬০। বাংলা নাটকে লোক প্রভাব—ডঃ মীরা গাঙ্গুলী
৬১। বাংলা নাটকের বিবর্তন—সুরেশচন্দ্র মৈত্র
৬২। বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—মন্মথমোহন বসু
৬৩। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন
৬৩ক। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৪। বাংলা সাহিত্যে লঘুনাট্যের ধারা—বৈদ্যনাথ শীল
৬৫। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস—অজিত দত্ত
৬৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)—ডঃ সুকুমার সেন
৬৭। বিনয় সরকারের বৈঠকে—(১ম ভাগ)
৬৮। বিবেকানন্দ রচনাবলী—গোপাল হালদার সম্পাদিত
৬৯। বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী—উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
৭০। বিচিত্র প্রবন্ধ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৭১। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭২। বঙ্গীয় নাট্যশালা—ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়









৯৯। শতবর্ষে নাট্যশালা—আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ও অজিত ঘোষ
১০০। শিশির সান্নিধ্যে—রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু
১০১। শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার—মনি বাগচি

স

১০২। সঞ্চয়িতা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১০৩। সতর্কীকরণ ও হিন্দুসংগঠনের আবশ্যকতা—সদানন্দ স্বামী
১০৪। স্বর ও বাক্‌রীতি—ডঃ গৌরীশংকর ভট্টাচার্য্য
১০৫। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (২য় খণ্ড)—বিনয় ঘোষ
১০৬। সাহিত্য ও সমাজ মানস—নারায়ণ চৌধুরী
১০৭। স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল—হীরালাল দাশগুপ্ত
১০৮। সাহিত্য দর্পণঃ—বিশ্বনাথ কবিরাজ
১০৯। সাজঘর—ইন্দ্রমিত্র
১১০। স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখরের নটজীবন—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
১১১। স্মৃতিকথা—মীরাদেবী
১১২। সৌখিন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ—হেমেন্দ্রকুমার রায়

পত্র-পত্রিকা

১। Amrita Bazar Patrika—২৩.১২.১৮৭৫, ৯.১২.১৯০৫
২। Bengalee—৩.৯.১৯০৭
৩। Gujrati Dipotsavi Number—১৫.১০.১৯৩৩
৪। Hindu Patriot—২২.৫.১৮৬৫, ১.১.১৯০৮, ১২.৮.১৯০৫, ৫.৭.১৯০৬, ২১.৭.১৯০৬, ১৩.১২.১৯০৬, ২০.৫.১৯০৮, ১০ ৪.১৯০৮
৫। Indian Daily News—২২.৮.১৯০৫, ৯.১২.১৯১১, ১১.১.১৯১২, ১৬.৮.১৯১২
৬। Indian Mirror—২১.৮.১৯০০, ১৫.১১.১৯০৩
৭। Indian Nation—১৪.৮.১৯০৫
৮। Nagari Pracharini Patrika Beneras—Vol XI 1887/1937
৯। Report of the National Council Education Bengal—1908
১০। Statesman—৮.১.১৯১০, ১৫.৪.১৯০৫, ১৯.৭.১৯০৫ ২১.৮.১৯০৭
১১। The Telegraph—২৮.৯.১৯১২
১২। অভিনয় পত্রিকা (শারদ সংকলন), অক্টোবর, ১৯৭৮।
১৩। অর্চ্চনা পত্রিকা—আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩১৫।
১৪। ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটয়্যুট (কলিকাতা) প্লাটিনাম জুবিলী স্মারক গ্রন্থ।
১৫। গল্পভারতী (বঙ্গরঙ্গমঞ্চ শতবর্ষ সংখ্যা)—ফাল্গুন, ১৩৮০।
১৬। থিয়েটার—৪ঠা ভাদ্র, ১৩২১।
১৭। দেশ পত্রিকা—১৪.৮.১৯৮২।
১৮। নাট্যমন্দির—শ্রাবণ—১৩১৭, শ্রাবণ-ভাদ্র—১৩১৯, ভাদ্র—১৩১৭, পৌষ—১৩১৭, আশ্বিন-কার্ত্তিক—১৩১৭।
১৯। নব প্রবন্ধ—ফাল্গুন—১২৭৪
২০। নাচঘর—১৪ই কার্ত্তিক—১৩৩১, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৭, ১৪ই কার্ত্তিক—১৩১১।
২১। নাট্যপ্রতিভা—ফাল্গুন, ১৩২৫।
২২। পরিচয় পত্রিকা—বৈশাখ, ১৩৪৯।
২৩। পার্কসার্কাস বেনিয়াপুকুর দুর্গোৎসব সুভেনির—শারদোৎসব সংখ্যা ১৩৮৭।

নির্দেশিকা

বাংলা

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
৭৩	৯	Lewis Campbeel	Lewis Campbell
৭৪	৮	বিভাজত	বিভাজিত
৭৭	১৫	কার্যকারী	কার্য্যকরী
৮৫	২৭	আণীত	আনীত
৮৬	০৭	ভ্রষ্টাচারি	ভ্রষ্টাচারী
৮৮	০৯	তুষারবৃত স্থানে	তুষারাবৃত স্থানে
৮৮	২৭	লাভেয়	লাভের
৮৯	০২	দধিচী	দধীচির
৯০	১৯	অম্বরষ	অম্বরীষের
৯০	২২	বিশ্বমিত্র	বিশ্বামিত্র
৯১	২২	সাহায্যে	সাহায্য
৯৩	২৮	বামনাচার্য্যের	যামনাচার্য্যের
৯৫	১৪	দৃশ্যগুলি	দৃশ্য
৯৫	৩২	আকবরীনামা	আকবরনামা
৯৬	২০	পুনরায়	পুণরায়
১০০	১৬	কেন্দ্রিয়	কেন্দ্রীয়
১০১	০৮	মর্যদা	মর্য্যাদা
১০১	২২	রূপে	রূপে
১০৪	১৩	সমন্দ্রে	সমরেন্দ্র
১০৫	১৫	অবস্থা	অবস্থার
১০৬	২০	চুক্তিয়	চুক্তির
১০৭	০৪	অধ্যবসনার	অধ্যবসায়ের
১০৭	৩৫	দৃশ্যে	দৃশ্যে
১০৯	২০	কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত	কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত
১১১	৩০	পলায়ন	পলায়নের
১১২	২৯	মায়াকানন্দ	মায়াকানন

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
১১৩	১৪	স্থীর্পে	স্থীর্পে
১২৪	১৯	chaleos stowart	Charles Stuwart
১২৭	২৫	Number of clashos	Number of clashe:
১২৭	৩২	মহারাষ্ট্র	মহারাষ্ট্রের
১২৮	২৯	১৩৩ক (সূত্র নং)	১৩৪
১২৯	০২	১৩২ ,,	১৩৪ক
১২৯	০৩	১৩৩ ,,	১৩৫
১২৯	১২	১৩৪ ,,	১৩৬
১৩০	১১	১৩৫ ,,	১৩৭
১৩০	১৬	১৩৬ ,,	১৩৮
১৩২	০৪	সূতয়াং	সূতরাং
১৩৩	০৮	১৪৭ (সূত্র নং)	১৪৫
১৩৩	২৯	হারিরে	হারিয়ে
১৩৪	২১	প্রসন্নকুমায়ের	প্রসন্নকুমারের
১৪১	১৪	অসঙ্গতিপূর্ণ	অসঙ্গতিপূর্ণ
১৫০	২০	অঙ্গতা	অংগতা
১৫৯	০৯	George Mortin	George Martin
১৭৩	১১	W. H. Huson	W. H. Hudson
২১৩	০৬	অবৃত	আবৃত
২১৮	০৯	ভাব	ভার
২২৩	০২	চিত্রণ	চিত্র
২২৭	০৮	ওঠেছে	উঠেছে
২৩১	২২	গ্রাতা	ভ্রাতা
২৩২	০৩	ওঠেনি	ওঠেনি
২৩৩	২৭	বিদ্যবান	বিদ্যমান
২৩৯	০২	মর্ম্ম দেদনার	মর্ম্ম বেদনার
২৩৯	১৬	ওঠেছে	উঠেছে
২৩৯	২৪	অদূরদর্শিতার	অদূরদর্শিতা
২৪৬	২৬	রাজ্য প্রতিষ্ঠা	রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
২৪৮	০১	ওঠেছে	উঠেছে
২৫৯	২২	Drame of Intrigue	Drama of Intrigue
২৬০	২২	সশস্ত্র	সশস্ত্র
২৬৯	১৮	বিশিস্ট	বিশিষ্ট
২৭১	০৩	Egoistic	Egostic
২৭২	০৪	লক্ষণীয়	লক্ষ্যণীয়
২৭৩	২৯	মব্যে	মধ্যে
২৭৯	২২	কন্য	কন্যা
২৮২	১৩	মাধ্যমের	মাধ্যমে
৩০১	০৮	অপবারিকত	অপবারিতক
৩১৩	১৪	কাপালিক	কাপালিক
৩২৩	১০	সাম্রাটসত্তাকে	সম্রাটসত্তাকে
৩৩৬	০৪	ডুবারে	ডুবায়ে
৩৪৬	১৭	অনুয়ায়ী	অনুযায়ী
৩৪৮	২১	সৃস্টি	সৃষ্টি
৩৫০	২০	গাসে	গ্যাসে
৩৫৬	১৪	ক্রোন্ধান্ধ	ক্রোধান্ধ
৩৫৮	২৭	পথপর্দশক	পথপ্রদর্শক
৪২১	০৩	১৮.১.১৯৯৪	১৮.১.১৯৮৪

———